ইতিহাসের নিরিখে

রবীন্দ্র-নজরুল চরিত

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

ইতিহাসের নিরিখে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

প্রকাশক
ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১
চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

প্রকাশ কাল
জুলাই, ১৯৯৮

মুদ্রাকর
বুক প্রমোশন প্রেস
২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ঃ পঙ্কজ পাঠক

কম্পিউটার কম্পোজ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৩০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ITHEHASHER NIRIKHE RABINDRA-NAZRUL CHARIT : Written by Sarker Shahabuddin Ahmed, Published by : Engr. Munawwar Ahmad, Chairman, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 300.00, US$ 9.00
ISBN-984-493-036-7

পরমসত্তা ও স্রষ্টার প্রতি বান্দার আকুতি

(শুরু করিলাম) ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু!

সুরা ফাতেহার বাংলা কাব্যানুবাদ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম

বান্দার প্রতি পরম সত্তা ও স্রষ্টার বাণী

- (১) ইহা আল্লাহতা'আলার কিতাব, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা, সেই মুত্তাকীদের জন্য (২) যারা গায়েবে (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, আমরা তাদিগকে যে রেযেক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) এবং তোমার পূর্বে যে সব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সেই সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে (৫) বস্তুত এই ধরনের লোকেরাই তাদের খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাইবার অধিকারী। (আল কোরআন, সূরা বাকারা-২, আয়াত ১-৫)
- পড়ুন (হে রাসুল) আপনার রবের নামে যিনি পয়দা করেছেন, জমাট রক্ত থেকে মানুষকে পয়দা করেছেন। আপনি পড়ুন। আর আপনার রব বড়ই মহান। যিনি কলম দিয়ে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে ঐ জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না। কক্ষনো নয়। নিশ্চয়ই মানুষ বিদ্রোহ করে। কারণ সে নিজকে অন্যের মুখাপেক্ষী নয় বলে মনে করে। অথচ আপনার রবের নিকট অবশ্যই আসতে হবে। (সূরা আল-আলাক ঃ ১-৮)
- ওঠ! সতর্ক কর! আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (আল-কোরআন)

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র। যিনি তাঁর সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে আমাদের ভাবতে, বলতে ও লিখতে শিখিয়েছেন। দুনিয়াতে আমাদের তাঁর খলিফা হিসাবে সকল প্রকার কল্যাণ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেছেন তাঁর প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে। আমরা এ লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত থাকতে চাই। আর এ চাওয়াতেই আজ আমি আমার অনুভূতি প্রকাশের মহৎ সুযোগ পাওয়ায় তওফিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরগাহে লাখো শুক্‌রিয়া আদায় ও প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর লাখো দরুদ পেশ করছি।

এই বিশাল গ্রন্থটি রচনায় যাঁদের লেখা গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ আমাকে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সহায়তা করেছে তাঁরা হলেন ঃ

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, জাতীয় অধ্যাপক আলী আহসান, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুনতাসির মামুন, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আব্দুল কাদির, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, লুতফর রহমান জুলফিকার, সুফি জুলফিকার হায়দার, ডি. এফ. আহমেদ, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, তিতাশ চৌধুরী, ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান, আবদুল মুকীত চৌধুরী, শেখ দরবার আলম, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, বুলবুল ইসলাম, এস. মুজিবুল্লাহ, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, আরিফুল হক, ওবায়দুল হক সরকার, আবুল হাসান মাহমুদ, মাসুদ মজুমদার, আবদুল হাই শিকদার, সৈয়দ তোশারফ আলী, আব্দুল ওয়াহিদসহ আরো অনেকে।

তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

এ গ্রন্থটি প্রণয়নে যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন

চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, আবদুল আউয়াল ঠাকুর, আবদুল গাফ্‌ফার, সাইয়েদ আতেক, মাহবুবুর রহমান সিকদার, তাজ মোহাম্মদ, ফরহাদ খাঁ, সুব্রত ঘটক, ইব্রাহীম রহমান, কে. এম. মোকতাদার হাসান চন্দন, আসাদউল্লাহ মিলটন, ফজলুল হক, ফখরুদ্দিন আহমেদ খোকন, আবদুর রাজ্জাক মাস্টার, অধ্যক্ষ শাহ মুহম্মদ খুরশীদ আলম, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, মোঃ আল মুজাহিদী, মাহবুবুল হক, মোঃ জাকির হোসেন, শেখ ফজল, মোঃ আবদুল মন্নান, মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম, জিশান আহমেদ, হাবীবুর রহমান হাবীব।

তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার পিতা মরহুম
তোতা মিয়া সরকারের
পবিত্র আত্মার
উদ্দেশে—

প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্যের দু'দিকপাল নজরুল-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এখন বইছে প্রচন্ড বৈরী বাতাস। এই বিষাক্ত বৈরী বাতাসে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে। জনমনে রয়েছে নানা বিভ্রান্তি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে জাতির মন-মানস। এমনি অস্থির অবস্থায় আমাদের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক সুস্থতায় ফিরিয়ে আনতে যাঁরা অবিরাম প্রচেষ্টায় লিপ্ত, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ তাদের একজন। জাতির বিভ্রান্তি নিরসনে এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাওয়া রুখে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর বিবেকের তাড়না থেকে বেরিয়ে আসে "ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত" শীর্ষক ধারাবাহিক লেখা।

দৈনিক মিল্লাত-এর সম্পাদকীয় পাতায় এ লেখাটি ধারাবাহিকভাবে এক বছর যাবত প্রকাশিত হয়। সুস্থ পাঠক সমাজ গ্রহণ করেন ধারাবাহিক লেখাটি। লেখাটি বই আকারে প্রকাশের জন্য তাঁরা লেখককে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধে সাড়া দিয়েছি আমরা। সরকার শাহাবুদ্দীনের এই সাহসী কর্মকান্ডের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হতে পেরে গর্বিত। আর পাঠকদের কাছে বই আকারে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে আমাদের এই আয়োজন এবং শ্রম সার্থক হবে।

ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

মন্তব্য

কোন বড় লেখককে অন্ধভাবে ভক্তি করার চেয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-যুক্তি দিয়ে তার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা আরও শ্রদ্ধেয়। এ কাজটা কঠিন। সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ "ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত" রচনায় সেই কাজটি করেছেন। এটা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার নয়। ঐ দু'টি বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি ও বিকাশের এবং তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পার্থক্যের; সেই সঙ্গে তাদের চরিত্র স্বরূপের পার্থক্যের তুলনামূলক বিচার।

বলা আবশ্যক বাংলাদেশের এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবী যতটা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এবং যতটা অজ্ঞতার কারণে রবীন্দ্রনাথকে যে দেবতাতুল্য করে রাখার চেষ্টা করেন সরকার শাহাবুদ্দীন সেটা অন্ধ ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা বলে মনে করে রবীন্দ্রনাথ যে মানুষ সেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন- যে মানুষের ত্রুটি থাকে, ভুল থাকে এবং সীমাবদ্ধতা থাকে। নজরুলকে তিনি একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন এবং আজাদীর যুদ্ধে নজরুলের অবস্থান যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী এই সত্য প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাহীন। তবু নজরুল চরিত্রের ত্রুটির দিকটি তুলে ধরতে তিনি পরান্মুখ হননি। তাঁর বিচারের তুলদন্ড অবশ্য নজরুলের দিকে একটু বেশী করে ঝুঁকেছে। বোঝা যায় প্রতিক্রিয়া তাঁকে সব সময় নিরপেক্ষ থাকতে বাদ সেধেছে তবু তাঁর সত্যানুসন্ধানের অধ্যবসায়কে প্রশংসা করতে হবে।

এই বিশাল গ্রন্থ থিসিস-ধর্মী নয়; তবে এটা যে ভীষণ শ্রমের ফসল তা বলতে আমার দ্বিধা নেই। পন্ডিতজনের চোখে এর মধ্যে কিছু ত্রুটির স্বাক্ষর থাকলেও এটাকে একটি অসাধারণ গ্রন্থ বলে আমি মনে করি যেখানে অনেক পাঠকের অজানা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে যা হয়তো স্তাবকতায় অন্ধ বহু ভক্তের চোখে নতুন দৃষ্টি দান করবে।

সরকার শাহাবুদ্দীন প্রমাণ করেছেন, তিনি একজন অকুতোভয় সাহসী লেখক। তাঁর সকল কথা ও বক্তব্য যে সর্বসমাদৃত বা সর্বপ্রশংসিত হবে তা তিনি মনে করেন না। কিন্তু তিনি মনে করেন মানুষের যথার্থ সত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষের মান নির্ধারণ করা উচিত। মানুষ তার কীর্তি বলে বড় হোক; কিন্তু সে বড়ত্ব যেন মিথ্যার উর্বর ভূমিতে বৃদ্ধি না পায়।

আমি লেখকের পরিকল্পনা ও সাহসের, তাঁর নিষ্ঠা ও সত্য উন্মোচনের অকুণ্ঠ প্রয়াসকে প্রশংসা দিয়ে বরণ করার পক্ষপাতী। এ গ্রন্থের আমি বহুল প্রচার কামনা করি।

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ
(নজরুল গবেষক)

১৯৫/১/এ শান্তিবাগ
ঢাকা-১২১৭।

পূর্ব কথা

বর্ষ-পরিক্রমায় প্রতি বছর বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের ভাষা বাংলা বিধায় নিঃসন্দেহে তাঁদের সাহিত্যকর্ম বাংলাভাষী মানুষের গর্বের বস্তু। এঁরা বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ জন্যে বাংলাভাষী জনগণ তাঁদেরকে নিয়ে গর্ব ও অহংকারবোধ করে থাকেন। তাই সাধ্য অনুযায়ী তাঁদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে, বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এই দু'কবিকে অকৃপণভাবে শ্রদ্ধা জানায়। এঁদেরকে নিয়ে আমাদের গর্বে ও শ্রদ্ধায় কোন কার্পণ্য নেই, নেই কৃত্রিমতা- আমরা বরাবরই তাঁদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে এর প্রমাণ রেখেছি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে না-কি তিন কোটি টাকা ব্যয়ে শিলাইদহে তিনদিনব্যাপী রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়েছিলো। এই রাজকীয় অনুষ্ঠানটি ছিলো গরীবের ঘোড়া রোগের মতো। পানির মতো অর্থ ব্যয়ে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রাম 'কোটি টাকার উৎসব শেষ হলো' শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

জাতীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মত রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য কুষ্টিয়া শহর থেকে ৮ মাইল দূরে পদ্মা নদীর তীরবর্তী শিলাইদহকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়। এ উপলক্ষে কুঠিবাড়ীতে নতুন করে ডিসটেম্পার করা হয়। কুঠিবাড়ীর অদূরেই প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার নামার জন্য দু'টি হেলিপ্যাড ও সংযোগ রাস্তা তৈরী করা হয়। এ কাজের খরচ হয় ১১ লাখ টাকার মতো। ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকার মত খরচ করে কুঠিবাড়ীর ডাক বাংলোটি সংস্কার করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল প্যান্ডেলটি তৈরী করা হয় ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে। এ প্যান্ডেলে ১৩শ' লোকের বসার ব্যবস্থা করা হয়। প্যান্ডেল তৈরীর বাঁশ যশোর থেকে আনতে হয়েছে বলে খরচ কিছুটা বেশী পড়ে গেছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ঝড়-বৃষ্টিতে প্যান্ডেল ভেঙ্গে যাওয়ার পর এর বাইরে নতুন করে সংস্কার বিল দেয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ কুঠিবাড়ীতে ২৫টি টয়লেট তৈরী করেছে। এর মধ্যে ৫টি সম্পূর্ণ পাকা বাকী ২০টি অর্ধপাকা। উৎসব উপলক্ষে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে ১৬টি। উৎসবের লাইটিং এবং নাট্যানুষ্ঠানের মাইক ভাড়া বাবদ গেছে ৭০ হাজার টাকা। চেয়ার, ভাড়া বাবদ খরচ করা হয়েছে ১৬০০ টাকা। এর মধ্যে প্রায় ২শ' চেয়ার ভেঙ্গে গেছে। প্রেসিডেন্টকে উপহার দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণখচিত প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে। প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানানোর জন্য ৫০০ স্কুল ছাত্রীকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি ছাত্রীকে ১০০ টাকার ফুল দেয়া হয় ফুল ছড়িয়ে স্বাগত জানানোর জন্য। এ হিসেবে ফুল কিনতে খরচ হয়েছে ৫০ হাজার টাকার মত। প্রত্যেক ছাত্রীর অভিভাবককে মেরুন পাড়বিশিষ্ট সাদা শাড়ী এবং লালপাড় বিশিষ্ট হলুদ শাড়ী কিনে দিতে হয়েছে। প্রতিটি শাড়ী ১৫০ টাকা করে কিনতে হলে এ খাতে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে খুলনার গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউস থেকে জেনারেটর নিয়ে যাওয়া হয় শিলাইদহে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুরো এলাকা ওয়ারিং করা হয়। যোগাযোগের জন্য গড়াই নদীতে একটি বেইলী ব্রিজও করতে হয়। উৎসবের প্রয়োজনে খুলনা বিভাগ থেকে ১০০টির মত গাড়ী রিকুইজিশন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন শিলাইদহে মোট ২৭২টি গাড়ী প্রবেশ করে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর ও নজরুল ইন্সটিটিউটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও যানবাহন ৪/৫ দিনের জন্য কুষ্টিয়া নিয়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ ও সিকিউরিটি ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিদের থাকার জন্য কুষ্টিয়া ছাড়াও ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও যশোরের বিভিন্ন রেস্ট হাউস ও হোটেল ব্যবহার করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিলাইদহে ৬টি এবং কুষ্টিয়ায় ১৬টি গেট তৈরী করা হয়। কুষ্টিয়ার পুরো প্রশাসন বলতে গেলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যস্ত ছিল। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে, অনুষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কম করে হলেও ২ কোটি টাকার মত ব্যয় হয়েছে।" (ত্যথ সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ১৩/৫/৯০)

এ অনুষ্ঠানে ভারত থেকে অনেক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞও এসেছিলেন। এঁরা আমাদের খরচের বহর দেখে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু বাহ্‌বা দেননি। আমরা যে কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মে অনুরক্ত বা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছি- এর যথার্থ মূল্যায়ন দাদা বাবুদের কাছে হয়নি। এঁরা সেদিন আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে প্রজা এবং জমিদারের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছেন। তাই সেদিন সগর্বে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে দাদা বাবুরা বলেছিলেন ঃ '১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকির দায়িত্ব পাওয়ার শতবর্ষ পর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে।'

অভিজ্ঞমহলের মতে, এরূপ অসৌজন্য বক্তব্য ছিলো সমগ্র জাতির প্রতি চপেটাঘাতের শামিল। মাড়োয়ারীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ পরাধীন দাদাবাবুরা এই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণকে এখনো জমিদার রবি বাবুর প্রজা হিসেবেই গণ্য করেন। অথচ যারা এরূপ উক্তি করেছেন তাদের দেশের মাটিতে আমাদের ন্যায় সরকারী পর্যায়ে, তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানের কল্পনাও করা যায় না। শোনা যায়, পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালী হিন্দু সংস্কৃতি না-কি অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অর্থ লগ্নিকারীদের হাতে জিম্মি। হিন্দু বাঙ্গালীদেরকে মাড়োয়ারীরা কাজের লোক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। সুতরাং কাজের লোকদের সংস্কৃতি যত শালীন আর উচ্চাঙ্গেরই হোক- মাড়োয়ারী, মারাঠি, পাঞ্জাবী কিংবা রাজপুত তথা দিল্লীওয়ালারা এ- সবের পাত্তা দেয়না। "নেতাজী বা টেগোর-ফেগোর" তাদের কাছে সেই পুরনো কালের কিস্‌সা। তাই মাড়োয়ারীরা না-কি রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী বাঙ্গালী হিন্দু বাবুদের বলে- "বুজরুকী ছেড়ে দিন বাবু। কাম করুন বাবুজী, মেহনত করুন। তবে তো খানা জুটবে। নইলে কোত্থেকে ডাল-ভাত আসবে? আফসোস হরবখত কালচার- কালচার করতা হায়। কালকাত্তাছে বাঙাল কা কোই কালচার নেহি রাহেগা।"

এই হলো কলিকাতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরসূরীদের সাম্প্রতিক অবস্থা। অথচ এই বাবুরাই আমাদের দেশে এসে আমাদের উদারতাকে উপহাস-বিদ্রূপ করেন, এখনো যখন প্রজা জ্ঞান করে বক্তব্য রাখেন- তখন দুঃখ হয়। আবার তাদের জন্য করুণাও হয়। শত হলেও আমরা একই ভাষাভাষী। তাই কবির প্রতি বাংলাদেশের মানুষের যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রয়েছে তা সাহিত্যের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ছিলো শ্রেয়।

কোন মানুষই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা কবি নজরুলও দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও অপকর্ম চাপা দিতে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। এরা কাজের চেয়ে কথা বেশী বলতে ভালবাসে। এছাড়া কাজ যা করে তার চেয়ে বেশী প্রচার করে। এ ধরনের স্তাবকেরা স্বার্থের প্রয়োজনে সকালে একজনকে মাথায় উঠায়; স্বার্থ ফুরালে বিকালে তাকে ছুঁড়ে ফেলে। এ দেশে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন তাদের কাছে পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথ ছিল খুবই অপ্রিয়। এমনকি, এদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মোনায়েম খানের পা পর্যন্ত ধরেছেন। এদেরই কেউ কেউ আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর হয়েছে একেবারে আদি, আসল, অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় রবীন্দ্র-প্রেমিক! শুধু প্রেমিক বললে ভুল বলা হবে, এরা এখন রবীন্দ্রনাথকে দেবতা বলে আখ্যায়িত করছেন।

গত কয়েক বছর যাবত এদের মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক অবাস্তব কথা শুনে আসছি। যেমন- রবীন্দ্রনাথকে দেবতার আসনে বসিয়ে পরম পূজনীয় স্বাধীনতার প্রেরণাদায়ক, বাঙালী জাতীয়তাবাদের দিক-নির্দেশক, ধর্মনিরপেক্ষবাদের প্রবক্তা, অসাম্প্রদায়িক প্রভৃতি। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমান প্রজাদের প্রতি জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারসুলভ আচরণ এবং একধর্ম দর্শিতার কারণে এ দেশের অনেকেই তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ। কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অনেকেই অতি রবীন্দ্র-প্রেমিকদের অনেক অবাস্তব কথার জবাব এড়িয়ে যায়। এ ছাড়া এদের প্রেম কখন যে কার উপর আছর করে তারও ঠিক নেই। এক সময় এরা মার্কস-লেনিন ও মাওসেতুং প্রেমেও ছিল গদ্‌গদ্। লাল বই ছিল খুবই প্রিয়। বর্তমান বিশ্বে লাল বইয়ের আদর্শ তাদের কাছে অপ্রিয় ও পরিত্যাক্ত। এখন আবার তারাই ভোল পাল্টিয়ে ইহুদী, খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রেমিক সেজেছে। তাদের কাছে এখন রবীন্দ্র সঙ্গীত খুবই প্রিয়।

প্রেম-প্রিয়ের আতিশয্যে অনেক সময় মুখ দিয়ে বেফাস কথা বেরিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই তাদের অনেক কথার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ অনেকেই করেন না।

গত বছর (১৯৯৭ সাল) রবীন্দ্রনাথের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়ীতে এবং ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর আলোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা আওড়ানো হয়েছে তা শুনে অনেকে বিস্মিত ও হতবাক হয়েছেন। এসব অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন- "ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাদেশের স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনার ফসল। রবীন্দ্রনাথের দেখানো আলোয় আমরা পথ দেখি। আমরা রবীন্দ্রনাথের চেতনায় আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছি। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই বাঙালী সংস্কৃতির বিধাতা। উত্তরাধিকার রক্ষায় মুসলমানী সংস্কৃতি বদলাতে হবে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু হিন্দুদের কবি নন; মুসলমান বাংলাভাষীদেরও কবি। ঠিক তেমনি নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানদের কবি নন; বাংলাভাষী হিন্দুদেরও কবি। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয় বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সম্পদ, গৌরব। ধর্মের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যকর্ম অসাম্প্রদায়িক বলে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু নজরুল ইসলাম অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার রেখে গেছেন- নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনিই একমাত্র উভয় সম্প্রদায়ের কবি। সাম্যবাদী কবি, বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি ও প্রেমের কবি হিসেবে উজ্জ্বল স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। নজরুল ইসলাম হিন্দু মুসলমানের বিভাজন রেখা অতিক্রম করে উভয় সম্প্রদায়ের কবি হবার চেষ্টা করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় বিভাজন রেখা অতিক্রম করতে পারেননি।

কবি নজরুল ছিলেন ত্যাগে বিশ্বাসী; ভোগে নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভোগে বিশ্বাসী; ত্যাগে নয়। কাজেই ভোগবাদী ব্যক্তিত্বগণ কোকিল কণ্ঠে যতোই চটকদার কথা বলুক না কেন, সুন্দর সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্ট শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে কিংবা বাক্যের বিলাসিতায় যতোই আকর্ষণীয় কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাস রচনা করুক না কেন তাঁরা কখনো ব্যক্তিগত জীবনে স্বীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। এঁরা যতোই প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারীই হোক না কেন তাঁদের সৃষ্টি কর্মে সমষ্টিগত স্বার্থ বা সর্বজনীনতা থাকে উপেক্ষিত। তাই দেখা যায় ১৭৫৭ সালের পর আজাদী পুনরুদ্ধারে মুসলমান মুজাহিদেরা একদিনের জন্যও বসে থাকেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সাহিত্যকর্মে তাঁদের গৌরব গাঁথা নিয়ে কোন বক্তব্য ও মন্তব্য নেই। এমনকি নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিয়েও নয়।

বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী ছলে বলে কৌশলে এদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, এদেশের সম্পদ পাচার করেছে, লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে বিভিন্ন বাহানায় নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে, লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে হত্যা করেছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে না খাইয়ে মেরেছে, এমনকি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব যখন ব্যর্থ হয় তখন বিজয়ী ইংরেজরা সমগ্র দেশে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিলো। শুধু ঢাকায়ই এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ৬০ জন নিরীহ মুসলমানকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো। সেসব হতভাগ্যের লাশ দাফন করতেও দেয়া হয়নি। মাসাধিককাল গাছের ডালে ঝুলিয়ে অসভ্য বর্বর ইংরেজরা উল্লাস প্রকাশ করেছিলো।

এই সব পাশবিক উল্লাসে মত্ত লুণ্ঠনকারী ইংরেজরাই ছিলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে খুবই সুসভ্য জাতি। এই প্রসঙ্গে নির্ঝরিনী সরকার নামে এক মহিলাকে লেখা এক পত্রে ইংরেজ প্রেমে গদ্ গদ্ হয়ে লিখেছিলেন; 'বৃটিশ শাসন হল ঈশ্বরের শাসন। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অন্যায়।' এছাড়া তিনি বৃটিশ উপনিবেশবাদের স্বপক্ষে দালালী করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

.... তারপর এলো ইংরাজ .... যেখানে সে পা বাড়িয়েছে সেখানেই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সভ্য সন্ধানের সততায়। নতুন শাসনে আইন এলো, তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে ব্যক্তি ভেদে অপরাধের ভেদ ঘটানো। ...... তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ ইউরোপের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার যুগ। ন্যায় ও সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা (!) এই ইংরাজ জাতির আদর্শ ..... 'এই জাতির মর্মগত আদর্শ মনে

ধ্রুব হয়ে থাকবে।'

ভোগবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ইংরাজ জাতি হলো সুসভ্য জাতি! অপরদিকে কবি নজরুলের দৃষ্টিতে ইংরেজ ছিলো জালেম জাতি, পররাজ্য দখলকারী- লুণ্ঠক। এই ইংরেজ জাতির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যখন দালালীতে ব্যস্ত; নজরুল তখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত। ইংরেজ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' বইটি প্রকাশিত হয়ে কারাগারে বিতরণ হয়েছে; আর নজরুলের বই একটার পর একটা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। এরপরও যখন কবিকে আজাদী আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি তখন তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছে। কয়েদীদের প্রতি কারাগার কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে দীর্ঘ ৩৯ দিন প্রায়োপবেশনের এক পর্যায়ে কবি যখন প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি লিখেন। এ সম্পর্কে আবুল হাশিমের উদ্ধৃতি দিয়ে এস. মুজিব উল্লাহ্ তাঁর যৎকিঞ্চিৎ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মনীষী আবুল হাশিমের মুখে শুনেছি, কবি নজরুল ইসলামকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ করেছেন না বলে সভা সমিতি বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা হচ্ছিল। এ সময় তাঁর চামচাদের অনুরোধে তিনি এক চিঠি লিখেন। তাই একথা সুস্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকারকে সহযোগিতা করাকে জাতীয় কর্তব্য মনে করেছিলেন; আর অন্যদিকে নজরুল আজাদী আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তাই কবি নজরুলকে তাঁর চরম শত্রুরাও বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করতে পারেননি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নকশালপন্থী কমিউনিস্টরা যখন রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক।

বয়সের জ্যৈষ্ঠতার কারণেই হোক বা বিস্ময়কর প্রতিভার কারণেই হোক বা ভক্তির আতিশয্যেই হোক কবি নজরুল রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। নজরুলের বহু মন্তব্য ও বক্তব্যে এর প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের অতি ভক্তি প্রমাণের জন্য রবীন্দ্র প্রেমিকেরা প্রায়ই একটি মন্তব্য জুড়ে দেয়। নজরুল নাকি বলেছিলেন ঃ

'বিশ্ব কবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধুপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোক কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র বিদ্রোহী কোন একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে।'

এই মন্তব্য নিয়ে সুধী মহলে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই এটাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে এস, মুজিবুল্লাহ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল হাশিমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ 'আবুল হাশিমের মুখে শুনেছি অন্যরকম কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের যেমন শ্রদ্ধা ছিল তেমনি ছিলো প্রত্যাশা। তিনি আশা করেছিলেন উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিবেন। অসাধারণ শক্তিশালী কলম নিয়ে এগিয়ে আসবেন এবং এসে দাঁড়াবেন পুরোভাগে কিন্তু দেখলেন, সংগ্রামের কাতারে তিনি তো এসে দাঁড়ালেনই না। উপরন্তু ইংরেজদের শাসনকে ঈশ্বরের শাসন বলে অভিহিত করলেন। প্রকৃত পক্ষে তখনই তার মোহভঙ্গ ঘটে এবং তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রদত্ত শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধার বাজে খরচ হিসেবে মনে করতে থাকেন নজরুল। তবুও তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরেননি সম্ভবতঃ ইতরসুলভ কলহ এড়ানোর জন্যেই।' এরপর এস, মুজিবুল্লাহ লিখেছেন ঃ ...... পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় আমি আশ্চর্য এক গান শুনেছি। এ গানের রচয়িতা কবি নজরুলের বলে অনেকে সন্দেহ করেন। গানের রচয়িতা কবি নজরুল হোন কিম্বা লোকায়ত কোন কবি হোন কবিকে এ গান কেউ কেউ গাইতে শুনেছেন;

'আমি রসগোল্লা ভেবে
প্রাণ ভরে খেয়ে এখন দেখি যে গোল আলু,
আমি ব্রাহ্মণ ভাবিয়ে, চরণ সেবিয়ে
এখন দেখি যে, ব্যাটা কলু॥'

কবি নজরুল বাংলা ভাষী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দাবী মিটাতে গিয়ে পৌত্তলিকতার দর্শন তাঁর সাহিত্যকর্মে এসেছে। এ জন্যে তিনি পরবর্তী জীবনে তওবাও করেছেন। এছাড়া তাঁর নিজ জাতিসত্তা স্বাতন্ত্রতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন বিভিন্ন কবিতায়। এমনি একটি কবিতার অংশ বিশেষ হলো ঃ

'বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোসলমান,
আল্লাহ ভিন্ন মানিনা অন্য আমি চির-নির্ভীক-প্রাণ।
আমি মৃত্যুর মাঝে চিরদিন খুঁজি নব জীবনের সন্ধান,
আমি আগুনের হল্কা, ঘুর্ণিত উল্কা খোদা-ই তেজে তেজীয়ান।'

গুজরাটী ভাষী প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ কায়েদ আজম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ 'Urdu and urdu shall be the state language' মন্তব্য করে যে অন্যায় করেছিলেন এরচেয়ে শতগুণ অপরাধ করেছিলেন বাংলা ভাষী নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'The only possible national language for inter provincial inter-course is Hindi in India' মন্তব্য করে। জিন্নাহ সাহেব এই অপরাধের জন্য মৃত্যুর আগে অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করেও অপরাধ থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মন্তব্যের জন্য কোন অনুশোচনা না করেও অপরাধী হিসাবে গণ্য হননি। বরং তিনি নন্দিত সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি হিসাবে আখ্যায়িত। সুতরাং এ দেশীয় কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে রবীন্দ্র প্রেমিকতা রাজনৈতিক হীন স্বার্থ প্রণোদিত তা সুস্পষ্ট।

সঙ্গত কারণেই ইতিহাসের আলোকে এ বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সময়ের দাবী। নতুবা নিজের বিবেকের কাছেই নিজকে অপরাধী মনে হবে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, কবি নজরুলকে নিয়েও তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে আমরা জেনে ও মেনে তৃপ্তি বোধ করি। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের তুলনা নজরুল নিজেই; আর রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কাউকে ছোট বা খাট করার লক্ষ্যে আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। মহামূল্যবান বস্তু অথবা অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে সাধারণ লোকেরাই যাচাই-বাছাই করে থাকে, যাতে প্রতারিত না হয়। কারণ সাধারণ লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রতারিত হলে সারা জীবনেও সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায় না। এক আউন্স স্বর্ণ ক্রয় করতে গেলে এর মান, উৎকৃষ্টতা কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করা হয়। কিন্তু লৌহখন্ড টনের পর টন ক্রয় করলেও কষ্টিপাথর দিয়ে কেউ যাচাই করে না। মূল্যবান বস্তু এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কবি নজরুল বলেছেন-

"মোরা সত্যের লাগি যুঝিব পরান পণ
মোরা বুঝিব সত্য, পুঁজিব সত্য
খুঁজিব সত্য ধন।"

তাই আমি এ আলোচনায় রবীন্দ্র-নজরুলের বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে মিথ্যার বেড়াজাল থেকে সত্যকে ছেঁকে বের করার চেষ্টা করেছি মাত্র। সত্যকে অস্বীকার করার অভ্যেস আমার নেই। কিন্তু মিথ্যাকে অস্বীকার করার মত বুকের পাটা আমার রয়েছে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি 'ইতিহাসের নিরিখে নজরুল-রবীন্দ্র চরিত' বইটি লেখার উদ্যোগ নিয়েছি।

দৈনিক মিল্লাত সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় এক বছর যাবত প্রতি শুক্রবার এ লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে আলোচিত, সমালোচিত, নন্দিত ও নিন্দিত হয়েছে। লেখালেখির ক্ষেত্রে এমনই হওয়াই স্বাভাবিক। এক কথায় বলা যায়, সুপ্রিয় পাঠক সমাজ লেখাটি সানন্দে গ্রহণ করেছেন। পত্রযোগে, টেলিফোনে ও ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন। যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁরা গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে লেখাটিকে আরো তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ করতে আমাকে সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া উভয় শ্রেণীর সুপ্রিয় পাঠক লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন দেশের ঐতিহ্যবাহী এককালের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা

প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি'। তাঁরা এগিয়ে না এলে হয়তো এতো শীঘ্র পাঠকদের সামনে লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এ জন্যে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে জানাই লাখো-কোটি শুকরিয়া, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এই মহৎ উদ্যোগের জন্য তাঁদের প্রতি থাকলো আমার শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

নজরুলের ব্যক্তিগত চরিত্র যেমন বিচিত্র ও রহস্যময়- ঠিক তেমনি তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা বলা যায়। এ ছাড়া মুসলমান কবি হওয়ার অপরাধ (?) তো আছেই। এ জন্যেই হয়তো নজরুলের জীবন ও বিশাল সাহিত্য ভান্ডার নিয়ে নজরুল বিশেষজ্ঞদের মাঝে রয়েছে মতানৈক্য। রয়েছে নানা বিষয়ে বিতর্ক। এই বইটি লেখার সহায়তার জন্য রবীন্দ্র-নজরুল গবেষকদের অনেকের প্রণীত গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। বিভিন্ন গবেষকের বই অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমি হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছি।

আমাদের দেশে যে-সব গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হয়ে আসছে এর পাঠক সংখ্যা খুবই সীমিত। বহু অর্থ ব্যয়ে প্রকাশিত এইসব বই গবেষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণে এইসব বইয়ের সুফল হতে দেশের অধিকাংশ লোক হন বঞ্চিত। আমি মনে করি, পাঠ্য পুস্তক ছাড়া যে-কোন বই-ই প্রকাশিত হোক না কেন তা সকল শ্রেণীর পাঠকের মন-মানসিকতা ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা আবশ্যক। আমি এই বইটি শুধু গবেষণা বা বিশ্লেষণমূলক বই হিসাবে প্রণয়ন করিনি। সকল শ্রেণীর পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা প্রণীত হয়েছে। ফলে এই ধরনের বই যে-ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে সেই চিরায়ত নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমি চাই এ ধরনের বই অধ্যয়নে যে-সব পাঠকদের অনীহা রয়েছে তারাও যেন বইটি নেড়ে-চেড়ে কিছুটা উপকৃত হন।

আল্লামা ইকবাল সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও গবেষক, অনুবাদক বন্ধুবর জনাব আবদুল ওয়াহিদ শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও নিরলস শ্রম দিয়ে মুদ্রণের আগে বইটি আগা-গোড়া পাঠ করেছেন এবং বইটি ত্রুটিমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য করতে সহায়তা করেছেন। দুর্লভ ও মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে আমাকে সহায়তা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে আমি খাটো করতে চাই না। তবে তাঁর এই ঋণ অপরিশোধযোগ্য।

এরপরও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া মুদ্রণ ত্রুটি তো রয়েছেই।

এই ক্ষুদ্র পরিসরে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য ভান্ডার নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়। বইটির কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব বাদ দিতে হয়েছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন এবং আরো তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজন করে বইটিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার আশা রাখি ইনশায়াল্লাহ্‌।

তাগুতি শক্তির দাপটের বিরুদ্ধে জেহাদ হিসাবে লেখালেখিকে বেছে নিয়েছি। বিবেকের তাগিদে এই লেখালেখির জগতে প্রবেশ করে আমাকে আর্থিকভাবে হতে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। সংসারের প্রতি হতে হয়েছে উদাসীন। এই ধকল হাসিমুখে সামলাতে হয়েছে আমার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগমকে। অসীম ধৈর্য্য সহকারে আমার এই উদ্যোগকে সচল করে রেখেছে সে। এ ছাড়া আমার মেয়ে শাহিনূর, কোহিনূর, নীলা সুলতানা ও পুত্র হাসান শাহরিয়ার তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রুফ সংশোধনে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

সুতরাং আমার স্ত্রীসহ যাঁরা আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নে গঠনমূলক পরামর্শ, সহযোগিতা দিয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের সবার কাছে আমি চিরঋণী। বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে নিজকে ধন্য এবং পরিশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

আগস্ট ১, ১৯৯৮

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

সূচীপত্র

ঠাকুর পরিবারের বংশলতিকা
কন্যা সন্তান [অল্পায়ু]
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭-১৯০৫ সারদা দেবী
নগেন্দ্রনাথ [আয়ু ৩ বছর]
গিরীন্দ্রনাথ ১৮২০-১৮৫৪ যোগমায়া দেবী
ভূপেন্দ্রনাথ ১৮২৬-১৮৩৯
নগেন্দ্রনাথ ১৮২৯-১৮৫৮ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী
গনেন্দ্রনাথ ১৮৪১-১৮৬৯ স্বর্ণকুমারী
কাদম্বিনী যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গো.
জ্যোতিঃপ্রকাশ ১৮৫৫-১৯১৯
যামিনীপ্রকাশ
কুমুদিনী নীলকমল মুখো.
গুণেন্দ্রনাথ ১৮৪৭-১৮৮১ সৌদামিনী দেবী
গনেন্দ্রনাথ ১৮৬৭-১৯৩৮ প্রমোদকুমারী দেবী
সমরেন্দ্রনাথ ১৮৭০-১৯৫১ নিশিবালা দেবী
অবনীন্দ্রনাথ ১৮৭১-১৯৫১ সুহাসিনী দেবী
বিনয়নী দেবী শেষেন্দ্রভূষণ চট্টো.
প্রতিমা দেবী ১৮৯৩-১৯৬৯
সুনয়নী দেবী রজনীমোহন চট্টো.
বীণাপানি দেবী
কন্যা সন্তান ১৮৩৮ [অল্পায়ু]
দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৪০-১৯২৬ সর্বসুন্দরী দেবী
সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৪২-১৯২৩ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
হেমেন্দ্রনাথ ১৮৪৪-১৮৮৪ নীপময়ী দেবী
বীরেন্দ্রনাথ ১৮৪৫-১৯১৫ প্রফুল্লময়ী দেবী
সৌদামিনী ১৮৪৭-১৯২০ সারদাপ্রসাদ গঙ্গো.
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৯-১৯২৫ কাদম্বরী দেবী
সুকুমারী ১৮৫০?-১৮৬৪ হেমেন্দ্রনাথ মুখো.
পুণ্যেন্দ্রনাথ ১৮৫১?-১৮৮৭
শরৎকুমারী ১৮৫৪-১৯২০ যদুনাথ মুখো.
স্বর্ণকুমারী ১৮৫৬?-১৯৩২ জানকীনাথ ঘোষাল
বর্ণকুমারী ১৮৫৮-১৯৪৮ সতীশচন্দ্র মুখো.
সোমেন্দ্রনাথ ১৮৫৯-১৯২২ [অবিবাহিত]
রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১-১৯৪১ মৃণালিনী দেবী
বুধেন্দ্রনাথ ১৮৬৩-১৮৬৪
দ্বিপেন্দ্রনাথ ১৮৬২-১৯২২ সুশীলা দেবী, হেমলতা দেবী
সুধীন্দ্রনাথ ১৮৬৯-১৯২৯ চারুবালা দেবী
দিনেন্দ্রনাথ ১৮৮২-১৯৩৫ বীণাপানি দেবী
সৌমেন্দ্রনাথ ১৯০১-'৭৪ শ্রীমতী
সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭২-১৯৪০ সংজ্ঞা দেবী
ইন্দিরা দেবী ১৮৭৩-১৯৬০ প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮-১৯৬৪
কবীন্দ্রনাথ ১৮৭৫-১৮৭৯
প্রতিভা ১৮৬৫-১৯২২ আশুতোষ চৌধুরী
ঋতেন্দ্রনাথ অলকা
সুভগেন্দ্র (সুভো)
বলেন্দ্রনাথ ১৮৭০-১৮৯৯ সাহানা দেবী
সত্যপ্রসাদ ১৮৫৯-১৯৩৩
ইরাবতী ১৮৬১-১৯১৮ নিত্যরঞ্জন মুখো.
সুশীলা শীতলাকান্ত চট্টো.
হিরন্ময়ী ১৮৬৮-১৯২৫
জ্যোৎস্নানাথ ১৮৭১-?
সরলা ১৮৭২-১৯৪৫
ঊর্মিলা ১৮৭৩-?
মাধুরীলতা (বেলা) ১৮৮৬-১৯১৮ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী [নিঃসন্তান]
রথীন্দ্রনাথ ১৮৮৮-১৯৬১ প্রতিমা দেবী ১৮৯৩-১৯৬৯
গৃহীতা কন্যা নন্দিনী (পুপু) জ. ১৯২২
রেণুকা (রাণী) ১৮৯১-১৯০৩ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টা. [নিঃসন্তান]
মীরা (অতসী) ১৮৯৪-১৯৬৯ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গো
শমীন্দ্রনাথ ১৮৯৬-১৯০৭
নীতিন্দ্রনাথ ১৯১২-১৯৩২
নন্দিতা (বুড়ি) ১৯১৬-? কৃষ্ণ কৃপালনী

কাজী নজরুল ইসলামের বংশলতিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশ-চরিত

রাজ বংশে হ'ত যদি জন্ম তোমার
বরষিতে স্বর্ণ মুদ্রা মুকুট সোনার
উচ্চমান নাহি যার বংশের ভিতর
কেমনে সহিবে সে মানীর আদর?

- *কবি ফেরদৌসী*

এককালে ভারতের আর্যরা এই অনার্য সমাজকে চরম ঘৃণার চোখে দেখতো। এদের ধর্ম-কর্মের যে চিত্র নীহার রায় দিয়েছেন তার মধ্যে দেখা যায় যে, তারা বাংলার বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়ে দু'একটা অনুষ্ঠান পালন করতো, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের রূপ ছিল বর্তমানের তিব্বতের তান্ত্রিকদের মতো। নরপূজার রেওয়াজ ছিল, লোকে মানত করে গঙ্গায় শিশু বিসর্জন করতো।

বঙ্গে পাল রাজত্বের অবসানের পর কর্ণাটক থেকে বহিরাগত হিন্দুরা যখন পালদের পরাজিত করে বঙ্গদেশ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন তখন এরা এদেশকে কলুষমুক্ত করার জন্য কনৌজ এবং কর্ণাটক থেকে দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে পাঁচঘর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। এদেরই একটি ধারা থেকে ঠাকুর পরিবারের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ।

কথিত আছে যে, মোঘল রাজত্বকালে যশোরে পীর আলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোর অঞ্চলে পাঁচজন ব্রাহ্মণের একজন ব্রাহ্মণ খান জাহানের শিষত্ব গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিলো শ্রী গোবিন্দ লাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো পীর আলী মোহাম্মদ তাহের। তিনি খান জাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও প্রধান আমাত্য ছিলেন। খান জাহান বাগেরহাটে অবস্থানকালে তিনি পায়গ্রাম কসবায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্য পরিচালনা করতেন। খান জাহান পায়গ্রাম কসবায় কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। এই সময় মোহাম্মদ তাহের মন্ত্রী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে সমস্ত রাজকার্যে সাহায্য করতে থাকেন।

খুলনা জেলার দক্ষিণ-ড়িহি প্রাচীন হিন্দু প্রধান স্থান। সেনহাটি, মূলঘর, কালীয়া প্রভৃতি স্থানে বহু পূর্ব থেকে উচ্চ শ্রেণীর বসবাস ছিলো। এই গ্রামের নাম ছিলো

পয়োগ্রাম। তৎকালে রায় চৌধুরী বংশের বিশেষ খ্যাতি ছিলো। সম্ভবত তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম দিকে এই ব্রাহ্মণ-বংশ রাজ সরকার হতে সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরা ছিলো কনোজাগত ব্রাহ্মণ। এদের পূর্ব পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলে তারা গুড়ী বা গুড়গাঞী ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এই বংশের কৃতি সন্তান দক্ষিণা নারায়ণ ও নাগর নাথ।

নাগরনাথ নিঃসন্তান ছিলো। আর ভ্রাতা দক্ষিণা নারায়ণের চার পুত্র ছিলো। তাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব নবাগত শাসনকর্তা খানজাহানের অধীনে উচ্চ পদে চাকরি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালীদের উৎপত্তি বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মে ওমালী বলেন যে, খান জাহান একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। এতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী মোহাম্মদ তাহের (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) বলেন যে, "ঘ্রাণেন কার্ধ ভোজনং" অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন। খান জাহান পরে একদিন খানা-পিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহের নাকে কাপড় দিলে খানজাহান বলেন, যখন ঘ্রাণে অর্ধভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তদনুসারে তাহের ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহেরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলো সে হিন্দু থেকে যায়। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দু পীরালী এবং তাহেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীর-অলী বলতো। মতান্তরে কাহিনীটি অন্যভাবে বর্ণনা রয়েছে।

জানা যায় যে, মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে নারায়ণের পুত্র জয়দেব ও কামদেবের অন্তরের মিল ছিলোনা। তাহের মনে মনে তাঁদেরকে মুসলমান করবার চেষ্টা করেন। পবিত্র রমজানের সময়। মোহাম্মদ তাহের একদিন রোজা রেখেছেন। দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ বসে আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ী থেকে একটি সুগন্ধি লেবু এনে তাঁকে উপহার দেন। পীর আলী লেবুর ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। তা দেখে কামদেব বললেন, হুজুর, ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন- 'ঘ্রাণেন কার্ধ ভোজনং'- আপনি গন্ধ শুঁকে রোজা ভেঙ্গে ফেলেছেন? এই কথা শুনে পীর আলী ব্রাহ্মণের প্রতি চটে যান। গোপনে পরামর্শ করে স্থির হলো যে, একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে আহার করাবেন। নির্ধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাগৃহে উপস্থিত হলেন। সভাগৃহের প্রাঙ্গণে গো-মাংসের সাথে নানা প্রকার মসলা দিয়ে রন্ধন কার্য ধুমধামের সাথে চলছিলো। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপুর। জয়দেব ও কামদেব নাকে কাপড় দিয়ে প্রতিরোধ করছিলেন। পীর আলী নাকে কাপড় কেন- জিজ্ঞাসা করলে কামদেব মাংস রন্ধনের কথা উল্লেখ করেন; পীর আলী লেবুর গল্প উল্লেখ করে বললেন, "এখানে গো-মাংস রন্ধন হচ্ছে। এতে আপনাদের অর্ধেক ভোজন হয়ে গেছে,

সুতরাং আপনারা জাতিচ্যুত হয়েছেন।"

অতঃপর কামদেব ও জয়দেব ঐ মাংস খেয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। পীর আলী তাঁদেরকে জামাল উদ্দীন ও কামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়ে আমাত্য শ্রেণীভুক্ত করে নিলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দুই ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীর আলী ব্রাহ্মণ হিসাবে সমাজে পরিচিত হলেন।

পরবর্তীতে সংশ্রব দোষে রায় চৌধুরী বংশের লোকেরা পুত্র-কন্যার বিয়ে নিয়ে বিড়ম্বিত হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রতিপত্তি ও অর্থ বলে সমাজকে বাধ্য করবার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। এদের সাথে কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং আরো কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন। কলিকাতার ঠাকুরগণ ভট্টনারায়ণের সন্তান এবং কুশারী গাঁঞিভুক্ত ব্রাহ্মণ। খুলনা জেলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিলো। পিঠাভোগের কুশারীগণ রায় চৌধুরীদের সাথে আত্মীয়তা করে পীরালী হন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কুশারী বংশের অধস্তন পুরুষ। রবি ঠাকুরের পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী খুলনা জেলা ত্যাগ করে কালিঘাটের কাছে গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। তথাকার কৈবত, জেলে, মালো প্রভৃতি জাতির লোকেরা নবাগত ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলে ডাকতো। তখন থেকে এই বংশের উপাধি কুশারী হতে পরিবর্তিত হয়ে ঠাকুরে পরিণত হয়। আজও না-কি পিটাভোগ গ্রামে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পূর্ব নিবাস লোকে দেখিয়ে থাকে। এই বংশের জয়রাম আমীন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর এবং আরো অনেকে দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী বংশে বিয়ে করেছিলেন। সংশ্রব দোষে রবি ঠাকুরের শ্বশুর বংশের পূর্ব পুরুষদের বদনাম সমাজে থেকে যায়। পীরালী গানের মাধ্যমে রায় চৌধুরীদিগকে অন্যান্য কুলীন হিন্দুরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেও ছাড়ে নাই। তারা বলতো ঃ

"মোসলমানের গোস্তভাতে
জাত গেল তোর পথে পথে
ও-রে পীরেলী বামন।"

দক্ষিণ ডিহিতে রবি ঠাকুরের মাতুলালয় ও শ্বশুর বাড়ী। তাঁর পূর্ব পুরুষের প্রকৃত বাসভবন পিঠাভোগে, এখনও সে বাড়ী আছে বলে শোনা যায়।

কেহ কেহ কবি সম্রাটের পূর্ব পুরুষের বাড়ী পিঠাভোগে কিনা সন্দেহ করিয়া থাকেন। কলিকাতা এবং স্থানীয় সম্ভাব্য সমস্ত সূত্র হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিলাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর যেরূপ রক্ত সম্পর্ক, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সম্পর্কও ঠিক ততটুকু। সেই জন্য বিভাগ-পূর্বে কলিকাতার

একটি পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে, এই দুইজনই একই বংশসম্ভূত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঠিক নহে। রবি বাবু যে খুলনা জেলার পিঠাভোগের কুশারী বংশসম্ভূত উহারই সমর্থনে কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

এই ব্রাহ্মণ গোত্রের পঞ্চানন কুশারী সপ্তদশ শতকে গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে এসে তিনি জমি ক্রয় এবং বাসগৃহ নির্মাণ করেন। প্রচুর ঐশ্বর্যও সঞ্চয় করেন। এ সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন ঃ

পঞ্চাননের সন্তানদের দ্বারাই এ পরিবারের প্রতিপত্তি। পঞ্চাননের প্রপৌত্র নীলমনি এবং দর্পনারায়ণ মিলিতভাবে হুগলির পাথুরিয়া ঘাটে গৃহ নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এঁরা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক সঙ্গেই ছিলেন। এরপর নীলমনি ক্লাইভের অধীনে একটি চাকরি নেন। শেষ পর্যন্ত এই দুই ভ্রাতার মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে অবিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং নীলমনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়া ঘাটের পারিবারিক গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং কলিকাতার নিকটে জোড়াসাঁকোতে একখন্ড জমি ক্রয় করে নতুন আবাস নির্মাণ করেন।[২]

বৃটিশ বিজয়ের অব্যবহিত পরে ঠাকুর পরিবারের পূর্ব পুরুষগণ ব্রিটিশদের তাবেদারী করে অর্থ লাভ ও তার মাধ্যমে জমিদারী লাভ করে হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। জয়রাম ছিলেন ঠাকুর পরিবারের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্গত চব্বিশ পরগনায় ভূমি পূনর্বন্টনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শিখে চট্টগ্রামে ফরাসীদের অধীনে চাকুরি করে অঢেল বিত্তের অধিকারী হন। নাটোর মহারাজার জমিদারী যখন খন্ড-বিখন্ড করে ইংরেজ সরকার নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তখন সদ্য গজিয়ে উঠা এই ধনী ঠাকুর বাবুরা তার অংশবিশেষ ক্রয় করে অভিজাত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হন। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর সমসাময়িক দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতার ভদ্রলোক সমাজের এক স্তম্ভ ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিলো ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে। তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা শিখে আইন ব্যবসা শুরু করেন। একজন ল' এজেন্ট হিসাবে তিনি পরবর্তীকালে পাবনায় এক বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর অগাধ বিত্তের প্রধান উৎস সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমত নিমক মহলের দিওয়ানের এজেন্ট এবং চব্বিশ পরগণার কালেক্টরের সেরেস্তাদার (অর্থাৎ প্রধান কেরানী) থাকাকালীন। পরে তিনি নিজেই এ পদে উন্নতি লাভ করেছিলেন। উৎকোচ, অসাধুতা, অত্যাচার সব মিলিয়ে বিত্ত অর্জনের পদ্ধতি যে কতো হৃদয়হীন তার একটি দৃষ্টান্ত নিমকের দেওয়ানী। দ্বারকানাথের মতো ব্যক্তিও সেই পদ্ধতিতেই প্রাথমিক বিত্ত সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এক

১। ., সুন্দরবনের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৮
২। সৈয়দ আলী আহসান, দৈনিক ইনকিলাব, আগস্ট '৯৬

জীবনীকার লিখেছেন ঃ

তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনেই ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে শহরের অনেক অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথও কতিপয় বৎসরের মধ্যে ধনবান হন।[৩]

জীবনীকার লিখেছেন, দ্বারকানাথ স্বেচ্ছায় নিমকের দেওয়ানী ত্যাগ করেন; আসলে তাঁর শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের জন্য তাকে দেওয়ানী ছাড়তে হয়। দ্বারকানাথ নিমকের দেওয়ানী ছাড়েন ১৮৩৪ সালের আগস্টের শেষ দিকে। এই ঘটনার প্রায় বাইশ বছর পর বিবরণটি 'সম্বাদ ভাস্করে' ১৮৫৬ সালের ৯ই আগস্ট ৫২তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমকালীন কোন ইংরেজী বা বাংলা পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত প্রভাব। তাঁর বিরুদ্ধে বা অপক্ষপাতী কোন সংবাদ সেকালে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশের সুযোগ ছিলোনা। ১৮৩৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'সমাচার চন্দ্রিকা' সহযোগী সমাচার দর্পণ'কে পক্ষপাতিত্বের যে অভিযেগা করেছিলো তাতে এই ঘটনার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল ঃ

'শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিশমেন কাগজের প্রোপ্রাইটার, হিরল্ড নামক কাগজের সর্জন কর্ত্তা, তিনি এই ক্ষণে বাঙ্গাল হরকরা মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইন্ডিয়া গেজেট নামক পত্রে এবং সে অফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন, বঙ্গদূত 'শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে।[৪]

'সমাচার চন্দ্রিকা' আরো লেখেন ঃ

'অপর দর্পনকার যে ঠাকুর পক্ষে আছেন, তাঁহার মতের বিপরীতে কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক ব্যাপারিগণের বিপক্ষ দর্পনকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এই ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে।[৫]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে খালাড়িগণ (লবণ প্রস্তুতকারক) যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর বিবরণে জানা যায় ঃ

"ন্যূনধিক দুই সহস্র খালাড়ি লর্ড বেন্টিকের কাছে আবেদন করতে লাট ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে দুঃখ ধ্বনি করেছিল। বেন্টিক গাড়ি করে বাইরে যাবার উদ্যোগ করলে 'খালাড়িরা' তাঁহার গাড়ির নিচে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল। যাত্রা স্থগিত রেখে বেন্টিক সেক্রেটারিকে তাদের চারজন প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠান। তাঁহারা ৫/৬ শত শরা সহিত বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন; গভর্নর বাহাদুর ঐ সকল শরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ সকল কেন আনিয়াছ? উক্ত চারি ব্যক্তি কহিলেন, গভর্নমেন্টের নির্ধারিত আছে লবণ ওজন দিলে খালাড়িরা প্রতি মোণে দশ আনা মাত্র মূল্য পাইবে কিন্তু তাহারা প্রতি মোণে পাঁচ আনাও পায় না এবং ওজন মুখে ঠাকুর বাবুর জন্য প্রতি মোণে এক এক শরা রাখিতে হয়, গভর্নমেন্ট প্রতি বৎসর লবণ প্রস্তুত করণীয় দাদনি টাকা অগ্রে দিয়া থাকেন খালাড়িরা তাহা দেখিতে পায়না, কর্ম্মচারীরা টাকার বদলে খালাড়িদিগের আহারীর তন্ডুল দেন, বাজারে যে সকল ধানি মোটা চাল মোণ আট আনা দশ আনার অধিক নয় কিন্তু

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ৫৬

৪। বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১৮-১৯

৫। (সমাচার চন্দ্রিকা, ১৪ অক্টোবর, ১৮৩৪)

খালাড়িদের নিকট হইতে মোণ মূল্য দেড় টাকা কাটিয়া রাখেন। খালাড়িরা অন্নবস্ত্র পায় না-আহারাভাবে তাহাদিগের পরিবারাদির প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, লর্ড বাহাদুর খালাড়িদিগের এই সকল দুঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। 'তৎপরে কালেক্টর প্লৌডন সাহেব অবসর লইলেন এবং ঠাকুর বাবু সেরেস্তাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কারঠাকুর কোম্পানী নামে বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করিলেন।[৬]

স্পষ্টত বোঝা যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর বাবুকে দুর্নীতির দায়েই চাকরিচ্যুত করা হয়েছিলো।

১৮০৬ সালে ময়মনসিংহ জেলায় নীল চাষ শুরু হয়। নীল চাষের গোড়ার দিকে জমিদারেরা নীলকরকে সহায়তা করতো। মোটা টাকার বিনিময়ে-জমিদার তার জমি নীলকরদের দিতো (নড়াইলের রামরতন রায়, রানাঘাটের জয়চাঁদ পাল চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর সবাই ইজারা নিয়েছিলেন) এবং অনেক সময় প্রজাদের দাদন দিতে উৎসাহিত করতো। রায়তদের জব্দ করার জন্য সময়বিশেষে জমিদার ও নীলকররা একত্রিত হতো। কৃষক নেতা তিতুমীরের বিরুদ্ধে জমিদার ও নীলকররা একত্রিত হয়েছিলো। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামরতন রায়, হরনাথ রায়, জয়চাঁদ পাল চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার প্রধান জমিদাররা নীলের ব্যবসা করতেন। রামরতন রায়ের ২৪টি নীলকুঠি ছিলো। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছিলো ৬টি। স্বার্থ জড়িত থাকায় প্রয়োজন মতো নীলকরের পক্ষে ওকালতি করতেও দ্বিধা করতো না।[৭]

১৮২৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী 'সম্বাদ কোমুদী' পত্রিকায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'এ দেশে যাঁরা ভূ-সম্পত্তি তাঁরই কাছে একথা সুবিদিত যে, নীল চাষের জন্য কি বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীলচাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছে তাতে দেশের নিম্ন শ্রেণীরা স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে। আগেকার দিনে যে সব চাষী জমিদারের জবর-দস্তিতে বিনা মূল্যে বা অল্প পরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হতো তারা এখন নীলকরদের আওতায় স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। গ্রামের দরিদ্র চাষীদের তথাকথিত 'স্বাচ্ছন্দ্যে দিনপাত করার' জন্য কি পরিমাণ মাসুল দিতে হয়েছে বা কি ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য তারা ভোগ করেছে নীলকরদের চাটুকার ঠাকুর বাবু তার ব্যাখ্যা না দিলেও ইতিহাস সে ব্যাখ্যা দিয়েছে।

নীলকুঠিয়ালরা পাঁচ বছরের জন্য জমি পত্তনি নিয়ে নীলের চাষ করতেন। কিন্তু বেশী মুনাফা ছিল 'রায়তী আবাদীতে' নীল চাষ করা। বিঘাপ্রতি দু'টাকা দাদন দিয়ে নিজের জমিতে কৃষককে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হতো। চাষের সমস্ত খরচ রায়তকেই বহন করতে হতো। আর রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ অগ্রণী ছিলেন।

এভাবে দেশীয় জমিদার ও বিদেশী কুঠিয়ালরা বাংলার উর্বরা ধানী জমিগুলো জবরদখল করে নীল চাষের আওতায় নিয়ে আসে। বাংলাদেশে এমন কোন জেলা নেই যেখানে নীলকর দস্যুদের অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা জনকাহিনীতে পরিণত হয়নি।

৬। বিনয় ঘোষ, সংবাদপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৩১৮-১৯
৭। শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী, বাংলার পারিবারিক ইতিহাস, ষষ্ঠ খন্ড, ঢাকা বিভাগ, ১৯৪২।

প্রবল শীতের শিহরণের মত নীলকর সাহেবদের পীড়ন-লুণ্ঠনের কাহিনী শুনলে উনিশ শতকের গ্রামীণ মানুষের শরীর শিউরে উঠতো।[৮]

নীলযুগের ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, উৎকট মুনাফা লালসার উন্মত্ত নীলকর দানবদের নির্মম উল্লাস, আর শোনা যায় অসহায় নীল চাষীদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ। কোথাও নীলকরদের সমর্থক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। নীলকরের অত্যাচারে কাতর একজন চাষীর একটি চিঠি ১৬ই চৈত্র ১২৭০ সালের 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"হা খোদা তোর মনে এই ছিল! এই রকম কত করছে। থানার দারোগা ৭০০ টাকা ফুরন করিয়া নিয়েছে সকল গাঁয় নীল বুনিয়ে দেবে, মেজেস্টারের নিকট দরখাস্ত করিলে লা মঞ্জুর, সারা বছর না খেয়ে মজুরি করে জমিগুলি চাষ করিয়া রাখিয়াছি, আসমান পানি দিলিই ধান বুনবো তবে বাল-বাচ্চা সমেত খেয়ে জান বাঁচবো। তাই নীল বুনে নেবে, চুক্তি ভঙ্গ বলে সকলে বেচে কিনে নিল, জমার তিন চার গুণ বেশী করলো, খোদার বান্দা ফাটকে মলো। আরো কত মরে তার ঠেকনা কি? আয়েন্দা ভাত পানির দফা যায়। আল্লা এমন করে মারিস ক্যান? তুইতো সকলই পারিস। একদিন কেন সব রাইতগুষ্ঠি সমেত মেরে ফেলে সাহেব গারে সব দেনা। আর তো বরদাস্ত হয় না। দোই আল্লা! এই দরখাস্ত করছি তুই আমাদের মেরে ফেল। - আব্দুল মতলেব মন্ডল।[৯]

১৮২৯ খৃস্টাব্দে ২০শে নভেম্বর কলকাতার টাউন হলে ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এক সভায় রামমোহন রায় তাঁর সুহৃদ দ্বারকানাথের সুরে সুর মিলিয়ে নীলকরদের সমর্থন করে বলেন ঃ

নীলকরদের সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, নীল কুঠির আশেপাশের বাসিন্দারা নীলকুঠি থেকে দূরের জায়গার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ও ভালো অবস্থায় বাস করে। নীলকরেরা আংশিকভাবে ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু সবদিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, সরকারী ও বেসরকারী সব শ্রেণীর ইউরোপীয়ানদের চেয়ে এই নীলকরেরা এ দেশের সাধারণ লোকের অনেক বেশী উপকার করছে।[১০]

বাংলার তথাকথিত রেনেসাঁর অগ্রদূতদের এ দাবী কতদূর সত্য তা তাদের দোসর ইংরেজদের মুখ থেকেই শোনা যাক। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়ে নীল কমিশনকে জানান ঃ

ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর কাছে কয়েকজন রায়তকে পাঠান হয়েছিল, যাদের দেহ বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলা হয়েছিল। তিনি এমন সব রায়ত দেখেছেন যাদের নীলকর 'ফোর্ড' গুলি করেছিল। তাঁর নথিতে লেখা আছে, কেমন করে প্রথমে রায়তদের বর্শার আঘাত করে পরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ধরনের নীলচাষ চালানোর ব্যবস্থাকে তিনি রক্তপাতের ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন।[১১]

এভাবেই দ্বারকানাথ বাবু গরীব খালাড়ি ও কৃষকদের শোষণ অত্যাচার করে তাদের

৮। কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য ঃ রাজা রামমোহন; বঙ্গ দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১১৭।

৯। বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ৩৪।

১১। Report of the Indigo Commission, Calcutta 1860

অন্ন কেড়ে নিয়ে নিজের বিত্ত বাড়িয়েছেন, একটার পর একটা জমিদারী ক্রয় করেছেন, বাবুয়ানার রসদ যুগিয়েছেন, উত্তরসূরীদের মেধা বিকাশের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়েছেন।

বিত্ত থাকলে অপকর্ম ঢাকা যায়, তারও উদাহরণ দ্বারকানাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন, বিভিন্ন পন্থায় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে। সমসাময়িককালে তিনি বংশগত প্রতিষ্ঠা অফুরন্ত বৈভব এবং তাক লাগানো 'বাবুয়ানা' দ্বারা জনমনে এক ধরনের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। তার পিতৃ পুরুষদের কেউ রাজা-মহারাজা নবাব বা লর্ড ছিলেন- এমন কোন তথ্য জানা যায়না। অথচ এই রবীন্দ্রনাথের পিতামহ নিজকে প্রিন্স বলে আখ্যায়িত হতেন। তাঁর চলন-বলন ঠাট- বাট দেখে কৌতুকচ্ছলে লোকে প্রিন্স বলে আখ্যায়িত করতো। তিনি আসল 'প্রিন্স' ছিলেন না। নিমক এজেন্সী, জমিদারি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, নীলকুঠি, ব্যাংক, বীমা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, কয়লা খনি ইত্যাদি বিচিত্র কর্মের উদ্যোক্তা হয়েও দ্বারকানাথ 'বাবু গিরির' জন্যই 'প্রিন্স' হয়েছিলেন।[১২]

উত্তরকালে তাঁর এই বাবুয়ানা তাঁর বংশধরদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁহার বেলগাছিয়া বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।[১৩]

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের প্রভাবে একেশ্বরবাদীতে দীক্ষা নিলেও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেননি। পূজা বা তপ-জপে একটুও ভক্তি কমেনি। বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে সাহেব সুবোদের সাথে খানাপিনা করে শেষে গঙ্গাজল স্পর্শ ও বস্ত্র ত্যাগ করে শুদ্ধ হতেন। যেদিন থেকে মেম সাহেবদের সাথে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হলেন সেদিন থেকে দেবপূজা ত্যাগ করে ১৮ জন পুরোহিত নিযুক্ত করে তাদের দ্বারা সব কাজকর্ম করাতে লাগলেন।[১৪]

গঙ্গাজল স্পর্শে শুদ্ধি হওয়ার পরও ভ্রষ্টাচারের কারণে দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী দ্বারকানাথকে স্পর্শ করার জন্য গভীর রাতেও সাতঘরা জলে স্নান করতেন। কারণ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে পানাহার করেন। দিগম্বরী দেবী ম্লেচ্ছ সংসর্গ দোষের স্পর্শে নিজকে অশুচি জ্ঞান করার জন্যই এই রাত দুপুরে স্নান করতেন।[১৫]

জমিদার হিসাবে দ্বারকানাথ কেমন ছিলেন, সে সম্পর্কে কৃষ্ণ কৃপালনীর মন্তব্যঃ

'দ্বারকানাথ ছিলেন প্রজাদের কাছে জবরদস্ত জমিদার।[১৬]

১৮৮৩ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকা সম্পদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য

১২। অবন্তী কুমার সান্যাল ঃ বাবু, পৃঃ ৩৭।
১৩। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খন্ড, ১৩৫৩, পৃঃ ৬।
১৪। স্বপন বসু ঃ বাংলার নব চেতনার ইতিহাস, পৃঃ ৭২।
১৫। সুব্রত রাহা ঃ অস্পৃশ্যতার রাজনীতি, পৃঃ ৩৩।
১৬। কৃষ্ণ কৃপালিনী ঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃত, পৃঃ ৮১।

করেন ঃ

জমিদাররূপে তিনি এদেশের অন্য জমিদারদের তুলনায় স্বতন্ত্র বলে আমরা জানিনা। জমিদার শ্রেণীর অন্য জমিদার এবং জমিদার দ্বারকানাথের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাত আছে বলে শুনিনি আমরা। তাঁর জমিদারির রায়তরা কি পাশের জমিদারির রায়তের চেয়ে সুখী? খেটে খাওয়া মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি কিছু কি করেছেন? অন্যায়, অত্যাচার, বেগার ও জবরদস্তি আদায়ের হাত থেকে (অধিকাংশ দেশীয় জমিদারিতে যা ঘটে থাকে) এদের রক্ষার জন্য খুব কিছু কি করেছেন তিনি? সর্বোপরি রচনা কি করেছেন এমন একটা মধুর পরিবেশ যেখানে সকল প্রজা সুখে ও আনন্দে বসবাস করতে পারে।[১৭]

B. Blair King দ্বারকানাথের জীবনী আলোচনাকালে জমিদারি পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

জমিদারি তাঁর কাছে ছিল ব্যবসা। ব্যবসাদার সুলভ শৃঙ্খলায় তিনি জমিদারী পরিচালনা করতেন। তাঁর সেই পটুতার মধ্যে দয়ামায়া বদান্যতার কোন স্থান ছিল না।[১৮]

১৮২৩ খৃস্টাব্দে নীলকরের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য ঢাকার নাজিমউদ্দীন ও আরো ৩৬ জন রায়ত জজ সাহেবের কাছে এক আবেদনে বলেন ঃ

দাদন দিতে তাদের বাধ্য করা হয়। তাদের সেরা জমিগুলি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। অত্যাচারের মধ্যে মারধোর, অবাধ্য প্রজাকে গুদাম ঘরে আটক রাখা, জোর করে নীল বোনা, ওজনে ঠকানো, ফসল কেটে নেওয়া, ঘরের মেয়েদের দিকে নজর দেওয়া, মিথ্যা মামলায় প্রজাকে সর্বস্বান্ত করা,- এর সাথে অশ্লীল গালিগালাজ তো আছেই।[১৯]

রামমোহন-দ্বারকানাথ যখন নীলকরদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন এংলো ইন্ডিয়ান ডিরোজিও তাঁর Kaleioscope পত্রিকায় (আগস্ট, ১৮২৯ খৃঃ) মন্তব্য করেন ঃ

এদেশীয় ব্যক্তিদের উপরে নীলকরদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার বিষয়ে বিশপ হেবারের মন্তব্যের দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, নীল চাষীরা সেই সমস্ত প্রদেশে নীলকরদের অত্যাচার থেকে কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে যে, দেশীয় ব্যক্তিদের প্রতি ইউরোপীয়দের ব্যবহার তাদেরকে বিরোধী করে তুলছে এবং পরিণতিতে তার ফল হবে ভয়ঙ্কর।[২০]

১৮৩০ খৃস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী India Gazette পত্রিকা এক প্রবন্ধে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কিভাবে তাদের উপনিবেশসমূহে শোষণ-অত্যাচার করছে, তার বহু দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে ভারত প্রসঙ্গে তীব্র বিদ্রুপের সঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ

ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিয়াই এদেশের লোকের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নানা জাতীয় মদ্য, রাম, জিন, ব্রান্ডি ও আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণ আমদানি করিয়া কিরূপ অল্প সময়ে তাঁহারা এই বর্বর জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।[২১]

উপরোক্ত উপাদান দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কপালে জোটেনি বলে, রেনেসাঁ নামক

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।
১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।
১৯। অবতী কুমার সান্যাল, বাবু ঃ ৩৭
২০। Goutam Chattopadhy : Bangul Early Ninetccn Century, p. 33
২১। রমেশ মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৭

সোনার হরিণ কি চীজ তা দেখার সৌভাগ্য তাদের কোন দিন ঘটেনি। রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বাবুরা তার সবটুকু গলধকরণ করে ফেলার কারণে- 'রেনেসাঁ', 'নব জাগরণ', 'বুদ্ধির মুক্তি' ইত্যাদি শুধু তাদের জীবনেই ঘটেছিল; কলকাতার বাইরে সে রেনেসাঁর ঢেউ, জাগরণের জোয়া'র বা বুদ্ধির বিস্তার, তার কিছুই ঘটেনি।

রামমোহন ফরাসী বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হননি; স্পেনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে টাউন হলে ভোজসভা দিয়েছেন, ইতালির গণবিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে শয্যা গ্রহণ করেছেন, ভাঙ্গা পা নিয়ে অন্য জাহাজে গিয়ে ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। কিন্তু রাজা কখনও ভারতের ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরোধিতা করেননি; স্বদেশের কৃষকদের ইংরেজবিরোধী কোন সংগ্রামকে সমর্থন করেননি। একটিমাত্র উদাহরণ দিলে এর সত্যতা বোঝা যাবে। রামমোহনের আবাসস্থল কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরবর্তী বারাসত ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষকরা যে বছর সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ইংরেজ শাসনকে উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ভারতে বৃটিশ শাসনকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে লিখেছিলেন;-

> কৃষক ও গ্রামবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ। সুতরাং তারা পূর্বকালের বা বর্তমানকালের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিস্পৃহ। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীদের আচরণের উপরেই তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করে।.... যারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে এবং যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শান্তিতে জমিদারী ভোগ করছে, তাঁরা তাদের বিচক্ষণতার দ্বারা ইংরেজ শাসনাধীনে ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম। আমি তাদের সাধারণ মনোভাব সম্বন্ধে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, তাদের ক্ষমতা ও গুণানুসারে তাদেরকে ক্রমশ উচ্চতর সরকারি মর্যাদা দান করলে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের অনুরক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।[২২]

নবজাগরণের অগ্রদূত বা তাঁর সুহৃদ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মনে তিতুমীরের সংগ্রাম কোন দাগ কাটতে পারেনি। এতো বড় একটি ঘটনা তাঁদের চোখের সামনে ঘটে গেল অথচ এ ব্যাপারে তাঁরা টু-শব্দটি পর্যন্ত করেননি। কারণ তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সর্বান্তকরণে ইংরেজ শাসনকে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ, তাঁদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূল, নতুন জ্ঞানভান্ডারের উদ্‌গাতা, মুসলমান অত্যাচার মুক্তকারী, নিশ্চিত জীবন যাপনের সহায়ক। ইংরেজদের প্রতি ছিল তাঁদের অন্তহীন কৃতজ্ঞতা।[২৩] রাজভক্ত দ্বারকানাথ ইংরেজের জয়গানে ছিলেন সর্বদা মুখর। ১৮৪২ সালে লন্ডনের লর্ড মেয়রকে ধন্যবাদ

২২। পূর্ববর্তী ৩০, দ্রষ্টব্য ৬৭ (৩য়)।
২৩। পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য।

দান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

> এই সেই মহান দেশ যা আমার দেশবাসীকে মুসলমানের অত্যাচার ও শয়তানি থেকে রক্ষা করেছে।[২৪]

মুসলমানদের যারা অন্তরের ঘৃণা দিয়ে শয়তান বলে উক্তি করতে পারে, সেই মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের কাছে মূল্যহীন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। রামমোহন রায় ইংলন্ডের রাজার কাছে এক আবেদনে বলেন ঃ

> Your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers and look up to your Majesty not only as a ruler but also as a father and protectror.[২৫]

অর্থাৎ ইংরেজ শুধু তাঁর কাছে বিজয়ী বীর নয়, সে সাক্ষাৎ পরিত্রাতা। আর ইংলেন্ডেশ্বর শুধু শাসক মাত্র নন, তিনি একাধারে পিতা এবং রক্ষক।

রামমোহন রায় তাঁর মানিকতলার বাড়িটি মূল্যবান ইউরোপীয় আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করে কলিকাতার জীবনযাত্রা শুরু করেন। উৎসব-ভোজে, বাইজী-নাচে ও রক্ষিতা-পোষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করার ঐতিহ্য তিনি বহন করেছেন।

সমসাময়িক কালে রাজা রামমোহন রায়ের এক যবনী রক্ষিতা ছিল। উমানন্দ ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন, যে ওরূপ যবনী রক্ষিতা রাখা শাস্ত্র মতে দোষণীয় নয়।[২৬]

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজের অপকর্মকে জায়েজ করার এমন বহু উদাহরণ সেকালের সমাজপতিদের জীবনে থেকে দেয়া যায়।

রামমোহন সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতেন। ১৮২৩ সালে 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশ ঃ

> মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক অনেক ভাগ্যবান সাহেব ও বিবিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংলন্ডিয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়া ছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণ পূর্ব্বক চর্ব্বনাদি করিল।[২৭]

দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়া বাগান বাড়ির অনুষ্ঠানে দেশীয় বেনিয়ান, জমিদার দেওয়ান ও ইউরোপীয় বণিক কর্মচারীদের আনন্দ দানের জন্য আতসবাজী, আলোর বিচিত্র খেলায় ও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতার বেলগাছিয়া বাগান বাড়ির এক উৎসবের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ

২৪। পূর্ববর্তী পৃঃ ১৯১
২৫। Appeal to the king in council, The English works of Raja Rammohun Roy (1906) p. 446
২৬। অতুল সুর, কলকাতার চালচিত্র, পৃঃ ৪৪
২৭। বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৬

যখন এখানে গবর্নর জেনারেল লর্ড অকলন্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের একভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।[২৮]

তৎকালে প্রচলিত একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার মধ্যে বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে অনুষ্ঠিত আমোদ-ফুর্তির পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি-কাঁটার ঝনঝনানি, খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি? জানেন ঠাকুর কোম্পানী?

ইংরেজদের দোসর দ্বারকানাথ ঠাকুরের অপকর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে '৯৬ সালের আগস্ট মাসে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বিভিন্ন অমুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রণীত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছেন। উক্ত প্রবন্ধের আংশিক এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

দ্বারোকানাথ ঠাকুর ছিলেন নীলমনির দৌহিত্র। তাঁর জন্ম হয় ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে। ঠাকুর পরিবারের সন্তানগণের মধ্যে দ্বারোকানাথই ছিলেন বেহিসেবী, বেপরোয়া এবং উচ্ছল। এদিকে ঐশ্বর্যে এবং প্রতাপে দর্পনারায়ণের সন্তান-সন্ততিরাও তৎকালীন বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দর্পনারায়ণের দৌহিত্র একজন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বেঙ্গল গভর্নরের কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন। দর্পনারায়ণের একজন প্রপৌত্র ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি ইংরেজ সরকারের প্রতি অসম্ভব অনুগত ছিল। ইংরেজ শাসক তাঁকে তাঁর রাজভক্তির জন্য 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এর এক ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। এ ভদ্রলোক ছিলেন একজন নির্লজ্জ মোসাহেব। রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি স্তাবকতা প্রদর্শন করে তিনি সংস্কৃত ছন্দে 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা' রচনা করেছিলেন। এই গীতিকায় রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তিসহ তাঁর পূর্ব-পুরুষদের এবং সন্তান-সন্ততিদেরও প্রশস্তি ছিল। তৎকালীন অনেক ইংরেজও এ ধরনের নির্লজ্জ প্রশস্তিতে বিচলিত এবং লজ্জিত বোধ করেছিলেন। তাঁর এই নির্লজ্জ স্তাবকতা এবং বৃটিশ পদলেহনের জন্য তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ উপাধি পেয়েছিলেন। অনেক পরে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে একই বংশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন অক্সফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি পান তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন তাঁর 'সাইটেশনের' মধ্যে সৌরিন্দ্র মোহনের নাম উল্লেখ না করা হয়। সৌরীন্দ্র মোহনের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত বোধ করেছিলেন। দর্পনারায়ণের বংশধরগণ এভাবে বৃটিশদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে ও তাদের চাটুকার সেজে পার্থিব সম্পদ আহরণ করেছিলেন প্রচুর। বৃটিশদের কাছ থেকে দর্পনারায়ণের বংশধরগণের সর্বশেষ সম্মান লাভ ঘটে যখন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের করনেশান অনুষ্ঠানে সৌরিন্দ্র মোহনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর বৃটিশদের দর্পনারায়ণের পরিবারের প্রতি আর কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন ঘটেনি। তখন বৃটিশদের জন্য নীলমনির বংশধরগণই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল।

২৮। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃঃ ৩৯

দর্পনারায়ণের ভ্রাতা নীলমনির দৌহিত্র দ্বারোকানাথ একাই বৃটিশ স্তাবকতায় দর্পনারায়ণের লোকজনদের চাইতে যথেষ্ট ছিলেন। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফ্লামবয়েন্ট' দ্বারোকানাথ ছিলেন তা-ই। এ শব্দটির বাংলা কি করা যায় বুঝতে পারছি না। আসল অর্থ হচ্ছে তরঙ্গায়িত অগ্নিশিখাতুল্য। অর্থাৎ তিনি ছিলেন দ্বিধা -দ্বন্দ্বহীন উজ্জ্বল আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ মানুষ। দ্বারোকানাথকে এই উপাধিতে সত্যিই মানায়। সমগ্র জীবন তিনি বৃটিশদের সর্বকর্মে সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন। নীলকরদের অত্যাচার সমর্থন করেছেন। যখন নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশের রায়তরা হতভম্ব এবং নির্যাতিত তখন তিনি এবং রাজা রামমোহন রায় নীলকরদের কর্মকান্ড সমর্থন করেছেন।

দ্বারোকানাথের জন্ম হয় ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর জন্মের এক বছর আগে ইংরেজ সরকারের নতুন 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট' বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হয়। সেই সুযোগে তাঁর পিতা অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুতে এ সমস্ত জমিদারীর দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। তিনি একজন বৃটিশ আইনজীবীর সহায়তায় জমিদারী পরিচালনার ব্যবস্থা করেন এবং ভূসম্পত্তি সংরক্ষণের নানাবিধ কৌশল জ্ঞাত হন। উক্ত আইনজীবী তাঁকে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যরত বিভিন্ন বৃটিশ বণিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবে দ্বারোকানাথের প্রভূত অর্থোপার্জন ঘটতে থাকে এবং তিনি জমিদারী সুরক্ষায় একজন নিষ্ঠুর শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর পিতা জমিদারী ক্রয় করেছিলেন পূর্ববঙ্গের যশোর ও পাবনায়। তিনি ১৮৩০ সালের দিকে পূর্ববঙ্গে আরও দু'টি জমিদারী ক্রয় করেন। উড়িষ্যার কটকেও তাঁর পিতার একটি জমিদারী ছিল। মূলত সমগ্র পূর্ববঙ্গেই তাঁদের জমিদারী ছড়ানো-ছিটানো ছিল।

মানবতাবোধ বর্জিত এই কঠোর নীতিগুলো সত্যিই লোমহর্ষক। দরিদ্র প্রজারা, যারা ঠিকমত খাজনা দিতে পারত না, পাইক-বরকন্দাজরা তাদেরকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করত এবং মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে যেত। এতে যদি প্রজারা খাজনা পরিশোধ করতে না পারত তাহলে তাদেরকে তুলে নিয়ে খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা হতো। তখন বাধ্য হয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা নিজেদের সর্বস্ব বিক্রি করে খাজনা পরিশোধ করে বন্দীদেরকে মুক্ত করত। অনেক সময় বন্দীদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জমিদার বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। পূর্ববঙ্গের এ সমস্ত নিরীহ প্রজারা প্রতিবাদ করতে সাহস করতো না। কেউ কেউ ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইংরেজ কমিশনারদের কাছে এ সম্পর্কে প্রতিবাদ করায় তার ফল আরও খারাপ হয়েছিল। রেকর্ডে পাওয়া যায় যে, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে এক দল প্রজা সম্ভবত পাবনা অঞ্চলে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিকের কাছে একটি পিটিশন দাখিল করেন। এই পিটিশনে তাঁরা দ্বারোকানাথের নানা প্রকার অত্যাচারের বিবরণ দেয়। সেখানে তারা একথানও বলে যে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কমিশনারদের কাছে আবেদন জানিয়ে তারা নিরাশ হয়েছে। এরা সর্বদাই দ্বারোকানাথের পক্ষ সমর্থন করেছে। এ পিটিশনের ফল কি হয়েছিল আমরা জানি না। দ্বারোকানাথ ঠাকুরের আমেরিকান জীবনকর ব্লেয়ার ক্লিং এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখেননি, কিন্তু পিটিশনটি তিনি তাঁর গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। ব্লেয়ার ক্লিং (Blair Kling)'র গ্রন্থটির নাম Partner in Znpire : Dwarkanath Tagore and the Age of in Zantere India (Barkeley, 1976)

সে সময় বাংলাদেশে নীলকরদের বর্ণনাতীত অত্যাচার চলছিল এবং বৃটিশ প্রশাসনের ইংরেজ কর্মকর্তারাও এতে বিচলিত বোধ করেছিলেন। এরকম একজন ইংরেজ কর্মকর্তার

নাম ন্যাথলিয়েল আলেকজান্ডার। তিনি এ সমস্ত অত্যাচারের সংবাদে ক্ষুব্ধ হন এবং বিশদভাবে যথার্থ সংবাদ জানার জন্য রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারোকানাথ ঠাকুরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। এ ঘটনাটি ১৮২৯ সালের। রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারোকানাথ ঠাকুর উভয়ই নীলকরদের সমর্থনে কথা বলেন এবং উভয়ই বলেন যে, নীলচাষ একটি অর্থকরী কার্যক্রম এবং রায়তদের এতে শেষ পর্যন্ত উপকারই হয়। দ্বারোকানাথ নিজেই তাঁর কৃষি জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তিনি নিজে নীলকরদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জোড়াসাঁকোতে তাঁর বাসগৃহে নিয়মিত মদ্যপানের আসর বসত এবং সেখানেও নীলকররা আমন্ত্রিত হতো। দ্বারোকানাথের নীলকর তোষণটি ঠাকুর পরিবারের জীবনে একটি কলংকজনক অধ্যায়। ১৫ ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা টাউন হলে কলকাতার নাগরিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারের স্তুতি করা। সভায় রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারোকানাথ ঠাকুর উভয়ই বক্তৃতা করেছিলেন। দ্বারোকানাথ তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, নীলকরদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি যে, জমিদারী প্রশাসনে তিনি একটি কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। তাঁর ভাষায় ঃ "am well acquainted with the charactor and manner of the Indigo planters."

তিনি আরও বলেছিলেন যে ঃ তাঁর জমিদারীতে বিভিন্ন জায়গায় নীলচাষের ফলে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন। এতে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়েছে। যার ফলে তিনি সরকারের প্রদত্ত খাজনা সহজেই পরিশোধ করতে পেরেছেন। শুধু তিনিই নন, তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের অনেকেই নীলচাষের ফলে ভাগ্যের উন্নতি ঘটিয়েছেন। এভাবে প্রজা-পীড়ন এবং নীলকরদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে দ্বারোকানাথ নিজেকে একজন নীতিবোধহীন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

বিলাস বসনে দ্বারোকানাথের সমকক্ষ কেউ তখন বাংলাদেশে ছিল না। তাঁর জীবন ছিল ঐশ্বর্যের এবং ভোগ-বিলাসের। কলকাতার বাইরে দমদমের পথে বেলগাছিয়ায় তাঁর একটি প্রাসাদ ছিল। উক্ত প্রাসাদ ইউরোপীয় ধাঁচে সাজানো হয়েছিল। এখানেই তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ান, ব্যবসায়ী বণিক, নীলকরকে আপ্যায়ন করতেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওকল্যান্ডের ইমিলি ইডেল বলে এক সুরসিকা ভগ্নী ছিলেন। দ্বারোকানাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি একটি পত্রে লিখেছেন যে ঃ

"এ দেশে দ্বারোকানাথই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষকে আপ্যায়ন করতে জানেন।"

একবার লর্ড অকল্যান্ড বেলগাছিয়ায় নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ খবরে কলকাতাবাসী খুব উল্লসিত এবং অহংকারবোধ করেছিল। বেলগাছিয়ার প্রাসাদের সম্মুখে খোলা চত্বরে দ্বারোকানাথের পোষ্য হাতী ঘুরে বেড়াত। প্রাসাদের পেছনে সান বাঁধানো পুকুর ছিল। পুকুরে নৌকো ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। দ্বারোকানাথ কয়েকবার ইংল্যান্ডে গিয়েছেন। প্রথমবার যান ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে, তাঁর নিজের 'ইন্ডিয়া' নামক জাহাজে। ইংল্যান্ডে তিনি লন্ডনের লর্ড মেয়র কর্তৃক সংবর্ধিত হন। প্রধানমন্ত্রী স্যার পিলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তাঁকে সকলেই প্রিন্স বলে সম্বোধন করতে থাকেন। কেননা তিনি একজন রাজকুমারের মতই সেখানকার মানুষকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়েছেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ইংরেজ রাজপুরুষদের সম্মানে ব্যাকুয়েট দিয়েছেন। দর্পনারায়ণের দৌহিত্র সৌরিন্দ্র মোহন বৃটিশ

তোষণে যতটা না অগ্রসর হয়েছিলেন, তার চেয়ে শতগুণে বেশী অগ্রসর হয়েছিলেন দ্বারোকানাথ ঠাকুর। এভাবে তিনি পাথুরিয়া ঘাটার জাতিগোষ্ঠীকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকন্সের সঙ্গে দ্বারোকানাথ ঠাকুরের পরিচয় ঘটেছিল। ইনিই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্বারোকানাথকে তার যথার্থ স্বরূপে চিনতে পেরেছিলেন। লন্ডনে তাঁর বিলাসবহুল জীবন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অর্থব্যয় যার সঙ্গেই পরিচয় হচ্ছে তাকেই উপঢৌকন প্রদান এসব দেখে ডিকেন্স তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন ঃ "বাবু দ্বারোকানাথ ঠাকুরকে 'বাবু' লিখতে আমার কলমে আটকায়, ভয় হয় বেবুন লিখে ফেলি কিনা।"

বেবুন হচ্ছে বানর জাতীয় প্রাণী এবং এর অঙ্গভঙ্গি খুবই কুৎসিত এবং হাস্যকর।[২৯]

জমিদার বাবুরা যখন সাত মহলা রাজ প্রাসাদে মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রঙ্গিন মদিরার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাঈজীর নূপুর নিক্কনের সাথে তাল ঠুকতেন, তখন সলিমুদ্দীন-কলিমুদ্দীনরা প্রখর রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি গায়ে এক হাঁটু কাদায় অস্থিচর্মসার দু'টি বলদের সাহায্যে বাবুর ভোগের জন্য খেটে যাচ্ছে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যে শোষণ এবং পীড়নের শিকার হয়েছিলেন তা সাহেব এবং দ্বারকানাথ বাবুদের সৃষ্ট এক নিষ্ঠুরতার ইতিহাস।

দ্বারকানাথ বর্ণিত মহান দেশ, যে দেশে মুসলমানদের শয়তানির হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছে, যে দেশের রাজাকে রামমোহন পিতৃতুল্য সম্মান করতেন, সেই বিলাতে এবং প্যারিসে যেয়ে তিনি কি করেছেন? মুসলমান বাদশা নবাবদের ব্যর্থ অনুকরণ করে রাজা-বাদশাদের সম্মান আদায় করতে গিয়ে জাঁকজমক ও বিলাসিতা প্রদর্শন করেছেন, থিয়েটার দেখেছেন, সুন্দরীদের নাচ দেখেছেন, বড় বড় পার্টি দিয়ে নিজেকে প্রদর্শন করেছেন। জ্ঞান-গম্ভির উপদেশ বাক্য আওড়িয়েছেন, আর সে-দেশের লোকেরা কল্পনার মোগল সম্রাটদের ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে। অথচ ইনি নিমকগোলার দেওয়ান থাকাকালীন দেশের গরীব প্রজাদের যে-ভাবে শোষণ করেছেন, অত্যাচার করেছেন- তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। দরিদ্র প্রজাদের শোষণের মাধ্যমে বিত্তের যে পাহাড় গড়ে ছিলেন, তার সিংহ ভাগ তিনি লন্ডন প্যারিসের পানশালা আর নৃত্যশালায় উড়িয়ে এসেছেন। ইংরেজ অনুগ্রহে কলকাতা কেন্দ্রিক নব্য ভদ্রলোকদের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল- তার ছোঁয়া বা পরিবর্তনের কোন সুফল উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের গ্রামীণ জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বা পরিবর্তন আনতে পারেনি। 'বাংলার নবজাগরণ' বলে যে কালকে চিহ্নিত করা হয় তাকে 'বাংলার জাগরণ' না বলে ইংরেজ পদলেহি কিছু 'নব্য ভদ্রলোকের' ব্যক্তিগত জাগরণ বললেই সঠিক বলা হবে। বাংলার নবজাগরণ একটি অতিকথন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৯। সৈয়দ আলী আহসান, দৈনিক ইনকিলাব, আগস্ট ২, '৯৬।

১৭৫৭ সালের পরে ইতিহাস বেনিয়া ইংরেজ এবং তাদের অনুগত ভৃত্য নব্য জমিদার বাবুদের সীমাহীন শোষণ, লুণ্ঠন-এ সোনার বাংলাকে শ্মশান বাংলায় পরিণত করেছিল। দ্বারকানাথ-রবীন্দ্রনাথ গংরা ব্যবসায়ী, আমলা ও জমিদার বাবু হয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। ইংরেজদের সাথে হিন্দুদের সখ্যতা ইংরেজদের এ দেশের মাটিতে পা রাখার সময় থেকেই শুরু হয়েছে। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততায় হিন্দুদের কোন খাদ ছিলোনা। তাই ইংরেজরা প্রভু ভক্ত ভৃত্য দ্বারকানাথ গংদের বৈষয়িক কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি।

১৭৯৯ খৃঃ লর্ড ওয়েলেসলি শহরবাসী অলস কর্মবিমুখ নব্য জমিদার বাবুদের সাহায্য কল্পে উৎপীড়নমূলক হফতম বা সপ্তম আইন জারি করেন। এই আইনের মাধ্যমে জমিদারদের সীমাহীন স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্ব দেয়া হয়। এই জমিদারেরা সরকারী অনুমতি ছাড়াই যখন তখন বকেয়া খাজনা অনাদায়ে প্রজাদের গ্রেফতার, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত এবং দৈহিক নির্যাতন করতে পারতো। এ বিষয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার কোন বিধান ছিলো না।

জমিদার বাবুরা প্রজাদের উপর কত রকমের কর যে চাপিয়ে দিয়েছিল- এর কিছু বিবরণ তৎকালীন 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ঃ

> প্রজারা যখন বাজারে তরিতরকারী বিক্রি করতো তখন 'তোলা' দিতে হতো। নিজের জায়গায় গাছ লাগালে তার 'চৌথ' কর জমিদারকে দিতে হতো। আখ হতে গুড় করলে 'ইক্ষু গাছ' কর জমিদারকে দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হতো। ঘাটে নৌকা ভিড়ালে জমিদারকে 'খোটা গাড়ি' কর দিতে হতো। নৌকায় মাল উঠালে বা নামালে 'কয়ালী' খাতায় কিছু জমা করতে হতো। গরুর গাড়ি করে বাজারে মাল পাঠালে 'ধুলট' কর দিতে হতো। ভাগাড়ে গরু ফেললে 'ভাগাড়' কর জমা দিতে হতো। প্রত্যেক জেলেকে 'জেলে জমা' দিতে হতো। জমিদার জমিদারিতে তোষদান নিয়ে উপস্থিত হলে সকল প্রজাকে নজরানা দিয়ে সেলাম করতে হতো। কোন প্রজা কিছুদিন জমিদারীতে থাকলে আগামী কর দিতে হতো। জমিদার কোন কুকাম করে কয়েদ হলে 'গারদ সেলামী' দিতে তাঁকে বাটীতে ফিরিয়ে আনতে হতো।[৩০]

১৮৭২ সালের 'গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা লিখেছেন ঃ

> যাঁরা জমিদারদের কাছারীতে সর্বদা যাতায়াত করেন তাঁরা বলেন এখনও সর্দার দিয়ে প্রজা ধরে এনে জুতা, লাঠি দ্বারা প্রহার করা হয়। জরিমানা করা হয়, পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করে গালি দেয়া, কখন কখন প্রজার মা-বোন, স্ত্রী প্রভৃতিকে কাছারিতে ধরে এনে নির্দেশ দেয়া হয়। আমিনগণ বিশেষ প্রণামী পেলে বিশ কাঠায় বিঘা নতুবা পনের কাঠায় বিঘা গণনা করেন। কোন প্রজার এত বড় মাথা নেই এর প্রতিবাদ করার। বস্তুত এক একটি জমিদারী নায়েবাদীর আত্মীয় প্রতিপালনের বেগুন ক্ষেত।[৩১]

খাজনা অনাদায়ে শারীরিকভাবে প্রজা নির্যাতনের আরেকটি তথ্য প্রকাশ করেছিল

৩০। পাবনার শাহজাদপুরে ঠাকুর বাবুদের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ (১৮৭৩), দ্রঃ স্বপন বসু ঃ গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ

৩১। ১৮৫৭ সিপাহী বিপ্লব

তৎকালীন 'তত্ত্ব বোধিনী' পত্রিকা। পত্রিকাটি লিখেন ঃ

১। দন্ডাঘাত বা বেত্রাঘাত, ২। কর্মপাদুকা প্রহার, ৩। বংশ কাঠাদি দ্বারা বক্ষস্থল দলন, ৪। খাপরা দিয়ে কর্ণ নাসিকা দলন, ৫। ভূমিতে নাসিকা ধর্ষণ, ৬। পিঠে দুই হাত মোড় দিয়ে বেঁধে বংশ দন্ড দিয়ে মোড় দেওয়া, ৭। গায়ে বিছুটি দেওয়া, ৮। হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, ৯। কান ধরে দৌড় করানো, ১০। কাঁটা দিয়ে হাত দলন করা। দু'খানি কাঠের বাখারির একদিক বেঁধে তার মধ্যে হাত রেখে মর্দন করা। এ যন্ত্রটির নাম কাঁটা, ১১। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড রোদে ইটের উপর পা ফাঁক করে দু'হাত ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা। প্রবল শীতের সময় জলে চোবানো, ১৩। গোনীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা, ১৪। গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান দেওয়া, ১৫। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা, ১৬। চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা, ১৭। কারারুদ্ধ করে উপবাসী রাখা, ১৮। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে লঙ্কা মরীচের ধোয়া দেয়া।[৩২]

জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে আবদুল মওদুদ লিখেছেন ঃ

"হিন্দু জমিদার ও নীলকররা তাঁর অনুগামী মুসলমান কৃষকদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালাতো, তার তুলনা নেই। দরিদ্র কৃষকদের দড়িতে দড়িতে বেঁধে নাকে মরিচের গুঁড়ো দেওয়া হতো; শ্যামচাঁদের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করতো। দাড়ি রাখার জন্যে ও শাদী, খাৎনা উৎসবকালে পৃথক আবওয়ার আদায় দিতে হতো। কিন্তু মুসলমান রায়তকে দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চাঁদা দিতে বাধ্য করা ও জমিদারীর মধ্যে গো-কোরবানী নিষিদ্ধ করার মতো জমিদারদের অত্যাচার ছিল দুদু মিয়ার চোখে একেবারে অসহ্য।[৩৩]

অর্থ পিশাচ হৃদয়হীন এই নব্য বাবু জমিদারদের প্রজা পীড়নের তালিকা এটাই সম্পূর্ণ নয়। ঊনিশ শতকের বাংলার সাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এরূপ অত্যাচারের আরো অনেক বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই শোষণ এবং পীড়নের শিকার হয়েছিল যে প্রজা সাধারণ তার সিংহভাগই ছিল মুসলমান কৃষক।

ইংরেজ শাসন আমলে হিন্দুরা ইংরেজকে ত্রাণকর্তা 'কল্কির দেবতা' ভেবেছে, ইংরেজ শাসনকে ভেবেছে বিধাতার আশীর্বাদ। ইংরেজ ছিলো তাদের কাছে কলির দেবতা স্বরূপ। এই সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঃ

১৮৩৩ সালে কি ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর হবে- না... তখন বাঙালী নেতারা, মায় রামমোহন রায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন অন্যান্য ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভের জন্য। ..... ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে দু'টি জাতের মানুষ ছিল; হিন্দু ও মুসলমান। যদিও তারা একই দেশের বাসিন্দা ছিল, তবুও এক ভাষা ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ছয়শো বছর ধরে বাস করেছে যেন দু'টি ভিন্ন পৃথিবীতে। ..... রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ মুসলিমদের জ্ঞান করতেন হিন্দুদের যতো দুর্গতি ও অসম্মানের মূল উৎস হিসেবে- যা হিন্দুরা নয়শো বছর ধরে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আর বৃটিশ শাসনকে জ্ঞান করতেন বিধাতার আশীর্বাদ; যার প্রসাদে হিন্দুরা কুখ্যাত মুসলিম শাসন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে ও পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের উল্লেখ করা হতো 'যবন' হিসাবে.... তখন ব্রিটিশকে বিতাড়িত

৩২। বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৯৬৮, পৃঃ ২৩-২৪
৩৩। আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩২৫

করে হিন্দু বা ভারতীয় শাসন স্থাপনের কোনও ইচ্ছাই ছিল না। এমনকি রাজা রামমোহন রায়ের এমন ইচ্ছা জন্মেনি। এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট নাগরিক প্রকাশ্যে বলতেন যে, যদি ঈশ্বর তাঁকে 'স্বরাজ' ও বৃটিশ শাসনের মধ্যে বেছে নিতে বলেন, তাহলে তিনি শেষেরটাই বিনা দ্বিধায় বেছে নিবেন।[৩৪]

রামমোহনের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ 'শর্মনঃ' ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের নেতা হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উৎকট বেদ-উপনিষদ প্রীতি, বেদকে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে প্রচার ও ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রীতি ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন ধরিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী; তিনি হিন্দুদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি খৃষ্টানদের প্রভাব প্রতিরোধ করতে অগ্রণী হন।

দেবেন্দ্রনাথের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেশবচন্দ্র সেন নতুন ব্রাহ্মণ সমাজ 'নববিধান' সংগঠন করেন। রাজা রামমোহনের মতো তাঁরও চোখ ইংরেজদের উপরেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর মানস জীবনও সেকালের কলেজী শিক্ষার বিচিত্র বর্ণ সমারোহকে কেন্দ্র করে, এবং ব্যবহারিক জীবন ইংরেজ সংসর্গে কাটে। ইংরেজ শাসন, অন্যান্য সকলের মত তাঁর কাছেও বিধাতার আশির্বাদ। আবেগ-উৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় তিনি স্বয়ং বলেছেন ঃ

করুণার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর ভারতবর্ষকে উদ্ধার করার জন্য ব্রিটিশ জাতিকে প্রেরণ করেন; ঈশ্বরেরই আজ্ঞাবহরূপে ইংল্যান্ড এলো, এবং ভারতের তিমিরগুণ্ঠিত দরজায় আঘাত করে বললো, উঠো এবার, দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিলে তুমি (Nable Sister, rise thon has slept to long)। তাঁর মতে বর্তমান ভারত বাইবেলের মর্মবাণী গ্রহণ না করে বাঁচতে পারে না।[৩৫]

তিনি প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে সফর করে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। রাজার মতো তিনিও ইংল্যান্ডে গমন করেছিলেন। শেষে চৈতন্যের ভক্তিবাদও প্রচার করেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানবপূজা বা অবতার বাদ আরম্ভ হয়। তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পর্দা প্রথা বিলোপের উৎসাহী ছিলেন। অথচ তিনিই কুচবিহারের নাবালক হিন্দু রাজার সংগে চতুর্দশী কন্যা সুনীতি বালার হিন্দুমতে বিবাহ দিয়ে (১৮৭৮ খৃঃ) ব্রাহ্মশিবিরে দ্বিতীয় ভাঙন ধরিয়ে দিলেন।[৩৬]

নতুন মনিব ইংরেজরা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে 'বাবু' নামে সম্বোধন করতো। তিনি যতোই ইউরোপীয় জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হোন, এবং বিলাত-ফেরতই হোন, তিনি বাবু।

বাবু রামমোহন, বাবু দ্বারকানাথ, বাবু রাম দুলাল দে হিসাবে তাঁদের ইংরেজ মহলে পরিচয় ছিল। এই বাবুদের রূপ ও স্বভাব এভাবে অংকিত হয়েছে ঃ

"এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হইয়া

৩৪। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিষ্টরী অব বেঙ্গল, পৃঃ ১৯৩

৩৫। উনবিংশ শতাব্দীর ভারত পথিক, ৭৫-৭৬ পৃঃ

৩৬। (Advance Hist. of India pp. 878-80 দ্রঃ আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ১১৯-১২০)

ভোগ সুখেই দিন কাটাইত। ভ্রু মুখের পার্শ্বে ও নেত্র কোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাবরী চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালা পেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেম্‌রিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সম্বলিত চিনে বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাফ আকড়াই পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাটাইত।[৩৭]

কালীপ্রসন্ন সিংহ তখনকার কলিকাতা কেন্দ্রিক 'বাবু'দের জীবনযাত্রা তাঁর লেখনীতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

"নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্ত রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছেদ হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। ....পুঁটে তেলি রাজা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো.... হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। ..... পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। ...... আজকাল শহরের ইংরেজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচু কেতা শহরের গোবরের যষ্ঠ', দ্বিতীয় 'ফিরিংগীর জঘন্য প্রতিরূপ' ...... শহরের অনেক বড় মানুষ ...... তাঁরা যে বাংগালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন। বাবু চূনাগলির অ্যানড্রু পিদ্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা খুশী হন..... পূর্বের বড় মানুষরা এখনকার বড় মানুষদের মতো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত থাকতেন না। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল..... তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘন্টা লাগতো...... সেই সময় বিষয় কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সই মোহর চলতো..... রামমোহন রায়, গোপিমোহন দেব, গোপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো।[৩৮]

তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিশ্চিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল, মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত।.... পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পন্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। .... সন্ধ্যার পর দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ কার্যোপলক্ষে লোকের সেখানে স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, তেমনি বিজয়ার রাত্রিতে বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।[৩৯]

মুসলমান শাসনের পতনের পর বৃটিশ বেনিয়াদের আনুকল্যে সৃষ্ট বাবুদের উদ্দেশ্য ছিলো ইন্দ্রিয় সম্ভোগ। চোখে কালি পড়া, বাউরী চুল, ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতিপরা এই বাবুদের বক্তব্য ছিল- "সুখজনক কাজ করিলে যদি পাপ হইবে তবে ঈশ্বর সুখসাধন

৩৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ৫৫-৫৬
৩৮। কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা
৩৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৪১

ইন্দ্রিয়কে আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন কেন? দেখ হস্ত, ইন্দ্রিয় দ্বারা আহার করিতেছে, চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতেছে। তাহাতে লোকে পরম সুখী হইতেছে।" তবে গণিকা সম্ভোগে পাপ হইবে এ কেমন কথা? এ ধরনের জীবনাদর্শে বিশ্বাসী জমিদার বাবুরা এক সময় মেলা নামক সামাজিক উৎসবটির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তারা মেলাকে রোজগার বাড়াবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন। মেলার চরিত্র গেল বদলে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রাতমনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' হইতে বাবুদের মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলায় কিংবা মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হইতে বীরঙ্গণাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "পল্লীচিত্র" বইতে মরুটীয়ার স্থান যাত্রার মেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "বার বিলাসিনীদের দোকান" এ অঞ্চলের মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেলায় ইহাদের সমাগম যত অধিক হয় জমিদারে লাভও তত অধিক হইয়া থাকে। এক একটি রূপজীবিনী তিনচারি হাত লম্বা 'টোঙ্গে' রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। অর্থোপার্জনের আশায় এখানে নানা পল্লী হতে তিন শতাধিক রূপজীবিনীর সমাগম ঘটেছে। শিকারের সন্ধানে অনেক চারি গাছা মলের ঝনঝনানিতে গ্রাম চাষীদের, পাইক-পেয়াদা ও নগদীগণের তৃষিত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করে মেলার মধ্যে বিচরণ করছে।

লোকগীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর গানে বাবু বিবিদের এই মেলার বর্ণনা দিয়ে গেয়েছেন ঃ

"নাগরী চারিদিকে
বেড়াচ্ছে পাকে পাকে
দেখে যারে তাইরে ডাকে
প্রাণ বন্ধু বলে।"

বাবু-গৌরবের আমলে মেলা হয়ে উঠেছিল একান্তভাবেই মদনোৎসব। মেলা মানেই ছিল নাগর-নাগরীদের খেলা। মেয়েরা ছড়া কেটে বলতো-

"সবাই দেবে গায়ে হাত
তবেই হবে মেলার জাত।"

সেকালে মেলার নামে যা হতো বিদ্যাপতি ঠাকুরের কাব্যে বর্ণিত আছে। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"ব্রাহ্মণের পৈতে গিয়ে পড়ছে
চন্ডালের গায়ে,
আর বেশ্যার পয়োধর মর্দিত হচ্ছে
সন্যাসীর বুকে।"

সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণীকুলের সাথে নরককুলের যাত্রাতিরিক্ত ভীড় দেখে সেকালের ঘোষ পাড়ার কর্তাভাজা মেলা সম্পর্কে 'সোম প্রকাশ' (১২৭০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় লেখা হয়েছিল-

"এ বৎসরে 'দোলে' প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দয়ানা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক। যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা লজ্জা ও কুল ভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের, সেই স্ত্রীলোকের এক কর্তার অনুরোধে বহুসংখ্যক অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না, এক একটি পুরুষের নিকট গড়ে ৪/৫টি করিয়া যুবতী বসিয়া আছে।[৪০]

১৮৫০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ইংরেজদের কাগজ "The Morning Chronicle" মন্তব্য করেছিল ঃ

"পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কৃষকরা জমিদারদের দ্বারা এ দেশের মতো নির্যাতিত হয়না। এইসব জমিদারেরা অনেকেই দারিদ্র্য থেকে উঠেছে, এদের নীতি- লুটে নাও যা পারো।"

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বসুরীদের ভূমিকা সম্পর্কে আবদুল মওদুদ লিখেছেন ঃ

বস্তুত ঃ দেশের জনগণ যখন বিদেশী ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করতে মরণপণে শুধু হাতেই লড়ছে এবং স্বাধীনতা লাভের আশায় সমগ্র দেশে সমরানল জ্বলে উঠছে, তখন কলিকাতার সংস্কৃতিমনা উচ্চ সম্প্রদায় পাইকপাড়ার রাজার বেলগাছিয়া বাগান বাড়ীতে সখের নাট্যশালায় 'রত্নাবলীর' অভিনয় দেখেছেন। মাইকেল মধুসূদন 'মহামান্য' ইংরেজ অতিথিদের অভিনয় উপভোগের সুবিধার্থে 'রত্নাবলীর' ইংরেজী অনুবাদ করেছেন ও স্বয়ং 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেছেন। হিন্দু কলেজের উন্নতি মানসে তদানীন্তন গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের দরবারে হাজিরা দিচ্ছেন 'ধুতিপরা লোকটী' ঈশ্বরচন্দ্র প্যান্টালুন চোগা-চাপকান ও পাগড়ী শোভিত হয়ে। (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র) আর রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় পাদদেশে নির্জনে নিশ্চিন্তে আত্মিক উন্নতির সাধনায় তৎপর আছেন।[৪১]

সুতরাং ব্রিটিশ প্রভুদের সপক্ষে তাঁবেদারী, অর্থলোভ, অনৈতিকতা ও জমিদারীর মধ্যে কিভাবে ভদ্রলোকদের সাহিত্য প্রতিভা স্ফূরণের বীজ নিহিত ছিল, তা বাংলার বিশ্ব-বিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক ইতিহাস প্রমাণ করে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী এই বাংলার নির্যাতিত জনগণের ঘামে ও রক্তে ভেজা অর্থে গড়া। কাজেই প্রজাদের ঘামে ও রক্তে ভেজা অর্থে নির্মিত তিন অংশে বিভক্ত একশ' তিরিশ রুমের বিশাল বাড়ীর বাতাসে রয়েছে এই দেশের মজলুম জনতার আর্তনাদ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর প্রতিটি ইট, সুরকী, বালি ও কঠিন ধাতু লোহাতে রয়েছে পাপ। এই পাপ পুরীতেই ১৮৬১ খ্রীঃ ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) রাত আড়াইটার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

৪০। দৈনিক ইনকিলাব, আয়ার দানিশ, ২৩শে বৈশাখ, ১৪০১

৪১। আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ১২৯)

ছবি কথা বলে ঃ (রাক্ষুসী পলাশীর পরের বাঁকে)

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশী প্রান্তরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার পর রবার্ট ক্লাইভ এবং মীর জাফর আলী খাঁর মিলন দৃশ্য একখানি প্রাচীন চিত্র থেকে গৃহীত - মাসিক মোহাম্মদীর সৌজন্যে

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ক্লাইভের সনদ লাভ

সর্বনাশা নীল গাছের পরিবহন নিয়ে সাহেব-বাবুরা মহাব্যস্ত। ইংরেজদের সীমাহীন লুন্ঠন, বাবুদের শোষণ এবং এই নীল চাষের আমাদের পূর্বসুরীদের হতে হয়েছিল সর্বস্বান্ত। আর বাবুরা নিঃস্ব থেকে হয়েছিল অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। হয়েছিল প্রিন্স জমিদার। নীল চাষের অবাধ্যতার কারণে আমাদের পূর্বপুরুষদের পিঠে পড়েছে চাবুকের আঘাত, নির্যাতন-নিপীরণে শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেকের। চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের আর্তনাত এখনো বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু আমরা বাবু প্রেমে গদ্ গদ্ হয়ে এসব ইতিহাস ভুলে গেছি। আর ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে অবিরত।

সীমাহীন নির্যাতনে মুসলমানেরা যখন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হারা তখন বাবু জমিদারদের গায়ে উঠেছে জরির জামা, পরনে উঠেছে চিকন সুতোর মিহি ধুতি অথবা ইউরোপীয় সাহেবদের অনুকরণে সাহেবী পোশাক এবং পায়ে শোভা পেয়েছে সোনায় মোড়ানো জুতো। ছবিতে জরির জামা পরিহিত রবীন্দ্রনাথের পিতামহ তৎকালে লোক মুখে উপহাসচ্ছলে প্রিন্স বলে খ্যাত জমিদার দ্বারকানাথকে দেখা যাচ্ছে

ইংরেজ ও জমিদারদের নির্মম শাসন-শোষণ ও নির্যাতনে দারিদ্রগ্রস্থ অসহায় একটি অর্ধনগ্ন মুসলিম যোগী পরিবার কাজের সন্ধানে শহর অভিমুখী।

ইংরেজ সিভিলিয়ান বাইরে যাচ্ছে; আর এ দেশীয় সেবাদাসরা একটি বিশেষ জীবের ন্যায় কৃতজ্ঞচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে।

এ দেশীয় কেরানী ও ইংরেজ (১৮১৯)

ইংরেজদের অত্যাচার

একদিন যারা জলদস্যু ও লুটেরা ছিলো তারা হয়েছে শাসক; আর যারা প্রজাবৎসল শাসক ছিলো তারা হয়েছে চাকর। মাতা ভিক্টোরিয়া সরকারী নথি দেখছেন। সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মুসলিম চাকর।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবীরা প্রাণপণে আজাদী পুনরুদ্ধারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। আর অন্যদিকে বাবুরা বেলগাছিয়ার বাড়ীতে ইংরেজ প্রশংসার নাটক মঞ্চায়ন এবং নাটক লিখায় ব্যস্ত ছিলো। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয়ের পাদদেশে নির্জনে নিশ্চিন্তে আত্মিক সাধনায় রত ছিলেন।

সিপাহী বিপ্লবের দশ বছর পর ১৮৭৭ সালের পহেলা জানুয়ারী ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের স্বাধীনতা হরণ, সীমাহীন সম্পদ লুণ্ঠন এবং কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, বন্দুকের গুলি ও নানা কৌশলে নানাভাবে লক্ষ লক্ষ বনি আদমের প্রাণ সংহারকারী বৃটিশের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এ দেশীয় সেবাদাসরা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে প্রথম দিল্লীর দরবারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'কাইজার-ই-হিন্দ' বা ভারত সম্রাজ্ঞী রূপে অভিষিক্ত করে। ছবিতে ভারতবাসীর জন্য কলংকজনক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি দেখা যাচ্ছে।

অসুস্থ মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত অথবা পুণ্যের আশায় গঙ্গাযাত্রায় (স্বমরণে) সহায়তা করছে ঠাকুরেরা

রেম্ব্রান্সের আঁকা-গুরুই সহায়

বাবুরা বিভিন্ন পূজা পার্বনে অসহায় গরীব মুসলমান প্রজাদেরকে চাঁদা দিতে বাধ্য করতো। ছবিতে এমনি একটি চড়ক পূজায় প্রজাদের অর্থে আনন্দ-ফূর্তি করতে দেখা যাচ্ছে। এ ধারা রবীন্দ্রনাথের জমিদারী এলাকায়ও প্রচলিত ছিল। ছবিটি ইংরেজ চিত্রকর বেলুনসের আঁকা

কালি ঘাটের পটঃ
বাবুদের অপেক্ষায় ফুল হাতে একজন তরুণী

বিদেশীদের দৃষ্টিতে বাবুদের কালী ঘাটের দৃশ্য
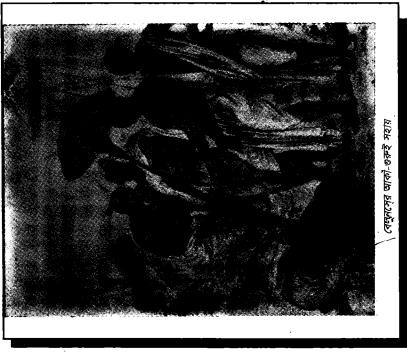
উনিশ শতকের দূর্গাপূজা এবং বাবু জমিদার সম্প্রদায়

ব্রাহ্মণবাদী হিন্দু ও ইংরেজ বেনিয়াদের চক্রান্তে ভারতীয় জনগন যখন পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ এবং তাদের শাসন শোষণে দিশেহারা তখন বেনিয়া ইংরেজদের মনোরঞ্জনে মত্ত হয়ে উঠেছিলো এ দেশিয় নব্য বাবু জমিদারেরা । বেনিয়া ইংরেজ সাহেবরা ছিলো নব্য জমিদার বাবুদের দৃষ্টিতে দেবতুল্য। ক্লাইভ ছিলেন স্বয়ং মা দুর্গার প্রতীক। আর অসুরের প্রতীক ছিলেন নবাব সিরাজদৌল্লা।

বলতে গেলে সাহেবদের (ইংরেজ) তুষ্টি সাধনের জন্যই দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাইজী নাচের আয়োজন হতো সাড়ম্বরে। এই সম্পর্কে ৭ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত ভারতীয় 'দেশ' পত্রিকায় ভারতীয় লেখক শোভন সোম "শ্রী শ্রী দূর্গাপূজা সাকিন কলিকাতা" শিরোনামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেনঃ। এই নিবন্ধ থেকে শ্রী শোভন বলেন ঃ

পলাশির যুদ্ধে জয়ী ইংরাজই যে এ দেশে প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কলকাতা হয়ে উঠে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানী, ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। একদিকে আশ্রয়ের নিরাপত্তা ও অপরদিকে ইংরাজের সহায়তায় ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাগমের অভূতপূর্ব সুযোগ আঠারো শতকেই কলিকাতার বাঙালি পেয়েছিল। যাঁরা এই সুযোগে ধনসম্পদ অর্জন করেছিলেন, তাঁদের সকলেরই পরিবার গৌরব ছিল না, কেউ কেউ হঠাৎ বড় লোকও হয়েছিলেন। আঠারো শতকের শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে নূতন ভূমিব্যবস্থার ফায়দাও এদের অনেকের সম্পদবৃদ্ধি ঘটায়। এই নয়া ধনী.সমাজের মানুষদের স্বভাবচরিত্র, আদবকায়দা, রুচিরেওয়াজে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইংরাজের কাছে এদেশি জনগনের প্রতিনিধি এই সমাজ পরিচিত হয়ে উঠে জেন্টু বা বাবু নামে।

আলিবর্দি খাঁ, সিরাজউদ্দৌলার সমকালিক চুরাশিটি পরগনার অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাবদরবারে নিয়মিত রাজস্ব দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণনগরের রাজদরবারে নৃত্যগীতকাব্যচর্চাপ্রিয়তা, পণ্ডিতসভা ও পণ্ডিতপোষণ, পালাপার্বণ উযাপনের আড়ম্বর এবাং বিলাস ব্যসনের যে-নিরিখ কৃষ্ণচন্দ্র তৈরি করেছিলেন, তা বাঙালি ধনপতিদের কাছে হয়ে উঠেছিল অনুকরণযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন কুলরক্ষক সমাজপতি। রাজা রাজবল্লভ তাঁর বিধবা বালিকার বিয়ের যে উদযোগ করেছিলেন, তা ব্যর্থ করে কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন ধর্ম রক্ষা করেছিলেন। ধর্মরক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র আড়ম্বর সহকারে পূজাপার্বণ পালন করতেন। তিনিই আঠারো শতকের মাঝামাঝি তাঁর বাড়ির দূর্গা পূজায় আমোদপ্রমোদের অঙ্গ হিসাবে তয়ফাওয়ালি বাইনাচের প্রবর্তন করেন।

সতেরো শ আশি শকাব্দ, মাঘ, আঠারো শ আটান্নরর বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, সুচতুর, পণ্ডিত, গুণিজনের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের

গুণগরিমা 'লাম্পট্য দোষে' কলুষিত হয়েছিল। ভাঁড়ামো, যাত্রা, খেউড়, কবিগানের 'অশ্লীল বিনোদ' তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। "কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য বিনোদের উৎসাহী" হয়েছিলেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন, বর্গির উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের অদূরে গোয়াড়িতে রাজধানী পত্তন করেন। "লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন", গোয়াড়ি, কৃষ্ণনাগরিকরা "বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন" এবং পর্বোপলক্ষে বেশ্যালয়ে লোকের স্থান হয়ে উঠতো না।

কৃষ্ণচন্দ্রের পূজার গরিমা, ধূমধাম ও তয়ফাওযালি নাচের ধারা নবকৃষ্ণ কলকাতায় এনেছিলেন আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে নবকৃষ্ণের যেমন মিল ছিল তেমনি দুজনের মধ্যে দলাদলিও কিংবদন্তী হয়ে আছে। নবকৃষ্ণ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসি ভাষার মুনশি, মীরজাফরের নবাবি প্রাপ্তির কালে ক্লাইভের দেওয়ান। ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার তিনি ছিলেন সহযোগী। ক্লাইভের সহায়তায় তিনি সতেরো শ ছেষট্টিতে মহারাজা বাহাদুর খেতাব পান। তখন থেকে এই ধরনের খেতাব পেয়ে বংশগৌরব প্রতিষ্ঠায় বাঙালি ধনিকেরা লালায়িত হয়ে ওঠেন। সতেরো 'শ একাত্তরে তিনি পান সুতানুটির তালুকদারি। দানখয়রাতেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিন্দুধর্মের ও প্রজাস্বার্থের কারণ ছাড়াও তিনি দানখয়রাত করতেন। আরবি ফারসি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপনে তিনি কোম্পানি বাহাদুরকে তিন লক্ষ টাকা ও য়োরোপীয়দের সমাধিক্ষেত্রের জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়ে অন্য সম্প্রদায়েরও আস্থাভাজন হয়েছিলেন। তাঁরই দেওয়া জমিতে তৈরি হয়েছে সেন্ট জোন্স গির্জে। দানশীলতার জন্য কোম্পানি বাহাদুর তাঁকে সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। মায়ের শ্রাদ্ধে দশ লাখ টাকা ব্যয় করে তিনি মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছিলেন। ভাগ্যাকাশে তাঁর এই উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে উৎক্ষেপ ছিল বাবুসমাজের উৎক্ষেপের প্রতীক। কৃষ্ণচন্দ্রের মতো তাঁরও পণ্ডিতসভা ছিল। পণ্ডিতসমাজ তাঁকে যেমন হিন্দু সনাতন ধর্মের রক্ষক মনে করতেন তেমনি মৌলিক কায়স্থ হলেও তিনি গোটা কায়স্থ সমাজের শিরোমণি হয়েছিলেন।

জে, জেড হলওয়েল সতেরো 'শ সাতষট্টিতে প্রকাশিত তাঁর 'ইন্টারেসটিং হিস্‌টোরিক্যাল ইভেন্টস, রিলেটিভ টু দি প্রভিনসেস অফ বেঙ্গল অ্যান্ড দি এম্‌পায়ার অফ ইন্দোস্তান' বইতে কলকাতার এক এলাহি দুর্গাপূজার বিবরণ দিয়েছিলেন। সতেরো 'শ ছেষট্টিতে নবকৃষ্ণ মহারাজা বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির পূজায় লর্ড ক্লাইভ আসতেন, সব কেষ্টবিষ্ট সাহেবেরা আসতেন। হলওয়েল নামোল্লেখ না করলেও তিনি যে নবকৃষ্ণের বাড়ির পূজার বিবরণ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নবকৃষ্ণের দুর্গাপূজাই ছিল কলকাতার সবচেয়ে ঝাঁকালো পূজা। দানখয়রাত,

রোশনাই, খানাপিনা ইত্যাদি নিয়ে সে ছিল এক অকল্পনীয় সমারোহের ব্যাপার।

হলওয়েল তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে পূজার বিবরণ দিয়েছেন, তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন হিন্দুর দেবকুল (DEBTAH LOGUE) সম্পর্কে। তাঁর কথায় "দুর্গাপূজা (DRUGAH POOJAH) সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী থেকে শুরু ও চলে অষ্টমী নবমী পর্যন্ত। যাঁরা নিঃসন্তান, তাঁরা অষ্টমীতে উপোস করেন। এটি জেন্টুদের গ্যান্ড জেনারেল ফিস্ট। এই উপলক্ষে, পূজা চলাকালীন প্রতি সন্ধ্যায় পূজার কর্তা সাধারণত (আমন্ত্রিত) সাহেবদের খানাপিনা, মরশুমি ফল ও ফুল দিয়ে গান শুনিয়ে নাচ দেখিয়ে আপ্যায়িত করে থাকেন।" তাঁর কথায়, চতুর্থ বেদের (CHARTAH BHADE) মধ্যে অথর্ব বেদে (AUGHTORRAH BHADE) যে দেবদেবীর প্রসঙ্গ আছে, তাঁদের মধ্যে শিবের (SIEB) ঘরণী ভবানী দূর্গা (BOWANEE DRUGAH) সবচেয়ে সক্রিয়। এবং ব্রহ্মার শাস্ত্র অনুসারে পরমপুরুষ ঈশ্বর প্রথমে ব্রহ্মা (BIRMAH), বিষ্ণু (BISTNOO) ও শিবের (SIEB) সৃষ্টি করেন, তারপর মহিষাসুর (MOISASOOR) ও অন্যান্য দেবতাদের (DEBTAH-LOGUE) সৃষ্টি করেন ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি দুর্গার ছবিও ছেপেছিলেন। দুশ বাইশ বছর আগে ছাপা লন্ডনের টি-বেকেট অ্যান্ড পি.এ.ডি হোনড্‌ট্‌ প্রকাশিত এই বইটিতেই কলকাতার দুর্গাপূজার প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়।

নবকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় বাঙালি দেওয়ান, মুনশি, তালুকদার, মুৎসুদ্দি, জেন্টুদের বাড়িতে বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়ে ওঠে জাঁকজমক, অমিতব্যয়িতা ও দলাদলির এক অভূতপূর্ব ইন্সটিটিউশন। এই সব বাড়ির পূজার জাঁকজৌলুস, বিলাস সাহেব-মেমদের আপ্যায়নে নাচগান, খানাপিনার মুখরোচক খবর ছাপা হতে থাকে পত্রপত্রিকায়। উনিশ শতকে বাবুবিবিবিলাস নিয়ে প্রহসন লেখা হতে থাকে।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন, নিছক প্রবাদবাক্য নয়। আঠারো উনিশ শতকে বারো মাসে ছিল তেত্রিশ পার্বন। হিন্দুদের যেমন মেসায়া বা নবি নেই, তেমনি নেই ধর্মাচরণ সম্পর্কিত কোনো জেনারেল কোড অফ কনডাকট বা সর্বসাধারণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে যেমন ধর্মবিশ্বাসের সমতা নেই, তেমনি নির্দিষ্ট পূজ্য দেবকুলও নেই। হিন্দুধর্মের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেই যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছিলেন, "যস্মিন দেশে য আচারো ব্যবহার" কুলে স্থিতি। তথৈব প্রতিপাল্যোহসৌ যদাবশমুপাগত"॥ অর্থাৎ যে-দেশে বা কুলে যে বিশেষ-আচার আছে, তা প্রতিপালন করেই ধর্মপালন করবে। বাঙালি হিন্দুর কাছে দুর্গাপূজা সবচয়ে বড়ো ধর্মাচার হলেও অন্য প্রদেশের হিন্দুর কাছে তা নয়। জনশ্রুতি–বাঙলায় প্রথম দুর্গাপুজা বা শারদীয়া পূজা ষোলো শতকে করেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ন আট লক্ষ টাকা খরচ করে। ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতায় এরপর রাজশাহির ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ বাসন্তীপূজা করেন নয় লাখ টাকা ব্যয়ে। এভাবে রাজসিকতা ও দলাদলি জন্মলগ্ন

থেকেই পূজার অঙ্গ হয়ে ওঠে। কলকাতার জেন্টুরা সেই ঐতিহ্য বহন করেছিলেন। আঠারো উনিশ শতকে বিত্তের গরমে তা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল।

রাজা-মহারাজার প্রিন্সদের মধ্যে পারস্পরিক ঐশ্বর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা বড়ো হয়ে উঠেছিল। ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতার কারণে জেন্টুদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড দলাদলি, দল তৈরি ও অন্যের দল ভাঙানোর চেষ্টা। দুর্গাপূজা তার রাজসিক আড়ম্বরের কারণে কলকাতার বড়োলোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। মান-ইজ্জতের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল-কে কত বেশি খরচ ও জাঁকজমক দেখাতে পারলেন, তা হতো সমাজে আলোচনায় বিষয়।

কলকাতা ছিল জাতপাত, কুসংস্কার কুপ্রথার অবাধ লীলাক্ষেত্র। রেভারেন্ড জেমস লং তাঁর 'ক্যালকাটা ইন দি ওলডেন টাইমস' বইতে সেই সমাজের বিবমিষা উদ্রেককারী বিবরণ দিয়েছেন। উলঙ্গ ফকিরেরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো, অঘোরীরা শ্মশানে প্রকাশ্যে কাঁচা নরমাংস খেতো, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করাকে পরম পুণ্য জ্ঞান করা হতো। এক আঠারো শ সালের ছ' মাসের মধ্যে কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে দুশ পঁচাত্তরটি সতীদাহ হয়েছিলো। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসের সবকটি ধর্মকৃত্য পালন, ব্রাহ্মণ পোষণ, শাস্ত্রানুসরণ, ধর্মার্থে দান ও ক্রিয়াকর্মাদি ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যাপারগুলি ছিল "প্রতিটি নিষ্ঠাবান হিন্দু গ্রহস্তোচিত সমুদয় কার্য।" এগুলির অতিবাহুল্যকে স্বধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বেশি আনুগত্য মনে করা হতো। জেমস লং-এর বর্ণনায়, গঙ্গার তীর ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে সাত মাইল ও প্রস্থ গঙ্গার পাড় থেকে সারকুলার রোড অবধি বিস্তৃত কলাকাতার ছ বর্গমাইল এলাকা জুড়েই ছিল ব্ল্যাক টাউন বা নেটিভদের শহর। জেন্টুদের প্রাসাদ থাকলেও এই কালা শহরে ছিল নামেই শহর। বস্তুত সেখানে বিড়জিত ছিল গ্রামসমাজের সব কটি লক্ষণ। সেই সমাজে সবাই সবইকে চিনতো , হাঁড়ির খবর রাখতো, পান থেকে চুন খসলে ঢি ঢি পড়ে যেতো।

খ্রীস্টানদের বড়দিন-নববর্ষ পরবের সমকক্ষ, একটি ধুমধাম করে পালন করার মতো নিজেদের পরবের আত্যন্তিক প্রয়োজন সেদিন জেন্টুদের ছিল। এই সুবাদে য়োরোপীয়দের সঙ্গে দৈনন্দিন লেনদেনের বাইরে একটি সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্র তৈরি করারও প্রয়োজন সেদিনের জেন্টুরা অনুভব করেছিলেন স্বার্থের কারণে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইংরাজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও একই সঙ্গে তাদের আমোদপ্রমোদ, বাইনাচ, ফরাসি মদ্য, সাহেবি হোটেলের খানায় আপ্যায়িত করে বিচিত্র স্বার্থসিদ্ধির পথ তৈরি করে রাখার সুযোগ হিসাবে জেন্টুরা দুর্গাপূজাকে ব্যবহার করেছিলেন। যে (স্যোশ্যাল) পার্টি কালচারের জোয়ার গোটা উনিশ শতক জুড়ে বয়েছিল ও আজও যে-অভিজাত, বিত্তবান সমাজে ক্ষমতাবানদের সঙ্গে মেলামেশায়

পার্টিকালচার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কলকাতায় ভারতীয়দের সেই সোশ্যাল পার্টির সূত্রপাত হয়েছিল দূর্গাপূজাকে উপলক্ষ করে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের কামরায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় এর একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। এই অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখতে, শ্রমজীবী মানুষের রুজিরোজগারের স্বার্থ দূর্গাপূজা এদেশে আপামর জনজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। দুর্গাপূজার ব্যয়বাহুল্য এই অর্থনীতিকে উৎসাহিত করেছিল। সেকালের পত্রপত্রিকায় বাবুদের বাড়ির পূজার নাচ, জাঁকজমকের খবর ফলাও করে ছাপা হলেও এই অর্থনীতির দিকটি প্রায় পাওয়া যায় না। য়োরোপীয় লেখকেরাও নাচ, জাঁকজমকের কথা লিখেছেন। কিন্তু সেই বাহ্যিক আড়ম্বরের পিছনে গোটা সমাজের অর্থনীতিক নির্ভরতার দিকটি তাঁরা দেখেননি।

কংসনারায়ন–কৃষ্ণচন্দ্র–নবকৃষ্ণ সূত্রে কলকাতায় বিত্তবান বাড়িতে দুর্গাপূজা এক অবশ্য পালনীয় কৃত্য হয়ে ওঠে। সুতানুটি তালুকদার নবকৃষ্ণ, আন্দুলের রাজা রামচাঁদ রায়, ভূকৈলাসের রাজা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কৃষ্ণচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, বারাণসী ঘোষ, রামহরি ঠাকুর, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রূপলাল মল্লিক, এমন কি দ্বারাকবানাথ ঠাকুর প্রমুখ বিত্তবানদের বাড়ির দুর্গাপূজা ছিল প্রসিদ্ধ। তৎকালিক খবরে জানা যায় কলকাতায় জেন্টুদের বাড়ির পূজা শুরু হয় আগে, 'বারএয়ারি' বা বারোয়ারি সার্বজনের পূজা শুরু হয় পরে।

হলওয়েলের বর্ণনাকে সামনে রেখে জেন্টুদের বাড়ির পূজার জাঁকজমকের নাচগান আপ্যায়নের খবরগুলি খবরের কাগজ সূত্রে দেখা যেতে পারে।

শ্রাবণ তেরোশ ছাব্বিশের 'কায়স্থ পত্রিকা'য় ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্মা আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের গোড়া অবধি কালে কলকাতার প্রতিপত্তিশালী 'আটবাবু'র পরিচয় দিয়েছিলেন। এই আটবাবু হাটখোলার রামতনু দত্ত, নীলমণি হালদার, গোকুলচন্দ্র মিত্র, নবকুষ্ণের ছেলে রামকৃষ্ণ, ছাতু সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর , সুখময় রায় ও চোরবাগানের মিত্র বংশের একজন। ললিতাপ্রসাদ এই শেষ ব্যক্তির নাম জানাননি। এ ছাড়াও শ্রাবণ-আশ্বিন তেরোশ সাতচল্লিশের 'ভারতবর্ষে' সুরেন্দ্রনাথ সেন 'শতবর্ষ' পূর্বের কলিকাতার বাঙালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের 'পরিচয়' দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজপত্র ঘেঁটে তথ্য জোগাড় করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মুখ্য তেইশ জন পরিবার ছাড়াও কলকাতার বিভিন্ন পল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তালিকায় মেছুয়াবাজারের 'রামমণি ঠাকুরের পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর' রয়েছেন। তিনি মূখ্য তেইশ জনের পরিবারে স্থান পান। আঠারোশ বাইশে ভারত সরকারের জনৈক সচিব এইচ–টি–প্রিনসেপের অনুরোধে রাধাকান্ত দেব 'রেসপেক্টেবল্, অ্যান্ড ওপুলেন্ট নেটিভস অফ দি প্রেসি্ডেন্সি' নামে যে–তালিকা তৈরি করেছিলেন, সেটিকে সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রধান আকর হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এই তালিকায় প্রায় একশ

জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম আছে। এই তালিকায় স্থান পাননি, এমন ধনী ছিলেন না, তা মনে করার কারণ নেই। এই রেস্‌পেক্‌টেবল ও ওপুলেন্‌ট্‌ জেন্টুদের প্রায় সকলের বাড়িতেই দুর্গাপূজা মহাসমারোহে হতো। সেদিনের শহর কলকাতার আয়তন অনুসারে শ'খানিক বিলাসবহুল পূজা যে রীতিমত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই বাবুদের অমিতব্যয়িতা ও বিলাসব্যসনের নানা কাহিনী আজকের দিনে রূপকথার মতো শোনায়।

হলওয়েল সতেরোশ্‌ ছেষট্টিতে দেখা কলকাতার 'গ্যান্ড ফিস্‌ট অফ দি জেন্টুস' দুর্গাপূজার বিবরণ দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে তার মাত্র ছ'বছর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়ে গেছে। এও মনে রাখতে হবে যে, সতেরোশ আশিতে কলকাতার ইংরাজি খবর কাগজে দাস কেনাবেচার বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে। বাটলার, খিদমতগার ও সুপকারের ত্রিবিধ কাজে নিপুণ একটি ফাইন কাফ্‌রি বয়-এর বিক্রময়মূল্য জানানো হচ্ছে চার শ' সিক্কা টাকা। তখনও মধ্যযুগীয় অন্ধকার ও জড়তায় এই দেশ নিমজ্জমান। তখন কলকাতায় সতীদাহ মহিমান্বিত হচ্ছে, গুরুপ্রসাদীকে অবশ্য মর্তব্য মনে করা হচ্ছে, বেশ্যাপল্লী বসানো হচ্ছে, কন্যাসন্তানকে অবাঞ্ছিত জ্ঞান করে কখনও হত্যা করা হচ্ছে আর তারই সঙ্গে মাতৃশক্তি শত্রুহন্ত্রী দেবী দুর্গার পূজা মহা সমারোহে হচ্ছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাসে' আঠারোশ ছ'য়ে নবকৃষ্ণ বংশের রাজকৃষ্ণের দুর্গাপূজার বিবরণে লিখেছেন, সন্ধেয় দেবীমূর্তির সামনে একদল বেশ্যা অতি সূক্ষ্ম কাপড় পরে ইতর অঙ্গভঙ্গি করে নাচগান করেছিল আর কলকাতার ভদ্রসমাজ তা উপভোগ করেছিলেন। বস্তুত, পূজা ছিল উপলক্ষ্য, আনুষঙ্গিক আমোদপ্রমোদ ছিল লক্ষ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী আরো লিখেছিলেন, পূজা, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অমিতব্যয়িতার প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছিল। ধনিকেরা প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে লজ্জিত হতেন না। নিজের বাড়িতে যে-কোনো উপলক্ষে বাইজি অভ্যর্থনা ও "নাচ দেওয়া দনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল।" আঠারোশ তেইশে ফ্যানি পার্কস এ-দেশে এসেছিলেন। লন্ডনের পেলাহ্যাম রিচার্ডসন কর্তৃক আঠারোশ পঞ্চাশে ছাপা তাঁর 'ওয়ান্ডারিংস্‌ অফ এ পিলগ্রিম্‌ ইন সার্চ অফ পিকচারাস্‌ক্‌' বইতে তিনি লিখেছিলেন, রামমোহনের বাড়িতে তিনি সে কালের সবচেয়ে নামিদামি নিকি তয়ফাওয়ালির নাচ দেখেছিলেন।

আগষ্ট আঠারো শ' ষোলোর এশিয়াটিক জর্নল্‌ কলকাতার খবর উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, আঠারো শ পনেরোতে কলকাতায় দুর্গাপূজায় নিকি আর আশারুম নেচেছিল নীলমনি (NEEL MUNNEE) মল্লিক ও রাজা রামচন্দ্রের বাড়িতে। বেনারসের জীনত নেচেছিল জোড়াসাঁকোয় বৈদ্যনাথ (BUDI NATH) বাবুর বাড়িতে। ফৈজ বকস নেচেছিল গুরুপ্রসাদ বসুর (GOROO PERSAD BHOS)

বাড়িতে। এই হাঁড়ির খবরই সে কালের কাগজে ফলাও করে ছাপা হতো।

ফ্যানি পার্কস আঠারো শ' তেইশে কলকাতার এক 'বাবু'র বাড়িতে দুর্গাপূজার নাচ দেখতে গিয়েছিলেন। চকমিলান এক বাবুর বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের এক পাশের ঘরে গানটার অ্যান্ড হুপার কম্‌পানি থেকে আনা নৈশভোজ আয়োজিত হয়েছিল। ছিল প্রচুর পরিমাণে ফরাসি মদ্য ও বরফ। আরেক পাশের ঘরে তয়ফাওয়ালির নাচের ব্যবস্থা ছিল। অনেক য়োরোপীয় ও দেশি গণ্যমান্য পুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরেকটি কথা, এই সোশ্যাল পার্টিতে মেমেরা এলেও কোনো ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা তাতে আসতেন না। বাঙালি বাবুদের খরচের বহর ফ্যানিকে বিস্মিত করেছিল।

আঠারোশ' ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ এই চারবছর শ্রীমতি ফেন্‌টন (ফেঁত?) এদেশে ছিলেন। তাঁর জর্নল উনিশ শ একে লন্ডনের এডওঅর্ড আর্নল্‌ড থেকে ছেপে বের হয়। অন্যান্য য়োরোপীদের মতো তাঁর নাচ দেখার খুব কৌতুহল ছিল। তখন পূজা ছাড়াও কলকাতার জেন্টুবাড়িতে হরহামেশা নাচগান খানাপিনা হতো। তিনি শুনেছিলেন, সত্যিকারের হিন্দুস্থানী নাচ কোনো ভদ্ররমণীর দেখা সংগত নয়। স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও নাছোড়বান্দা শ্রীমতি ফেন্‌টন, সঙ্গে শ্রীমতী আইট্‌কিন্‌কে নিয়ে, রূপলাল মল্লিকের (ROUPE LOLL MULLOCK) বাড়িতে নাচ দেখতে গেলেন। তাঁর মতে, নেটিভরা এই সব নাচের মজলিশ বসিয়ে য়োরোপীয়দের আপ্যায়ন করে কৃতার্থ হন ও ঐশ্বর্য দেখবার বাহানা তৈরি করেন। "এই সব গরিবগুর্বোরা (পুয়োরা অ্যানিমেল) সারা বছর ঘি ভাত খায়, বিছানা হিসাবে একটা মাদুর পেলেই তুষ্ট থাকে, আর এই সব উৎসবে উদার হস্ত হয়ে যায়।" বাইজিকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছিল একটা কুড়ি গজ কাপড় শরীরের চারপাশ ঘিরে জড়িয়ে পরানো হয়েছিল। তাতে কোনো ছিরি তিনি দেখতে পাননি। নাচগান ঐশ্বর্য আড়ম্বরের গোটা ব্যাপারটাই তাঁর হাস্যকর মনে হয়েছিল। 'সমাচার দর্পণে'র খবরে জানা যায়, আঠারোশ' কুড়িতে রাসলীলায় এই রূপচাঁদ তাঁর বাড়িতে নাচ দেখতে সাহেবদের নিমন্ত্রণ-চিঠি পাঠিয়েছিলেন। গোরার বাদ্যি ডেকেছিলেন।

আঠারোশ' ঊনিত্রিশে এই পত্রিকা দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে যে, য়োরোপীয়রা নাচগান খানাপিনার লোভে-এই উৎসবে যান। মদ খেয়ে মাতলামি করেন। এতে বাঙালির চোখে য়োরোপীয়দের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়। রেভারেন্ড ডবলু ওঅর্ড মন্তব্য করেন যে এক কলকাতাতেই দুর্গাপূজায় খরচ হয় পঞ্চাশ লাখ টাকা, পাঁঠা বলি হয় হাজারের উপর।

"সংবাদ প্রভাকর" চব্বিশে আশ্বিন বারো শ একষট্টি, আঠারো শ চুয়ান্নতে 'কলিকাতায় দুর্গোৎসব' নামে সম্পাদকীয়তে লেখা হল, "নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইয়াছে, ধনাঢ্য পরিবারেরা অতি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, শোভাবাজারস্থ নৃপতিদিগের (নবকৃষ্ণের) উভয় নিকেতনে নৃত্য

নব্য প্রভুদের মনোরঞ্জনে নব্য বাবু জমিদারদের আয়োজিত দুর্গা উৎসবে বাঈজী নাচ উপভোগ করছে ইংরেজ সাহেবরা

উনিশ শতকে কলিকাতার অভিজাত বাবু জমিদারদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব।
শিল্পী ঃ সলভিনস্ বাল থাজার

বিদেশীদের দৃষ্টিতে দুর্গাপূজায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে কবিগান

রুশ শিল্পী প্রিন্স আলেকিস সলিটকফের আঁকা দুর্গা পূজার উৎসব। সামনে নর্তকীরা।

গীতাদির মহাধুম হইয়াছিল, সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, লোভ দেবের প্রিয় শিষ্য শ্বেতাঙ্গ ও আন্ডু পিন্দ্রু গোমিস্ ও গানসেলবস্ প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ যাহারা মোদের বেলাত ও মোদের কুইজ বলিয়া গর্ব পর্ব বৃদ্ধি করেন "তাঁহারা এই পূজো উপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদর পূরণ করিয়াছেন"।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হলেও দ্বারকানাথের মেজছেলে গিরীন্দ্রনাথের পরিবার সনাতন ধর্মবিশ্বাস ছাড়েননি।। গগনেন্দ্র–সমরেন্দ্র–অবনীন্দ্রনাথ সমারোহে হিন্দুর ধর্মকৃত্য পালন করতেন। তাঁদের বাড়ির পূজায় নাচ-গান হতো। তাঁদের বাড়িতে বাইনাচও হতো। আঠারো শ চুরানব্বইয়ের দুর্গাপূজায় অবনীন্দ্রনাথ এক বীণকারকে ডেকে এনেছিলেন। সেই আসরে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নেই অভিজ্ঞতা জানিয়ে ভাইঝি ইন্দিরাকে লিখেছিলেন, "বীণটা ভারি চমৎকার বাজিয়েছিল। ....মুচড়ে মুচড়ে, নিঙড়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল ... মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই এক অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীম সুন্দর... ।"

শৌখিন বাবুদের বাড়িতে মুজরো করতে সে কালে কেবল তয়ফাওয়ালিরাই আসতো না, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুণী গাইয়ে- বাজিয়েরাও আসতেন। কলকাতার মতো সংগীতরসিক শহর আর ছিল না, এমন দিলদরিয়া বাবুও ভূভারতে ঝাঁক বেঁধে আর কোথাও ছিলেন না।

'সংবাদ চন্দ্রিকায়' বলা হয়েছিল যে, রামমোহন গত কুড়ি বছর কোনো প্রতিমাদর্শনে গেছেন, এমন শোনা যায়নি। 'সংবাদ চন্দ্রিকা' আক্ষেপ করে বলেছিল, তিনি না হয় পূজা করেন না, তা বলে কি তাঁর ছেলে পূজার আমোদ থেকে বঞ্চিত হবেন, যেহেতু তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদ বাবার মতের অন্যথা করেন না। এই সূত্র ধরে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে আমরা দেখতে পাই, বাবার বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ির দুর্গাপূজায় রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে রামমোহন বলেছিলেন, 'বেরাদর! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।" দৃঢ়চেতস রামমোহনের বিশ্বাস ও কাজে আত্মখন্ডন ছিল না, যা সে কালে অনেকেরই ছিল। কলকাতার গ্রামসমাজে এ সাহস বড়ো কম দুঃসাহস ছিল না।

আঠারো শ বত্রিশে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, দুর্গাপূজায় নানা ন্যূনতা দেখা যাচ্ছে। আগে এই শহরে ও অন্যত্র নাচগান প্রভৃতি "নানারূপ সুখকর" ব্যাপার হয়েছে। বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখতে ইংরাজসহ অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হতো, ফলে নিমন্ত্রিতদের ভিড় ঠেলে প্রতিমা দেখা অসম্ভব ছিল। এ বছর সে সব বাড়িতে সাধারণ ঘরের মেয়েরাও স্বচ্ছন্দে গিয়ে প্রতিমা দেখেছে। বাইজিরা গলি-গলি ঘুরে বেড়িয়েও মুজরো পায়নি। যে বাড়িতে "পাঁচ-সাত তরফা" বাই থাকতো, এ বছর

সে সব বাড়িতে বৈঠকি গান, চণ্ডীর গান কিংবা যাত্রাপালা হয়েছে .... এবং "এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধনশূন্য" হওয়াই এমন হয়েছে।

পারস্পরিক দলাদলি, বিলাসব্যসন ও অমিতব্যয়ের কারণে জেন্টুদের পড়তি দশায় লক্ষণগুলি দুর্গাপূজায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকাতেই আঠারোশ উনচল্লিশে লেখা হয়েছিল, সে বছর দুর্গাপূজায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকাতেই আঠারোশ উনচল্লিশে লেখা হয়েছিল, সে বছর দুর্গাপূজায় "নৃত্য সংদর্শনার্থ" খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিশেষ কেউ আসেননি। সর্বসাধারণ এ বিষয়ে যদি উৎসাহ পরিত্যাগ করেন, তবে তা আরো আনন্দের কারণ হবে।

আঠারো শ ছাপ্পান্নর ত্রিশে অগষ্ট সংখ্যা 'সংবাদ ভাস্করে' লেখা হয়, ইদানীং পূজায় কে কত বেশি প্রণামী দিতে পারেন সেই প্রতিযোগিতা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে প্রণামী দেবার ভয়ে লোকে পরম মিত্রের বাড়িতেও পূজা দেখতে যেতে বঞ্চিত হচ্ছে। কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে দশ পনেরো জায়গায় প্রণামী দেওয়া অসম্ভব। কে কত প্রণামী দিলেন তা লিখে রাখতে হয়, যাতে তাঁর বাড়িতেও সেই দস্তুরে প্রণামী ফিরিয়ে দেওয়া যায়। 'ভাস্করের' মন্তব্য, "দৈন্য দশাগ্রস্ত ভদ্র সন্তানদিগের মর্মান্তিক হয়।" এখানেও জেন্টুদের পড়তি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, পূজার প্রণামী হয়েছে জমিদারির খাজনার মতো।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় দুর্গাপূজা বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য বেশ কয়েকবার করা হয়েছিল। আঠারো'শ বাষট্টিতে পত্রিকায় দু'শ ত্রিশতম সংখ্যায় বলা হয়েছিল, "দুর্গোৎসব বঙ্গবাসীদিগের প্রধান উৎসব। পৌত্তলিকতার সঙ্গে যতপ্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার সকলি আছে। দুর্গোৎসবের সময় লোকের অর্থগৌরব প্রকাশ করিবার সময়। দুর্গোৎসবের সময় আমোদপ্রমোদ, অত্যাচার ও উন্মত্ততার সময়।" বলা হয়েছিল, ত্রিশ বছর আগে এই পত্রিকায় যা বলা হয়েছিল সেই দোষগুলি এখনও রয়েছে। ত্রিশ বছর আগে বলা হয়েছিল যে দুর্গোৎসবের "উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময় অমঙ্গল এবং ইহার সমাপ্তিতেও প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা" প্রতিবছর বাঙলাদেশ পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।"এদেশে সম্বৎসরের যত দুষ্কর্ম হয়, এই তিন দিবসে তাহা সম্পূর্ণ কৃত হয় ...পূজার তিন দিন পাপের স্রোত বহিতে থাকে ..নীচ প্রবৃত্তি সকল প্রদীপ্ত হয়" ইত্যাদি। ব্রাহ্মদের আহ্বান জানিয়ে এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি "একমেবাদ্বিতীং ব্রহ্মনামের মঙ্গলধ্বনি সমূদায় বঙ্গভূমিতে প্রচার করিয়া এককালে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবে না? অবশ্যই করিবে! অবশই করিবে!

....সম্পাদকীয়র শেষ পংক্তিতে বলা হয়েছিল, "এই উৎসব প্রসঙ্গে যে ভয়ানক পাপাচার সকল প্রশ্রয় পায়, মদ্য যে অতিমাত্রায় হৃদ্য হইয়া উঠে আমরা হৃদয়ের সহিত তাহা ঘৃণা করিয়া থাকি।

তথ্য সূত্র ঃ ভারতীয় 'দেশ' পত্রিকা, ৭ অক্টোবর, ১৯৮৯ সংখ্যা

পলাশীর যুদ্ধ বর্তমান কালের যুদ্ধের মতো না হওয়াতে প্রথম দিকে অনেকেই পলাশীর বিপর্যয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে ইংরেজ ও বাবুদের নির্মম নির্যাতন সাধারণ মানুষের মনে সচেতনতা ও আত্ম উপলব্ধি জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী বাবুরা যখন তাদের রচিত কবিতা, গান ও শ্লোকে নব্য প্রভু ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল তখন এ দেশের মজলুম মানুষের পক্ষে কথা বলার মত কেউ ছিল না।

অগ্যতা নজরুলের পূর্বসূরীরা নিজেরাই মুখে মুখে ব্যঙ্গ ছড়া-কবিতা রচনা করে ইংরেজ ও বাবুদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষ আক্ষেপ করে বিক্ষুব্ধ চিত্তে যে ছড়াটি রচনা করে তাদের মনের ভাব বা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল তা হলোঃ

আইলরে ফিরিঙ্গির দল,
দেশটা গেল রসাতল।
সবার মুখে কোম্পানীর দোয়াই,
আল্লাহ রসূল দেশে নাই।
ইংরেজ দেখখ্যা মাইয়ার দল,
চাইয়া হাসে খল খল।
মনে তাদের কি যে চায়,
কেউ না তাহা টের পায়।
বাবুয়ানা বিবিয়ানা,
ঘরে বাইরে একটানা।
জাইত কুল সব গেছে,
আর কি দেশে মানুষ আছে।
পশু পাখীর গলায় দড়ি,
কয়দিন পরে দিব ছুঁড়ি।
কোরান-কালাম কেউ পড়ে না,
এ-বি-সি-ডি একটানা।
আল্লাহ আল্লাহ বল ভাই
নিয়ামতের দেখা নাই।

বিশ শতকে পলাশী সম্পর্কে কবি নজরুলের প্রতিক্রিয়া

নবাগত উৎপাত

কাজী নজরুল ইসলাম

মনে পড়ে আজ পলাশীর প্রান্তর-
আসুরিক লোভ কামানের গোলা বারুদ লইয়া যথা
আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাংলায়।
সেই আগুনের লেলিহান শিখা শ্মশানের চিতা সম
আজো জ্বলিতেছে ভারতের বুকে নিষ্ঠুর আক্রোশে।
দুই শতাব্দী নিপীড়িত এই দেশের নর ও নারী
আঁখিজল ঢালি নিভাতে নারিল সেই আগুনের শিখা
এ কোন করালী রাক্ষুসী তার রক্ত-রসনা মেলি
মজ্জা অস্থি রক্ত শুষিয়া শক্তি হরিয়া যেন
চল্লিশ কোটি শবের উপরে নাচিছে তা থৈ থৈ!
অক্ষমা অভিশপ্তা শক্তি তামসী ভয়ঙ্করী।

চল্লিশ কোটি নরকঙ্কাল লয়ে এই অকরুণা।
যাদুকরী নিশিদিন খেলিতেছে যাদু ও ভেল্কী, হায়।
যত যন্ত্রণা পাইয়াছি তত তার ভূত-প্রেত সেনা
হাসিয়া অট্টহাসি বিদ্রুপ করেছে শক্তিহীনে।

এ কাহার অভিশাপ সর্পিণী হয়ে জড়াইয়া আছে,
সারা দেহ মন প্রাণ জরজর করি কালকূট বিষে
লয়ে যায় যমলোকে! –হায়, যথা গঙ্গা, যমুনা বহে-
যথায় অমৃত-মধু-রস-ধারা বর্ষণ হত নিতি,
যে ভারতে ছিল নিত্য শান্তি সাম্য প্রেম ও প্রীতি,
যে ভারতের এ আকাশ হইতে ঝরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি
সে আকাশ আজ মলিন হয়েছে বোমা বারুদের ধূমে।
যে দেশে জ্বলিত হোমাগ্নি, সেথা বোমার আগুন এল,
ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।

হে পরম পুরুষোত্তম! বলো, বলো, আর কতদিন
উদাসীন হয়ে রহিবে?- তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আর্তনাদ!
নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতি সুন্দর তরবারি
দুর্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও।
বন্দী আত্মা কাঁদে কারাগারে, "দ্বার খোলো, খোলো দ্বার!
পরাধীনতার এই শৃঙখল খুলে দাও, খুলে দাও।
নিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাহি পায়,
প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দীর দেশে।"

কাজী নজরুল ইসলামের বংশ-চরিত

"নহে আশরাফ যার আছে শুধু
বংশের পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার
পূর্ণ কর্মময়"

- *আল-হাদিস*

এ-দেশে মোগল আমলে কাজী প্রথা চালু হয়। কাজী নিয়োগ আদেশ তখন জারি হতো সরাসরি দিল্লী থেকে। নিয়োগপত্রে দস্তখত করতেন স্বয়ং সম্রাট। এর ফলে কাজীরা স্থানীয় শাসনকর্তাদের খুব একটা পরোয়া করতেন না।

পাটনার কাজী-উল-কোজাৎ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের পরদাদা, অর্থাৎ তাঁর দাদা ছিলেন কাজী আমিনুল্লার আব্বা। পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন তখন সৈয়দ হুসেন আলী। তিনি না-কি খুব কূট-প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু কাজী-উল-কোজাতের কাছে ছিলেন অসহায়। তৎকালীন কাজী-উল-কোজাতদের ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে কালী প্রসন্ন শর্মা রচিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ইন্তেকাল করলে তৎপুত্র মোয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ তার দুই ভাই আজম ও কাম বক্সকে হত্যা করে প্রথম শাহ আলম উপাধি ধারণ করে মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার আমলে (১৭০৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭১২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) নজরুলের পরদাদা ফারসী ভাষার বিচক্ষণ পন্ডিত এবং শরা-শরীয়তে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে বিহার প্রদেশের কাজী-উল-কোজাৎ নিযুক্ত হন। তিনি প্রদেশের অধীন থাকলেও বাদশা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে তার মধ্যে কিছু গর্ব ও আভিজাত্য বিরাজ করতো। পক্ষান্তরে সৈয়দ হুসেন আলী ছিলেন কূট প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। অতএব দ্বন্দ্ব। সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যায় যে, দেশের প্রত্যেক এলাকার বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য একজন কাজী থাকতেন। তার উপর ছিলেন কাজী-উল-কোজাৎ। প্রত্যেক সুবায় বাদশা নিয়োজিত আর একজন বিচারপতি ছিলেন। তিনি আপীল কার্য পরিচালনা করতেন, তার পদবী ছিল সদরস সদুর বা প্রধান বিচারপতি। তাছাড়াও নবাবের দপ্তরে

অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে আর একজন বিচারক ছিলেন। তার কার্য ছিল পত্তনীদার ও আয়মাদারগণের উত্থাপিত সকল অভিযোগের নিষ্পত্তি সাধন। তার পদবী ছিল দারুল কাজা বা প্রধান সদরস সদুর।

১৭১২ খৃস্টাব্দে বাদশা শাহ আলম ইন্তেকাল করলে তার চার পুত্র জাহান্দার শাহ, আজিমুশ শান, জাহান শাহ এবং রফিউস সানের মধ্যে মোগল সিংহাসনের দাবি নিয়ে বিরোধ বাধে। জাহান্দার শাহ তিন ভাইকে হত্যা করে ১৭১৩ খৃস্টাব্দে মোগল সিংহাসন দখল করেন এবং চার বছর পর আজিমুশ শানের পুত্র ফররখ শিয়র এলাহাবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ আবদুল্লাহ এবং পাটনার শাসনকর্তা সৈয়দ হুসেন আলী (এরা দুই ভাই ছিলেন) সাহায্যে জাহান্দার শাহকে হত্যা করে মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দ্বন্দ্বে বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খান কূটনৈতিক সুযোগ হাসিল করেন। বাদশাহ ফররখ শিয়র প্রচুর ইনামের বিনিময়ে ইংরেজ বণিকদেরকে বিনা শুল্কে এই দেশে আমদানি-রফতানি ব্যবসা পরিচালনার অধিকার দিয়ে ফরমান জারি করেন। মুর্শিদকুলি খান এই ফরমান অমান্য করেন। বাদশা ফররখ শিয়র বিহারের রশীদ খাঁ নামক এক যোদ্ধাকে বাংলার নবাবী দখল করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু রশীদ খাঁ পরাভূত হন। ফররখ শিয়রও ১৭১৯ খৃস্টাব্দে নিহত হন। সেটা অন্য অধ্যায়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেই আমলে কাজীগণের সুদৃঢ় মনোভাবের এক দৃষ্টান্ত পাঠক-পাঠিকাদের সদয় অবগতির জন্য উল্লেখ করা যায়। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে মহম্মদ শরীফ নামে একজন কাজী ছিলেন। তিনি বাদশা আওরঙ্গজেবের অনুমোদনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় চুনাখালীর জমিদারের কাছে সাহায্য চায়। তার আচরণ বৃন্দাবনের খারাপ লাগে। তিনি ফকিরকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। ফকির বৃন্দাবনের বাড়ীর রাস্তার ধারে ইট জোগাড় করে মসজিদ নির্মাণ করে আজান দেয়া শুরু করেন। বৃন্দাবন মসজিদটি ভেঙ্গে দেন। ফকির কাজীর দরবারে বিচারপ্রার্থী হন। কাজী শরীফ বৃন্দাবনের প্রাণ বধের রায় দেন। মুর্শিদকুলি খাঁ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নমনীয়ভাব দেখাবার জন্য কাজী শরীফকে অনুরোধ করেন। ক্ষিপ্ত হয়ে কাজী শরীফ নিজ হস্তে বাণ নিক্ষেপ করে বৃন্দাবনকে হত্যা করেন। বাদশা আওরঙ্গজেব তখন জীবিত। তাঁর কাছে অভিযোগ আকারে বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিবেদন পাঠানো হয়। বাদশা সেই প্রতিবেদনের উপর নিজ হস্তে "কাজী শরফ আল্লাকা তরফ" লিখে ফেরত দেন। ১৭০৭ খৃস্টাব্দে বাদশার ইন্তেকাল হলে কাজী শরীফ ইস্তফা দেন। এ ব্যাপারেও মুর্শিদকুলির অনুরোধ তাকে টলাতে পারেনি।

মুর্শিদকুলি নিজে বিদ্বান, জ্ঞানী, সুবিচারক, দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। এবার তিনি দেশে কাজী নিয়োগের দায়িত্ব প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর ন্যস্ত করেন। আদেশ দিলেন সৎ, জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিগণকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাপেক্ষে নিয়োগ করা হবে। দৃশ্যত, কাজীগণের ভাগ্য সব প্রাদেশিক শাসনকর্তাসহ পাটনার শাসনকর্তা সৈয়দ

হুসেন আলীর উপর ন্যস্ত হয়ে গেল। আমাদের আলোচ্য কাজী-উল-কোজাৎ পরিবারকে নিজ মর্যাদা রক্ষার্থে পাটনা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিহার এলাকার বাইরে কোথাও বসবাসের জন্য।

নবাবী আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার তথা পাটনা, রামগড় ও মুর্শিদাবাদের যোগাযোগ ছিল ত্রিভুজাকার। মুর্শিদাবাদ থেকে একটু উত্তরে গেলে সাহিবগঞ্জ, সেখান থেকে খাড়া পশ্চিমে ভাগলপুর, তারপর নবাবের বন্দুক তৈরীর কারখানা শহর মুঙ্গের; তারপর মোকামগঞ্জ শেষে পাটনা। আবার পাটনা থেকে মোকামগঞ্জ হয়ে খাড়া দক্ষিণে গয়া তারপর রামগড়। এবং রামগড় থেকে পূর্বে আতিয়া আসানসোল রামহল সাঁথিয়া কাঁদী হয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়া যেতো। তাছাড়া শেরশাহ নির্মিত বাদশাহী সড়ক বা গ্রান্ড ট্রাংক রোড দিয়ে পাটনা থেকে রানীগঞ্জের নিকট চুরুলিয়া যাতায়াতের যোগাযোগে সুবিধা ছিল। আলোচ্য কাজী পরিবার পরিচিত এবং পূর্বে উপস্থিত লোকজন ছাড়াও স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন। এলাকাটি বিহার প্রদেশের সাওতাল পরগনা জেলার রাজমহল মহকুমার। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার এবং বীরভূম জেলার সদর মহকুমার সংযোগস্থল। কাজী পরিবারের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এখন একটু 'ধান বানতে গাজীর গান গাওয়ার' মত কিছু তথ্য সরবরাহ করতে হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের বৃন্দাবন শহর বৈষ্ণব ধর্মের এক প্রভাবশালী আখড়ায় পরিণত হয়। এর তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন লোকনাথ গোস্বামী। রাজশাহীর নরোত্তম দাস ওরফে ঠাকুর মহাশয় (লোকনাথ গোস্বামী কর্তৃক দেয় উপাধি) শ্রী নিবাস আচার্য এবং শ্যামানন্দ গোস্বামী-উল্লেখ্য, তার পদবী গোস্বামী ছিল না। কিন্তু তার বংশধরেরা এই পদবী ব্যবহার করেন কেননা গোস্বামী শব্দের অন্যতম অর্থ হলো "যে ব্যক্তি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিয়া ধর্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করে সে।"

লোকনাথ গোস্বামী এই তিন বাঙালীকে বৃন্দাবনে পেয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য তাদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বঙ্গদেশে পাঠান। এই তিন কর্মী আরো কর্মীকে নিজ মতবাদে দীক্ষিত করেন। তাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবি রাধা বল্লভ ও রঘুনাথ দাসের নাম উল্লেখ করা যায়। রাধা বল্লভ শ্রী নিবাস আচার্যের কিংকর ছিলেন। নরোত্তম দাস (ঠাকুর) আসানসোল অঞ্চলে এবং শ্রী নিবাস আচার্য কাটোয়া অঞ্চলে এবং শ্যামানন্দ বর্ধমান সদর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। চুরুলিয়ার জমিদার নিঃসন্তান ছিলেন। তার মৃত্যুর পর নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণব ধর্মের বিত্তবান হিসাবে চুরুলিয়ায় বসবাস শুরু করেন, কিন্তু এক পুরুষেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার আসখোনা ইউনিয়নের অধীন মোড়ি নামে একটি গ্রাম আছে। শ্রী নিবাস আচার্য গোপাল দাস নামে এক শিষ্যকে এখানে আখড়া তৈরী করে দেন। গোপাল দাস সিদ্ধ পুরুষ নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময় মৌড়ির জমিদার বৈষ্ণব ধর্মে আকর্ষিত হন। আমি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত এই জমিদারির দেউড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। তারা এক পুরুষেই ধ্বংস হয়ে যান। এই পোড়ো বাড়ীতে ছিন্নমূল ও হনুমানও বাস করতে দেখেছি। সেখানকার অদূরে নবদ্বীপ ও শ্রী খন্ড অঞ্চলেও বৈষ্ণব ধর্ম মতাবলম্বী কর্মী এখনো দেখা যায়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বৈষ্ণবগণ পরকিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ও অনুসারী এবং তাদের মতে দেহটাই সর্ব শান্তির মূল। আমাদের আলোচনা কাজী পরিবার স্বচ্ছলভাবেই পুনর্বাসিত হলেও কাজী-উল-কোজাতের পুত্র ওরফে কাজী নজরুল ইসলামের দাদা কাজী আমিনুল্লার ছিল বড় সংসার। তিনি সৌখিন পুরুষ ছিলেন। তার পুত্র কাজী ফকির আহমদ তথা নজরুলের আব্বা। বৃদ্ধকালে প্রথম পক্ষের সন্তান বিয়োগহেতু বিপত্নীক হলে গ্রামের খান্দানী পরিবারের কর্তা মুনশী তোফায়েল আলীর কন্যার সাথে কাজী ফকির আহমদের নিকাহ পড়িয়ে দেয়া হয়।[১]

এই কাজী ফকির আহমদের ঔরসে এবং জাহেদা খাতুনের গর্ভে মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ ঈসায়ী সালের ২৪মে) মতান্তরে ১৮৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতামহের নাম মুনশী তোফায়েল আলী।

কাজী ফকির আহমদের ঔরসে সাত পুত্র ও দু'কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কবি ছিলেন ষষ্ঠ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যৈষ্ঠ কাজীর জন্মের পর ৪ পুত্র অকালে লোকান্তরিত হয়। এরপর নজরুলের জন্ম হলে তাঁর ডাক-নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'। নজরুলকে তাঁর পড়শী ও পরিজনেরা এই নামেই ডাকতেন।

কাজী বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পীর পুকুর। কথিত আছে যে, হাজী পাহ্লোয়ান নামে এক জবরদস্ত ফকির ঐ পুকুরটি খনন করিয়েছিলেন। তাই এই পুকুরটির নাম হয় 'পীর পুকুর'। পীর পুকুরের পূর্বপাড়ে পাহলোয়ান শাহের মাজার এবং পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ ছিলো। কবির পিতা-পিতামহ আজীবন ঐ মাজার শরীফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান করে গেছেন। কবির পিতা কাজী ফকির আহমদ অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন; সাধক-বৃত্তি তাঁর স্বভাবগত ছিল। প্রত্যহ মাজার শরীফে সাঁঝ বাতি দেয়া এবং মসজিদে বসে এশা'র নামাজ পর্যন্ত তসবিহ্ তেলাওয়াত করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

কবি নজরুলের পূর্ব পুরুষেরা ছিলো কাজী। পূর্বে কাজী নিয়োগ করতে সম্রাটগণ প্রার্থীদের নিম্নোক্ত গুণাবলী বিচার করতেন। যথা-

(ক) স্বাস্থ্য ও সাধুতা

(খ) বংশ

(গ) আরবী ফারসী ভাষায় জ্ঞান

(ঘ) শরা শরীয়তে পান্ডিত্য

(ঙ) আদর্শবান ব্যক্তিত্ব।-

কাজেই নজরুলের অর্থবৈভব না থাকলেও তাঁর শরীরে কুলীন বংশের রক্ত যে প্রবাহিত- তা বলাই বাহুল্য। এই রক্ত ধারায় কোন পাপ নেই। রয়েছে ন্যায়, ইনসাফ ও শান্তির প্রতীক। নজরুলের বংশধারায় নির্যাতন-নিপীড়ন, শঠতা, প্রতারণা, লোভ-লালসার কোন ঘটনার নজির নেই। নজরুলের দেহ-মাংস পবিত্রতায় গড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধারায় এর বৈপরীত্যই লক্ষ্যণীয়। অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন-জুলুম, শঠতা, প্রতারণা ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি- সবই রবীন্দ্রনাথের বংশধারায় বিদ্যমান।

সুতরাং পূর্বে উল্লেখিত আল-হাদিসের কাব্যানুবাদ এবং কবি ফিরদৌসির কবিতার মর্মবাণীগুলো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুলের ব্যক্তিগত, সাহিত্য ও রাজনৈতিক বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে যথার্থ।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত কুলীন বংশধারার একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিহাসের পাতায় এবং বর্তমানকালে প্রত্যক্ষ করে আসছি। কবিদ্বয়ের বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কবি নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাস্তব জীবনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই কবিতার মর্মবাণী সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং প্রভাবিত করেছে।

১। আব্দুল কাদের, কবির জীবন কথা (নজরুল পরিচিতি)
২। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল।
৩। কবি নজরুল ও গায়ক কে. মল্লিক, ডি. এফ আহমদ, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯/১১/৯৩

জ্ঞানের উৎস তিনটি, যথাঃ প্রকৃতি, ইতিহাস ও অহী বা আল্লাহর কিতাব
- ডঃ মহাকবি ইকবাল

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা
দেখরে যবন দ্যাখরে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"
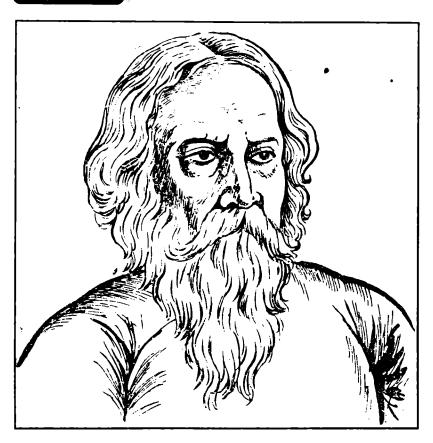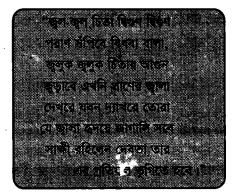
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে সংযোজিত রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে রচিত গান।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও শিক্ষা জীবন

বালক রবীন্দ্রনাথ

জমিদার তনয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে। কাজেই আর্থিক দৈন্যতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু পিতা-মাতার আদর-সোহাগ কবি তেমন একটা পাননি। কারণ একান্নবর্তী ঠাকুর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিলো অনেক। ছেলেবেলায় বাবা-মা, ভাই-বোনদের স্নেহ, আদর-যত্ন সবার একমাত্র সম্বল, সবচেয়ে কাম্য। অথচ দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ এর কিছুই পাননি। মা ছিলেন রুগ্ন। ছেলের কোন খোঁজ-খবরই রাখতে পারেননি। আর বাবা সর্বদাই বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসেন দু'দিনের মুসাফিরের মতো। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই-বোনেরাও যে যার খেয়ালে, অথচ চৌদ্দজন ভাইবোনের মধ্যে তিনিই সবার কনিষ্ঠ। এই শিশুর সেবা-শুশ্রুষায় বাড়ীর পুরাতন দাস-দাসীরাই ছিলো একমাত্র ভরসা। তাই বহু পরে কবি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন ঃ

> "আমি ছিলুম সংসার পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিলো গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে। এদিকে হর রোজ রবীন্দ্রনাথের সামনে দিয়ে দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর সত্য ভাগনা তখন স্কুলে যেতো এবং ছুটির পর রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে স্কুলের নানা গল্প বলতো। এই গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ইচ্ছে জাগে স্কুলে ভর্তি হবার। 'স্কুলে যাব, স্কুলে যাব' বলে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। ঘরে যিনি পড়াতেন,

---

১। হায়াত মামুদ, রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী, পৃঃ ৪

সেই গৃহ শিক্ষক একদিন ভয়ানক রেগে গিয়ে ছোট্ট রবিকে কষিয়ে এক চড় লাগিয়ে বলেছিলেন ঃ

"এখন স্কুলে যাবার জন্যে যে রকম কান্নাকাটি করছ, পরে না যাবার জন্যে আরো বেশি কাঁদতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের আবদারে পরবর্তীতে তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। প্রথম দিকে তিনি খুব আনন্দে স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। কিন্তু দিন কয়েক যেতেই রবীন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়ার শখ মিটে যায়। তিনি দেখলেন কোনো ছেলে পড়া বলতে না পারলেই তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে তার দু'হাতের উপর অনেকগুলো শ্লেট জড়ো করে চাপিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এই স্কুলে বেশী দিন তাঁকে থাকতে হয়নি। এরপর তিনি ভর্তি হন নর্মাল স্কুলে। এ স্কুলের নিয়ম-কানুন ছিলো সাহেবি ব্যাপার-স্যাপার। ক্লাস শুরু হবার আগেই স্কুলের গ্যালারীতে সব ছাত্রকে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। এই লাইনে দাঁড়িয়ে গানের সুরে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে হতো। গানের কথাগুলো ছিলো ইংরেজী। সে ইংরেজীর উচ্চারণ ছিলো অদ্ভূত, তার সুর ছিলো আরো অদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ গান ভালো লাগতো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' নামক আত্মচরিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে-
কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।
অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি- কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয়-
Full of glee, singing merrily, merrily, merrily"[২]

এবার নর্মাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয় বেঙ্গল একাডেমী নামে একটা ফিরিঙ্গি স্কুলে। ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া, বিশেষ করে কথা বলা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারবে- এই আশায় তাঁকে এই স্কুলে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এখানে থেকেও তাঁর কোন লাভ হয়নি। বড়লোকের ছেলে বলে সমস্ত শিক্ষক তাঁকে খুব আদর করতেন আর প্রশ্রয় দিতেন। তিনিও প্রায় হর রোজই কোনো না কোনো অজুহাতে স্কুল থেকে বাড়ী চলে আসতেন।

পরবর্তীতে কবির অভিভাবকদের কঠোর তত্ত্বাবধানে নিয়ম মাফিক নানা প্রকার শিক্ষাভ্যাস শুরু হয়। খুব ভোরে তাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হতো। শীতকালই হোক, কি বর্ষা কিংবা গ্রীষ্মকালই হোক না কেন। সকালে উঠেই একখানা পালোয়ান হিরা সিং-য়ের কাছে হাফ প্যান্ট পরে ধুলোমাটি মেখে কুস্তি লড়তে হতো। কুস্তি লড়া শেষ হতে না হতে মাইনে করা গৃহ শিক্ষক চলে আসতেন ভূগোল ইত্যাদি পড়াবার জন্যে। এর পর স্কুলে যাওয়া। বিকেল বেলা স্কুল থেকে মেজাজ বিগড়ে ফিরে আসতেন। এরপর ড্রয়িং মাস্টারের কাছে ছবি আঁকা শিখতে বসতেন। এরপর কিঞ্চিত ব্যায়াম।

২। হায়াত মামুদ, রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী, পৃঃ ৩

সন্ধ্যের পর ইংরেজী পড়া, প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। রোববার সকালে একজন শিক্ষক আসতেন বিজ্ঞান শেখাতে। এই বিষয়টা না-কি রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগতো। বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে সময় কাটাতে তাঁর খুব আনন্দ হতো। এ সময়েই আবার মেডিক্যাল স্কুলের এক ছাত্র আসতো অস্থিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে। তার জন্য একটা নরকংকাল কিনে এনে পড়ানোর ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিলো। বাংলা ভাষা শিক্ষাও পুরোদমে চলে। সুর ক'রে ক'রে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শেষ করে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পড়া শুরু করেন। এই অল্প বয়সে তিনি এরকম কঠিন বই পড়ে শেষ করায় অনেকেই বিস্মিত হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক বয়সে কঠিন কঠিন বিষয়ের বই অত্যন্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের সাথে পাঠ এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও বাধাধরা পড়াশোনায় তাঁর দারুণ অনীহা ছিলো। এ জন্যে গুরুজনেরা বকুনি দিতেন স্কুলে যাবার জন্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নানা অজুহাতে স্কুল থেকে পালিয়ে আসতেন অথবা স্কুল কামাই করতেন। অভিভাবকেরা রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সবচেয়ে বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ রামসর্বস্ব পণ্ডিত রেখে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত পড়ার জন্য। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

সবশেষে এক যুবক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তিনি ছাত্রের চরিত্র বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এসেই সংস্কৃত কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য আর ইংরেজীতে শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক পড়াতে শুরু করেন। এই দুটো গ্রন্থ বালক রবীন্দ্রনাথের সামনে যেন নতুন এক পৃথিবীর দ্বার উন্মোচন করে দেয়। কুমারসম্ভব তিন সর্গ মুখস্থ হয়ে যায়। ম্যাকবেথ নাটক পড়ানোর সাথে সাথে নতুন মাস্টার ছন্দে অনুবাদ করিয়ে দিতেন। এভাবে সমস্ত বইটাই অনুবাদ হয়ে যায়। এই অনুবাদ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুনেছিলেন এবং খুব খুশী হয়েছিলেন।

এ সময়ে বেঙ্গল একাডেমী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে। ফল যা হবার তা-ই হলো। ইতোমধ্যে পুরনো গৃহ শিক্ষক চলে যান। নতুন আরেকজন এসে সুবিধা করতে পারেননি। ছাত্রের স্কুলে যাবার নাম নেই; পড়াশোনায়ও মন নেই। কেবল স্কুল কামাই করেন আর বাসায় বসে নতুন বৌদির সঙ্গে মনের সুখে গল্প করেন। আর রাজ্যের যতো বাংলা বই ঘরে ছিলো সব একে একে পড়ে ফেলেন। ফলে, পাঠ্য বই পড়ায় অমনোযোগী হওয়ার কারণে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করেন। এরই মাঝে মা মারা যান। মা-হারা চৌদ্দ বছরের এই বালক রবীন্দ্রনাথ আরো প্রশ্রয় পেয়ে স্কুল যাওয়া প্রায় ছেড়েই দেন। অবশ্য ঘরে মাস্টার রেখে পড়াবার চেষ্টা চলে।

অভিভাবকদের ইচ্ছে ছিলো রবীন্দ্রনাথ অন্তত ম্যাট্রিক কিংবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তো পাস করবে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যাট্রিক পাসও করতে পারেনি। এদিকে বয়সও বেড়ে গিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ সতের বছরের কৈশোরে পদার্পণ করেন। এঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকমহল আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অবেশেষে সিদ্ধান্ত হয়

রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাকে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলাতে পাঠানো হবে। সেকালে ধর্মীয় দুলালেরা লেখাপড়া না শিখলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ী পরীক্ষায় ফেল করলে তাদের বিলেতেই পাঠানো হতো। কিন্তু এ ছেলে যে ইংরেজীও ভালো জানেনা, বিলেতে গিয়ে চলবে কেমন করে?

অতএব ঠিক করা হয়, মেজদাদা সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়ে মাস তিনেক ইংরেজী কথা-বার্তা আর আদব-কায়দা শিখে নেবেন। বিখ্যাত আই সি এস অফিসার এই মেজদাদা থাকেন আহমেদাবাদের শাহিবাগে মোগল যুগের আলীসান প্রাসাদসম বাড়ীতে। বাড়ীর নিচেই সবরমতী নদী। সতেন্দ্রনাথ দুপুরে আদালতে চলে যান। তাঁর স্ত্রী-পুত্র ইংলন্ডে থাকেন; ফলে বিশাল প্রাসাদ শূন্য। ফাঁকা বাড়ি, কোন হৈ চৈ কোলাহল নেই। রবীন্দ্রনাথ একা একা লাইব্রেরীতে বসে ইংরেজী পড়তে চেষ্টা করেন। ভালোভাবে আয়ত্ত করতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। ইংরেজী কেতাবের যেখানে কোন প্রকারেই অর্থ বুঝতে না পারেন, অভিধানের সাহায্যে অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করেন।

আহমেদাবাদে একা একা ইংরেজী বলা-কওয়া হচ্ছে না দেখে তাঁকে আবার বোম্বাই পাঠিয়ে দেয়া হয় সতেন্দ্রনাথের এক বন্ধুর বাড়ীতে। বোম্বাইয়ের পান্ডুরঙ্গ-পরিবার ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী আদব-কায়দার জন্য তখন প্রসিদ্ধ ছিলো। এখানেই এলেন রবীন্দ্রনাথ। সেজ দাদার বন্ধু দাদোবা পান্ডুরঙ্গের মেয়ে আন্না তড়খড়। বিলেত ঘুরে এসেছেন। ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ দখল। বয়সেও কিশোর। কবির সামান্য বড়। এরই কাছে রপ্ত করছেন ইংরেজী।

আন্না কবিকে খুবই পছন্দ করতেন। কবি বান্ধবীকে 'কবি কাহিনী' নামে স্বরচিত কাব্যটি পড়ে শোনাতেন। কবি বলেছেন ঃ

> 'আমার বিদ্যা সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারতনা। তা করেননি। পুঁথিগত বিদ্যে ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে, কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। .... মনে পড়েছে, তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না; তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয়নি। সে-কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[৩]

পরবর্তীতে মেজদাদার সাথে বোম্বাই থেকে জাহাজ যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত যাত্রা করেন। এ যাত্রাতেই জাহাজের মধ্যে ভালোভাবে তাস খেলা শিখেছিলেন। যথা সময়ে বিলেত পৌঁছুলেন। বৌদী এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা তখন লন্ডন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ব্রাইটনে থাকেন। সমুদ্রের তীরে সুন্দর শহর ব্রাইটন। এখানেই একটা পাবলিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে। শহরের ক্লাবে, পার্টিতে যাচ্ছেন; বিলেতি গানে হাতে খড়ি হলো, বিলেতি নাচও একটু একটু করে রপ্ত করলেন। নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে, বান্ধবীও জুটেছে অনেক। একটি মেয়ের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়, মেয়েটি দেখতেও না-কি বেশ সুন্দরী ছিলো; তাঁর সঙ্গে একদিন gallop নৃত্যও

৩। হায়াত মামুদ, রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী, পৃঃ ১৪

জোড়াসাঁকো এই ঠাকুর বাড়ীর বিশাল অট্টালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়
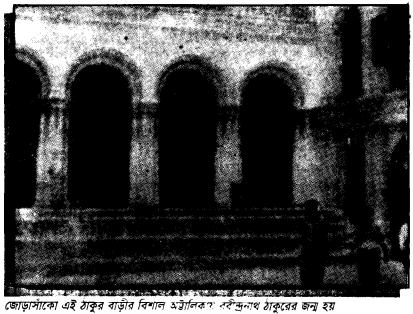
পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র রবীকে পুরস্কার দিচ্ছেন

করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর কপালে এত সুখ বেশী দিন সইলো না। সতেন্দ্রনাথ দেখলেন ব্রাইটনে থাকলে লেখাপড়া এগুবার সম্ভাবনা নেই। অগ্যতা লন্ডনের য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে। ইংরেজী পড়াতেন অধ্যাপক হেনরি মর্লিং; এঁকে খুব ভালো লেগেছিলো রবীন্দ্রনাথের। যদিও এই অধ্যাপকের কাছে রবীন্দ্রনাথ তিন মাসের বেশী পড়েননি। তবুও এই অধ্যাপকের প্রশংসা কবি বুড়ো বয়সেও করেছেন। কারণ, অন্তর দিয়ে রস উপলব্ধির বিষয় এই মর্লিং সাহেবের পড়ানো থেকে প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের পিতা তাঁকে দেশে ফিরে আসবার নির্দেশ পাঠান। দেড় বছর বিলেত থেকে, কোনো বিদ্যা আয়ত্ত না করে কোন ডিগ্রি না নিয়ে, ব্যারিস্টারী না পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন। একেবারে শূন্য হাতে। আর এভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ চুকে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে। জমিদারের তনয় হয়েও উচ্চ শিক্ষা দূরে থাক ম্যাট্রিক পাসও করতে পারেননি।

অল্প কিছুদিন লন্ডনে থেকে লাজুক ও বিনম্র রবীন্দ্রনাথ একেবারে সাহেব হয়ে যান। আগের ন্যায় লজ্জা এবং ব্যবহারে জড়তা নেই। মুখে সর্বদা ইংরেজী খৈ ফুটছে। যে শুনতে চাইছে তাকেই বিলেতী গান শুনিয়ে দিচ্ছে। এদিকে বাড়ীতে এসেই দেখেন আগের মতো বাড়ী তেমন নীরব নেই। বাড়ীময় হৈ চৈ লেগেই আছে। কারণ জ্যোতি দাদা 'মানময়ী' নামে একটা নাটক লিখেছেন, তারই অভিনয়ের মহড়া চলছে। রবীন্দ্রনাথ শুনে মহড়ায় নেমে পড়েন। নাটকের জন্য একটি গানও রচনা করেন। গানটি হলো ঃ

'আয় আয় সহচরী
হাতে হাতে ধরি ধরি'

এছাড়া এ সময় 'বাল্মিকী প্রতিভা' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই নাটকেও তিনি অভিনয় করেন। এতদসত্ত্বেও তার মনে সুখ ছিলো না। মন পড়ে ছিলো সুদূর লন্ডনে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

> 'যৌবনের আরম্ভ সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা। নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব- এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্ঠিত হয়ে চুপ করে পড়ে যাচ্ছি।'[৪]

কিছুই তার ভালো লাগছে না। মনে কী রকম কাঁটা ফুটে আছে। নিজেই স্থির করলেন, পুনরায় বিলেত যাবেন এবং ব্যারিস্টারী পড়ে আসবেন। এবার নিজেই বাবা মশাইকে চিঠি লিখলেন, ইচ্ছার কথা জানালেন। যথাসময়ে মহর্ষি উত্তর পাঠালেন

> .... 'তোমার শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংল্যান্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। .... গতবারে সতেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলো; এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

৪। হায়াত মামুদ, রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী, পৃঃ ১৬

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

চেয়ারে বসে আছেন গানের শিক্ষক শ্রী কাশীনাথ সিংহ, আর তাঁর ডানদিকে দণ্ডায়মান কিশোর রবীন্দ্রনাথ

বিলেতে সতেরো বছরের ছাত্র রবীন্দ্রনাথ

কবির সঙ্গে ভাগ্নে সত্যপ্রসাদও যাচ্ছে। কিন্তু অদৃষ্ট লিপি খন্ডাবে কে? মাদ্রাজ পর্যন্ত রাস্তা তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। এরপর কি মনে করে ফিরে এলেন দু'জনেই। ভয়ে মাথা হেঁট করে পিতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন উভয়ে; পিতা কেবল বললেন যে 'ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই' এর মধ্যে তিনি দেখছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাত বছর বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। এ কথা বাড়ীর সকল সদস্য এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররাও জেনে যায়। একদিন বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে পরখ করার জন্যে ডেকে নিয়ে বললেন, দেখ, বর্ষা সম্বন্ধে দু'ছত্র কবিতা বলছি, খাতায় লিখে নাও। কাল ওর সঙ্গে মিল করে আর দু'ছত্র কবিতা লিখে এনো দেখি। দেখব কেমন কবিতা লিখতে শিখেছ তুমি।" লাইন দু'টো হলো ঃ

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথ বাড়ী এসে লিখলো দু'ছত্র কবিতা। পরদিন স্কুলে সে কবিতা নিয়ে এলোঃ

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।"

কবিতা পড়ে শিক্ষক মহাশয় খুব খুশী হলেন। বললেন, ভারী সুন্দর কবিতা লিখেছ তো! লেখ, আরো লেখ। ভবিষ্যতে ভাল কবিতা লিখতে পারবে তুমি।

রবীন্দ্রনাথ আর একটু বড় হয়ে গান লিখতে শুরু করেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কানে গেলে ছেলেকে ডেকে পাঠান এবং গান গাইতে বলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ পর পর কয়েকটি নিজের লেখা গান গেয়ে শোনান। ছেলের গান শুনে ও প্রতিভা দেখে পিতা মুগ্ধ হন। তিনি বললেন, দেশের রাজা (ইংরেজ) যদি এই ভাষা জানতো আর সাহিত্যের আদর বুঝতো তবে এই কবিকে যোগ্য পুরস্কার দিতো। রাজার দিক্ থেকে যখন তার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন আমাকেই সে কাজ করতে হবে। এই বলে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার সূত্রপাত সাত বছর বয়স থেকেই কিন্তু তেরো বৎসর বয়স থেকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক একটি পত্রিকায় 'বনফুল' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া ঠাকুর বাড়ি থেকে 'ভারতী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা, ছোটগল্প 'ভিখারিনী' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান' ভারতীয়তে ছাপা হয়।

পরবর্তীতে ঠাকুর বাড়ি থেকে আরেকটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। পত্রিকার নাম 'বালক'। সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী অর্থাৎ মেজ বৌদি জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকায় প্রচুর লিখেছেন।

ছড়াও ছড়াও প্রাণের আবীর শীত-জর্জ্জর দেশে
রাঙিয়া উঠুক জীর্ণ ও জরা, ফাগুন উঠুক হেসে
আবার পুষ্প-পল্লব-হীন শীর্ণ তরুর শাখা
হউক পূর্ণ কুঁড়ি কিশলয়ে পরাগের ফাগে মাখা।

- নজরুল

কবি নজরুলের বাল্য ও শিক্ষা জীবন

বালক নজরুল

কবি নজরুল বাল্যকালে খুবই ডানপিটে আর দুষ্টু ছিলেন। গাঁয়ের সবাই তাঁর দুষ্টামীর কারণে অতিষ্ঠ ছিলো। এমন কোন দুষ্টামি নেই, তাঁর মাথা থেকে বের হতো না। পাখীর ছানা পাড়া থেকে শুরু করে মানুষের পাকা ধানে মই দেয়া পর্যন্ত কোন দুষ্টামীই বাদ যেতো না। পিতার কড়া শাসন, মায়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তিনি গাঁয়ের বখাটে ছেলেদের নিয়ে মেতে থাকতেন এবং হৈ হৈ করে বেড়াতেন। গ্রামের সকল দুষ্টু ছেলের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। অর্থাৎ সর্দার।

নজরুলের পিতার ইচ্ছে ছিলো নিজের আদর্শে তিনি ছেলেকে গড়ে তুলবেন। তাই তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন গ্রাম্য মক্তবে। নজরুল দুষ্টামীতে যেমন ছিলেন পারদর্শী; ঠিক তেমনি লেখাপড়ায়ও ছিলেন খুবই তুখোড়। দশ বছর বয়সেই তিনি উর্দু ও ফার্সী এমন সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন যে, তা শুনে অনেকেই বিস্মিত হতেন। নজরুলের খুশ এল্‌হানে বা সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনে বড় বড় আলেম সাহেবও আনন্দে তাঁর পিঠ চাপড়াতেন।

দুর্ভাগ্য কবির! কবির বয়স যখন আট বছর তখন অর্থাৎ ৭ চৈত্র, ১৩১৪ সালে তাঁর পিতা ফকির আহমদ ইন্তেকাল করেন। তাই তাদের সংসারে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। তাঁর মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে

বিপাকে পড়েন। এরপরও অনেক কষ্টে নজরুল আরো দু'বছর লেখাপড়া করে মক্তবের শিক্ষা শেষ করেন। এরপর আর্থিক দৈন্যতার কারণে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

পরে নজরুল ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করেন। এমনকি, এই অল্প বয়সে তিনি গ্রামে মোল্লাকী এবং মসজিদে ইমামতও গ্রহণ করেন।

নজরুলের পিতৃব্য কাজী বজলে করীম ছিলেন পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি ফার্সীতে কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর প্রভাব নজরুলের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিলো। চাচার দেখাদেখি কবি নজরুলও বাল্যকালেই ফার্সী-বাংলা মিশানো কবিতা লিখতে শুরু করেন। কথিত আছে, বালক নজরুল একদিন চাচার কাছে বলে ফেলেন ঃ

তাঁর মতো সেও কবিতা লিখছে।

শুনে চাচা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বলেন ঃ

সে কি রে! তুই আবার কবিতা লিখবি কি হে!

অতঃপর চাচা নজরুলের কবিতা দেখতে চান। নজরুল তাঁর স্বরচিত কবিতা চাচাকে দেখায়। কবিতাটি হলো ঃ

'মেরা দিল বেতাব কিয়া
তেরে আব্রুয়ে কামান
জলা যাতা হ্যায়
ইশ্‌ক্ মে জান পেরেশান', ...

কবিতাটি পড়ে তো চাচা অবাক। এই বয়সে এতো সুন্দর কবিতা! চাচা দোয়া করে বলেছিলেন, 'তুই আমার চেয়েও বড় কবি হবি'। বাস্তবিকই, পরবর্তীতে নজরুলের জীবনে চাচার এই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

সেকালে বর্ধমান জেলায় 'লেটো নাচ' নামে এক ধরনের যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিলো। কবির চাচা বজলে করীম, কাজী ফজলে আহমদ প্রমুখ ছিলেন স্থানীয় লেটো-দলের উস্তাদ। নজরুল ১১/১২ বছর বয়সেই সেই নাট্য দলের জন্য 'শকুনি-বধ', 'মেঘনাদ-বধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সং' প্রভৃতি গীতি-নাট্য ও প্রহসন এবং বহু মারফতী, পাঁচালী ও কবিগান রচনা করে, 'ছোট উস্তাদজী' খ্যাতি অর্জন করেন। নজরুলের কবি প্রতিভা সেই বাল্যকালেই সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও বিভিন্ন লেটো-দল তাঁর কাছে পালা লেখাতে আসতো। এতে তাঁর কিছু উপার্জনও হতো।

নজরুলের তৎকালীন রচনায় উর্দু-ফারসী-মিশ্রেল ঘরোয়া বাংলা জবানের প্রাচুর্যে মুসলমানী পুঁথি ও মারফতী গানের সংস্পর্শ লাভ তাঁর ঘটেছিলো। রাঢ়বঙ্গের পাঁচালীকার,

কবিয়াল ও যাত্রাওয়ালাদের ঢঙে তিনি অনেক হাসির গানে প্রচুর ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজী-বাংলা মিশানো ব্যঙ্গাত্মক কমিক গানের একটি হলো ঃ

রব না কৈলাসপুরে
আই এ্যাম ক্যালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফেসেন
আহা মরি, কি লাইট্‌নিং॥
ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার
দেখলে বন্ধ দেয় চেয়ার,
কামন ডিয়ার গুডমর্নিং,
বন্ধু আসিলে পরে,
হাসিয়া হেন্ডশেক করে,
বসায় তারে রেস্‌পেক্ট করে,
হোল্ডিং, আউট এ মিটিং।
তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতূহলে
খেয়েছে সব জাতি কুলে
নজরুল ইসলাম ইজ টেলিং।

সেই বাল্য রচনাতেও রয়েছে কবির স্বকীয়তার ছাপ। তাঁর 'চাষার গীতে' আছে ঃ

চাষ করে দেহ-জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি সামালে
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে ভবেতে?
লা-ইলাহা ইল্লিলাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।
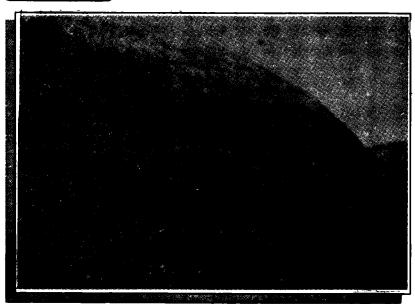
চুরুলিয়ার এই পর্ণ কুঠিরে নজরুল জন্মগ্রহণ করেন
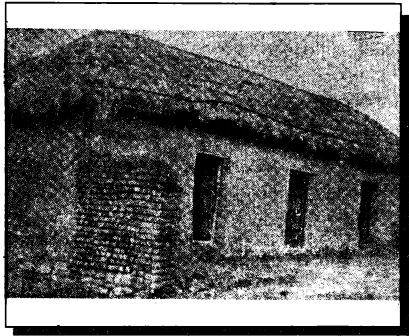
চুরুলিয়ার এই মক্তবে নজরুলের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়

নয়টি নালা আছে তাহার,
ওজুর পানি নিয়াত ইহার
ফলে পানি নানা প্রকার
সফল জন্মিবে তাহাতে
যদি ভাল হয়েছে জমি
হজ-জাকাত লাগাও তুমি,
আর সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে।

রামপ্রসাদ সেনের "ও মন তুমি কৃষি-কাজ জান না" গানটিতে রয়েছে কালি মাহাত্ম্যের প্রচারণা। তাই কবি নজরুল এর বিপরীতে তাঁর 'চাষার সং' রূপক-নাট্যে লিখেছেন মুসলমানী ঈমান ও আহকামের ফজিলৎ বর্ণনা। তাঁর বাল্য-রচনায় সকল বৈচিত্র ছাপিয়ে উঠেছে এই বিশেষত্বে সবাই ছিলো বিস্মিত।

নজরুল গবেষকদের মতে, সেই কিশোর বয়সে লোক শিল্পী দলের সংস্পর্শে এসে তার বাল্যের আচারনিষ্ঠা ভাবরসে বিধৌত হয়ে তাঁর মনোজীবন হলো যেমন অন্তর্মুখী, তেমনি সাংসারিকতার বন্ধন বিস্মৃত হয়ে বহির্মুখী জীবন হলো উদ্দাম, সংগ্রামশীল। একদিকে ঔদাসীন্য, অন্যদিকে চাঞ্চল্য নজরুলের প্রকৃতিতে প্রথম বয়সেই দেখা গিয়েছিলো। তাঁর পদ্য-রচনার বাতিক দেখে পড়শীরা তাঁকে ডাকতো, 'ক্ষ্যাপা' বলে। এই ক্ষ্যাপা পথে-প্রান্তরে পরশ-পাথর খুঁজে খুঁজে একদা হলো গৃহছাড়া।

কবি নজরুলের বেশ কয়েক বছর লেখাপড়া বন্ধ ছিলো। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে মাথরুম হাই স্কুলে ভর্তি হন। ভর্তির সঠিক তারিখ জানা না গেলেও ১৩১৮ সালে দেখা যায় নজরুল ঐ হাই স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র ছিলো। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নজরুলের নম্র প্রকৃতি ও সম্ভ্রমবোধ সহজেই কুমুদরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েই নজরুলকে অর্থাভাবে সে স্কুল ত্যাগ করতে হয়।

অতঃপর নজরুল রাণীগঞ্জের রেলওয়ের এক গার্ড সাহেবের কবলে পড়ে কিছুদিন তার বাবুর্চীগিরি করেন। সেখানে এক ফ্যাসাদ পাকিয়ে উঠতেই তিনি হলেন অদৃশ্য।

জীবন-জীবিকার তাগিদে আসানসোলে এসে আবদুল ওয়াহেদের বেকারীর দোকানে থাকা-খাওয়াসহ মাসিক ১ টাকা মতান্তরে ৫ টাকা বেতনে রুটির ময়দা মাখার চাকরি গ্রহণ করেন। দিনের বেলা গুন্ গুন্ করে গান করতেন আর ময়দা মাখতেন এবং রাতের বেলা অবসর সময়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বিভিন্ন পুঁথি সুর করে পাঠ করতেন। তার

১৯৫৬ সালে স্থাপিত বর্ধমানের রানীগঞ্জে সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল। ১৯১০-১১ সালে নজরুল এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন

মাথরুন নবীন চন্দ্র উচ্চ ইংরেজী স্কুল বা ইন্সটিটিউট। নজরুল ১৯১১-১২ সালে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

দরিরামপুর হাইস্কুলের জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন ভবন। ধারণা করা হয়, এই ভবনেই ছিল কবির শ্রেণীকক্ষ
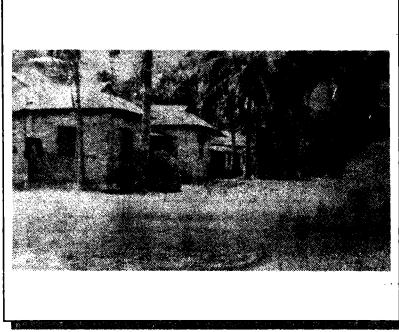
কাজীর শিমলার দারোগা বাড়ী
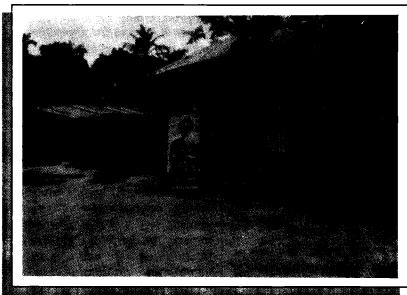
বেচুতিয়া বেপারী বাড়ীর সেই বৈঠকখানার ঘর। যে ঘরে কেটেছে ছাত্র কবির দীর্ঘ সময়। অনাদর-অবহেলার মাঝে এখনও কোনো রকমে টিকে আছে।
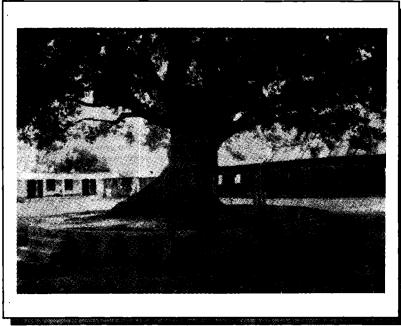
নামাপাড়ার পথে, শুকনি বিলের কিনারে সেই ঐতিহাসিক বটগাছ, যেখানে বসে বাঁশি বাজাতেন কবি

ত্রিশালের দরিরামপুর হাই স্কুল। বর্তমানে নজরুল একাডেমী। ১৯১৪ সালে নজরুল এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন

সুললিত কণ্ঠে পুঁথি শোনার জন্য মানুষের ভীড় জমে যেতো। এছাড়া হারমোনিয়াম বাজিয়ে নজরুল নিজের লেখা গান গেয়েও শোনাতেন উপস্থিত জনতাকে। এভাবে পুঁথি পাঠে, গানে, গল্পে, কৌতুকে তিনি আসর গরম করে রাখতেন। হাসি-উল্লাসে পাড়া মাতিয়ে তুলতেন। প্রাণখোলা এই উদ্দামতার জন্য অল্প দিনেই তিনি সেখানে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

সেখানে এক ফকিরের সাথে তাঁর প্রায়ই দেখা হতো। ফকিরকেও নজরুল গান শোনাতেন। এই ফকিরের অকস্মাৎ মৃত্যুর খবর শুনে কবি নজরুল হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শোকাচ্ছন্ন হয়ে তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ হলো ঃ

'দেখাইয়া গেলে ঐ স্থানে আছে লেখা
ব্যথার কাহিনী যাহা যায় নাকো দেখা।
পাওনি দরদী বন্ধু জগত খুঁজি
দুঃখেতে তাই মুখটি রাখিতে বুঁজি

চাইনি ভিক্ষা কোনদিন কথা কয়ে
খোঁড়ায়ে খোঁড়ায়ে হেঁটে যেতে রয়ে রয়ে।"

সে সময়ে ময়মনসিংহের কাজী রফিজ উল্লাহ্ নামে এক ভদ্রলোক আসানসোলে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন। একদিন তিনি বাসার সিঁড়ির নিচে বালক নজরুলকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সামান্য বেতনে ঘরের কাজে নিযুক্ত করেন।

মতান্তরে লেটো দলের সঙ্গীত শিক্ষক রূপে নজরুল ইতোপূর্বেই যন্ত্রসঙ্গীতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সে সুবাদে আসানসোলের তৎকালীন পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

মনে হয়, প্রথম ঘটনাটিই সঠিক। কারণ, নজরুল সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে পূর্ব পরিচিত হলে তিনি কখনোই নজরুলকে সামান্য বেতনে বাসার কাজে নিয়োগ করতেন না। যা-ই হোক, অল্পদিনেই নজরুলের অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বিচক্ষণ পুলিশ কর্মকর্তা রফিজ উল্লাহ্ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এই ছেলে একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এই উচ্ছৃঙ্খল ছেলেটি যদি রুটির দোকানের এই নিম্ন রুচি ও পরিবেশের সাথে থাকে তা হলে এই বিরাট প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটবে। তাই তিনি নজরুলকে সঙ্গে করে ময়মনসিংহের নিজ গ্রাম কাজীর সিমলায় নিয়ে আসেন এবং গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে (১৯১৪ সালে) দরিরামপুর হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি করিয়ে দেন।

মেধাবী নজরুল এখানেও অল্প দিনেই শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন সদ্য বি.এ. পাস করা শ্রী মহিম চন্দ্র খাস নবীশ। তিনি নজরুলের ক্লাসে ইংরেজী ট্রান্সলেশন শিক্ষা দিতেন। নজরুলকে ক্লাসে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রথমে হতচকিয়ে যেতেন, তাকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখা যেতো, কিন্তু প্রশ্নটি পুনরায় বলা হলেই নজরুল এর সঠিক জবাব দিতেন। ক্লাসে তিনি অন্যমনস্ক থাকতেন, কিন্তু দুষ্কর্মের পান্ডাগিরি ছিল তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। স্কুলের অদূরে ঠুনি ভাঙ্গা বিল, নজরুলকে মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিয়ে প্রায়ই তার তীরে উদাস দৃষ্টিতে একা বসে থাকতে অথবা বাঁশি বাজাতে দেখা যেতো। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিলো অদম্য, কিন্তু স্কুলের নিয়মের বাঁধন তাঁর শিল্পী মন মেনে নিতে পারেনি। ফলে বার বার হয়েছেন পলাতক। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হবার পরই তিনি হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। স্কুলের পড়া নিয়মিত অভ্যাস করা তার ধাতে ছিলো না; কিন্তু আশ্চর্য মেধা-গুণে তিনি পরীক্ষায় প্রথম কি দ্বিতীয় হয়ে

অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসে নজরুল ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে রাণীগঞ্জে সিয়ারসোল হাইস্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হন। সে বছরই হাফিজ নুরুন্নবী সে স্কুলে ফারসী ভাষায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁরই আগ্রহে নজরুল সংস্কৃত ছেড়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফারসী নেন এবং যথেষ্ট আগ্রহের সাথে ফারসী শিখেন।

সে সময় কুমার রামেশ্বর মালিয়াহ বাহাদুর সেখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি বোডিং করে দিয়েছিলেন। এই বোডিংয়ে মাত্র পনেরজন মুসলমান ছাত্র থাকতো। স্কুল কর্তৃপক্ষ নজরুলকে বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তদুপরি রাজবাড়ি থেকে মাসিক ৭ টাকা বৃত্তি পেতেন। এই ৭ টাকায় তার চা-নাস্তা ও কাপড়-জামা হতো এবং কোনো কোনো মাসে কিছু বাঁচিয়ে তিনি তাঁর ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচের জন্য পাঠাতেন।

১৯১৬ সালে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এ সময়ে স্কুলে একটি রচনা প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় নজরুল পুরস্কার সামান্যই পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনা সুধীজনের বিশেষ আকর্ষণ করেছিলো। স্কুলের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীতে হিন্দু প্রধান শিক্ষক মহাশয় নজরুলের নাম উল্লেখ করে রিপোর্টে লিখেছিলেন ঃ

"Further considering in intrinsic merit of the several papers of the competitors for the Edgely prize, the generous donar has kindly granted Rs. 4/- to each of the three other candidates viz. Belaram Mukherje, Golak Bihari Misra and Kazi Nazrul Islam for their good production of the essay."[১]

সংকীর্ণমনা একজন হিন্দু শিক্ষকের কাছে পরানুগ্রহে শিক্ষারত এক দরিদ্র মুসলমান বালকের নাম প্রধান শিক্ষকের বার্ষিক বিবরণীতে স্থান পাওয়া সে-কালে ছিলো বিস্ময়কর ব্যাপার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নজরুল দশম শ্রেণীর ছাত্র ষান্মাসিক পরীক্ষার প্রাক্কালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, শহরের দেয়ালে দেয়ালে রকমারি প্রাচীরপত্র এঁটে দিয়ে বাঙ্গালী যুবকদের সৈন্য দলে যোগ দিতে আহবান করা হয়েছে। প্রাচীরপত্রে লেখা ছিলো ঃ

"কে বলে বাঙালী যোদ্ধা নয়? কে বলে বাঙালী ভীতু! জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য- আর তা পারে একমাত্র বাঙ্গলার যুবশক্তি! ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ বিক্রমে!

১। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃঃ ১১

বাঙালী পল্টনে যোগ দাও!"

প্রাচীরপত্র পড়ে নজরুলের প্রাণে জাগে উন্মাদনা। বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা তাঁর অন্তরে। সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বাৎসরিক পরীক্ষার পরই লেখাপড়ায় ইতি টেনে সকলের চোখ এড়িয়ে নজরুল চলে যান আসানসোলে। সেখান থেকে মহকুমা হাকিমের চিঠি নিয়ে তিনি যান কলিকাতায়। নজরুল এবং তাঁর সাথে শৈলজানন্দ নাম লেখালেন ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে। ডাক্তারী পরীক্ষার পর নজরুলের সেনা দলে ভর্তি হওয়ার আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু রিক্রুটিংকালে দেখা গেল, শৈলজানন্দের যুদ্ধ গমনে পড়েছে বাধা। এতে নজরুল মোটেই নিরুৎসাহ হননি। সরকারি খরচে স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে লাহোর হয়ে গেলেন নৌশেরা। ট্রেনিং উপলক্ষে তিনমাস নৌশেরায় অবস্থান করেন। অতঃপর গেলেন করাচী। করাচী বন্দরের পূর্ব উপকণ্ঠে গানজা লাইনে (বর্তমান আবিসিনিয়া লাইনে) ছিলো সৈন্যদের ব্যারাক। এখানে সাত হাজার বাঙালী যুবকের সমন্বয়ে গঠিত হয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা বাঙালী পল্টন। সৈনিক জীবন গ্রহণ করে নজরুল বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হন।

তাঁর সৈনিক জীবন মাত্র তিন বছরের (১৯১৭-১৯১৯)। এই তিনটি বছর ছিলো তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখাপড়ায় চিরদিনের জন্য ছেদ পড়লেও তাঁর পরবর্তী জীবনের ভিত্তিমূলের সন্ধান এখান থেকেই শুরু হয়। ......"এই তিন বছরে একদিকে যেমন নির্ভীক বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ ঘটে, তেমনি সাহিত্যিক জীবনের উত্তরণের প্রারম্ভকাল সূচিত হয়। বলা যায়, করাচীর সেনানিবাস থেকেই তিনি প্রকৃত সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন এবং এখান থেকেই সর্বপ্রথম তাঁর লেখা জনসমাজে প্রচারিত হয় এবং খ্যাতিলাভ করেন।

> *হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন।*
>
> —কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন কাহিনী রচয়িতা রাজীব লোচন।
>
> ----------
>
> *ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ তখন বারভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাতেই হিন্দু জমিদার...... প্রকাশ্য না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।*
>
> -ঐতিহাসিক তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য ঃ কিছু কথা

"সকলের সহিত মিলে মিশে যা উপভোগ করা যায় তাই সাহিত্য। সাহিত্যে সকল মনের সাহায্য থাকে। সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী সবই একটা টাইপ বা নমুনা।"

- ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বাংলা ভাষায় সবচেয়ে পুরনো যে পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার নাম দেয়া হয়েছে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'- সংক্ষেপে চর্যাপদ। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নামে এক ভদ্রলোক (১৮৫৩-১৮৩২) নেপাল রাজ দরবারের পুঁথি-পত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই পুঁথি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে সাড়ে ছিচল্লিশটি পদ বা কবিতা আছে। প্রায় তেইশজন বৌদ্ধ সহজিয়া কবি এই সকল পদ রচনা করেছিলেন। এ পদগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম সম্পর্কে নানা কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন বাংলা বলে পন্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। হাজার বছর আগেকার বাংলা দেশের নানা বর্ণনা, বাঙালীদের আচার-আচরণ প্রভৃতির পরিচয়ও এর মধ্যে পাওয়া যায়। পন্ডিতেরা অনুমান করেন, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পদগুলো এই পুঁথিতে সংকলিত হয়েছিলো। এর ভাষা ছিলো এই রকম ঃ

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিত্র পইঠো কাল ॥
দিট করি অ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভনই গুরু পুছিহ জান ॥

সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বয়স প্রায় এক হাজার বছর। এ এক হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর এই দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভবও নয়। এর জন্য প্রয়োজন আলাদা গ্রন্থ প্রণয়নের। যেহেতু বাংলা সাহিত্যের দু'দিকপাল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুলকে নিয়ে এই গ্রন্থে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করছি, তাই এ বিষয়ে সংক্ষেপে

কিছু আলোকপাত না করলে অপূর্ণতা থেকে যায়। সংক্ষেপে হলেও এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে সাহিত্য কি? সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল ভাব। ভাষায় তার প্রকাশ। ভাবপূর্ণ ভাষাই সাহিত্য। সুন্দর সুন্দর ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করতে, আনন্দ দিতে এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কথা জানাতে সক্ষম হলে তাকে আমরা সাহিত্য বলি। প্রথম যুগের সাহিত্য ছিলো কাব্যপ্রধান। গদ্যেরও যে একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে তা সৃষ্টি করতে অনেক বছর লেগেছে। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গদ্য সাহিত্য কাব্য সাহিত্যের প্রচলনের অনেক পরে এসেছে। লিপি আবিষ্কার হবার পর থেকেই সাহিত্যের প্রকাশ। এরপর মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকেই হয় এর সাধারণ্যে প্রচার।

বাংলা সাহিত্যকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) আদি যুগঃ চর্যাপদ

(খ) মধ্যযুগ ও

(গ) আধুনিক যুগ।

মধ্যযুগে অর্থাৎ মুসলিম আমলেই বাংলা সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতা ঘটেছিলো। এটা কোন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মন্তব্য নয়। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরাই বলে গেছেন। হিন্দু লেখক অজিত কুমার ঘোষ তাঁর বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থের অবতরণিকায় লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের আগমনে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।"[১]

আর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ

"আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গ ভাষায় এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[২]

এরপর আর কোন মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে আফগানী মুসলমানেরা বাংলা জয় করে গৌড়ে রাজত্ব কায়েম করেন। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষারও সৃষ্টি হয়ে বাংলা সাহিত্যের গৌড়ীয় যুগের পত্তন হয়। মুসলমান আমল থেকেই বাংলা দেশের হিন্দু ও বৈষ্ণব কবিগণ (ক) মঙ্গল কাব্য, (খ) অনুবাদ সাহিত্য, (গ) বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, (ঘ) চৈতন্য জীবনী সাহিত্য, (ঙ) মুসলমান কবিগণ পুঁথি সাহিত্য ও (চ) কবি আলাওল পদ্মাবতী রচনা করতে শুরু করেন। এই নতুন করে গড়া ভাষাকে হিন্দু অথবা মুসলমানের যার ভাষাই বলা হোক না কেন, এটাই বাঙ্গালীর ভাষা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই বাংলা

১। অজিত কুমার ঘোষ, পৃঃ ৫।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১১৫।

ভাষাকে এককালে ব্রাহ্মণ্যবাদী কবি-সাহিত্যিকরা 'জাবনী' ভাষা বলে উপহাস-বিদ্রুপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিকে এই ভাষাকে 'জবানে বাঙ্গালা' বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু কবি ভারতচন্দ্রের হাতে 'জবানে বাঙ্গালা' বিকৃত হয়ে 'জাবনী বাঙ্গালা' অভিহিত হয়েছে। এই 'জাবনী' শব্দ থেকেই মুসলমানদেরকে দেয়া 'যবন' গালির উদ্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই বাঙ্গলা ভাষাকে ইতরের ভাষা, অসুর ভাষা, অপভাষা, পক্ষীর ভাষা বলেও বিদ্রুপ করা হতো। বাংলা ভাষার চর্চাকে ব্রাহ্মণেরা কিরূপ হীন দৃষ্টিতে দেখতো নিম্নের প্রবাদ বাক্যটিই তা বোঝার জন্য যথেষ্ট। তাঁদের রচিত প্রবাদ বাক্যে বলা হয় ঃ

"অষ্টাদশ পুরাণমণি রামস্য চারিতানি চ। ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ"

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করবে, তারা রৌরব নামক নরকে গমন করবে।[৩]

এই সম্পর্কে শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন-এর 'বহু ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধের একস্থানে শ্রী দীনেশ চন্দ্র লিখেছেন ঃ

"…. ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গ ভাষাকে পন্ডিতমন্ডলী 'দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গ ভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল- তেমনই ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গ ভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন। শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। দৌড়দেশ মুসলমানগণের অবিকৃত হইয়া গেল। তাঁহারা ইরান-তুরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন। আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি সেদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভূমি হইল। তাঁহারা বাণিজ্যের অছিলায় এদেশ হইতে রত্নাহরণ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুরমত এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট উহা তদপেক্ষা বেশী আপনার হইয়া পড়িল।

বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল। …. কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানদের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

…… চারিদিকে হিন্দু প্রজা, চারিদিকে শব্দ ঘন্টার রোল, আরতির পঞ্চ প্রদীপ, ধূপ ধূনা, অসুরুর ধোঁয়া- চারিদিকে রামায়ণ মহাভারতের কথা, এবং ঐ সকল বিষয়ক গান। প্রজা বৎসল মুসলমান সম্রাট স্বভাবতই জানিতে চাহিলেন, "এ গুলি কি?" পন্ডিত ডাকিলেন,- তিনি তিলক পরিয়ে মিখা দোলাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া হুজুরে হাজির হইয়া বলিলেন, "এগুলি কি জানিতে চাহিলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র জানা চাই। দ্বাদশ বর্ষাকাল ব্যাকরণ পাঠ

৩। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব, সওগাত, চৈত্র, ১৩৩৫।

করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার হইতে পারে।" বাদশা ক্রুদ্ধ হইলেন, "আমি ব্যাকরণ বুঝি না, রাজ-কাজ ফেলিয়া আমি ব্যাকরণ শিখিতে যাইব, তাহাও বামুন আমাকে পড়াইবে, না, ও-সকল হইবে না! দেশী ভাষায় এই রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবত রচনা কর।" .... দেশী ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিতে হইবে, এই আদেশ শুনিয়া পন্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল- ইতরের ভাষায় পবিত্র দেব-ভাষা রচনা করিতে হইবে, চন্ডালকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে! কিন্তু শত শত কল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, শত শত স্মৃতি লিখিয়া শত শত বৎসরে যাহা না করিতে পারেন, শাহানশাহ্ বাদশাহের একদিনের হুকুমে তাহা হয়- রাজশক্তি এমনই অনিবার্য। অগত্যা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণকে তাহাই করিতে হইল।

.... এহেন প্রতিকূল ব্রাহ্ম সমাজ কি হিন্দু-রাজত্ব থাকিলে বাঙ্গলা ভাষাকে রাজসভার সদর দরজায় ঢুকিতে দিতেন? সুতরাং এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়া ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের উপযোগী করিয়া নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[৪]

সে থেকেই এই ভাষার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব ঘটেছে। এই ভাষায় বাঙালী নিজের প্রাণের কথা বলেছে, শুনেছে, গেয়েছে। তাই এর নাম হয়েছে বাংলা সাহিত্য। এই সাহিত্য নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন ঃ

"অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।"[৫]

কাজী নজরুলের সাহিত্য বিষয়ে একটি রূপক লেখা এই বইয়ের যথাস্থানে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর আর কোন মন্তব্য এখানে দেয়া নিষ্প্রয়োজন।

গত এক হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরালে এবং নিরপেক্ষভাবে তা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি ঘটাতে মুসলমান শাসকেরা নিঃস্বার্থভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর মুসলমানেরা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেই নয়; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকেও ইংরেজ ও হিন্দু বাবুরা বিতাড়িত হয়েছিলো।

রবীন্দ্রবাবুরা মুসলমানদের শুধুই মুসলমান অর্থাৎ ম্লেচ্ছ বা যবন বলে বিবেচিত করতো; আর নিজেদেরকে খাঁটি বাঙালী বলে জাহির করতেন। সেভাবেই পরাধীন আমলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথদের অন্তরের জিনিসকে বাইরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের বিশ্ব মানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে বাঙ্গালী মুসলমানেরা ছিলো অনুপস্থিত। মুসলমানদেরকে এরা মনে করেছে অন্য গ্রহের জীব। তাই তাদের জীবনের চালচিত্র ঠাকুর বাবুদের সাহিত্যে স্থান পায়নি। স্থান পেলেও তা হয়েছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য,

৪। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮

বিদ্রুপাত্মক ও বিকৃতভাবে। সাহিত্যের প্রয়োজনে নিম্ন চরিত্রে অর্থাৎ ডাকাত, মাঝি, সন্ত্রাসী ও চাকর-বাকর হিসাবে মুসলমানদের রাখা হয়েছে।

বৃটিশ আমলে ফাঁক-ফোকর দিয়ে যদিও কোন মুসলমান লেখক-সাহিত্যিকের জন্ম হতো তারা মূলত ছিলো হিন্দু লেখক বাবুদের প্রভাবিত। তাদের সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করা হতো। হিন্দু লেখকদের সাহিত্যগুলোর বিষয়বস্তু ছিলো পৌরাণিক কাহিনী, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা, মুসলিম বিদ্বেষী ও মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন এবং ইসলাম ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা। তাদের দেখাদেখি হাতে গোনা যে ক'জন মুসলমান সাহিত্যিক ছিলো এরাও তাদের বইয়ে হিন্দু লেখকদের ন্যায় আল্লাহ, ফেরেশতা, বেহেস্ত, দোযখ এবাদত, দোয়া, রোজা, সালাম প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বর, দূত, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, প্রার্থনা, উপবাস, প্রণাম প্রভৃতি পৌত্তলিক শব্দ ব্যবহার করতো। তাদের সাহিত্য পাঠ করে বোঝার উপায় ছিলোনা। যে এগুলো কোন মুসলমানের রচনা।

সেকালে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা বঙ্কিমচন্দ্র, নীহার রঞ্জন, ঈশ্বরগুপ্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কবি হেম নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু বাবুদের গ্রন্থ পাঠ করেছে। আর অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানেরা একমাত্র ভরসা ছিলো অবাস্তব কাহিনীসম্বলিত পুঁথি সাহিত্য। সেখানে এ-দেশের সাধারণ মুসলমানের বাস্তব চালচিত্র স্থান পায়নি। স্থান পেয়েছে ধর্মীয় ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে অতিরঞ্জিত কল্প-কাহিনী এবং অবাস্তব রসালো উপাদান। যেমন ঃ

দুধে জলে ত্রিশ মণ করি জল পান
আশি মণ খানা খায় বিবি সোনাভান ॥
হাজার মণের গুর্জ তুলি নিল হাতে
আছিল লোহার জেরা, পরিল গায়েতে॥

এই সব পুঁথি সাহিত্য দ্বারা সাধারণ মুসলমানেরা বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায় তাদের চিত্তের খোরাক মিটিয়ে তৃপ্ত হতো।

প্রত্যেক নতুন শাসক সম্প্রদায় নিজেদের গরজেই চায়, যাদের হাত থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের সমস্ত গৌরবকে আচ্ছন্ন করে, তাদের কল্পিত কদর্য চেহারাকে জনসম্মুখে তুলে ধরতে। যাতে দেশের মানুষের মনে প্রাক্তন শাসকদের প্রতি ঘৃণা এবং বর্তমান শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। ইংরেজদের সহযোগী হিসেবে হিন্দু সাহিত্যিকেরা অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কাজটি করেছেন।

হিন্দু জনসমাজের মধ্যে মুসলমান শাসক সম্পর্কে ঘৃণা ও অপবাদ প্রচার করা, ইংরেজদের তা প্রয়োজন ছিল।

এ সম্পর্কে ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান তাঁর "রবীন্দ্র-নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ"
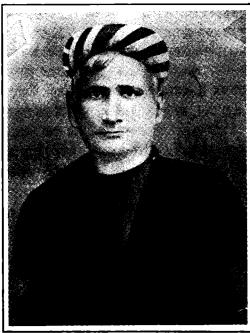
মুসলিম বিদ্বেষী চরম সাম্প্রদায়িক বাংলা সাহিত্যিকের পালের গোদা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মানুষের মুখে মুখে এবং বাংলার অভিধানে যতো কুৎসিত ও নোংরা শব্দের গালি রয়েছে বা প্রচলিত আছে সবই মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায়। হয়তো চরম মুসলিম বিদ্বেষী হবার কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা অভিধানের উৎকৃষ্ট শব্দ বাছাই করে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হিন্দুদের প্রতি মুসলমান শাসকদের (এমনকি ভারতের বাইরে থেকে আগত) অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তারা আফগানিস্তান (১৮৩৮-৪০) আক্রমণ করেছেন, এমন কথা ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন কলকাতায় বসেই বলেছেন। প্রথম আফগান যুদ্ধে ইংরেজরা সুলতান মাহমুদ কর্তৃক লুণ্ঠিত সোমনাথ মন্দিরের ফটকটি ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে এলে গভর্নর জেনারেল ঘোষণা করেন, এতদিনে সুলতান মাহমুদের হাতে হিন্দুদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে, প্রমোদ সেনগুপ্ত কর্তৃক রচিত ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (১ম খন্ড)' গ্রন্থের লেখক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, বিদ্রোহ চলাকালেই ইংরেজগণ সুকৌশলে হিন্দুদের প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন এবং মুসলমানদের হত্যা করার কথা প্রচার করেছে।"[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ প্রভু ভক্ত, শ্রেষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং শ্রেষ্ঠ কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী গদ্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই চরম সাম্প্রদায়িক লেখক তার সাহিত্যকর্মে অত্যন্ত কুৎসিত ও অশালীন ভাষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলমান শাসক এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করেছেন।

গ্রামে-গঞ্জে মুসলমানদের পাড়ায় পাড়ায়, আগুন লাগিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর পোড়াতে এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করতে উৎসাহিত করেছেন। মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় সভ্যতার-বৈভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে অত্যন্ত নগ্নভাবে মিথ্যা কলংক লেপন করেছেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো সীতারাম, মৃণালীনী, রাজসিংহ,

৬। ডঃ কাজী আঃ মান্নান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৯৯।

কৃষ্ণকান্তের উইল, দুর্গেশ নন্দিনী, কপালকুন্ডলা, আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরানী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি।

তিনি যতগুলো উপন্যাস রচনা করেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আনন্দ মঠ'। এ উপন্যাসে তিনি যে শুধু হিন্দু মহাপুরুষের প্রতি পাঠকের ভক্তি উদ্রেক করার চেষ্টা করেছেন তা-ই নয়, ইংরেজ শাসকদের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করার উপদেশও দিয়েছেন। কারণ তার মতে, ইংরেজ হিন্দুর কল্যাণার্থে এদেশে আবির্ভূত হয়ে(?)।

মুসলিম বিদ্বেষী নবীনচন্দ্র সেন

অনেক দিন আগে একজন মাওলানার ওয়াজে শুনেছিলাম- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একদিন শয়তানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ

"তোমার প্রধান শত্রু কে?"

জবাবে বলেছিলেন-

"আপনি। এরপর আপনার অনুসারী। অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়।"

ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান শত্রু ছিল মুসলমান। বঙ্কিমের মতে, শত্রু মুসলমান এবং মুসলমান শাসক। উৎপীড়ক, শোষণকারী শুধু মুসলমান শাসকই নয়- সমস্ত মুসলমান জনসমষ্টিও! 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসিগণ যুদ্ধে জয়ী হবার পর সকলে বলিল, 'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে এবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।' গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিরাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু।' হিন্দুরা বলিতে লাগিল, 'আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দূর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।'

আনন্দ মঠে বঙ্কিম মানস মুসলিম বিদ্বেষ আচ্ছন্ন। এ গ্রন্থের এক স্থানে ভবানন্দের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে, এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে।' অন্যত্র সন্তান সম্প্রদায়ের নেতা সত্যানন্দ নতুন Convert মহেন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন,- "আমরা রাজ্য চাই না। কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাদের সর্বাংশে নিপাত করিতে চাই।" (আনন্দমঠ)। সন্তান সম্প্রদায়ের এক বৈঠকের

মুসলিম বিদ্বেষী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে- তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চিৎকার করিতে লাগিল, মার মার, নেড়ে মার।' .... কেহ বলে এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধা মাধবের মন্দির গড়িব।" (আনন্দমঠ, ৭৬৮)

কাপ্তান টমাস ভাবানন্দের হাতে বন্দী। ভবানন্দ তাকে বলছেন ঃ

"কাপ্তান সাহেব তোমাকে মারিব না। ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানদের সহায় হইয়া আসিয়াছ? ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।" (দ্রষ্টব্য ঃ আনন্দমঠ)

'আনন্দ মঠ'-এর এ চিত্র এক নোংরা দাঙ্গার চিত্র। বঙ্কিম বাবু 'আনন্দমঠে' আরো লিখেছেন ঃ

"ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" (আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ)

আল্লাহ, কোরআন শরীফ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে উপহাস করে 'আনন্দমঠ' বঙ্কিম বাবু লিখেছেন ঃ

"মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা-আকবর! এতনা রোজের পর কোরআন শরীফ বেবাক কি ঝুটা হলো? মোরা যে পাঁচওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তিলক কাটা হিঁন্দুর দল ফতে করতে নারলাম। (ঐ, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

শুধু তাই নয়, এই বঙ্কিম বাবু ঢাকা সফর শেষে কলিকাতা গিয়ে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদেরকে কাক ও কুকুরের সাথে তুলনা করে ১২২৭ সালের অগ্রহায়ণের 'বঙ্গ দর্শনে' লিখেছেন ঃ

"ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করলেই তিনটি বস্তু দর্শকদের নয়ন পথের পথিক হইবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুর্দ্দম, অজেয়। ক্রিয়া বাড়ীতে কাক আর কুকুর। আদালতে মুসলমান।" (বঙ্কিম চন্দ্র, বঙ্গ দর্শন, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, পৃঃ ৪০১)।

এ ধরনের সংকীর্ণ ও ধর্মান্ধ চিন্তা ও মানসিকতা মানুষের বৃহত্তর এবং মহত্তের কল্যাণ সাধন করতে পারেন কি-না সে প্রশ্ন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়।

মুসলিম বিদ্বেষী দীনবন্ধু মিত্র

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে বঙ্কিমের মসজিদ ভাঙ্গার ইচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ করেছিলো ১৯৯০ সালে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে।

সীতারাম উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করেছেন। গঙ্গারাম নামে এক হিন্দু যুবক তার মুমূর্ষু মায়ের চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডাকতে যাবার সময় পথে এক মুসলমান ফকির শুয়েছিলেন। গঙ্গারাম তাকে পথ ছাড়তে বললে তিনি পথ ছেড়ে দিলেন না। মুসলমান ফকিরগণ তখনকার দিনে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় ঃ

"সে-কালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও একজন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন।" (পৃঃ ৮৭৩)।

এহেন সম্মানিত ব্যক্তি সংকীর্ণ পথের ধূলায়, "আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন।" গঙ্গারাম তাকে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও ফকির সরলেন না। অগত্যা গঙ্গারাম তাকে লংঘন করে কবিরাজের বাড়ি গেল। "লংঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়েছিল।" সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "বোধ হয় সেটুকু ফকিরের নষ্টামি।" (পৃঃ ৮৭৩)।

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঔপন্যাসিক, "ইচ্ছামত, অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।" কাজেই মুলমান ফকির সম্মানিত ব্যক্তি হলেও তাকে সংকীর্ণ গলি পথে প্রতুষ্যে আড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে এবং তাকে লংঘন করার সময় তার গায়ে গঙ্গারামের পা লেগেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করে 'নষ্টামি' করতে হবে। এজন্য তিনি কাজী অর্থাৎ বিচারকের কাছে অভিযোগ করবেন এবং বিচারকও "আজ্ঞা প্রচার করিলেন ইহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেল।" সর্বোপরি বিচারকের আদেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তার যে দুই-চারটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলোই মুক্তিলাভ করিল।"

কৈফিয়ত ঃ আরেকজন চরম মুসলিম বিদ্বেষী বাংলা সাহিত্যিক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর ছবিটি এখানে সংযোজন করে পাঠকদের সামনে চেহারাটা তুলে ধরার বড্ড ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু ছবিটি সংগ্রহে নেই বলে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।

এই কট্টর সাম্প্রদায়িক চিন্তার লেখক বঙ্কিম বাবু যত কিছিমের গালি রপ্ত করেছিলেন বা শিখেছিলেন তার উপন্যাসে মুসলমানদেরকে তা-ই উপহার দিয়েছেন। যেমন ঃ হীন, নীচ, কাপুরুষ, যবন, ম্লেচ্ছ। এমনকি প্রাচীনকালে বৌদ্ধদেরকে দেয়া নেড়ে গালিটিও মুসলমানদের কপালে জুড়ে দিয়েছেন।

এই বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে ওস্তাদজী দানেস খাঁকে দিয়ে মুসলমানদেরকে 'শূয়ার' বলে গালি দিয়েছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে মহাত্মা আকবর বাদশাহের বাড়িতে একটি যুবতী মেয়ে দিয়ে ঝাড়ু মেরেছেন এবং ধর্মাত্মা আওরাঙ্গজেব বাদশাহের মুখে কতিপয় কল্পিত সখী বা স্ত্রী লোক দ্বারা লাথি মারারও বন্দোবস্ত করেছেন। 'মৃণালিনীতে' বখতিয়ার খিলজীকে 'অরণ্য নর' 'বানর' বলতেও বিবেকে বাধেনি। কবিতা পুস্তকে মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-

"আসে আসুক না আরবী বানর
আসে আসুন না পারশী পামর।"

ষোলশ' শতাব্দীর কোন এক সময়ের ঘটনা। পারস্য সম্রাট স্বপ্নে কবিতার একটি চরণ মুখস্থ করলেন। কবিতার চরণটি হলো "দূররে আবলাককাসে কমদিদাম মওজুদ।" অর্থাৎ "সাদা কালোয় মেশানো রঙ্গের মোতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরল।" তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত কবি-সাহিত্যিককে আহবান জানালেন স্বপ্নে পাওয়া ঐ কবিতার চরণটির সাথে সঙ্গতি রেখে- অর্থ, ছন্দ, তাৎপর্য সমমানসম্পন্ন আর একটি চরণ লিখে দরবারে পেশ করার জন্য। অনেক কবি-সাহিত্যিক লিখলেন। কিন্তু সেগুলো সম্রাটের মনঃপুত হলো না। এখন অনেকের পরামর্শ মত সম্রাট কবিতার লাইনটি হিন্দুস্তানের কবিদের জন্য দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। মোঘল দরবারের সকল কবি যখন কবিতাটি নিয়ে চিন্তিত, তখন অন্তপুরের সম্রাট দূহিতা কবি জেব-উন-নিসা কবিতাটির চরণে একবার চোখ বুলিয়েই দ্বিতীয় ছত্র লিখলেন ঃ

"মাগার আশকে বুতানে সুরমা আলুদ।" অর্থাৎ সুরমা মাখা আঁখির বিন্দুতে ঐ মোতির প্রাচুর্য।"

কবিতাটি পারস্য সম্রাটের কাছে পৌছালে সম্রাটসহ দরবারের সকল জ্ঞানী-গুণী আনন্দে 'মারহাবা' বলে ওঠেন। তাঁরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে হিন্দুস্থানী বিদূষী কবির যশকীর্তন করেন এবং সেই সঙ্গে সম্রাটকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন ঐ মহান নারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পারস্যে আমন্ত্রণ জানান। সম্রাট সে যুগের বিখ্যাত কবিদের সাহায্যে রচিত এক আমন্ত্রণলিপি দিল্লীতে পাঠালেন। লিপিতে লেখা ছিলো-

"তুর এ্যায় মহ্জেবী বে পরদা দিদান, আরজু দাবামা।" অর্থ হল "হে চাঁদ শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হোক, পর্দার বাইরে আপনার দর্শনের আশা নিতে যেতে চাই।"

উত্তরে বিদূষী জেব-উন-নিসা পারস্য সম্রাটকে লিখলেন ঃ

"বুয়ে গুলদার বারগে গুলপুশিদাহ, আম দরশোখন বিনাদ মোরা।" অর্থাৎ "ফুলের সৌরভের মত ফুলেই আমি লুকিয়ে আছি, আমায় যদি কেউ দেখতে চায়, সে দেখুক আমার লেখায়।"

এই পর্দানশীল, মেধাবী, মহিয়সী ললনাশ্রী দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের কন্যা জেব-উন-নিসা সারাজীবন কুমারীব্রত পালন করে, কঠোর সাধনায় কাব্যচর্চা ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে গেছেন। কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারিনী হাফেজা, অনন্য-সাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারিণী, প্রতিভাবতী, চরিত্রবতী, গুণবতী জেব-উন-নিসার বিয়ে হলে অধ্যয়ন, গবেষণা, কাব্যচর্চা ক্ষুণ্ন হবে ভেবে তিনি বিয়ে করেননি। চিরজীবন কুমারী থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী এ পুণ্যশীলা রমণী যিনি দূর থেকে ছড়িয়ে দেয়া কাব্য সৌরভে ভারতের কাব্য গগণকে বিমোহিত করেছিলেন, সেই পুণ্যবর্তী রমণীকেও নিদারুণ মুসলিম বিদ্বেষের খড়গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে ছাড়েননি বঙ্কিম বিদ্বেষীরা। সাহিত্য সম্রাট বলে খ্যাত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার রাজসিংহ উপন্যাসে এই মহীয়সী রমণীকে ভ্রষ্টা, পতিতা, চরিত্রহীনা এক কুলটার রূপদান করেছেন। তিনি জেব-উন-নিসাকে মোবারক খান নামক এক সাধারণ মনসবরদারের প্রণয় হিসেবে চিত্রিত করে লিখেছেন-

"জেব-উন্নিসা তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক।

মবারক ঃ ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উন্নিসা হাসিয়া বলিল, "ঐ পুরাতন কথা। বাদশাজাদীরা কখন বিবাহ করে?----

মবারক ঃ এই মহাপাপ।---

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসিল। বলিল বাদশাজাদীর পাপ!--- আল্লা এ সকল ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন- কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসিত্ব করিয়া শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাজাদী করিতেন না।"

এহেন ইতিহাস বিকৃতি, এহেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ লেখার পরও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট, ঋষি। মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যে ঠাসা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি শব্দও ব্যয় করেননি। বরং তিনি বিভিন্ন শব্দের মালা গেঁথে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এই কুরুচিপূর্ণ মুসলিম বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ধভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি কট্টর সাম্প্রদায়িক লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যের কর্মযুগী, সাহিত্য মহারথী,

মুসলিম বিদ্বেষী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভগীরথের ন্যায় সাধনাকারী, বাংলা লেখকদিগের গুরু ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন।[৭]

অথচ শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' বইটিতে ইংরেজ বিদ্বেষী বক্তব্য থাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তাই অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলতে হয়ঃ হায়রে কবি! কি বিচিত্র তোমার উদারতা! কি বিচিত্র তোমার অসাম্প্রদায়িকতা! কি বিচিত্র তোমার ধর্মনিরপেক্ষতা! কি বিচিত্র তোমার একজাতিতত্ত্ব! কি অদ্ভুদ তোমার বিশ্ব কবির বিশ্ব হৃদয়ের স্বরূপ!

মুসলমানদের হেয় করার জন্য ঈশ্বরগুপ্ত নিজে বা কারোর গোপন ইঙ্গিতে লিখলেন-

"একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে (দাড়িওয়ালা)
হাসফাঁস করে যত প্যাঁজাখোর নেড়ে॥
বিশেষত পাকা দাড়ি পেট মোটা ভূঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি॥

মুসলমান জাতি কত অসভ্য, মূর্খ ও শুষ্ক কথা বলায় অপটু, অথবা তার বিপরীত কিছু একটা প্রমাণের জন্য তিনি লিখেছেন ঃ

দিশি পাতি নেড়ে যারা,
তাতে পুড়ে হয় সারা
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাঁদু বাড়ি খেনু ব্যাল
প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় ফুফু নানী
কলুই ডেলের পানি
ক্যাঁচা ক্যালা কেছুর ছালন।...

৭। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা- সমালোচনা সংগ্রহ, ১৯৫৫, পৃঃ ২৪৪-৪৫

ব্যাপকভাবে যখন অমুসলমান জোয়ানরা ১৮৫৭ সালের আন্দোলনে দেয়নি তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের পরাজিত হতে হলো। দখল করা দিল্লী ছেড়ে পালাতে হল। ঠিক তখন ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন ঃ

"ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।..

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ও বেগম জিনাত যখন বন্দী হলেন তখন তাদের পুত্রদের হত্যা করে কাটা মাথাগুলো বাহাদুর শাহকে উপঢৌকন দিয়ে নিষ্ঠুর উপহাস করা হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত ঐ ঘটনাকে সামনে রেখে লিখলেন-

"বাদশা বেগম দোঁহে ভোগে কারাগার॥
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দু'জন তাঁর প্রাণের কুমার।
একবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার॥

বঙ্কিম- গুরুর কামনা ছিলো, মুসলমানরা পরাজিত হয়ে ইংরেজরা যেন জয়ী হয়। তাই তিনি লিখলেন ঃ

"যবনের যত বংশ
একবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা।"
গরু জরু (স্ত্রী) লবে কেড়ে
চাঁপদেড়ে যত নেড়ে
এই বেলা সামাল সামাল ॥

হিন্দু আদর্শকে বড় করে দেখাবার জন্য মনসা দেবী এবং তার চেলাদের দ্বারা এদের অপমানের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। দেশের সুলতানও যে মনসা দেবীর কাছে কত তুচ্ছ অসহায়, বিপ্রদাস কৃত মনসা বিজয়ে তা দেখানো হয়েছে, দেশের রাজা হাসানের সাথে মনসার বিষাদ বাধলে চাঁপা বিবি দেশের বাদশা হাসানকে উপদেশ দিচ্ছেন-

সাপের দেবতা সেইত মনসা
হিন্দুর গোসাঞি যবনের হাওস॥
তার সাথে রাজা তুমি না করিও বাদ।
নাগেতে বেড়িয়া রাজা হবেক প্রমাদ॥
হাসন উপদেশ না শুনে হুকুম দিলেন,
হেড়া খাওয়াইব তারে দেহ পাকড়িয়া।
দরবেশ নিকা দিব কলেমা পড়াইয়া॥

(বিপ্রদাস কৃত মনসা বিজয়)

মনসা রাগে হাসনহাটির সমস্ত প্রজা ধ্বংস করলেন। তারপর হাসনকে মহাবিপদে ফেললেন। হাসন কোন উপায় না দেখে বিধিমতে মনসার চরণে পূজা দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।

পদ্ম পুরাণগুলোতে হাসান-হুসন পর্ব্বের সংক্ষিপ্তসার হলো নাগমাতা মনসাদেবী দেশ-দেশান্তরে গিয়ে তার মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে স্বীয় পূজা প্রতিষ্ঠিত করছেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন দেশে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করে অবশেষে মদিনায় উপস্থিত হন। নাগ সৈন্যদের সাহায্যে তিনি হাসান-হুসনকে পরাস্থ করেন। মনসা দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে হাসান-হুসন তার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে নিজেরাই শুধু তার পূজা করেননি, রাজ্যের সর্বত্র যাতে মনসা পূজার প্রচলন হয়- সে ব্যবস্থাও করেন। মোটামুটি হাসান-হুসন পর্বের এই হল সংক্ষিপ্ত কাহিনী। কোন কোন পুরাণ রচয়িতা হাসন-হুসনকে 'বঙ্গের পাশ্বা' বলে দেখিয়েছেন। কেউ কেউ আবার তাকে জোলা বা তাঁতি সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মনসা দেবী ও তার চেলা-চামুন্ডাদের দ্বারা মুসলমানদের অপমান করতে হিন্দু লেখকগণ শ্রীলতার কোন ধার ধারেননি। দ্বিজ বংশী দাসের বিষ হরির পাঁচালিতে রয়েছে ঃ

হাসেন হোসেন দুই যবন ঈশ্বর।
তার অধিকারে সেই গোয়ালা নগর॥
হাসান হোসেন কাজী গোষ্ঠি তার জোলা
পড়িয়া হয়েছে খল করে কাজীওয়ালা।
কাপড় বুনিয়া যায় এই বৃত্তি ছিল
জীবন উপায় এই পড়ে ছাড়ি দিল।
কাজী ভাই কাজীর শালা বিরাদরি কত
নমাজ করিয়া তারা পড়ে শত শত॥
তিন বার নমাজ পড়ে মার্গ (পাছা) মুক্ত করি।
উঠে বৈসে তিন বার দুই কান ধরি॥

মোল্লাদের দাড়ি ধরে চড়-থাপ্পড়-কিল কোনটাই বাদ রাখেনি হিন্দু বাবুরা। এমনকি মুসলমানদের নামাজ পড়া নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়েছে এভাবে ঃ

এতেক কহিয়া মোল্লা না করিল আন।
আমার বাড়িতে ঘট কৈল খান খান॥
তাহা দেখি গোয়ালা সব ধায় দড়বড়ি।
বেড়িয়া ধরিল সবে তার লম্বা দাড়ি॥
দাড়িতে ধরিয়া কিল মারে শতে শতে।
চড়লাথি গলাধাক্কা না পারি কহিতে॥
নয়া ধাড়িতে নিয়া দিল মার্গ ছেচারণ।
মিনতি করিয়া বলে ধরিয়া চরণ॥

হাসেন-হোসেনকে বধ করার খবর পেয়ে বিবি খাদিজার প্রতিক্রিয়া কবিতার ভাষায় বর্ণনা করা হয় এভাবে ঃ

খাতিজা (বিবি খাদিজা) বিবী আইল হাসানের মা
পদ্মাকে প্রণাম করি ধরে দুই পা॥
লক্ষ বলি পূজা দিয়া পূজিত তোমারে।
দুই পুত্র জিয়াইয়া দেহত সত্বরে॥
লক্ষ বলি পূজা দিয়া পদ্মার সম্মুখে
জিয়াইল কাজী পদ্মা সর্ব্বলোকে দেখে ॥

সাম্প্রদায়িক বিকারগ্রস্ত এইসব পুরাণ রচয়িতাগণ মনসাদেবীর গুণ-কীর্তন করতে করতে হঠাৎ এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যার সাথে ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হীন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকার কারণে মুসলমানদের ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ গালাগালি ও হীনভাবে চিত্রিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। যেমন ঃ

মোল্লা বেটার মোটা মূল
তিলে তিলে ফেলে থুক,
ফাটা এক ইজারা পরনে।
ভাঙ্গা তাকিয়া শিরে
ঘন ঘন মাথা নাড়ে
মাদিয়াকে ডাকে ঘরে ঘনে

মনসাদেবীর আদেশে তার চেলারা কিভাবে মোল্লাকে মনসার পূজা করতে বাধ্য করলো সে বিবরণ এরূপ ঃ

মোল্লা বেটা হাফ ছাড়ে
গোপালের মিলে ধরে,
মোল্লা সনে বাধে মহারণ।
গোপেরা মোল্লারে মারে,
বুকে হাঁটু দিয়া পড়ে
মোল্লা বেটার সংশয় জীবন॥
তোবা তোবা আল্লা আল্লা
বাপ বাপ ডাকে মোল্লা
হায়াতে পাঠাই দেহ ঘর।
বিপ্রজগন্নাথ কয়,
মোল্লা কহে সবিনয়
সুখে তোরা নাগ পূজা কর॥

মোল্লার মুখ দিয়ে লেখক অত্যাচারের কাহিনী বলাচ্ছেনঃ

জবা করিবারে মোরে
বুকে হাঁটু দিয়া ধরে,
উপাড়িল খোদার নূর দাড়ি।
ঘাড় ভাঙে মোচাড়িয়া
নাক ভাঙে লাথি দিয়া
লৌউ পড়ে নিবারিতে পারি
গোয়ালার হাত শনে
রাখালেরে ধরিয়া আনে,
গালে বান্ধে ছাগলের দাড়ি।
টানি আনে হিছড়িয়া,
উঠানেতে ছেলাইয়া
পৌছে মোর দিতে চাহে ছড়ি।

(তথ্য সূত্র ঃ আবুল হাসান মাহমুদ, ধর্মীয় সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, মাসিক সফর, জানুয়ারী '৯৫ সংখ্যা)।

পুরাণ রচয়িতারা কিরূপ সাম্প্রদায়িক বিকারগ্রস্ত হলে এরূপ কুৎসিক ভাষায় অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে আমি শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু পংক্তি উল্লেখ করেছি মাত্র। মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ মনসাভক্ত চিত্তানন্দ বর্ধিত করার প্রয়াসে নাগ সেনাদের দ্বারা মুসলিম রমণীদের সাথে অশ্লীল ও নির্মম ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রকাশ অশোভন বিধায় উদ্ধৃত করতে বিরত থাকলাম।

'কবিতা সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে আরেক প্রবীণ কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন ঃ

'বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগল দেড়ে, নেড়ে পানে রূকে
চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে ঠুকে।
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাঁচা খোল্লা, তোবা তাল্লা বোলো,
কোলে পোড়ে তোপে উড়ে যাবে সব জ্বোলে,
কেবল মর্‌জী তেড়া তেড়া, কাজে ভেড়া নেড়া মাথা যত,
নরাধম নীচ নাই নেড়াদের মত।'

দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ মহাশয় মুসলমান জাতিকে 'প্রতাপ সিংহ' উপন্যাসে দুরাত্মা, দুরাচার ধর্মজ্ঞানহীন, দস্যু, দুর্দান্ত ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে তৃপ্ত হয়েছেন।

"জামাই বারিক', পুস্তকে বাবু দীনবন্ধু মিত্র মুসলমান ধর্ম, সমাজ, মোল্লা, বপর এমনকি মুসলমান কুলবধূদের নিয়ে কিরূপ জঘন্য কুৎসিত ভাষায় কবিতা লেখেছেন

নিম্নে কবিতার একটি অংশবিশেষ তুলে দেয়া হলো ঃ

"আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার।
মাঝা দুলায়ে চলে যাব ভব নদী পার॥
শুনরে ভাই বিবরণ, লবদ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বলতে নাহি পারি।
কোরানেতে বয়েদ আছে, দুনিয়াটা ক্যাবল মিছে
খোদার নাম বিনে জানবা সকলি ঝকমারি॥
ব্যানে বিকেলে দুপহরে, গরু-ছাগল সাথে করে,
নমাজ পড়াবা মলডা করে স্থির।
মুখ খামচে বুক খামচে বিবিরে ভেসে যাচ্ছে হিয়ে
খসম যদি থাকত কাচে পুঁচতো নুমাল দিয়ে।
পিড়েয় বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আঁসির জলে।
মোল্লারে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে ॥

অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক মোহনলালকে উদারচিত্তের স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক হিসাবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক 'রিয়ায্-উস-সালাতীন' মোহনলালের চরিত্র সম্পর্কে বলেন, "এই অখ্যাত ও উদ্ধত কায়স্থ-নন্দন রাজা মোহনলাল সিরাজের দেহে ও মস্তিষ্কে সাপের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে বসেন, এবং পুরাতন কর্মচারীদের বরখাস্ত করে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিগণকে নওয়াবী খাস-তালুকসমূহ ও রাজস্ব বিভাগের সকল পদে নিয়োগ করেন। এ থেকেই সহজে ধারণা হবে, কায়স্থকুল নবাব সিরাজের অর্থাৎ মুসলিম শাসনের পতনের জন্য কিরূপ কুশলী ও ধুরন্ধর ছিলো। শাহী আমলে কিভাবে তাদের প্রতিপত্তি বর্ধিত করেছিলো। হিন্দু সাহিত্যিক নবীন সেন মোহনলালকে নিয়ে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদেরকে ডেকেছেন এভাবে ঃ

দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে ডবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ
যদি ভঙ্গ দাও রণ-
মনেতে জানিও স্থির
রবে না কাহারও শির-
সবান্ধবে যেতে হবে সমন সদন।

এই হিন্দু বাবুদের সাহিত্যের পাতায় এরূপ বহু মুসলিম বিদ্বেষী উক্তি ছড়িয়ে আছে। মুসলমানেরা ভারত প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর শাসন করেছেন। এঁদের সাহিত্যকর্মে এ ধরনের কুৎসিত ও রুচিহীন উপাদান স্থান পেয়েছে কি-না আমার জানা নেই; বরং মুসলমানেরা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে অনুবাদ কাব্য প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অথচ এরূপ জঘন্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করা দূরে থাক সাহিত্যাঙ্গনে কলম চালানোর মতো মুসলিম লেখকের অস্তিত্বও তখন ছিলো না।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এদেশে মুসলিমদের অনেক বীরত্বগাঁথা কাহিনী থাকা সত্ত্বেও এ নিয়ে কোন উপন্যাস গ্রন্থ লেখা হয়নি। একটি ঐতিহাসিক ধর্মীয় উপন্যাস লেখা হয়েছিল 'বিষাদ সিন্ধু', শেষ দিকে রচিত হয়েছিলো তৎকালীন মুসলিম সমাজের চালচিত্র নিয়ে একটি সামাজিক উপন্যাস 'আনোয়ারা'। গ্রন্থ দু'টি তখন মুসলিম সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো।

'বিষাদ সিন্ধু' বইটি কবির কল্পনায় যেভাবে অতিরঞ্জিত বা চিত্রিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা সত্য ঘটনার সাথে অনেকাংশে সম্পর্কহীন। অথচ বাংলার বহু মুসলমান এটাকে সত্য ইতিহাসই মনে করে। বিষাদ সিন্ধুতে যুদ্ধের মূল কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে একটা বিবাহ সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এর মূল কারণ ছিলো ইয়াজিদের অবৈধ খেলাফতির স্বীকৃতি না দেয়া যা আমরা রাজনৈতিক কারণ বলে জানি। আর যখনই ইমাম হুসাইনের চরিত্রকে উল্টোভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তখনি এই উপন্যাস লেখার পেছনে লেখকের হয়তো দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। প্রথমটি হলো তৎকালে এদেশে ইসলামী সাহিত্যের খুব অভাব ছিলো। মীর মশাররফ হোসেন সে অভাব পূরণের জন্য হয়তো বিষাদসিন্ধু রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামকে মিথ্যা ধর্ম হিসাবে প্রমাণ এবং ইসলামের মহান ব্যক্তিদেরকে চরিত্রহীন হিসাবে সমাজের সামনে তুলে ধরা। এরূপ সন্দেহ করা অমূলক নয়। কারণ বইটিতে পৌত্তলিক শব্দের ছড়াছড়ি অসহনীয়। এছাড়া ইংরেজ সরকার যখন দেখলো মীর মশাররফ হোসেনের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে তখন তারা একটা ব্যবস্থা করলো যা হয়তো অনেকেই ভেবে দেখেন না। তা হচ্ছে এই যে, তৎকালিন বাংলাদেশের প্রায় এক লাখ গ্রামের প্রতি গ্রামে যেন ২/৪ খানা বিষাদ সিন্ধু পৌছে যায় এবং এই বইটিকে যেন মুসলমানেরা একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে। এ জন্যে যত প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দরকার ছিলো তা তৎকালিন সরকার করেছেন। প্রতি গ্রামে কমপক্ষে দু'খানা করে বই পৌছালেও ২ লাখ বইয়ের দরকার হয়েছিল। সে সময়ে এটা যে একজন লেখকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব ছিলো না তা বলাই বাহুল্য। কারবালার ঘটনাটিকে নিয়ে একদিকে হিন্দু বাবুদের লেখা মনসা বিজয়, মনসা মঙ্গল, পদ্মাপুরাণ অন্যদিকে মীর সাহেবের এ বিষাদ সিন্ধু মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিনষ্ট এবং বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট ছিলো।

মরহুম নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্নের 'আনোয়ারা' বইটি তখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। তৎকালে ভালো বইয়ের আকাল ছিলো। 'আনোয়ারা' বইটি কিরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন মখদুমী লাইব্রেরীর প্রকাশক আলহাজ্ব খান বাহাদুর মোবারক আলী 'আমাদের পরিচয়'

স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে 'আনোয়ারা' উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"সে সময়ে পাড়া গাঁয়ে সন্ধ্যার পর গ্রামবাসীগণ হয়তো কোন বৃদ্ধলোকের নিকট গিয়া গল্প শুনিত অথবা তাস পাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। কিন্তু যে গ্রামে একখানা 'আনোয়ারা' পুস্তক গিয়াছে সেখানে সকলে অবাক হইয়া 'আনোয়ারা' কেচ্ছা শুনিতো। তাহাতে পুস্তকটি প্রচুর বিক্রয় হইতে থাকে। এই 'আনোয়ারা' পুস্তকে দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার আগ্রহ আনায়।"[৮]

'আনোয়ারা' গ্রন্থটির কাহিনী বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারকে নিয়ে। এই বইয়ের কাহিনী ততোটা জোরালো বা ভাবাদর্শে ততোটা গভীর নয়, তবুও বইটি এই দেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানদের উদ্বেলিত করেছিলো। মনের ক্ষুধা মিটিয়েছিলো তপ্ত বালু রাশিতে সদ্য ঝরে যাওয়া এক পশলা বৃষ্টির মতো। জানিনা এসব দেখে সাম্প্রদায়িক হিন্দু সাহিত্যিক বাবুরা হেসেছিলো কি-না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হেসেছিলো। তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ করায়।

নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় দেড় বছর আগের এক ঘটনার বিবৃতি প্রসঙ্গে ৫ বর্ষঃ ১১-১২ সংখ্যা ঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০-এর 'ইসলাম ও প্রচারক' পত্রিকায় সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'মুসলমান ও হিন্দু লেখক' শিরোনামে এক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমুসলিম লেখক, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান শিক্ষক সমিতির কলকাতা মহানগরীতে যে অধিবেশন হইয়াছিল- যথায় ভারতের যাবতীয় গণমান্য শিক্ষিত পদস্থ মুসলমানদিগের পক্ষ হতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজ-হিতৈষী খ্যাতনামা জমিদার মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষে'র বিরুদ্ধে একটি রেজলিউশন পেশ করেন। পরে এই রেজলিউশনটির বিবৃত বিষয় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া "ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন্ বেঙ্গল" (Vernaculer Education in Bangal) নাম দিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করা হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলেও, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই। .... বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম মহারথী অত বড় নামজাদা কবি মাননীয় রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতী' পত্রিকায় সমালোচনা উপলক্ষে উহা একরূপ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।"[৯]

মুসলমানদের এহেন দুর্দিনের সময় চারদিক আলো করে, নতুনের জয়কেতন উড়িয়ে, হাত উঁচিয়ে, গা-দুলিয়ে, মাথায় একরাশ ঝাঁক্ড়া চুল ঝাঁকিয়ে, হিন্দু বাবুদের হাসিমুখ কালো করে, বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে উল্কার মতো কাজী নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হন। পরাধীন জাতির কানে অভয় মন্ত্র ও আশার বাণী উচ্চারণ করে কাজী

৮। আলহাজ্ব খান বাহাদুর মোবারক আলী, আমাদের পরিচয়, প্রথম সংস্করণ।
৯। শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৬২-৬৩

নজরুল গাইলেন ঃ

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এলো ঐ,
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর-রে।

তাঁর এই আহবানে মুসলিম সমাজে আশার সঞ্চার হলো। তাঁর কবিতা, তাঁর গান আর গানের অপূর্ব সুর মূর্ছনায় তরুণ চিত্তকে উদ্বেলিত করলো। দেশ, দেশের আপামর মানুষ জেগে উঠলো, মেতে উঠলো। প্রাণ বন্যায় ভেসে গেলো দেশ। উল্কার মতো কবি নজরুলের আবির্ভাব কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দু সাহিত্যিকদের জন্য ছিলো যেন কষে একটি চপেটাঘাত।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বাংলা সাহিত্যের এই অন্ধকার যুগে কবি নজরুল এসেছিলেন আলোকবর্তিকা হয়ে। মরহুম আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় ঃ

"এটা অবধারিত সত্য যে, কবি নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ না করলে অন্ততঃ বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ এরা আজিকার জয়যাত্রার অগ্রগতি থেকে সম্ভত এক শতাব্দী পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হতো। নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দরী হাঁক মেরে, ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন, মুসলিম বাংলার ভাংগা কিল্লায় নিশান উড়িয়েছিলেন। একদিনে দূর করেছিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা, মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনে এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবের এক ইমাম নজরুল ইসলাম।"[১০]

নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্যের ধারা কিভাবে মোড় নিয়েছিলো এ সম্পর্কে ডঃ এনামুল হক বর্ণনা করেছেন এভাবে-

"নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা রাবীন্দ্রিক যুগের অবসান ঘোষণা করিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো যুগের অবসান একদিনে ঘটে না, কিছুদিন প্রাচীন যুগের চলিতে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। 'নজরুল যুগে' হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এই সত্য সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[১১]

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ তৎকালীন মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র জানিয়ে কাজী নজরুলের কাছে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেন। কাজী নজরুল ইসলাম তিন বছর পর পত্রের জবাব দিয়েছিলেন। তবে ডাকযোগে নয়। মাসিক পত্রিকা সওগাতের মাধ্যমে। এই পত্রের মাধ্যমে তৎকালে বাংলা সাহিত্য নিয়ে নজরুল কি ভেবেছেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র পত্র এবং নজরুলের জবাব দুটোই মাসিক পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে। সুদীর্ঘ পত্রের এক স্থানে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন ঃ

১০। মধ্যবিত্তের সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতি রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, পৃঃ ৩৮৬, ৩৮৭
১১। ডঃ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৩৫০

ভাই নজরুল ইসলাম,
তোমায় কখনো দেখিনি। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগ ঘটে উঠে নাই,- দূর হ'তে শুধু তোমার লেখা প'ড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে এ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি।, "প্রভো, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ, ওকে রক্ষা ক'রো- সমাজকে দিয়ে ওর কদর ক'রে নিও।"
.... আজ তোমায় কয়টি কথা বলব,- গুরুরূপে নয়, ভাইরূপে, ভক্তরূপে। ... কথাগুলি বুকের তলে অনুদিন তোলপাড় করছে। ... আমি আগেই বলেছি, বাঙ্গালার মুসলিম সমাজ কাঙ্গাল শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙ্গালার অমুসলিমরা তোমার যে কদর করেছেন, মুসলিমরা তা করে নাই, করতে শেখেন নাই। একথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু-মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু শুধু নিন্দায় ফায়দা কি, শুধু আস্ফালনে ফল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র; তাই ভেবে তাকে কখনও স্নেহের হাত বুলিয়ে, কখনও জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর সমাজের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি। তাই এবার সমাজকে ছেড়ে তোমার দিকে ফিরছি। সমাজ মরতে বসেছে; তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী সুধা,- কে সেই সুধার হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন্ সুসন্তান আপন তপোবনে গঙ্গা আনয়ন করে, এ অগণ্য সাগর গোষ্ঠিকে পুনর্জ্জীবন দান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কে জানিনা; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা ভান্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, তোমার অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ ক'রবে কি?
.... বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দরিদ্র, সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে বেশী আত্মভোলা তোমারই ভাই এই মুসলিমগণ! আর বাঙ্গালা সাহিত্যে সবচেয়ে অবহেলিত, সবচেয়ে কলঙ্কিত, সবচেয়ে নিন্দিত, কুলিখিত বিষয় ইসলাম। ইসলামী শাস্ত্র, সাহিত্য, সভ্যতা, ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যে হয় নাই, না হয় বিকৃতরূপে আছে। যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি 'এই সব মূক ম্লান মুখে' ভাষা দিবেন, 'এই সব ভগ্ন শ্রান্ত বুকে' আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্য স্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দেবেন, অমুসলিমের বুক হতে ইস্‌লাম অশ্রদ্ধা দূর করতঃ হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনিই হবেন বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠতম দেশ-হিতৈষী, তিনিই হবেন বাঙ্গালা মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত। তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার; তুমি সেই মহাগৌরবের আসন দখল করতে পার, তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতম রূপে সার্থক করতে পার।
..... তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই, কাঙ্গাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই দিকে, পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও; তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণরাগিনী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আবেগের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হউক, ইসলামের মহান উদার উচ্চ আদর্শ তোমার কবিতায় মুক্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহাগীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমিন।

"ইব্রাহীম খাঁ"

নজরুল চিঠির উত্তরে লিখেছেন ঃ

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান সাহেব!

..... বাঙ্‌লার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কিনা জানিনে, মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহু দিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবে যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার ব'লে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের- আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি! অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তা হ'লে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য, কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু সভা'ওয়ালা আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদেরে আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তা'ছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,- আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

... সকলে জাগাবার কাজে আমায় আহবান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহবানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি- শুধু যে লিখে, তা নয়- আমার জীবনী ও কর্ম্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি- লিখেছি, বলেছি, চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনো দিন হয়েছি, এ বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশ-সেবার, সমাজ সেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। এই সে-দিনো পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি,-

"Behold, I do not give a little charity

When I give, I give myself."

তা'হলে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না....।

আপনি সমাজকে "পতিত, দয়ার পাত্র" বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মন করি- কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ সমাজ সর্ব্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর

দোষ-ত্রুটির আলোচান করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয় ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইঁট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয়, জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভালো করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে উঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসাকে। হাতুড়ে ডাক্তার হয় ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশী হয়ে উঠার কথা। কিন্তু বেচারা 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র-চিকিৎসক তা বিশ্বাস করেনা। সে বের করে তার ধারাল ছুরি, চালায় সে ঘায়ে অস্ত্র; রোগী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্ত্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ ত হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মতো শক্ত চামড়া যাদের নেই, তাদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতী দলকে। এ সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাঁদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট আর মার সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা-বতাজা'র গান।

.... এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়, পুশ্‌কিন, দস্তয়ভস্কি, হুইটম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে, এই ত আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি, সে গানে হয় ত রূপ-রং ফুটে উঠেনি আমি ভাল রংবেজ নই বলে; কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মতো নীচতা মানুষের কেমন করে আসে। অথচ এইসব গালাগালির বিপক্ষে কোন প্রতিবাদও ত হ'তে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনে সূর্য ওদের শর নিক্ষেপ মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না- আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্ততঃ আমি ত জানি, আমার এই ত চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই ত সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবী ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চল্‌তে যদি নাই দেয়, কাঁটার পথেই চল্‌ব সমস্ত মারকে সহ্য ক'রে। অন্ততঃ পথের মাঝ পর্যন্ত ত যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে মালার অবমাননাই বা কর্‌ব কেমন ক'রে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই কর্‌ব- পথে চলার তপস্যা।

.... আপনার 'মুসলিম সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা

তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুস্‌লিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা কর্ম্ম থাক্‌বে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্ম্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চল্‌বে না; ইসলাম কেন, কোন ধর্ম্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে ব'লে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি ত স্বীকার করিই, যাঁরা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র ক'রে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র করি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইস্‌লামের এই মহিমা গানই করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও না। তা হ'লে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠ্‌লে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি- কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও-

"আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাবে ভব নদীর পার।"

রীতিমত কাব্য! বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বল্‌তে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হ'ল, মাজাও দুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল! যাক, বাঁচলনা কেবল কাব্য! সে বেচারী ভবনদীর এ-পারেই রইল প'ড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে- মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দুলাও; পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল-বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি- আর এরাই শতকরা নিরানব্বইজন- তারা বলে কমল-বন টমল-বন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেও ভি আচ্ছা- কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ অবস্থায় কি করব, বলতে পারেন? আমি 'হুজ্জতল ইস্‌লাম' লিখ্‌ব, না সত্যিকার কাব্য লিখ্‌ব?

এরা যে শুধু হুজ্জতুল ইস্‌লামই পড়ে, এ আমি বল্‌ব না; রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়ছে,-

"ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ্দ হাঁটিয়া চলিল"

অথবা

"লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার
শুমার করিয়া দেহি পঞ্চাশ হাজার।"

আর এই কাব্যের চরণ পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত-

"কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া
আর লড়ির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল হামারা ঘোড়া"
পড়তে পড়তে আনন্দে গদ্‌ গদ্‌ হয়ে উঠেছে।

বিদ্রুপ আমি করছিনে বন্ধু, এ আমার চোখের জল জমানো হাসির শিলা বৃষ্টি!

সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তা হলে

তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি; কিন্তু আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কিনা, সেইটাই যে বড় প্রশ্ন। .... আবার বলি, যাঁরা মনে করেন আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে-সব কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে- তাকে ইসলাম বলে না- মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে- এ ছাড়া আমার আর কি বলবার থাকতে পারে?

..... জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান-বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।.....[১২]

- নজরুল ইসলাম

কবি নজরুল বাংলা সাহিত্য নিয়েই শুধু ভাবেননি; তৎকালীন 'বিশ্ব সাহিত্য' নিয়েও ভেবেছেন। তাঁর এই ভাবনার মাঝে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা অসাধারণ। 'বর্তমান বিশ্ব ও সাহিত্য' শিরোনামে একটি রূপক রচনায় কবি লিখেছেন ঃ

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দু'টি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত, মিল্টনের Birds of Paradise-এর মত এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না; কেবলি ঊর্ধ্বে-আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইভাবে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে- অন্ধকার নিশীতে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে- তরুতলা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে- তেমনি করে এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে ঃ স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব, আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ-ঔদ্ধত্যে সুর-লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন ঃ অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে ঃ আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রুকুটি হেনে বলেন ঃ দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনোকালেই টেকেনি। নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে ঃ কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই ত চাই, দেবতা! আমরা তা তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই-দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েট্স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি Dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে প্রভৃতি। আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

১২। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৬৯৪-৭০৭

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পক্ষীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা। তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাজরাণী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী- কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গান খানি একলা ঘরে বসে বসে গায়- তার দুঃখিনী মাকে শোনায়। - তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে- লিওনিদ, আঁদ্রিভ, ক্লুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল, রেমদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এরাও পান করেছেন, এরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী- তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন ঃ এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল-নল্‌চে দুই বদ্‌লে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি, নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেনঃ

> A thing of beauty is a joy for ever, (ENDYMION)
> Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন ঃ

> Not physiognomy alone-
> Of physiology from top to toe I sing.
> The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুন্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হল না, সেই capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ত-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রজার পাইন যমরাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, লক্ষ-সেনা দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই- তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব- বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণালঙ্কারও পুড়ছে- এ আপনারা যে কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দূরবীনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে।

সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে- তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না-এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লংকা ডিঙাতে হবে। অবশ্য বড় বড় পেট যাদের, তাদের বলছিনে, হয়তো তাতে করে তাদের মাথা হেঁটই হবে।.....

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম' পড়ে 14th December ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 14th December- এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-র বেদনা-চিৎকার "14th December!" এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ সম্রাট নিকোলায়ের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাচিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস। এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি। এই দিনই নির্যাতনের কংস কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু। বীণাবাদিনী সরস্বতী এইদিন বীণা ফেলে খড়গ হাতে চামুন্ডা-রূপ পরিগ্রহ করে। এর পরই পাতাল ফুঁড়ে আসতে লাগল দলে দলে অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল। কেতকী-বিতানের শাখায় শাখায় দুলে উঠল বিষধর ভুজঙ্গের ফণা।

এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির Crime and Punishment। রাস্কলনিকভ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বলল, "I bow down not to thee, but to suffering humanity in you!" সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল-মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে Noah-র তরণীর মত ভাসতে লাগল সৃষ্টি- প্লাবন শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙ্গে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করল। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে ঃ তোমার সৃষ্টির জন্যেই আমার এ তপস্য। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন ঃ That man has only one God and that is Satan! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারল না। গোর্কি বললেন ঃ দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হবো না- আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।

'লক্ষ কণ্ঠে গুরুজীর জয়' আরাবে বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠল। নির্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নীচের ফণিনীর মত মোচড় খেয়ে উঠল। দূর সিন্ধু তীরে বসে ঋষি কার্লমার্ক্স যে মারণ-মন্ত্রী উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে ভক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করল। জার গেল-জারের রাজ্য গেল-ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মত গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়তো বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তার প্রভাব আজ রুশিয়ার আকাশে বাতাসে। কার্ল মার্ক্সের ইকনমিকস-এর অংশ এই জাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অংকলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পান্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণামাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে

কি না তা আজও বলা দুস্কর।

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যান্ডিনেভিয়া। আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবী রাশিয়া যেমন করে তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানীর এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবী করে।

আজকের নরওয়ের ক্লুট হামসুন, সোহান বোয়ার- শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানস-পুত্র। হামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের 'গ্রেট হাঙ্গার'-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তার The Prisoner who Sang-এর নায়ক যেন পাপে পুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত স্তবের আকুতি। যে করুণ সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এদের লেখায় সিন্ধু তীরের উইলো তরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে- তার তুলনা কোন কালের কোন সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃখ-বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে- মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছেন Revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা; স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি; নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ- বেদনাকে পুরুষ-শক্তিকে অতিক্রম করবো, ভূজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা কর। উর্ধ্বে আঁখি তোলো! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত- তিনি কখনো তার এ অপমান সহ্য করবেন না।

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোন অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রুপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রুপ হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মত, জাবালির মত, দুর্বাশার মত দাঁড়িয়ে ভ্রুকুটি-কুটিল বার্নার্ড শ' আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিতো বেনার্ভাঁতে। তাদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড। শ' বলেন ঃ লাভ-টাভ কিছু নয়- ও হচ্ছে মা হবার instinct মাত্র, ওর মূলে seal আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, কি হে ছোকরারা, খুব তো লিখছ আজকাল। বলি, ব্যালজ্যাকজোলা পড়েছো?

বেনার্ভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Lonardo-র মুখ দিয়ে বলে ঃ 'বন্ধু! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল- তাকে ভুলতে হলে ভাল করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাংখা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়- সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে, তবে তার মরাই মঙ্গল।'

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল- শাহজাহানের মোমতাজকে ভাল করে কবর দিয়ে, ভাল করে ভুলবারই চেষ্টা।

বেনার্ভাঁতে হাসে, সে নির্মম ঃ কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মত অবিশ্বাসী নয়।

এরই মাঝে আবার দু'টি শান্ত লোক চুপ করে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে- তাদের একজন ওয়াদিশল রেমন্ট-পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা-ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চমকে উঠে শুনি- আবার যুদ্ধ বাজনা বাজছে।- এ যুদ্ধ বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাত্যের। দেখি তালে তালে পা ফেলে আসছে- সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালীর দ্যু-অনন্‌থসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী "The sound of the bell that leaves the bell itself" তারপরেই সে বলে ঃ 'আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেয়ার জন্য আমার এ গান শোনা।' শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়! স্বপ্নে শুনি- পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশি,- তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মত দেহ!

তখনো চারপাশে কাদা- ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি- "Thou wast not born for death, immortal bird!"[১৩]

কবি নজরুল শুধু তৎকালীন দেশীয় সার্বিক প্রেক্ষাপট নিয়েই বিচলিত ছিলেন না; আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়েও ছিলেন বিচলিত। তিনি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতোটা সচেতন ছিলেন এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন উল্লেখিত লেখার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে।

সাহিত্য যদি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতীক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র কবি নজরুল অসাধারণ প্রতিভার মাধ্যমে সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন সাহিত্য কর্মে। তিনি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের স্বপক্ষে যেমন জয়গান গেয়েছেন; ঠিক তেমনি অসত্য, অসুন্দর ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার ও উচ্চকণ্ঠ। তাই কবি নজরুল দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

> "আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের।"[১৪]

সুতরাং প্রকৃত সাহিত্যিকদের ধর্মই হলো তাদের সৃষ্টিকর্মে জাতির ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমাজের বাস্তব চিত্র ও অসঙ্গতি তুলে ধরা। আঙ্গুল দিয়ে জাতিকে দেখিয়ে দেয়া। জাতিকে মেধা ও মননে গড়ে তোলা। জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো বা জিইয়ে রাখা প্রকৃত ও সৎ কবি-সাহিত্যিকদের কর্ম নয়। কবি-সাহিত্যিকেরা যেমন একটি জাতিকে গভীর অরণ্যে অথবা অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিতে পারেন; ঠিক তেমনি গভীর অরণ্যে পথহারা জাতিকে দিতে পারেন সঠিক পথের সন্ধান অথবা অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত জাতিকে হাত ধরে উঠিয়ে দিতে পারেন আলোর সন্ধান। কবি নজরুল তাঁর সাহিত্য চর্চায় এই প্রয়াস চালিয়েছেন অত্যন্ত নিরলসভাবে। দেশ ও জাতিকে উন্নত

১৩। নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড (যুগবাণী), পৃঃ ৬৩০-৬৩৩
১৪। জাতীয় সম্বর্ধনায় নজরুলের প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

সভ্যতায় পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন কবি নজরুল তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের মাধ্যমে। সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ চিরতরে উৎখাত করতে চেষ্টা করেছেন অবিরাম। সাহিত্য দল-মত নির্বিশেষে সবার সুখ-দুঃখের কথা বলবে- এটাই ছিলো কবি নজরুলের ঐকান্তিক ইচ্ছে। কিন্তু গত ২৪২ বছর যাবত এদেশে সাহিত্যের নামে যা চলছে তাকে ইত্‌রামি ও নোংরামি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। একদিকে বারো চাঁদের ফজিলত, মুকছুদুল মুমেমীন, জয়গুন বিবির কিচ্ছা প্রভৃতি বইয়ের মধ্যে ইসলামী সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে এইসব বই পড়ে যারা ইসলামী বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে ধর্মান্ধ হয়েছে তাদেরকে উপলক্ষ করে মানবতার মহান ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ব্রাক্ষণ্যবাদী চক্র সাহিত্যসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে চতুর্মুখী আগ্রাসন চালিয়েছে। কবি নজরুল এইসব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জিহাদ করে গেছেন তার সৃজনশীল সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে : ঘুমন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের জাগাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর বিপ্লবী গানে- কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে ও বক্তৃতায়। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাক্ষণ্যবাদী শক্তির কাছে কবি নজরুল আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তাদেরই কৌশলগত চক্রান্তের নীতিমালার ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট এদেশীয় ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও কাঠমোল্লাদের কাছে নজরুলের সাহিত্য ছিলো অসহ্য। যার জের এখনো চলছে।

ভিক্ষা দাও! ওগো পুরবাসী ভিক্ষা দাও। তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও। আমাদের এমন একটি ছেলে দাও যে বলবে আমি ঘরের নই, আমি পরের। আমি আমার নই, আমি দেশের।

–কবি নজরুল

হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে
নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই.....
বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়,
ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধনং
শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজন্ম নিরাকার (একেশ্বর) ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। তাঁর বিশ্ব ভারতীয় চত্বরে মূর্তি রাখা অথবা মূর্তি পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো। তবুও তিনি কবিতার আবহে এবং অনুষঙ্গে প্রায় সর্বদাই হিন্দু দেব-দেবী এবং হিন্দু পুরাণকেই এনেছেন, সার্থকভাবে তাঁর কবিতার ভাবমূর্তিতে রূপায়িত করার জন্যই। অবশ্য তিনি মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র এবং তাঁদের ধর্মীয় কাহিনী, ইতিহাসের অনুষঙ্গকে লেখা ও কবিতায় রূপায়িত করেননি। কেন রূপায়িত করেননি, এর কৈফিয়ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ঃ

> "ধর্মমতে হিন্দুর বাঁধা প্রবল নয়, কিন্তু আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাঁধা প্রবল নয়, কিন্তু ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের দ্বার যেদিকে খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ।"[১]

অর্থাৎ মুসলমানদের সমালোচনার ভয়ে তিনি না-কি মুসলমানদের ধর্মীয় কাহিনী ও ইতিহাসের অনুষঙ্গকে তাঁর লেখায় রূপায়িত করেননি। মুসলমানদেরকে এড়িয়ে যাবার রবীন্দ্রনাথের এটা নিছক একটি খোঁড়া যুক্তি। সমালোচনার ভয়ে তিনি মুসলিম শাসকদের গৌরব কথা তাঁর সাহিত্যে স্থান না পেলেও তাদের চরিত্রে কলংকে লেপনে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন কৃপণতা করেননি, বিরত থাকেননি। প্রকৃত পক্ষে এর রহস্য অনেক গভীরে। ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে।

ঐতিহাসিক কল্যাণ চৌধুরী তাঁর ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> "…. মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজ রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল। মুসলমানদের সম্পর্কে অমুসলমানদের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগ্রত করার জন্য তারা মুসলমান শাসকদের পরধর্মপীড়ক রূপে চিত্রিত করেছিলেন যাতে এ দেশের অমুসলমানদের ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সহযোগী হিসাবে পেতে পারে এবং এ দেশের অমুসলমানরা বৃটিশ শাসনকে

১। কালান্তর, পৃঃ ৩১৩।

বিধাতার আশির্বাদ বলে ভাবতে পারে। ইংরেজ তার নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে মুসলিম শাসকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবার কাজে হাত দিয়েছিল। মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে ইংরেজের সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল প্রশাসনের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চবর্ণের আমলারা। এরা নতুন নতুন প্রভুর চাটুকারিতায় সকলকে ছাড়িয়ে গেল। ইংরেজও শ্বেতাঙ্গ ও আর্য হওয়ার কারণে গৌরবর্ণ দেশীয় আর্য ব্রাহ্মণদের প্রশাসনে অগ্রাধিকার দিল। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ ইংরেজ শাসনে শুধু অটুটই রইল না বরং তা একাধিপত্য স্থাপন করে বসলো। এ জন্য বাংলার ব্রাহ্মণরা ইংরেজ বিরোধিতায় তৎপর না হয়ে মোগল-পাঠান বিরোধের ন্যায় মধ্যযুগে যে মোগল রাজপুত, মোগল-মারাঠা বিরোধ ঘটেছিল তাকে হিন্দু মুসলিম-বিরোধ হিসাবে চিত্রিত করে দেশে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি করলো। প্রতাপ ও শিবাজীকে তারা হিন্দু জাতির 'হিরো' হিসাবে চিত্রিত করলেন। যা আদৌ সত্য ছিল না।"

"শিবাজী আওরঙ্গজেব সংঘর্ষকে কেউ কেউ ধর্মগত কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর সমর্থনে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। ধর্মগতভাবে আওরঙ্গজেব যে মারাঠাদের বিরোধিতা করেছিলেন তারও প্রমাণ মেলেনি। শাহজী ভোঁসলে এবং তাঁর পুত্র শিবাজী নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন বলেই মোগল শক্তির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেঁধেছিল।"[২]

শিবাজীকে ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিকরা গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হিসেবে চিত্রিত করেন। তাঁকে ইসলামের বিরুদ্ধে সনাতন ধর্মের রক্ষক হিসাবে চিত্রিত করা হয় অথচ এটাও প্রকৃত চিত্র নয়। কল্যাণ বাবু লিখেছেন ঃ

'হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবে শিবাজীর দাবীকে আধুনিক ঐতিহাসিকরা মানতে রাজি নন। শিবাজী হিন্দু ধর্মোদ্ধারক উপাধি গ্রহণ করলেও আশেপাশের হিন্দু অধিবাসীদের মারাঠা আক্রমণ থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।'[৩]

ব্রাহ্মণরা মানুষে মানুষে সমতার নীতিতে বিশ্বাসী নয়; তাই অশোকের সাম্যনীতি তাদের পছন্দ হয়নি। কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে তারা সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধরাজ খতম করার জন্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করেন। খৃষ্ট-পূর্ব ১৮৪ খৃষ্টাব্দে পুষ্য মিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ মৌর্য সেনাপতি বৃহদ্রনকে হত্যা করে মোর্য সিংহাসন অধিকার করেন। ইতোপূর্বে ব্রাহ্মণরা কখনও সরাসরি সিংহাসনে বসেননি। সিংহাসন দখল করার পর ব্রাহ্মণরা অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করেন, শুরু করেন ভয়ংকর বৌদ্ধ নির্যাতন। এই ব্রাহ্মণ রাজত্বকালেই মনুস্মৃতিকে চালু করা হয় এবং এর নাম দেয়া হয় মানধর্ম শাস্ত্র। অথচ এত বড় শূদ্রবিরোধী, মানবতাবিরোধী শাস্ত্র দুনিয়াতে আর কোথাও কখনও রচিত হয়নি।

অনুরূপ অবস্থা ঘটেছিলো শিবাজীর আমলেও। মোগলদের বিশেষত আওরঙ্গজেবের ইসলাম-প্রভাবিত মানবীয় শাসন ব্রাহ্মণদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিলো। তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। ইসলামের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থা বৌদ্ধ জীবন ব্যবস্থার

২। অরুণ মাল, রুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র শিবাজী, দ্রষ্টব্য ঃ মাসিক সফর, এপ্রিল '৯৩।
৩। পূর্বোক্ত।

মতোই তাদের আশংকার কারণ হয়েছিলো। কিন্তু এটাই এদেশের অব্রাহ্মণ জনতার জন্য আশার আলো স্বরূপ ছিলো। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আন্দোলনসমূহ শিবাজীকে তাদের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যবহার করে। শিবাজী যখন মোগলদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সফলতা লাভ করে তখন ব্রাহ্মণদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরা তাঁকে রাজা হিসাবে মানতে রাজী হয়নি। কারণ শূদ্রকে রাজা হিসাবে মান্য করা মনুশাস্ত্রবিরোধী। শিবাজী তাঁকে ক্ষত্রিয়ত্ব দান করার জন্য ব্রাহ্মণদের নিকট অনুরোধ জানান। কারণ ইতোপূর্বে ব্রাহ্মণরা স্ব-স্বার্থে শূদ্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করেছেন এমন প্রমাণ আছে। উত্তরে ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'সেটা পূর্বে হয়ে থাকলেও কলিযুগে শূদ্রকে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করা যাবেনা।' শিবাজী তখন একজন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে ক্ষত্রিয়ত্বের সার্টিফিকেট লাভ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাঁকে জাল সার্টিফিকেট নাম দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। এই দ্বন্দ্বের ফলেই পরে মারাঠা রাজ্যে পেশোয়াতন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে। পেশোয়ারা ছিল ব্রাহ্মণ। ফলে, দেশে আবার ব্রাহ্মণ্য শাসন কায়েম হয়।

পেশোয়াদের শাসনামলে অচ্ছুতদের দূরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডাঃ আম্বেদকর লিখেছেন ঃ "পেশোয়াদের আমলে মারাঠা রাজ্যে অচ্ছুতদের সাধারণ রাস্তায় চলবারও অধিকার ছিলো না, যদি সে রাস্তায় কোন হিন্দু আসে পাছে তার ছায়ায় হিন্দু অপবিত্র হয়ে যায়। অচ্ছুতকে তার হাতের কব্জী অথবা ঘাড়ে কালো সূতো পরতে হতো নিজকে চিহ্নিত করার জন্য, যাতে হিন্দুরা ভুলক্রমে অপবিত্রতার লীলাক্ষেত্রে ঢুকে না পড়ে। পেশোয়াদের রাজধানী পুনায় অচ্ছুতদের কোমরে ঝাঁটা দড়ি ঝুলিয়ে চলতে হতো, যাতে তার চলা পথের ধুলো সাফ হয়ে যায়। অন্যথায় সে পথের ধুলো মাড়িয়ে হিন্দু অপবিত্র হয়ে যেতে পারে। পুনাতে অচ্ছুতকে মাটির ভাড় গলায় ঝুঁলিয়ে চলতে হতো থুথু ফেলার জন্য। কারণ তার থুথু মাটিতে পড়ে গেলে তা অজান্তে মাড়িয়ে কোন হিন্দু অশুচি হয়ে যেতে পারে।"[৪]

পেশোয়াদের আমলে ব্রাহ্মণরা তথাকথিত ছোটজাত ব্রাহ্মণদের মত আচার-ব্যবহারও করতে দেননি। ভাঁজ করে ধুতি পরা কিংবা নমস্কার বলাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো।

ব্রাহ্মণরাজ কায়েম করার জন্যই ব্রাহ্মণরা শূদ্র শিবাজীকে ব্যবহার করে, কিন্তু কাজের সময় কাজী হলেও কাজ ফুরোলেই তিনি পাজী বনে যান। শিবাজীর পৌত্র শাহু এই চক্রান্ত উপলব্ধি করেন। শাহু আওরঙ্গজেবের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, এমনকি প্রতিবছর তাঁর সমাধিতে বসে শ্রদ্ধাঞ্জলিও অর্পণ করতেন।

ব্রাহ্মণদের জুলুম-অত্যাচারের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। তাদের আমলে বর্গীয় অত্যাচারে বাংলা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়। ভাস্কর পান্ডিত্যের নেতৃত্বে ও অত্যাচারে বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। আজও প্রবাদ-প্রবচনে সে জুলুম বাণীবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

৪। পূর্বোক্ত।

হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের গৌরব ও অহংকার পর্বত মুষিক বলে কথিত রবীন্দ্রনাথের বীর তস্কর লুটেরা শিবাজী

বাংলার গৌরব, বাঙ্গালীর অহংকার বীর ঈশা খাঁ
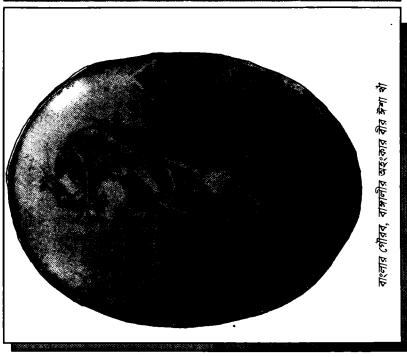
যদি মারাঠা সাম্রাজ্য স্থায়ী হতো তাহলে ব্রাহ্মণরা আবার মনুর শাসন প্রবর্তন করতো। এটা করার জন্যই ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলো।

পলাশীর যুদ্ধের পর তারা কলিকাতায় ক্লাইভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সসম্মানে দুর্গা পূজায় আমন্ত্রণ করে, এমনকি গৌরী দানও করে। ইংরেজকে দিয়ে কার্যোদ্ধারের পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে তারা আবার ইংরেজকে হটিয়ে ক্ষমতার মালিক হয়েছে এবং অব্রাহ্মণ জাতিগুলোকে পিষ্ট করে চলেছে। ব্রাহ্মণরাই শিবাজী উৎসবের নামে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করেছে।

মহারাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে স্বাধীন এক হিন্দু রাজ্য স্থাপনের পর শিবাজী নিজেকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করার জন্য অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে মনস্থ করেন। শিবাজী ও তাঁর সুহৃদবর্গ এ-ও অনুভব করেন যে, অভিষেক বৈদিক রীতি অনুযায়ী না হলে তার আদৌ কোন মূল্য নেই। তাঁর এই বাসনা পূরণ করতে গিয়ে শিবাজী বহু সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি দেখলেন যে, বৈদিক রীতি অনুযায়ী তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে কি-না তা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণদের উপর নির্ভরশীল। ধর্মীয় দিক থেকে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ এ কাজ করার জন্য উপযুক্ত নয়।

শিবাজীর ব্যাপারটা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা প্রমাণ করে যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কারও উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অধিকার নেই এবং ব্রাহ্মণ যদি এটা করতে রাজি না হয় তাহলে তাকে কেউ এ কাজে বাধ্য করতে পারেনা। শিবাজী এক স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসক এবং তিনি ইতোমধ্যেই মহারাজা এবং ছত্রপতি স্টাইলের কাজ শুরু করেও দিয়েছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রজাও ছিলো। অথচ শিবাজী কাউকেও তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করতে বাধ্য করতে পারেননি।

সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেনারসের এক গনাভাট ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করেছিলেন। বেদ ও শাস্ত্র জ্ঞানী গনাভাট সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন রায়গড়ে প্রথমে ব্রাত্য অনুষ্ঠান এবং পরে উপনয়ন করিয়ে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন।

কৌলিন্যের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের সিদ্ধান্ত ছিলো ক্যাথলিক গীর্জায় পাপমুক্তির সার্টিফিকেটের মতোই বিক্রয়যোগ্য পণ্য মাত্র। ব্রাহ্মণরা কখনও রীতি-নীতির ধার ধারে না। তাদের কাছে শাশ্বত সত্য বলে কিছুই নেই।

গঙ্গাভাটের সিদ্ধান্ত যে সৎ ছিলো না তা এই ঘটনা থেকেই সুস্পষ্ট। গঙ্গাভাট ও অন্য ব্রাহ্মণরা সরকারী পুরোহিত হিসাবে সরকারের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা পেয়েছিলেন। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে যে টাকা খরচ হয়েছিল তার কত অংশ গঙ্গাভাট এবং অন্য ব্রাহ্মণরা পেয়েছিলেন- তার হিসাব পাওয়া যাবে শ্রী বৈদ্যের সংগৃহীত বিশদ

কংগ্রেসের অন্যতম নেতা এবং শিবাজী আদর্শে অনুপ্রাণিত সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী

বিবরণ থেকে। এই মন্ত্রীরা উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন এক লাখ করে টাকা, একটা করে হাতী-ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি। অনুষ্ঠানটি তদারক করার জন্য গঙ্গাভাটকে এক লাখ টাকা দেয়া হয়েছিলো। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের অনেকগুলো ঘটনায় শিবাজীর প্রদত্ত দক্ষিণার পরিমাণ ছিলো বিপুল। সভাসদরা বর্ণনা করেছেন যে, অভিষেকটি সম্পন্ন করতে ১ কোটি ৪২ লাখ ৪২৬ টাকা লেগেছিলো। সভাসদরা আরো বর্ণনা করেছেন, শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে ৫০০০০ বৈদিক ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো।

এ ছাড়া ছিলো হাজার হাজার যোগী, সন্ন্যাসী ও অন্যান্য বনী আদম। তাদের ভূঁড়িভোজন করানো হয়েছিলো কিংবা দূর্গের নিচে শয্যাদি দান করা হয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণাদি থেকে জানা যায়, শিবাজীকে রাজ্যাভিষেকের আগে সোনাদানা ও অন্যান্য প্রায় সব মূল্যবান পবিত্র সামগ্রী দিয়ে ওজন করা হয়েছিলো।

ডাচ বর্ণনায় রয়েছে, (১৩৮৪ পর্তুগীজ সনের ৩রা অক্টোবর) রাজ্যাভিষেকের সময় শিবাজীকে ১৭০০০ তংকা দিয়ে ওজন করা হয়েছিলো এবং তাঁকে রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ইত্যাদি ধাতু, কর্পূর, লবণ, চিনি, মাখন, নানা ধারনের ফল, সুপারী প্রভৃতি দিয়ে মাপা হয়েছিলো এবং এসব কিছুর মূল্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিলো। ৭ জুন অভিষেকের পরের দিন সাধারণভাবে দক্ষিণা দেয়া হয়েছিলো এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ৩ থেকে ৫ পেয়েছিলো আর নারী হোক শিশু হোক প্রত্যেকেই ৩, এবং ১, পেয়েছিলো। মোটের ওপর দক্ষিণার পরিমাণ ছিলো দেড় লাখ তংকার সমান। (এক তংকা ৩ টাকার সমান ছিলো)।

Oxendone ও তাঁর ১৮ই মে থেকে ১৬ই জুনের ডাইরীতে বর্ণনা করেছেন যে, শিবাজীকে সোনা দ্বারা ওজন করা হয়েছিলো এবং এই ওজনের পরিমাণ হয়েছিল ১৬০০ তংকা আর এর সাথে যুক্ত করা হয়েছিলো আরও এক লাখ তংকা এবং এসবই দক্ষিণা হিসাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল।

উপরোক্ত ডাচ বিবরণীতে আরও বলা হয়েছিলো যে, ব্রাত্য অনুষ্ঠানে ৭০০০ তংকা গঙ্গাভাটকে দেয়া হয়েছিলো, ১৭০০০ দেয়া হয়েছিলো অন্য ব্রাহ্মণদের। ৫ই জুন শিবাজী গঙ্গাস্নান করেছিলেন এবং প্রত্যেক উপস্থিত ব্রাহ্মণকে ১০০ তংকা করে দেয়া

দেন এবং নিজে পুনরায় বিয়ে করে বিজাপুরে অবস্থান করতে থাকেন। শিবাজী ঐ পূনাতেই জন্মগ্রহণ করেন, পিতা শাহজী বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাহেব চাকুরিতে নিযুক্ত থাকায় পুত্রের দেখাশুনার জন্য শিবাজীর দাদাজী তার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য পন্থ্ নামক একজন ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শিবাজী এত অবাধ্য ও দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল যে, কারও কোনও কথাই সে মানত না। মাত্র সতের বছর বয়সে শিবাজী তার সমবয়সী দলবল নিয়ে কয়েকটি তালুক লুণ্ঠন ও নারী হরণ করে। তখন অভিভাবক হিসাবে নিজের দায়িত্বের জবাবদিহির ভয়ে দাদাজী পন্থ্ বিষপানে আত্মহত্যা করেন।[৭]

ঐতিহাসিক স্যালিভ্যান লিখেছেন ঃ

> "শিবাজী" ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লুণ্ঠক ও হন্তারক দস্যু। আর তিনি যাদের সংগঠিত করেছিলেন সেই মারাঠা জাতি ছিল এমন অপরাধপ্রবণ যে, মুহূর্তের মধ্যে তারা তাঁদের লাঙ্গলের ফলাকে তরবারিতে রূপান্তরিত করে এবং ঘোড়া ধার অথবা চুরি করে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তো, আর এ ব্যাপারে তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য করতো না। মারাঠাগণ হিন্দু হলেও অবৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য তারা অবাধে মন্দির ধ্বংস করেছে, গো হত্যা করেছে এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতকে হত্যা করেছে। যেখানেই তারা গিয়েছে সেখানেই কেবল ধ্বংস ও মৃত্যু রেখে এসেছে।"[৮]

'পার্বত্য মুশিক' বলে কথিত শিবাজী সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ব্যস্ত রেখেছিলেন মারাঠা অঞ্চলে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করার জন্য। যে যুদ্ধে ছিলো না কোন বীরত্বের মহিমা। একবার যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হয়ে নির্লজ্জের মত প্রাণে বাঁচবার জন্যে কৌশল অবলম্বন করে। কথিত আছে, শিবাজী আওরঙ্গজেবকে জানালেন, তাঁর কোন একটি অনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর ফলের প্রয়োজন। আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে কয়েকটি ঝুড়ি বোঝাই ফল শিবাজীকে দেয়া হয়। এই ঝুড়ির একটির মধ্যে লুকিয়ে কাপুরুষ শিবাজী পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আফজাল খাঁর মত একজন সাহসী ও দক্ষ সেনাপতির অধীনে কামানের বহরে সুসজ্জিত দশ হাজার সৈন্যের একটি দুর্ধর্ষ সেনা দল শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। শিবাজী সম্মুখ সমরে মোকাবেলা করতে পারবেন না জেনে আলোচনার জন্য মুসলিম সেনাপতির নিকট এক ব্রাহ্মণ দূত পাঠান। শিবাজী ও ব্রাহ্মণ দু'জনে ষড়যন্ত্র করেন। আলোচনার কথা বলে আফজাল খাঁকে এনে তাঁকে হত্যা করা হবে। এই হত্যায় মারাঠাদের কোন ঝুঁকি নিতে হবে না। আফজাল খাঁ সহজেই ফাঁদে পা দিলেন এবং মাত্র দু'জন সঙ্গী নিয়ে প্রতাপ গড়ের শিবিরে শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আফজাল খাঁ ইসলামী উদারতায় দু'হাত বাড়িয়ে শিবাজীকে বুকে টেনে নিলেন। অমনি শিবাজী তার বাঁ হাতের মারাত্মক 'বাঘ নখ' দিয়ে আফজাল খাঁর পেট

৭। হিস্ট্রি অব বৃটিশ ইনডিয়া, পঞ্চম সংস্করন, ১৮৫৮, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৮৬-২৮৭ ও পৃঃ ২১।
৮। দি প্রিনসেস অব ইনডিয়া, স্যার এডওয়ার্ড সুলিভ্যান, এডওয়ার্ড স্ট্যানফোর্ড, লন্ডন, দ্রষ্টব্য।

ফেঁড়ে ফেলেন এবং ডান হাতের আস্তিনে লুকানো ছোরা দিয়ে আঘাত হানেন। এই অতর্কিত আক্রমণে শত্রু ধরাশায়ী হন। সম্ভুজী তার তরবারি দিয়ে মরণোন্মুখ আফজাল খাঁর শিরোশ্ছেদ করেন। সেনাপতির ছিন্নশির দর্শনে মুঘল সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। পাশের জঙ্গলে ওৎ পেতে থাকা মারাঠা সৈন্যরা বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রচুর গোলাবারুদ, চার হাজার অতি উন্নত জাতের ঘোড়া এবং কামানের বহর শিবাজীর হস্তগত হয়। আফজাল খাঁ বন্ধু ভেবে শিবাজীকে বুকে নিলেন। প্রত্যুত্তরে শিবাজী নিরস্ত্র আফজাল খাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করেন। পরবর্তীতে আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন 'ইয়া তখ্‌ত্‌ ইয়া তাবু'ত'। অর্থাৎ, হয় সিংহাসন না হয় মৃত্যু। কিন্তু সম্রাটের দক্ষিণ পথে পৌঁছার আগেই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী মারা যান।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্র সর্দার শম্ভুজী গদীতে বসেন। শিবাজীর গুরু রামদাস মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে উত্তেজক কবিতা লিখতে শুরু করেন। শম্ভুজী বুরহানপুর লুণ্ঠন করে শান্তিপ্রিয় নিরীহ শহরবাসীর বাড়ীঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। বুরহানপুর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই মিলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে সাহায্যের জন্য আবেদনপত্র পাঠায়। মোঘল সিংহ আওরঙ্গজে তখন গর্জে উঠেন। তিনি শেষবারের মতো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাজির হন দাক্ষিণাত্যে। ১৬৮৪ সালে মোঘলদের সাথে মারাঠা শম্ভুজীর ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেনাপতি মোশাররফ খাঁ শম্ভুজীকে সপরিবারে বন্দী করে নিয়ে এলেন সম্রাটের শিবিরে। শম্ভুজী পরাজয়ের সংবাদ রাজ্যের চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আনন্দোৎসব পালন করেন।

শম্ভুজী তার মারাঠা ধর্মের নির্দেশানুযায়ী বিধর্মী বন্দী শিবিরে আহার করতে অস্বীকার করেন। কেবলমাত্র তিনি ফল-ফলাদি খেতেন। অন্ন স্পর্শ করতেন না। আওরঙ্গজেব এ সংবাদ শুনে উৎকণ্ঠিত হন। বন্দী শম্ভুজীকে খবর পাঠান। এখন তুমি আমার বন্দী নও। তুমি মনে কর যে, এই কারাগার তোমার বাসগৃহ। তুমি মনের আনন্দে আহার করতে পার। আমি তোমাকে বিজিত বন্দীর মত দেখবো না। মারাঠা সর্দার শম্ভুজী সম্রাটের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েও আহারে নিবৃত্ত থাকলেন। তাকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। শম্ভুজী প্রকাশ্য দরবারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাষায় সম্রাটকে গালিগালাজ শুরু করে দিলেন। মোঘল সিংহ আওরঙ্গজেব আর নিশ্চুপ বসে থাকলেন না। তখনই চুলচেরাভাবে শম্ভুজীর কৃতকর্মের জন্য বিচার শুরু করেন। বিচারে শম্ভুজীর প্রাণ দন্ডাদেশ দিলেন এবং শম্ভুজী নিজ কৃতকর্মের জন্য প্রাণ হারালেন। এরপর বাদশাহ আওরঙ্গজেব দয়াপরবশ হয়ে শম্ভুজীর পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। শম্ভুজীর সতেরো বছর বয়স পুত্র সাহুকে রাজা উপাধি দান করে একখন্ড রাজ্যের সর্বময় কর্তা বানিয়ে দেন। শম্ভুজীর আরো দু'পুত্রকে সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তির

সাহায্যে লালন-পালন এবং বিদ্যা-শিক্ষা করিয়েছেন। বিজিত শত্রুর পরিবারবর্গের প্রতি সম্রাটের মহানুভবতায় এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।[৯]

আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। মোঘল সেনাপতি মানসিংহ বাংলায় এসেছিলেন ঈশা খাঁকে শায়েস্তা করতে। উভয়ের মধ্যে দ্বৈতযুদ্ধের সময় ঈশা খাঁর আঘাতে মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে যায়। ভগ্ন তরবারির সুযোগ ঈশা খাঁ গ্রহণ করেননি। আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে ঈশা খাঁ একটি তরবারি দিলেন মানসিংহকে। নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা বীরের ধর্ম নয়। মানসিংহ ঈশা খাঁর মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে তখন যুদ্ধ না করে সন্ধি করেন। বিশ্বের ইতিহাসের বীর শ্রেষ্ঠরূপে ঈশা খাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। অথচ বিশ্ব কবির বিরাট সাহিত্য ভান্ডারে উদার বীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট আওরঙ্গজেব ও ঈশা খাঁ স্থান পাননি। তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে বীরের কলঙ্ক, বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ লুটেরা শিবাজীর নাম। এই তস্কর শিবাজী মুখ দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন-

"হে রাজা শিবাজী
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি....
এক ধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।
তারপর একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব ব্রজ্র শিখা
আঁকি দিল দিগ্-দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুৎ বহ্নিতে
মহামন্ত্র লিখা।
মোগল উষ্ণীষ শীর্ষ প্রস্ফূরিল প্রলয় প্রদোষে
পুষ্প পত্র যথা
সেদিনও শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিলো বারতা।"[১০]

শিবাজীর শুধু স্তুতি নয়, ইতিহাস বিকৃতির এবং শিবাজীর পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত ঐতিহাসিকদের বিদ্রুপ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলে করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে...
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিস্ফল প্রয়াস

৯। মোজহারুল ইসলাম, আমি স্মৃতি আমি ইতিহাস, পৃঃ ২৪, ২৫।
১০। আহসান উল্লাহ, অখন্ড বাংলার স্বপ্ন, পৃঃ ৭৬।

এই জানে সবে।
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষ্যান্ত করো মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন- 'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গ বাণী
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।"[১১]

১৩৩১ সনে রচিত হয় 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। এই কবিতা রচনার অল্পদিন আগে 'ভারতী' পত্রিকায় সগর্ভে মন্তব্য করেছিলেন, "মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলিয়া আমরা আপন সাহিত্য বর্জন করিতে পারি না।" এই ধারণা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক ধর্ম রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আহবান জানালেন শিবাজীর হাত ধরে আট কোটি বঙ্গের নন্দনকে জাগ্রত এবং 'জয়তু শিবাজি' মন্ত্র উচ্চারণ করার। কবিতাটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

... "আমি কবি এ পূর্ব ভারতে
কী অপূর্ব হেরি,
বঙ্গের অঙ্গন দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরি।
....
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি
করিল আহবান-
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল হে স্বামী,
বাঙালীর প্রাণ।।
....
তোমারে চিনেছি আজি চিনেছি হে রাজন
তুমি মহারাজ।
তব রাজ করলয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ॥
....
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।"

১১। আহসানুল্লাহ, অখন্ড বাংলার স্বপ্ন, পৃঃ ৭৭।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালীকে শম্ভুজীর জয়গান গাইতে বলেছেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা রচনা করেন ১৩১১ সনে। কিন্তু এর পাঁচ বছর পূর্বে ১৩০৬ সনের অগ্রহায়ণে 'পণরক্ষা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মারাঠাদের প্রতি ঘৃণার ভাবই ফুটে উঠেছে। মারাঠাদের প্রতি রাজপুত সেনার মুখ দিয়ে দস্যু বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়। যেমন ঃ

'মারাঠা দস্যু আসিছিরে ঐ
করো করো সবে সাজ'

এই বলে সাবধান বাণীর মাধ্যমে ১৩০৬ সনের রবীন্দ্রনাথ ১৩১১-তে এসে একেবারে শিবাজী প্রেমিক হয়ে যান। পাঁচ বছর পর তিনি সেই দস্যু মারাঠাদের আদর্শে উজ্জীবিত এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ভারতবর্ষে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। কবির এই অতি শিবাজী প্রিয়তা যে চরম মুসলিম বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। তা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী মেলা প্রবর্তন করেছিলেন। স্বদেশীদের স্লোগান ছিল ঃ

'স্বদেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলি।'

স্বদেশী মেলাকারীদের আচরণে দেখা যাচ্ছে স্বদেশের কুকুর (ঈশা খাঁ) ধরি, বিদেশের ঠাকুর শিবাজী ফেলি।

মারাঠা ব্রাহ্মণ বলে গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের পূনা শহরে শিবাজীর জন্মস্থানে 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন।[১২]

হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রতীক ও উপলক্ষ হিসেবে ঐ অনুষ্ঠান কলিকাতা শহরেও আমদানি হয়ে যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ সব হিন্দু বুদ্ধিজীবীই তাতে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে পূনার রিয়াই মার্কেটে ১৮৯৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর যে শিবাজী স্মৃতিসভা হয়। সভায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা বাবু স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যোগদান করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন ঃ

> 'মহোদয়গণ, এখানে ঐ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে (দেয়ালে টাঙ্গানো শিবাজী ছবি দেখিয়ে) আমরা কি তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি না। (হিয়ার হিয়ার!) এই আন্দোলনের প্রতি আমার উষ্ণতম সমর্থন ও সহানুভূতি আছে! সমগ্র ভারতের সহানুভূতি আছে! (হিয়ার হিয়ার!) আমি জানি শিবাজী বার বার বঙ্গদেশ হামলা করেছিলেন (হাস্য), তাঁর বাহিনী আমাদের সম্পদ লুট করেছে, আমাদের মন্দির ও গৃহদেবতা পর্যন্ত ধ্বংস

১২। কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, এম আর আখতার মুকুল, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭, ৬৩ পৃঃ।

করেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করছি যে, ইংরেজদের সভ্যতা সূচক শাসনে (হিয়ার হিয়ার!) আমরা এখন অখন্ড ভারতে পরিণত হয়েছি (হিয়ার হিয়ার!) একজন বাঙ্গালী হিসাবে শিবাজীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।' (হর্ষ ধ্বনি)[১৩]

ইংরেজ তোষণ ও হিন্দু পুনর্জাগরণের সেই জোয়ারের পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতা রচনা করেছিলেন। এমনকি সুরেন্দ্রনাথের মত 'মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবনা' বলে তিনিও বঙ্গদেশে শিবাজীর হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও গবেষকদের 'জয়তু শিবাজি' বলার পরিবর্তে, 'জয় জয় ঈশা খাঁ' অথবা 'জয়তু মীর কাসিম', এমনকি 'জয়তু টিপু সুলতান' বলাটাই ইতিহাসবোধের দিক থেকে অনেক সঙ্গত ছিলো। ঈশা খাঁ বাংলার মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তারকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। মোঘল সম্রাট আকবরের বিজয় অভিযানের সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহকে তিনি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন বাংলার স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করার জন্য; এবং সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের কথা হচ্ছে, দ্বৈত যুদ্ধে বাঙালীর বাহুবলের আঘাতে রাজপুত বীর মানসিংহের তরবারি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো! মীর কাসিম তো আসলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক বাংলার নবাব। লড়েছেন, সর্বস্ব হারিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন, কিন্তু ইংরেজের কাছে মাথা নত করেননি। টিপু সুলতান আমৃত্যু বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে তাঁর প্রয়াস ছিলো তদানীন্তন ইতিহাস-সচেতন একজন সামন্ত শাসকের, বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের।

প্রকৃতপক্ষে শিবাজি, ঈশা খাঁ, মীর কাসিম, টিপু সুলতান- সবাই দিল্লীর মোঘল অথবা ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়েছেন; এবং তাঁদের লড়াইয়ের একটা লক্ষ্য সর্বদাই ছিলো, আপন সামন্ত-প্রভুত্ব বজায় রাখা। এটা ছিলো অনেকটা রাজায় রাজায় যুদ্ধ, যদিও তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার চেতনা তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়।

ইতিহাসের ধারা ছিলো রবীন্দ্রনাথের 'জয়তু শিবাজি' আবেগের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি শিবাজির হাত ধরে যে 'আট কোটি বঙ্গের নন্দন'-কে 'জয়তু শিবাজি' বলে কোমর বাঁধতে বলেছেন তার অধিকাংশই, প্রায় পাঁচ কোটি 'বঙ্গের নন্দন' শিবাজির মধ্যে কোন মহিমা তো দেখেইনি বরং দেখেছে, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মোন্মাদনার উদগ্র প্রকাশ।

মোঘলরা এই ভারতবর্ষ শাসন করে প্রায় ৫৫৫ বছর। এই ৫৫৫ বছরে ভারতবর্ষ সকল ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করে। ভারত তখন এমনই একটি সম্পদশালী দেশ ছিল যে, সমগ্র বিশ্বের লোভাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভারতের দিকে। মহাকবি শেক্সপীয়র

১৩। স্পিচেস বাই দি অনারেবল বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম খন্ড, এস কে লাহিড়ী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৮৯৬, ৮৭ পৃঃ।

অভিভূত হয়েছিলেন মহামতি মোঘলদের মানবিক ও বস্তুগত উভয়বিধ ঐশ্বর্যে। তিনি ধন-সম্পদের উপমা দিয়ে বলেছেন ঃ

"From east to western Ind
No Jewel is like Rosalind"

ভারতীয় নৃপতিকে শ্রেষ্ঠতম যুগনায়কদের বিভূতি জানিয়ে ঐতিহাসিক পত্র পাঠিয়েছিলেন রাণী এলিজাবেথ। মোঘল শাসকরা বিশ্ব মানসকে জয় করেছিল তাদের ইনসাফ এবং আদব-লেহাজ দিয়ে। মহাকবি মিল্টনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মোঘলদের নাম উঠলেই তিনি "The Great Mughal" শব্দটি ব্যবহার করেন কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ ভারতের শাসকরা মহান। তাদের দেশে যখন বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, সমবয়সীদের শুভেচ্ছা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তখন আমাদের জগতে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধ চলছে এবং বয়স্ক রমণীদের ডাইনী বলে অভিযুক্ত করে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।

মোঘলদের সাড়ে পাঁচশ' বছরের সুশাসনে বিদেশী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা অভিভূত হলেও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিভূত হতে পারেননি। তাই তাঁর লেখায় মোঘলদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ছাড়া সাফল্যের প্রশংসা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় মোঘলদের সাড়ে পাঁচশ' বছরের সাফল্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন একটিমাত্র কবিতায়। মোঘলদের অপূর্ব স্থাপত্য শিল্প তাজমহল যা গোটা বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পে অদ্বিতীয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

'এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।'

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় মোঘলদের দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ' বছরের শাসনের নিট সাফল্য 'কালের কপোল তলে এক বিন্দু নয়নের জল' বৎমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে শ্রী নীরদ চৌধুরী বলেছেন ঃ

'একটা একবারে বাজে কথা সর্বত্র শুনিতে পাই। তাহা এই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি হিসেবে 'বিশ্ব মানব' ও লেখক হিসাবে 'বিশ্ব মানবতার'ই প্রচারক। কথাটার অর্থ ইংরেজী ও বাংলা কোনো ভাষাতেই বুঝিতে পারিনা। তবে অস্পষ্টভাবে ধোঁয়া-ধোঁয়া যেটুকু বুঝি, তাহাকে অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বিশিষ্ট বাঙালী খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দু জন্মায় নাই।"

শ্রী নীরদ চৌধুরী 'দৃষ্টিদান' গল্পের উদাহরণ টেনে আরো বলেছেন ঃ

"আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বাঙালী হিন্দু ছিলেন, বাঙালী হিন্দু হিসাবেই নিজের কথা পৃথিবীর লোকের কাছে বলেছেন। তার রচনায় ইংরেজী অনুবাদে তার এই প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়নি। তাই আজ পাশ্চাত্য, এমনকি বাংলার বাইরেও তার আন্তরিক সমাদর নেই।"[১৪]

১৪। বাঙালী জীবনে রমণী, নীরদ চৌধুরী, পৃঃ ১৪১।

ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা সিসেন্ট ও স্মিথ 'দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্মিথ নামে এক ইংরেজ স্বচক্ষে দেখেন সুরাটের এক তাঁবুতে বসে শিবাজীর নির্দেশে কিভাবে সম্পদ গোপনকারীদের হাত ও মাথা কেটে ফেলা হচ্ছে। শিবাজী যখন সম্পদ সংগ্রহ করতো তখন ভারতীয় দস্যু ও লুটেরার মত নির্মম ও পৈশাচিক রূপ ধারণ করতো। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রচুর পারিতোষিক প্রদানের ফলে এক গরু রক্ষা করার দরুন এই দস্যুই শেষ পর্যন্ত দেবতা হয়ে গেল। এই ইতিহাসবেত্তা শিবাজীর রাজ্যকে 'দস্যু রাজ্য' আখ্যা দেন।

'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' শিবাজী একটি গরুর জন্য কয়েকশত মুসলমানকে হত্যা করতেন। মুসলমান মেয়েরা মারাঠা বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিতা হতেন। মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠিত হতো। মোটকথা, মুসলমান ত্রাস ছিলেন এই শিবাজী। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান নিধনের জন্য শিবাজী উৎসব প্রবর্তিত হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালী জাতির গৌরব, বাঙালী ঈশা খাঁ ফেলে মারাঠী শিবাজী বন্দনায় মেতে উঠেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' শিবাজীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে তার জমিদারীতে গরু কোরবানী নিষিদ্ধ করেছিলেন। একটি ভারতীয় দৈনিকের ২৮ মে ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত উপসম্পাদকীয় উদ্ধৃতি ঃ

"কিন্তু শিলাইদহ জমিদারী এলাকায় যেখানে প্রায় সকল রায়তই ছিল মুসলমান, সেখানে গরু কোরবানী নিষিদ্ধ করা কিংবা একতরফাভাবে খাজনা বাড়িয়ে মুসলিম প্রজাদের প্রতিরোধের মুখে আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের গ্রামে হিন্দু (নমশূদ্র) প্রজাপত্তন করার ঘটনা নিশ্চয়ই কোনও উদার অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বহন করেনা।

বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৩) প্রকাশিত 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' নামে একটি প্রবন্ধে প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ডক্টর আহমদ শরীফ দালিলিক প্রমাণসহ এইরূপ আরও অনেক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ গরু কোরবানী নিষিদ্ধ করেছিলেন অথচ দেবী কাত্যায়নীর পূজা উপলক্ষে পনর দিনব্যাপী লাঠি খেলা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই পূজার ব্যয়ভার হিন্দু-মুসলমান সব প্রজাকে বহন করতে হতো। পনর দিনব্যাপী এই মহোৎসব অনুষ্ঠানে যে বাড়তি খরচ হতো, সে জন্য তিনি একতরফাভাবে খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি অধ্যাপক ডাঃ মযহারুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

"শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ পৌষ মেলার প্রবর্তন করেন ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে। তারই অনুসরণে শিলাইদহে স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীয়র পূজা উপলক্ষে ১৯০২ সালে ১৫ দিনব্যাপী স্বদেশী মেলা প্রবর্তন করেন যেখানে লাঠিখেলা ও যাত্রাভিনয় প্রাধান্য পায়।

১৫। তথ্য সূত্র ঃ ওবায়দুল হক সরকার, মাসিক সফর, ঈদুল আজহা সংখ্যা, '৯৪।

এই মেলাতেই রাখী বন্ধন ব্যবস্থাও চালু করা হয়। স্বদেশী এবং বাগ্মী কালিমোহন ঘোষকে কবি কাছে নিয়ে আসেন এই স্বদেশী মেলা উপলক্ষে। কবি গুরুর নির্দেশে তিনি সর্বক্ষণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে শত শত যুবককে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।"[১৬]

কালি মূর্তি স্পর্শ করে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হতো। মুসলমান যুবকের পক্ষে কালি মূর্তি স্পর্শ করা মাত্র সে আর মুসলমান থাকে না, যদিও 'হিন্দু-মুসলমান' থাকে। উপমহাদেশে সাংবাদিকদের প্রবাদ পুরুষ আবুল কালাম সামসুদ্দীন (মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক) তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর তথা হিন্দুত্বের পরিপোষক বিষয়সমূহ চালু করে বুঝাবার এই চেষ্টা চলেছিল যে, এ-সবই হলো বাঙালি ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। কাজেই হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও এ সবের আপত্তি করবার কিছু নেই। কিছু সংখ্যক তরলমতি মুসলমান তরুণদের মনে এ প্রচারণার প্রভাব পড়ে নাই, এ কথা বলতে পারি না। তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা 'হিন্দু-মুসলমান'। বাঙলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এই 'হিন্দু-মুসলমান' সৃষ্টির চেষ্টাই অব্যাহতগতিতে শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে। মুসলমান তরুণদের একশ্রেণী এ প্রচারণায় এতটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলো যে, এদেরই গুরুস্থানীয় জনৈক চিন্তাশীল মুসলমান অধ্যাপক (কাজী আবদুল ওদুদ) এক প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় লিখেই ফেলেছিলেন যে এদেশী মুসলমান হচ্ছে- 'হিন্দু-মুসলমান'।[১৭]

এই উপহমহাদেশের ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের অন্যতম আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসেবেও, হিন্দুদের প্রজা হিসেবেও। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্যে যে, হিন্দুরা চাহিত 'আর্য-অনার্য শক, হুন' যেভাবে 'মহাভারতের সাগর তীরে' 'লীন' হইয়াছিল মুসলমানেরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, 'হিন্দু মুসলমান' হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু সভার জনতার মত ছিল না, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত ছিল।[১৮]

রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু-মুসলমান' থিওরী অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়নি। শিবাজী উৎসব বোম্বাই প্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে শ্রীযুক্ত তিলক নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে গিরিরাজা শঙ্কর রায় চৌধুরী বলেছেন ঃ

তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবের' তরঙ্গ বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। সখারাম গণেশ

১৬। মযহারুল ইসলাম, কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭।
১৭। আবুল কালাম সামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃঃ ১৫০।
১৮। আবুল মনসুর আহমদঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

দেউস্কর মহাশয় সম্ভবত ১৯০২ সালে মারাঠার এই বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্তিত করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় ও মফস্বলে শিবাজী উৎসবের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিপনচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথে শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছে।[১৯]

মতিলাল রায়, 'বীরপূজা' সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ভগবতঃ ১৯০২ সালে মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশ প্রবর্তিত করিয়া মারাঠী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এক জাতীয়তা সূত্রের সখ্য সন্দ দৃঢ়তর করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় 'শিবাজী' উৎসবের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবিবাবুর সুবিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী' এই উৎসব উপলক্ষে বিরচিত হয়। জাতীয়তার মনীষী বিপিন চন্দ্রও সেদিন সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।"[২০]

এখানে উল্লেখ্য যে, শিবাজীকে সীমাহীন মহত্ত্ব দান করার পেছনে ছিল সাম্প্রদায়িক (?) নেতা তিলকের হাত। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজী ভক্ত নেতা। তারপর তিনি করেছিলেন 'গণপতি পূজা', আর ১৮৯৩-এর পুনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন 'গোরক্ষিণী সভা'।

এ প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

"গোরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়, সেটাই হলো হিন্দু ধার্মিকতার প্রতীক। অচিরকালের মধ্যে মুসলমানের পক্ষে ধর্মের জন্য গোবধ অতি আবশ্যক ও হিন্দুর পক্ষে গোবধ নিবারণ ধর্ম রক্ষার জন্যই অনিবার্য হয়ে উঠল। রক্তারক্তি শুরু হল। গরু মারতে ও গুরু বাঁচাতে গিয়ে বিস্তর মানুষ মরতে লাগল।"[২১]

ভারতবাসী এই ভয়াবহ রক্তারক্তির মূলে তিলকের নেতৃত্বে থাকার জন্য অনেক শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান দুঃখিত হলেন। ইংরেজ সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে ১৮৯৭ সালে তিলককে বন্দী করলেন। মামলা চলতে থাকলো। ঠিক তখন রবীন্দ্রনাথ মোকদ্দমা চালাবার খরচ এবং তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বা ভিক্ষা করতে নেমে পড়লেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় শিবাজী ও মারাঠাদের যথেষ্ট গুণকীর্তন করায় বিপুল শিবাজী ভক্ত সৃষ্টি হয় এবং এরা গো-খাদক মুসলমানদের বিদ্বেষী হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, মুসলমানেরা যেমন গোরুর গোশত ভক্ষণ করে ঠিক তেমনি খ্রীষ্টানরাও ভক্ষণ করে। অথচ গোরুর গোশত ভক্ষণের অপরাধে মুসলমানদের হত্যা করা হয়, কিন্তু খ্রীষ্টানদের কেশাগ্রহও স্পর্শ করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈশরে আত্মবলিদানকে উৎসাহিত করে কবিতা লিখেছিলেন।

১৯। গিরিরাজা শঙ্কর রায় চৌধুরী, শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, নবভারত পাবলিশার্স। (কলিকাতা ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৫৬, পৃঃ ২৭৩)।

২০। মতিলাল রায়ঃ শতবর্ষের বাংলা, পৃঃ ৫৮।

২১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবন কথা, পৃঃ ৬৭

যেমন-

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।"

ধর্মের নামে মানুষের আত্মবলিদানকে সমর্থন করলেও 'গো-ব্রাহ্মণ' প্রতিপালক দস্যু শিবাজীর দৃষ্টান্তে জমিদার রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারীতে গরু কোরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মুসলমানদের ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করাই শুধু নয়, অন্যায়নভাবে দেবী কাত্যায়নী পূজার চাঁদা দিতে তিনি প্রজাদেরকে বাধ্য করেন। ধর্মে হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নিকট রবীন্দ্রনাথ ধর্মনিরপেক্ষ!

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন 'পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গ, পিতা পরমতপঃ'-এ ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসে অটল ছিলেন। তিনি নিজে রীতি অনুযায়ী উপাসনা মন্দিরে যেতেন। ১৮৮৪ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক থেকে হিন্দুদের ব্যাপক হারে খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া রোধ করেছিলেন।

তাঁর বিপুল সৃষ্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে হিন্দু ধর্ম-দর্শনের অনুপানে সিক্ত হয়েছে অনেক রচনা। শিব, রুদ্র, কৃষ্ণ, সরস্বতীকে তিনি তাঁর সাহিত্যে মহিমান্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সরস্বতী বন্দনা বাল্মিকী ও কালিদাসকে হার মানিয়েছে। বাল্মিকী প্রতিভায় কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সুন্দর উপস্থাপনা রয়েছে। শিব, রুদ্র বা শঙ্করের মহিমা তাকে মুগ্ধ করেছিলো। কৃষ্ণের প্রেম এবং সরস্বতী ভক্তজনের কৃপা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেড়েছিল। দুর্গার মাতৃভাবও তার মনঃপুত ছিলো। অল্প বয়সের লেখা শৈশব সঙ্গীতের একটি কবিতায় (হর হৃদ কালিকা) তিনি কালী বন্দনাও করেছেন। যদিও কালীর ব্যাপারে তাঁর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিলো। 'জন্মভূমি' প্রবন্ধে যে জন্মভূমির কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে জন্মভূমি হিন্দু জন্মভূমি, মুসলমানের নাম-গন্ধও এর মধ্যে নেই। এ প্রবন্ধে আছে মায়ের পূজা, মায়ের প্রতিষ্ঠা, অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ভারতীয় বীণাধ্বনি। যে দেশে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি জাতির বাস, সেখানে এই ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়া একে কি বলে আখ্যায়িত করা যায়?

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৈশাখ'কে নিয়ে রচনা করেছেন কবিতা। এই কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

"হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি-লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্ম সার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"

এখানে বৈশাখকে কল্পনা করা হয়েছে শিবের সাথে। তাই শিবানুসারী রবীন্দ্রনাথকে যদি কেউ মৌলিকতাবিরোধী আখ্যায়িত করতে চায় তা হলে তাদেরকে জ্ঞানপাপী অথবা ভন্ড-প্রতারক ছাড়া আর কি বলে আখ্যায়িত করা যায়?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পূজারিণী' কবিতায় পরিষ্কারভাবে তাঁর সঠিক অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি পৌত্তলিকতায় যে একেবারে চূড়ান্ত তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। লিখেছেন ঃ

"বেদ ব্রাহ্মণ-রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।"

উল্লেখ্য, বিভাগ-পূর্ব ভারতে স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে মুসলিম বিদ্বেষী এবং রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ পুস্তক হতে গল্প ও ভাবের আমদানি করা হতো। মুসলমান শিক্ষার্থীদের মনে ও মস্তিষ্কে সহস্র বছরের আগের দেব-দেবী, রাক্ষস-খোক্কস এবং আদিম মানবের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ধারণা দেয়া হতো। মুসলিম শাসনের কলঙ্ক লেপন ও ইতিহাস বিকৃতির উপাদান তৎকালীন পাঠ্যপুস্তকে স্থান নিয়েছিল। ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতিকে পাঠ্যপুস্তক থেকে অতি যত্নের সাথে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। পৌত্তলিকতা ও জড়পূজার শিক্ষাকে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল করে দেয়ার প্রচেষ্টা করেছিল। যেমন ঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব এই তিনজন হচ্ছেন সম্মিলিত ঈশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের তিনটি বিষয় তিন ঈশ্বরের হাতে ন্যস্ত। ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী রচনা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দু ধর্মীয় অনেক রচনার সাথে পূজারিণীর এই কবিতা

"বেদ ব্রাহ্মণ-রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।"
(পূজারিনী)

কলকল কণ্ঠে মুসলমান ছাত্রদের পাঠ করতে হতো। এ সম্পর্কে "ছাত্র জীবনে নৈতিক শিক্ষা" শিরোনামে মোহাম্মদ কবির উদ্দিন সরকার প্রতিবাদ করে তৎকালীন 'বাসনা' (২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

"আজকাল বিদ্যালয়াদিতে যে সকল সাহিত্য ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত হইতেছে, তাহা হিন্দু দেবদেবী, মুণি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, রাজা-মহারাজা, বীর-বীরাঙ্গণা ইত্যাদির উপাখ্যান ও জীবন চরিত আদিতেই পরিপূর্ণ-হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, ব্রত-অর্চনা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই সেইসব পাঠ্যগ্রন্থ অলংকৃত। মুসলমানের পয়গাম্বর, পীর-অলি-দরবেশ, নবাব-বাদশাহ, পন্ডিত-ব্যবস্থাপক, বীর-বীরাঙ্গনা আদির উপাখ্যান বা জীবন-বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য-কর্তব্য ধর্মাধর্ম ব্রত উপাসনা, খয়রাত-যাকাত ইত্যাদির মাহাত্ম্যরাজির নামগন্ধও ঐ সকল পুস্তকে নাই, বরঞ্চ মুসলমান ধর্মের ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের ভাবই বর্ণিত আছে। ..... প্রথম বর্ণ পরিচয় কাল হইতেই আমাদের বালকগণ রামের গল্প,

শ্যামের কথা, হরির কাহিনী, কৃষ্ণের চরিত্র ইত্যাদি পড়িতে থাকে। যদু-মধু, শিব-ব্রহ্মা, রাম হরি ইত্যাদি নামেই পাঠ আরম্ভ হয়। কাজে কাজেই আমাদের সরলমতি কোমল প্রকৃতি শিশুগণ বিদ্যালয়ে পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাখ্যান ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।[২২]

দুঃখজনক হলেও সত্য, তৎকালে মক্তবে পর্যন্ত হিন্দুর গৌরবগাঁথা পাঠ্য ছিল। জ্ঞান-তাপস অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন ঃ

"প্রথমে চাই মুসলমান বালক-বালকাদিগের পাঠ্যপুস্তক। কি পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড় ভাল ছেলে। কাশেম বা আবদুল্লা কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তারপর সে তাহার পাঠ্যপুস্তকে রাম-লক্ষণের কথা, কৃষ্ণার্জ্জনের কথা, সীতা-সাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। সম্ভবত তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের মধ্যে বড় লোক নেই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে জাতীয়ত্ববিহীন করা হয়। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড় কেহ নয়। মোসলমানরা নিতান্ত ছোট জাত। তাহাদের মধ্যে ভাল লোক জন্মিতে পারে না। এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদ করা হয়।

.........মক্তবে ও মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদিগের শিশুগণকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, তদপেক্ষা আর কি কলংকের কথা আছে? আমরা কি এতই মূর্খ যে, তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতে পারি না? মূল পাঠ্য ইতিহাস সম্বন্ধে ঐ কথা। তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী চারি পৃষ্ঠা আর হযরত মোহাম্মদের জীবনী অর্ধপৃষ্ঠা মাত্র। অথচ ক্লাসে একটি ছাত্রও হয়তো বৌদ্ধ নহে। আর অর্ধাংশ ছাত্র মুসলমান।.... মূল পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে অগৌরবজনক কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়, আর মুসলমানদিগের বেলা ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয়। গুণের কথা বড় একটা উল্লিখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় এই, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্রেরা বুঝিল, মুসলমান নিতান্ত অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর জাতি। পৃথিবী হইতে তাহাদের লোপ হওয়াই মঙ্গল।[২৩]

মোহাম্মদ কবির উদ্দিন সরকার, ডঃ শহীদুল্লাহসহ অনেক সচেতন মুসলিম মনীষী এমনকি কোন কোন হিন্দু মনীষীও ইংরেজ এবং হিন্দু বাবুদের এ অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী বিশ্ব কবির বিশ্ব হৃদয়ে এ বিষয়ে কোন রেখাপাত করেনি। কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ইদানিং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে এই বিশ্ব কবির আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের পাঠ্য পুস্তকে।

২২। তথ্য সূত্রঃ মুস্তফা নুরউল ইসলাম ঃ সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃঃ ৩০-৩১।

২৩। আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা, মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (এম এ, বিএল) আল-এসলাম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত; বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃঃ ৩১-৩২)।

মধ্যযুগীয় ফারসী কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী তাঁর একটি কবিতায় 'আর্য-অনার্যদের প্রতি আহ্বান' জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"বাজ আঁ বাজ আঁ
হর আঁচে হাস্তী বাজ আঁ।
গর্ কাফির গর গবর ওয়া
বোতপোরস্তী বাজ আঁ।
ই-দরগাহে মা দরগাহে
না উম্মিদ নীস্ত।
শত্‌বার গর তওবাহ্ শিকস্তী বাজ আঁ।"

তৌহীদী ভাষায় এর অনুবাদ ঃ

"এসো হে (আর্য, এসো অনার্য)
আল্লাহ্‌র দরগাহে এসো।
এখানে জাত-অজাতে কোন বাছবিচার নেই।
এ আল্লাহর দরগাহ
সকলেরই এখানে সমান অধিকার।
এখানে কেউ খালি হাতে বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে না।
শতবার তওবাহ্ করে ভঙ্গকারী,
ফিরে এসো, ফিরে এসো।
এখানে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবে না।

এই কবিতার আদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় আর্য, অনার্য ও ইংরেজদের আহবান জানিয়ে লিখেছেন ঃ

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীস্টান।
মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

এ সম্পর্কে গবেষক অধ্যাপক আবূ তালিব 'ইতিহাস কথা কয়' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"কৌতূহলের ব্যাপার, কবি রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নিরাকার একেশ্বরবাদী (মোয়াহেদ) মানব ধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান

কবিতায় দেখা যাচ্ছে, বাহ্য দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বর্জন করলেও তিনি নিরাকার একেশ্বরবাদের বদলে বহুত্ববাদী পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়েছেন, যা রাজা রামমোহনের চিন্তা-চেতনা থেকেও পৃথক। তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে মূর্তিপূজা বিরোধী (মোয়াহেদ), কিন্তু অন্তরে বহুত্ববাদী (নর-দেবতা পূজারী)।

আলোচ্য অংশে-

"মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা"
ইত্যাদি।

অভিনব মানবতাবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যা নিতান্ত অংশীবাদী পৌত্তলিক চেতনাসম্পন্ন। তৌহীদবাদবিরোধী তো বটেই, এটি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মচেতনা থেকেও পৃথক। মনে হয়, এখানে তিনি শূন্য পুরাণ বর্ণিত যবন ধর্মেরই অনুসারী।

মনে করি, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রামঞি পন্ডিতের শূন্য পুরাণও এই উদ্ভট ও উৎকট সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। যেমন-

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ
বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূল পাণি।
গণেশ হৈল্যা গাজি
কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি।

তৌহিদ আর বহুত্ববাদের এ মিলন সম্ভব কি?"[২৪]

ব্রাহ্ম হয়েও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু প্রথা মেনে চলতেন কেন? এর পেছনে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে কি ছিলো? কেনই বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারকে পতিত ব্রাহ্মণ বলা হতো? ইতিহাসের এক অপ্রকাশিত অধ্যায়ের দিকে আলোকপাত করেছেন প্রণবেশ চক্রবর্তী, শারদীয় আলোকপাত, ১৩৯৮ সংখ্যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

...... যদি তাঁরা পতিত হন, তবু তারা ব্রাহ্মণত্বের মোহ ও অহংকার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই সে যুগের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ডিহির এবং অখ্যাত 'পিরালী' ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকেই পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিবাহঘটিত বিষয়টিও উল্লেখ করতে পারি।

প্রভাতকুমারের রচনা থেকেই জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুপুরুষের উপযুক্ত বধূ সংগ্রহের জন্য বহু চেষ্টা হয়, কিন্তু সংকীর্ণ পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ কন্যা সুদুর্লভ। কারণ সে যুগে ছেলেদের বিবাহ হইত বিশ বৎসরের মধ্যে এবং বধূদের বয়স হইত নয় থেকে দশের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ পূর্ণ, সুতরাং তাহার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা বালিকার সন্ধানে সবাই প্রবৃত্ত হইল। একবার এক অ-বাঙালী ধনী পরিবার

২৪। আবু তালিব, ইতিহাস কথা কয়, পৃঃ ২৪,২৫।

হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। ... বিবাহ সেখানে না হইয়া হইল ফুলতুলি গ্রামের এগারো বৎসরের এক কৃশ, রুগ্ন অশিক্ষিত অত্যন্ত সাধারণ পাড়াগেঁয়ে বালিকার সঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিলেন- বহু স্থানেও যখন সর্বদিসম্মতিক্রমে কোন বধূ মিলিল না, তখন স্থির হইল ঠাকুর এস্টেটের সামান্য কর্মচারী বেণীমাধব রায় চৌধুরীর একাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত রবির বিবাহ হইবে। এক 'পিরালীত্ব' ছাড়া আর কোন মিল ছিল না এই দুই পরিবারের মধ্যে'।

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রাহ্ম নায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'কট্টরব্রাহ্ম' হয়েও ব্রাহ্মণত্বের মোহ বা আবরণ ছিন্ন করতে পারেন নি। পারেন নি বলেই নিতান্তই অন্ত্যজ এ ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকে রবীন্দ্রনাথের মত এক সুপুত্রের বধূ নির্বাচন করেছেন, তবু ব্রাহ্ম সমাজের কোন অব্রাহ্মণ কন্যাকে মেনে নিতে পারেন নি।

এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা গোঁড়া ছিলেন, আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হবে। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয় পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের কুলতিলক। অথচ যেহেতু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেহেতু তাঁকে ব্রাহ্মণ সমাজের আচার্যপদে দেবেন্দ্রনাথ বরণ করতে রাজী হননি, যার ফলে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের ভাঙন দেখা দেয়। গোঁড়া দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথকেই ১৮৮৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণ সমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন এবং অন্য কোন অব্রাহ্মণ যাতে এই পদে না আসতে পারেন, সে পথেই প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এই ঘটনাগুলোকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। কেন ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ লিখিত বয়ানে ব্রাহ্ম হয়েও সমাজ ও সংসার জীবনে আদৌ ব্রাহ্মণ হতে পারেননি, সেটা আজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে হবে।

কাগজে-কলমে 'ব্রাহ্ম ঠাকুর পরিবার' সে যুগের অন্যান্য কট্টর ব্রাহ্মণ পরিবারের তুলনায় যে কিছুমাত্র উদার ছিলো না, আরও দু'একটি ঘটনার উল্লেখে বুঝতে পারব। 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খন্ড (পৃঃ ২০৩) প্রভাতকুমার বলেছেন ঃ

'হিন্দু সমাজবিরোধী কোন অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ আন্দোল (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই।'

শুধুই কি তাই? প্রভাতকুমার আরও বলেছেন ঃ

'আদি ব্রাহ্ম্য সমাজ বিবাহাদির ব্যাপারে বর্ণবিচার করিতেন, উপনয়নাদি বিষয়ে কুলাচার পালন করিতেন।' প্রভাতকুমার আরও বলেছেন (প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২) 'ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের প্রায় সকলেই ঘরজামাই। তার বিশেষ কারণ ছিলঃ পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিবাহ করিয়া পৈতৃক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন জাত হারাইয়া ধনী শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তাঁহাদের আর গত্যন্তর থাকিত না।' অর্থাৎ ঠাকুর পরিবারের অধিকাংশ জামাই-ই 'ঘরজামাই' হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত বিষণ্ন বেদনায় পরিণত হয়।

ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং সঠিক পটভূমিকায় বুঝতে হলে ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও বর্ণাশ্রম সম্পর্কে তাঁর চেতনা বুঝতে হবে। 'রবীন্দ্রনাথের মতে হইল, বর্ণাশ্রমের আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্ম লাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়। হিন্দু ভারতের বর্ণাশ্রম আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি আজ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান ও রমণীয় করিয়া দেখিতেন।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্ব প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৬) আরও বলেছেন, 'প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ কিভাবে আধুনিক জীবনে সফল হইতে পারে, কিভাবে বর্ণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদবিষয়ে কবি চিন্তা করিতেছেন। এই সময় লিখিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি এ যুগের মনোভাব প্রকাশক।'

'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি কবি লিখেছিলেন কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে, সেটা একটু জেনে নেওয়া ভালো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি যে, সমসাময়িককালে বোম্বাই অঞ্চলে একজন সাহেব তার ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে পদাঘাত করেছিলেন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল জনচিত্রে আলোড়ন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করার ঘটনাকে নিন্দা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ওভারটুন হলে এক জনসভা হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠানের যে আদর্শ তুলে ধরলেন, অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে, কবি বুঝি হিন্দুর প্রাচীন বর্ণাশ্রম প্রথা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার পক্ষপাতী। অবশ্য অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কারও কারও একথাও মনে হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের যে রূপ তুলে ধরেছেন, তা দেশে কালে বিপরীত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

'ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগর কোলাহল ও স্বার্থ সংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহবান করিতেছে- ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪, পৃঃ ৩৯৭)।

এই প্রসঙ্গে আমরা 'কবির হিন্দুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩, পৃঃ ৫১৮-১৯) কথা স্মরণ করতে পারি, যেখানে তিনি হিন্দু একনিষ্ঠতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের পক্ষেই সওয়াল করেছেন।

'প্রবাসী' পত্রিকার (কার্তিক, ১৩৪৮, পৃঃ ১০-১৩) অনুসরণে আমরা দেখতে পাই যে, ১৩০৯ সনের ৭ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজ কুমারকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি বলেন ঃ

'ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে-দুর্গতিতে আক্রান্ত

হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়াছি। ... আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না। ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়?'

একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্ম হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় অনেক বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সম্ভবত তাঁর চিন্তার জগতেও কখনও কখনও দেখা দিয়েছে নিঃস্বতা।

প্রভাতকুমার বলেছেন (দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৬৪) ঃ রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে আদমশুমারী গ্রহণের সময়ে হিন্দু ব্রাহ্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন; এবারও (১৮৯১ সালে) তিনি বলিলেন ঃ

"আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বিশ্ব জননী, তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।"

এই সূত্রে আমরা করিব 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮, পৃঃ ৪৫২-৭৪) কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মণধর্ম তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়েছে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে এবং হিন্দু সংস্কৃতির উপরই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই কবির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'-তে প্রকাশিত হল 'আদি সমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ' (বাংলা ১৩১৯ সন, ১ বৈশাখ) নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল কবিকে আঘাত করা। কবি তারই প্রত্যুত্তরে ওই 'হিন্দুব্রাহ্ম' প্রবন্ধ লেখেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ)। ওই প্রবন্ধের মাধ্যমে কবি সরাসরি 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকাকে আক্রমণ করে বলেন ঃ

'ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপ ছাড়া কান্ড নহে। হই স্বতন্ত্র সমাজ নহে, ইহা সম্প্রদায় মাত্র।'

অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট করেই ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুত্বের আধারেই ব্রাহ্মধর্মের নিবাস।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্রম বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, সেখানেও তিনি সনাতনী। আমরা 'রবীন্দ্রজীবনী'র (দ্বিতীয়, পৃঃ ৫১) অনুসরণে দেখতে পাই ঃ

'ব্রাহ্ম-বান্ধবের (উপাধ্যায়) ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ব্রাহ্মচর্যাশ্রম রূপ গ্রহণ করিল। শিষ্যরা গুরু গৃহে যেন বাস করিতেছে, ইহা হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ হইলেন গুরুদেব। এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক; তবে আহার স্থানে

বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক।' আচারে-বিচারে আহারে সেই আশ্রম বিদ্যালয়েও বর্ণাশ্রমের রীতিনীতি প্রবর্তিত হল। ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। জাতপাতের বিচার থেকে সেই আশ্রমও মুক্তি পায়নি।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রাহ্মণসত্তা কতটা প্রবল ছিল, সেটা আশ্রম বিদ্যালয় প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমারের কথাতেই জানতে পারিঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে পাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত। উপাসনার সময় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া শূচিস্নাত দেহমানে একান্তে উপবেশন করিতে হইত। উপাসনান্তে পূর্বতন গ্রন্থাগারের মধ্যেও ঘরটিতে ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বন ছায়াতলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কিন্তু একদিন অ-ব্রাহ্মণ অধ্যাপনের পদধূলি গ্রহণ করা যায় কি-না তাহা লইয়া সমস্যা দেখা দিয়াছিল।' (দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৫২)।

শুধুমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়েই নয়, যখনই কোন অব্রাহ্মণকে নিয়ে সামাজিক বা ধর্মীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় পিতার অনুসরণে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রেও পড়েছিলেন। রবীন্দ্র জীবনীতে দেখি ঃ

'শান্তি নিকেতনের পরিচালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অশান্তি দুই মাসের মধ্যে দেখা দিল। অশান্তি বাধিল কবির আদর্শীকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম লইয়া। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্জলাল ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কায়স্থ, তাহার উপর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কিনা, এই লইয়া সমস্যা সৃষ্টি।' (দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৫৭)।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শুধুমাত্র কায়স্থ নয়, কুঞ্জলাল ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লোক। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি কায়স্থ, আবার সাধারণ ব্রাহ্ম হয়েও তিনি আদি ব্রাহ্মের স্বগোত্র নন। দু'দিক থেকে তিনি ছিলেন বিজাতীয়। শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষায় এই সমস্যার সমাধান সাধনে কবি নিজে যে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তা আমরা জানতে পারি আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি থেকে (স্মৃতি, পৃঃ ১৪-১৫)। কবি লিখেছেন ঃ

'প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে, ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।'

কবি পত্নীর মৃত্যু হয় বাংলা ১৩০৯ সনের ৭ অগ্রহায়ণ। আর মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে কবি চিঠি লেখেন ১৯ অগ্রহায়ণ। কবির এই মানসিকতা এবং আশ্রমের স্বরূপ সম্পর্ক রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৫৭)

লিখেছেন ঃ

'রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ বা উপদেশ অধিকাংশ শিক্ষকের জীবনে ও আচরণে কোনদিনই রেখাপাত করিতে পারে নাই। কেহ তাঁহার সাহিত্য, কেহ তাঁহার কলাচর্চা, কেহ তাঁহার সঙ্গীতকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁহার ধর্মসাধনা বা তাঁহার প্রগতিশীল সমাজ ভাবনাকে জীবনে রূপদান করিয়াছেন।

রবীন্দ্র জীবনীকার রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধী চিন্তাধারার পরিণাম সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। আসলে সংস্কার মুক্তির কথা বললেও, আশ্রম বিদ্যালয় সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তনের কথায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চরম সনাতনী। তাই 'বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলুন, যাহাই ভাবুন, প্রবন্ধ রচনায় যতই যুক্তি-তর্কের অবতারণা করুন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্ল্যানচেটে মিডিয়াম প্রভৃতির আলোচনা করিতে দেখিলে অবাক হইতে হয়। আলমোড়া হইত প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে তিনি প্ল্যানচেটের কথা বলিতেছেন। তাঁহার শরীর ও মন যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িত, তখনই তিনি এ সব তথাকথিত অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি মন দিতেন। কোষ্ঠির ফলাফল মানিতেন কি-না জানি না, তবে কোষ্ঠি লইয়া নাড়ানাড়ি করিতেন। শিলাইদহ হইতে একবার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, রথীর (পুত্র রবীন্দ্রনাথ) কুষ্টি পরীক্ষা করতে দিতে হবে।'

প্রভাতকুমারের এসব উক্তি রবীন্দ্রনাথের সত্য রূপকেই উদঘাটন করে। হিন্দু সমাজের সকল রীতিনীতিকে মেনে নিয়েই তিনি ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি আর অন্তর ব্রাহ্ম হতে পারেননি, যদিও মৌখিকভাবে হওয়ার প্রয়াসী ছিলেন।

আমরা রবীন্দ্রজীবনীতেই দেখেছি যে, বৈদিক মতে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পাদিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁর রথীন্দ্রনাথেরও উপনয়ন সম্পন্ন হয় যথাবিহিত উপাচারে। রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পর্কে প্রভাতকুমার বলেছেন ঃ (প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৮)

'১৮৭৩ মাঘোৎসবের পক্ষকাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর নয় মাস। এই অনুষ্ঠানে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন। ব্রাহ্মণ মাত্রই জানেন যে, উপনয়নের পর নতুন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'নতুন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল।

প্রভাতকুমারের জবানীতে আমরা আরও জানতে পারি (প্রথম খ., পৃঃ ৩৯) ঃ

'রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এক সময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দু সংস্কার বিশ্বাসবান ছিলেন ঃ কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন। ....কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচরণকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন।' শুধু নিয়ম রক্ষার মত উপনয়ন নয়, একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্মণের মত মুন্ডিত মস্তকে কেমন করিয়া ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে যাইবেন, যাইবেন, এই ভাবনায় যখন বালক অত্যন্ত ম্রিয়মান, এমন দুশ্চিন্তার সময়ে তিনি খবর পাইলেন পিতা এবার তাঁহাকে লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিবেন।'

রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি (প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৬৫) ঃ 'ইতিমধ্যে

(১৮৯৮) স্থির হইল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রের উপনয়ন হইবে। (আদি ব্রাহ্মণ সমাজে) বর্ণভেদ স্বীকৃত হইত-বিবাহাদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারো সহিত নিষ্পন্ন হইত পারিত না- উপনয়নাদি যথাবিহিত সম্পাদিত হইত; পৌরোহিত্যাদি কর্মে ব্রাহ্মণের বর্ণের অধিকার ছিল না। মহর্ষির ইচ্ছানুসারে রথীন্দ্রের উপনয়ন হইল শান্তিনিকেতনে (১০ বৈশাখ ১৩০৫) রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র.... এই অনুষ্ঠানের বহু পন্ডিতের সমাগত হয়। .... যথানিয়মে রথীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মণ বটুর ন্যায় ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিতে ও তিনদিন শূদ্রাদির মুখ দর্শন না করিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়।

বিধবা বিবাহের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ কতটা পিতৃপ্রভাবে আচ্ছাদিত ছিলেন, তা আমরা জানতে পারি তরুণ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীর দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রসঙ্গে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন, যাতে তাঁর আর দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার আয়োজন করা না হয়।[২৫]

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রোববার পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ তোসারফ আলী রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন ঈদ সংখ্যা '৯৪ সাপ্তাহিক রোববারে। তিনি লিখেছেন ঃ

রবীন্দ্রনাথ ধর্মমতে ছিলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদর্শন উপনিষদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রাহ্মদের অনেকে সরাসরি হিন্দু বলতে চান না। এ নিয়ে একদা অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। উপনিষদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টীয় প্রকরণ স্বীকার করেছিলো ত ৎকালীন হিন্দুদের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া রোধ করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজে রীতি অনুযায়ী উপাসনা মন্দিরে যেতেন। ১৮৮৪ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। মূর্তি পূজার তিনি সমর্থক ছিলেন এমন কথা যেমন বলা যাবে না তেমনি মূর্তি পূজার তিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। শেষ বয়সে তিনি নিজেকে কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখতে চাননি। মানুষের ধর্মের কথাও বলেছেন। এমনকি সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রত্যক্ষ করে 'নাস্তিকতার আগুনে' ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার কথাও তিনি খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন একবার।

তারপরও তাঁর বিপুল সৃষ্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অনুপানে সিক্ত হয়েছে অনেক রচনা। হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র যে ভূমিকা ১৩১০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অন্য কোন হিন্দুর পক্ষে তারচে' শ্রদ্ধাপূর্ণ ভূমিকা লেখা সম্ভব ছিলো না। শিব, রুদ্র, কৃষ্ণ, সরস্বতীকে তিনি তাঁর সাহিত্যে মহিমান্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সরস্বতী বন্দনা বাল্মিকী ও কালিদাসকে হার মানিয়েছে। সোনার তরী কাব্যের পুরস্কার কবিতা যার সাক্ষ্য বহন করছে। বাল্মিকী প্রতিভায় কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সুন্দর উপস্থাপনা রয়েছে। শিব, রুদ্র বা শঙ্করের মহিমা তাকে মুগ্ধ করেছিলো। কৃষ্ণের প্রেম এবং সরস্বতীর ভক্তজনে কৃপা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেড়েছিল। দূর্গার মাতৃভাবও তার মনঃপূত ছিলো। অল্প বয়সের লেখা শৈশব সঙ্গীতের একটি কবিতায় (হর হৃদে কালিকা) তিনি কালী বন্দনাও করেছেন। যদিও কালীর ব্যাপারে তাঁর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিলো।

২৫। শারদীয় আলোকপাত ১৩৯৮

বৌদ্ধ ধর্মের ওপরও তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেছেন। শিখ, মারাঠা, রাজপুত- এদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ সাহিত্যের আধারে তিনি ধর্মীয় বিষয়কে অমর করতে চেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এ দিকটির প্রতি অনেকেই নজর দিতে চান না। তাদের ধারণা, এ ব্যাপারে আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মের সার্বজনীন আবেদন ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধারণা কিন্তু সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য তাঁর ধর্ম ভাবনা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা আবশ্যক।[২৬]

এ প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়। তিনি লিখেছেন ঃ

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হিন্দু সংস্কৃতির পরম্পরকে তাঁদের (রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিম) চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার তত্ত্বচিন্তায়, কবিতায় এবং বিশেষ করে গানে সেই ঐতিহ্য তার চেতনাকে পুষ্ট এবং তাঁর কল্পনাকে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলো।"[২৭]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, নিরাকার একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে প্রচারণা প্রকৃতপক্ষে জনগণের আই-ওয়াশ করা। তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন বহুত্ববাদী পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন নির্ভেজাল হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। বিশ্ব ভারতী চত্বরে মূর্তি রাখা বা পূজা না করা এটা ছিলো তাঁর প্রতারণা ও ভন্ডামী। তাঁর বিশাল সাহিত্য ও বিভিন্ন কর্মকান্ড তা-ই বলে।

আমাদের এ দেশীয় রবীন্দ্রভক্তরা বলে থাকেন ঃ

"আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের দেখানো আলোয় (আল্লাহ-রসূলের দেখানো আলো নয়) আমরা পথ দেখি।"

সুতরাং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য জাতির কাছে পরিষ্কার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২৬। সাপ্তাহিক রোববার, ঈদ সংখ্যা, '৯৪।
২৭। রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার ও নক্ষত্র সংকেত, শিবনারায়ণ রায়, পৃঃ ১।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী
অধীনতা আনিল রজনী
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে চির।
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমনি!
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি,
ভীষম, দ্রোন, ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।

-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (নাটক, পুরুষ বিক্রম)

নজরুল সাহিত্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব

"সুন্দরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তো শিল্পীদের জন্ম। তাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সিদ্ধি শিল্পের পূজায়। মানুষ সুন্দরকেই ফুটিয়ে তুলবে চারিদিকে- যে এনে দেবে বিরোধের কোলাহলের মধ্যে মিলনের জয়গান।"

-ফজলুল করিম

ভাষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু হিন্দুদের কবি নন, মুসলমান বাংলাভাষীদেরও কবি। ঠিক তেমনি নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানদের কবি নন, বাংলাভাষী হিন্দুদেরও কবি। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল হিন্দু মুসলমানের সম্পদ, গৌরব। ধর্মের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যকর্ম অসাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু নজরুল ইসলাম অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার রেখে গেছেন- নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনিই একমাত্র উভয় সম্প্রদায়ের কবি, বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি এবং প্রেমের কবি হিসেবে উজ্জ্বল স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। নজরুল ইসলাম হিন্দু মুসলমানের বিভাজন রেখা অতিক্রম করে উভয় সম্প্রদায়ের কবির হবার চেষ্টা করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ধর্মীয় বিভাজন রেখা অতিক্রম করতে পারেননি। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমানেরা উপেক্ষিত হলেও নজরুল সাহিত্যে হিন্দুরা উপেক্ষিত হয়নি। নজরুল নিজেকে উভয় সম্প্রদায়ের কবি হতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কবি নজরুল তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় মানবতার মহান ধর্ম ও ইসলামকে যেমন তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনি ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি কলম চালিয়েছেন। অন্যদিকে কবি নজরুল কালি, দূর্গা, শিব, শংকর, কৃষ্ণ, সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীকে নিয়েও অসংখ্য গান, কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য কর্মে শব্দ প্রয়োগে নিজস্ব গন্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের লেখায় মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, পূজো, নমস্কার, প্রণাম, বৃন্দাবন, ব্রাহ্মণ, মুনি, নারদ, অর্ঘ্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী, স্বর্গীয় দূত, স্বর্গ, নরক, শংখ, সন্ধ্যারতি, শঙ্খ, পূজারী, উপবাস, ঈশ্বর বা ভগবান, দেব-দেবী, মহিমাময়ী, নমো নমঃ

দশভুজা, স্নান, পুরোহিত, পৌরহিত্ব প্রভৃতি শব্দ স্থান পেলেও আল্লাহ, রাসূল, মসজিদ, এবাদত, ছালাম, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোযখ, রোজা, গোসল, ইমাম, কিতাব প্রভৃতি শব্দ স্থান পায়নি। পেলেও তা ব্যঙ্গাত্মক। কিন্তু কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন যেমনি আকাশের মতো উদার, তেমনি ছিলেন আন্তরিক ও অসাম্প্রদায়িক।

বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য খ্যাতিমান নজরুল গবেষক, বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমেদ তার "নজরুল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ শুধু মানুষের শরীরটাকে উপেক্ষা করেননি, তিনি পরদেশী শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করেননি, তিনি পরদেশী শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার উপমহাদেশের মানুষের সুতীব্র আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করেছিলেন-তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। মনে হয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে মসি-সংগ্রামরত নজরুল ইসলামকে অগ্নিসেতু বাঁধার দাওয়াত দিয়ে সুভাস বসুকে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করে যার উৎসর্গপত্রে লেখা আছে 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ; সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।' রবীন্দ্রনাথ তার অপূর্ণতার নিকট পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিজের কাব্য কবিতায় তিনি নজরুলের মত সৈনিকের বা সেনাপত্যের ভূমিকাটি পালন করেননি। এই ভূমিকাতে নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার কারণ নেই। বলা বাহুল্য "বাঁশীর রাজা" বলে রবীন্দ্রনাথকে নজরুল যে সনাক্ত করেছিলেন, সেটা রবীন্দ্রনাথ "বাঁশীর রাজা" করুণ রস সৃষ্টির দেবতা। আর নজরুল বাঁশীর রাজা" করুণ রস সৃষ্টির দেবতা। আর নজরুল বাঁশী ও রণতূর্যের রাজা, বীর ও করুণ রস সৃষ্টির দেবতা।

আর একটি দিকে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন। ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায় বা জাতি হিন্দু ও মুসলমান বা মুসলমান ও হিন্দু। নজরুল এই দুই প্রধান জাতির সংস্কৃতিকে কাব্যে উপস্থাপন করতে, তাদের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খাকে মর্যাদা দিতে, তাদের ধর্মানুভূতিকে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন তুললে তা নজরুলের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যে বাধার প্রাচীর রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করতে পারেননি নজরুল তা পেরেছিলেন ঃ বরং যে কঠিন অনুশাসন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাঙ্গা সহজ ছিল, মুসলিম নজরুলের পক্ষে তা ছিল আরও কঠিন। কিন্তু নজরুল তা দুর্দান্ত সাহসে অতিক্রম করেছেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহসের পরিচয় দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। নিজের সমাজের সামাজিক সংস্কারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সেই একই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, যে জন্যে তার ভাগ্যে জুটেছিল কারাগার ও কাফের ফতোয়া। এই অভ্রভেদি সাহসিকতায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন সে কথা উচ্চারণ দ্বিধা থাকারও কোন কারণ দেখিনা।[১]

এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের অন্ধ রবীন্দ্র ভক্ত বুদ্ধিজীবীরা নজরুলকে খন্ডিত কবি রূপে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩০তম জন্মবর্ষিকী উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে ফেরদাউস খান বলেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ এ দেশের কৃষি ও সংস্কৃতির সাথে মিশে আছেন। রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতের মধ্যে

১। শাহাবুদ্দীন অহমদ ঃ নজরুল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন, দৈনিক ইনকিলাব, ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮।

পার্থক্য থাকলেও দু'টোকেই উপভোগ্য হিসেবে উল্লেখ করার পর তিনি নজরুলকে খণ্ডিত কবি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর রচনায় কিছু কিছু অংশ (ইসলামী গান, শ্যামা সঙ্গীত ইত্যাদি) এ দেশের জনপ্রিয় হলেও পশ্চিমবঙ্গে হয়নি অথবা তার উল্টোটি ঘটেছে অথচ রবীন্দ্রনাথ উভয় বাংলাতেই সমানভাবে সমাদৃত।"[২]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংল সাহিত্য অঙ্গনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন কবি নজরুল ইসলাম। জীবনের কবি, যৌবনের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যকর্মে, রাজপথে, কারাগারে, রঙ্গমঞ্চে, চলচ্চিত্রে, পত্রিকা সম্পাদনায় এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে বিচরণ করেছেন। উভয় সম্প্রদায়ের সমাদৃত কবি হতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কবির! তিনি আজ খণ্ডিত কবি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন। আবার কারো মতে, তিনি সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল কবি। কারো মতে, তিনি হিন্দু-মুসলমান কিছুই ছিলেন না।

১৯৯০ সালের ২৭শে মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এদেশে এসে দরিরামপুরে দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিলেন ঃ

"কবি নজরুল ইসলাম কেবল আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোনও কিছুই ছিলেন।"[৩]

নজরুল সম্পর্কে কট্টর হিন্দুবাদী অসিতবাবুদের এ ধরনের হীন ধারণা স্বাভাবিক। কারণ তাঁর পূর্বসূরীরা কবি নজরুলকে কিরূপ ঘৃণা করতেন, এর পরিচয় মেলে জনাব মাহমুদ নূরুল হুদার একটি উক্তিতে। তিনি দৈনিক মিল্লাতে লিখেছেন ঃ

"কলকাতার হিন্দুরা নজরুলকে ঘৃণা করতো। তারা বলতো, মুসলমান কবি সে আবার কি লিখবে।"[৪]

পরবর্তীতে নজরুল যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী সঙ্গীতের পাশাপাশি অপূর্ব কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তখন হিন্দু সমাজ বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর এসব সঙ্গীত শুনে হিন্দু মহলে আনন্দ-উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল এবং তারা 'কাজী দা' বলে ভাবে ও আবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে যখন মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন তখন অনেক অজ্ঞ মুসলমান তাঁকে 'কাফের' ও 'শয়তান' বলে ধিক্কার দিয়েছে এবং তাঁকে অশেষ লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল যে, একদিকে হিন্দুরা তাঁর সঙ্গীত শুনে উল্লসিত হন, অন্যদিকে বৃটিশের সৃষ্টি কট্টর ধর্মান্ধ মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হন। তখন কবি নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত একটি হ্যান্ডবিল পাঠে উভয় সম্প্রদায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। আজ থেকে ৬২ বছর আগে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে বাংলার মুসলিম

২। দৈনিক সংবাদ, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯১।
৩। দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ মে, ১৯৯০।
৪। দৈনিক মিল্লাত, ২৪ মে, ১৯৯০।

সমাজের উদ্দেশ্যে লিখিত এবং কলিকাতায় প্রচারিত ঐ ব্যক্তিগত ইশতেহারে নজরুল বলেন ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম!

কওমের খাদেম এই বান্দার নাম হয়ত আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমি আমার কবিতায়, ইসলামী গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আর বহু চেষ্টায় আজ ইসলামী গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আরবী, ফার্সী শব্দের প্রচলন বাংলা সাহিত্যে আজ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও এই বান্দার চেষ্টায়। আমি কওমের নিকট হইতে হাত পাতিয়া কখনো কিছু চাহি নাই ইহার বদলাতে। কোন কিছু প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমি লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আমার যথাসাধ্য কওমের ও ইসলাম ধর্মের খেদমত করিয়া আসিতেছি। আজ আপনাদের দরওয়াজায় এই খেদমতগার এক সামান্য আর্জি লইয়া হাজির হইয়াছে। আমার ভরসা আছে আমাদের দারাজ দিল ও দস্ত আমাকে রিক্তহস্তে ফিরাইবে না। আপনারা যদি আমাকে মদদ দেন তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে মক্তব মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বাংলা পুস্তক রচনায় মন দিব ও এইরূপে কওমের সেবা করিতে থাকিব। আশা করি আমার এই আর্জি আপনারা মঞ্জুর করিয়া আপনাদের কওমের একনিষ্ঠ খেদমতগারকে সরফরাজ করিবেন।

ইতি-

খাদেম নজরুল ইসলাম

কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৪৩

পাঁচ মাস পর ১৩৪৩ সনের চৈত্র সংখ্যা শনিবারের চিঠি পত্রিকায় (শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) ইশতেহারটি ছাপিয়ে দেয়া হয়। মনে হয় আকস্মিক আঘাতটি হজম করার জন্য তাদের অতদিন সময় লেগেছিল। কিংবা নজরুলের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যই তারা সময় নিয়েছিলেন। অবশেষে তারা যখন নিশ্চিত হন যে, কীর্তনাদি রচনা করলেও তিনি আসলে ঐ ভাবধারায় বিশ্বাসী নন এবং তাঁর বিশ্বাস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তখনই তারা ইশতেহারটি ছাপিয়ে দেন। এই অনুমান যে সঠিক তা পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। বলা হয়, 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবকে আমরা নিতান্তই আপনার জন্য বলিয়া জানিতাম। কালী, দূর্গা, শিবশঙ্কর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীকে লইয়া তিনি যেরূপ মাতামাতি করিতেন, আমাদেরই তো মাঝে মাঝে ভয় হইত।

তাহার রচিত এমন বহু গান আছে যাহা দেখিলেই মনে হইবে, কোনও হিন্দু সাধকের রচনা। মোটের উপর আমরা খুশি ছিলাম। হঠাৎ কাজী সাহেব স্বাক্ষরিত একটি হ্যান্ডবিল পাঠে জ্ঞান হইল যে, তিনি আসলে ৫৫%। এতখানি ভাবিতে পারি নাই, বড় আঘাত পাইয়াছি।

উল্লেখযোগ্য যে, (অবিভক্ত) বাংলাদেশে তখন মুসলমান ছিল শতকরা ৫৫ জন এবং

অমুসলিম (হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য) ছিল শতকরা ৪৫ জন। অসিত বাবুর ধারণা যে সঠিক নয়, নজরুলের ইশতেহার এবং শনিবারের চিঠির সম্পাদকীয়ের মন্তব্যই তা প্রমাণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তৎকালীন সচেতন হিন্দু সমাজ নজরুল সম্পর্কে সেই ৬২ বছর আগে যে উপলব্ধি করেছিল, বাংলাদেশের মুসলমানের মত নামধারী কোনও কোনও মহলে এখনও সেই উপলব্ধি আসেনি।[৫]

মুসলমানী শব্দ হিন্দু বাবুদের কাছে ছিলো অসহনীয়। ১৭৫৭ সালের পর ইংরেজ রাজ আনুকূল্যে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বময় কর্তৃত্ব সংখ্যালঘু হিন্দুদের হাতে চলে যায়। সংস্কৃত বহুল বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতো। আরবী, ফারসী শব্দ থাকলে হিন্দু প্রকাশকেরা তা গ্রহণ করতেন না। উপমহাদেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের বই বাজারে বেরোবার সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যেতো। এমন একজন কৃতি সাহিত্যিকের একটি ঘটনা ঃ

"কয়েকদিন পরেই ভট্টাচার্য এন্ড সন্সের মালিক আমাকে নিবার জন্য লোক ও গাড়ি পাঠাইলেন। আমি তাদের কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ দোকানে গেলাম। কুশল মন্দ জিজ্ঞাসা ও চা'র অর্ডার ইত্যাদি প্রাথমিক ভদ্রতার পরেই আমার বই-এর কথা তুলিলেন। বই খুবই জনপ্রিয় হইবে, গল্প ও ভাষা খুবই চমৎকার ইত্যাদি কয়েক কথার পরেই তিনি বলিলেনঃ "কিন্তু বই-এ অনেক আরবী-ফারসী শব্দ আছে। এইগুলির ফুটনোট দিতে হইবে।"....

আমিও রাগ করিয়া প্রশ্ন করিলাম ঃ

'শতকরা ছাপ্পান্নজন বাঙ্গালীর মুখের ভাষাকে আপনি বাংলা বলিয়া স্বীকার করেন না? দেশের দুর্ভাগ্য!'

আমি তখন পুরা কংগ্রেসী। মাথা হইতে পা পর্যন্ত ১টা খদ্দর। তিনি নূতন করিয়া আমার পোশাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ঃ 'দেখুন আমি ব্যবসায়ী। আপনার সাথে আমি দেশের ভাগ্য লইয়া তর্ক করিতে চাই না। আমার শুধু জানা দরকার আপনি ঐসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিবেন কি না।'

আমি বলিলাম, 'ঠিক আছে। আপনার কথাই মানিয়া লইলাম। ঐ সব শব্দের প্রতিশব্দ আমি লিখিয়া দিব। কিন্তু এক শর্তে।'

ভদ্রলোক খুশীতে হাসিতে যাইতেছিলেন অকস্মাৎ মুখের হাসির বদলে চোখে কৌতূহল দেখা দিল। বলিলেন ঃ কি শর্ত?

আমি ঃ আপনি বহু হিন্দু গ্রন্থকারের বই-এর প্রকাশক। তাদের ডাকিয়া রাযী করুনঃ তাদের বই এ পরিশিষ্টের শব্দার্থে ঈশ্বর অর্থ আল্লাহ, জল অর্থ পানি, উপবাস অর্থ রোযা ইতাদি যোগ করিবেন। এতে রাযী আছেন আপনি?

ভদ্রলোক রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এরপর যা কথাবার্তা হইল, তার খুব স্বাভাবিক

৫। তথ্যসূত্র ঃ ওসমান গনি, দৈনিক সংগ্রাম, ২১/১/৯৪।

পরিণতি হইল আমার জন্য খারাপ। ভদ্রলোক স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, আমার সাথে তার চুক্তি বাতিল। তিনি কপিরাইট কিনিবেন না। ব্লক তৈয়ার করিতে তার যে হাজার খানেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, তা তিনি আমার কাছে দাবি করিলেন না। আমার অগ্রিম নেওয়া একশত টাকা ফের দিয়া যে কোনও দিন আমি পান্ডুলিপি ফেরত নিতে পারি বলিয়া ভদ্রলোক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা আমিও উঠিলাম। 'আদাব বলিয়া বাহির হইলাম।...."[৬]

গিয়াছিলাম মোটরে। ফিরিতে হইবে ট্রামে।

মুসলমানী শব্দের প্রতি হিন্দুরা যেভাবে মারমুখো হয়ে উঠেছিলো, তাতে অনেকেই এটাকে মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা আখ্যায়িত করেছেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার "সংস্কৃত কথা' (বাংলা একাডেমী প্রকাশনা) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হিন্দুরা যে মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার হেতু মুসলিম বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ তাদের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের নেতা ও পত্রিকা সম্পাদকগণ সহায়তা করছেন। বিদ্বেষের হাতে ক্রীড়নক বলে তারা বুঝতে পারছেন না তথাকথিত নেতা ও সম্পাদকগণ তাঁদের মিত্র নন, শত্রু। নতুবা হিতকামী, ছদ্মবেশধারী অনিষ্টকারীদের শায়েস্তা করতে তারা বদ্ধপরিকর হতেন।

আমি যে 'মুসলিম বিদ্বেষ' কথাটা বলেছি, তা অকারণে নয়, তার যুক্তি দৃঢ়, ভিত্তিভূমি আছে। কিছুদিন আগেও অভিজাত কবি মোহিতলাল মজুমদার ও ছন্দ-সম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণ বাংলাকাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরবী-ফারসী শব্দের মিশাল দিয়ে রচনায় মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তখন কোন প্রতিবাদ হয়নি এবং বর্তমানে বিষ্ণু দে প্রমুখ লেখকগণ যে ইংরেজী শব্দ ও গ্রীক দেব দেবীর নাম ব্যবহার করে কবিতা লিখছেন, তার বিরুদ্ধেও কোন প্রতিবাদ হচ্ছে না, দোষ কেবল বেচারী মুসলমান লেখকদের বেলা।[৭]

রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীও মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। 'বিশ্বকবি'র উদার হৃদয়ে গোটা বিশ্ব ঠাঁই পেলেও মুসলমান কিন্তু ঠাঁই পায়নি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'রক্ত' না লিখে 'খুন' কেন ব্যবহার করেন এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

১৯২৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র পরিষদে এক সংবর্ধনার উত্তরে বাঙলা কবিতায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"সেদিন কোন এক বাঙ্গালী কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন খুন। যে কবি প্রচলিত বাংলা শব্দ বাদ দিয়ে খুন ব্যবহার করে, সে

৬। আবুল মনসুর আহমদ ঃ আত্মকথা ঃ পৃঃ ২৭২।
৭। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঃ সংস্কৃত কথা ঃ বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা, পৃঃ ১৯২-১৯৩।

কবি বাংলা কাব্যে রং ধরাতে পারে না বলেই তাক লাগাতে চাইছে।"

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য পরদিন সৃজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠিতে' ছাপা হয়। এতে নজরুল ক্ষুব্ধ হন। কারণ তারই লেখা- 'উঠিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন।

পরবর্তীতে নজরুল ইসলাম ১৩৩৪ সনের 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় ১১ই পৌষ সংখ্যায় 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির জবাবে নজরুল তার অনেক যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে লিখেছিলেন ঃ

> .... আজকের 'বাঙলা কথায়' দেখলাম তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।... আজ আমাদের মনে হচ্ছে আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।
> 'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায় মুসলমানী বা বল শেভিনী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।
> আমি শুধু 'খুন' নয়-বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি বিশ্ব কাব্য লক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। .... বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরো 'খুবসুরতই' দেখায়। আজকের কলালক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই তা মুসলমানী ঢং-এর।... পন্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন। তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে... এবং তা 'খুন' করা 'খুন' হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপার নয়। হৃদয়েরও খুন-খারাবী হতে দেখি আজো এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।"[৮]

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে এভাবে ক্রুসেডে নেমেছিলেন। বাংলা ভাষা থেকে মুসলমানী শব্দ তার উত্তরসূরীরাও ঝেটিয়ে বিদায় করেছিলেন। মুসলমানদের উপর অন্যায়ভাবে জোর করে পৌত্তলিক শব্দ চাপিয়ে দিয়েছিলো। ঠিক একই স্টাইলে স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলাদেশে মুসলমানী শব্দ ঝেটিয়ে বিদায় করার মহোৎসব শুরু হয়েছে। তবে আগে করেছে রবীন্দ্রবাবু এবং তাঁর উত্তরসূরীরা। আর তখন করেছে রবীন্দ্র প্রেমিক মুসলিম বাবুরা। আগে বাংলা ভাষা ও নজরুলকে দ্বিখন্ডিত করেছে অসিতবাবুর পূর্বসূরীরা; এখন এই অপকর্মটি করছে পশ্চিম বাংলার অসিত বাবুরা এবং তাদের এদেশীয় তাবেদার ফেরদাউস খানেরা। কাজেই জনমনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, মুসলিম বিদ্বেষী জমিদার রবীন্দ্রনাথকে অখন্ড কবি, নজরুলকে খন্ডিত এবং উর্দুর পরিবর্তে আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দাসত্ব বরণের জন্যই কি বরকত, সালাম, জব্বার, শফিক বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন? এর সদুত্তর আসা দরকার।

৮। 'আত্মশক্তি', ১১ পৌষ, ১৩৩৪।

মুসলিম জাগরণে কবি নজরুলের কাব্য 'কোথা সে মুসলমান?'

"বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তুর্য,
হুশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো ওঠ মুস্‌লিম হাঁকো হাইদরী হাঁক।
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক।"

- নজরুল

একটি জাতীয় দৈনিকে চিঠিপত্র কলামে "লন্ডনের স্কুল শিক্ষিকার কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য" শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠির বৃত্তান্ত নিম্নরূপ ঃ

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্মিংহাম। আমার এক বন্ধু এই শহরে বাস করেন বহুদিন ধরে। গত বছরের শুরুর দিকে লন্ডনের এক বৈঠকে তিনি একটি সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। আমার বন্ধু শিক্ষকতা করেন স্থানীয় একটি সেকেন্ডারী স্কুলে। একবার তিনি তার একজন মহিলা সহকর্মীকে একখন্ড কোরআন দিয়েছিলেন পড়ার জন্য। সপ্তাহখানেক পর যখন ভদ্র মহিলা বন্ধুকে কোরআন মজীদের ইংরেজী তরজমা ফেরত দিলেন, তখন এদের উভয়ের মধ্যে কোরআনের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল ঃ বন্ধুটি তার সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন, গ্রন্থটি কেমন লেগেছে বলুন। ভদ্র মহিলা জবাব দিলেন, 'চমৎকার। নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট বই।' বন্ধুটি মনে মনে খুশী হচ্ছিলেন, ভাবছিলেন, হয়তো মহিলা এবার ইসলাম গ্রহণ করবেন, এমন ধরনের একটি জিজ্ঞাসা তার সামনে পেশ করতে যাবেন– এমন সময়ে মহিলাটি তাকে বলল, 'আপনাদের অন্য কোরআনটি কোথায়? আমাকে তা-ও একটু পড়তে দেবেন!' আমার বন্ধু এবার একটু আশ্চর্যই হলেন। বললেন, 'এ কি বলছেন আপনি। আমাদের কোরআন তো একটিই। খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের মত, আমরা তো কোরআনকে বিকৃত করিনি। কোরআন আমাদের কাছে 'অরিজিনাল ফর্মেই' মজুদ রয়েছে। বুঝতে পারলাম না, আপনি আরেক কোরআন বলতে কি বোঝাতে চাইলেন।' এবার ভদ্র মহিলা বললেন, না আসলে তেমন কিছু না, আপনি প্লিজ অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনাদের এই কোরআনের কোনো বিকৃতি ঘটেছে তেমন কিছু আমি বলিনি। আসলে আমি যা বলছিলাম তা হচ্ছে, আপনি আমাকে যে কোরআন পড়তে দিয়েছেন তা তো নিঃসন্দেহে একখান সুন্দর কেতাব, কিন্তু আমি আপনাদের সেই কোরআনটি দেখতে চাই যা আপনারা প্রাত্যহিক জীবনে 'প্র্যাকটিস' করেন। যে কোরআন আপনি আমাকে

দিয়েছেন তা তো আপনাদের কাউকেই আমি মেনে চলতে দেখি না। আমার মুসলিম প্রতিবেশি আর খৃস্টান প্রতিবেশীর বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে কোন তফাৎ আমি দেখতে পাইনি। এরা উভয়েই সুদের ভিত্তিতে বাড়ী কেনে। এরা উভয়ই সুদের ওপর ব্যবসা করে, মিথ্যা কথা উভয়েই পাল্লা দিয়ে বলে। জুয়ার আড্ডায় উভয়ে একত্রেই হারে-জিতে। নামায, রোযার কথা বলবেন? তাতেও এরা দু'জন সমান। কেউই মসক্-চার্চ-এর ধারে-কাছে যায় না। আপনিই বলুন, এ অবস্থায় আমার মত একজন ব্যক্তি বুঝবে কি করে যে, আপনাদের আসল কোরআন কোন্‌টি। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, তা নিঃসন্দেহে ভিন্ন কিছু । সে ধরনের কিছু চেয়ে আমি যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে আমি দুঃখিত।'

আমার বন্ধুটি তো একথা শুনে রীতিমত হতবাক হয়ে গেলেন। কি বলবেন, ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিলেতের বার্মিংহাম আমাদের এখান থেকে ৭ হাজার মাইল দূরে হলেও এই কথা কয়টি মনে হয় আমাদের অন্তরের অনুভূতি থেকে খুব দূরে নয়। আপাদমস্তক আয়নার সামনে একবার নিজেকে দাঁড় করালে অজান্তেই আমাদের মনই বলে উঠবে, আসলে আমাদের সেই ব্যবহারিক কোরআনটি কোথায়?

তাকের ওপর গেলাফে মোড়ানো কোরআন মজীদ আর ব্যবহারিক জীবনের কোরআন মজীদ মুসলমানদের কাছে এ দুটো আলাদা নয়। মুসলমানদের কোরআন একটাই। 'তাক' থেকে 'তাজ' পর্যন্ত কোরআন একটিই।[১]

শিক্ষিকা ভদ্র মহিলার প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। ১৮৩৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সে সময়ে ১৮৩২ সালে দাখিলকৃত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে কমন সভায় ব্যাপক আলোচনা হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন একখানি কোরআন শরীফ হাতে করে কমন সভায় প্রবেশ করেন। পবিত্র গ্রন্থখানি উঁচু করে ধরে বলেছিলেন ঃ এটা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন। বৃটিশেরা বর্তমানে অনেকগুলো মুসলমান দেশ দখল করে নিয়েছে। যদি এই দেশগুলোর ওপর বিনা বাধায় বৃটিশদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায় তাহলে এই কোরআন শিক্ষা থেকে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

উদারপন্থী দলের মিঃ ম্যালকম বলেছিলেন, আমাদের ক্রমশ উন্নতি সাধনের পথে অগ্রসর হতে হবে। যখন আমাদের শাসন শেষ হবে, এবং তা হতে বাধ্য (যদিও সম্ভবত বহু পরে) তখন আমাদের শিক্ষার বিকিরণের স্বাভাবিক সুফল স্বরূপ আমাদের জাতি হিসেবে এ গর্ব থাকবে যে, আমরা ভারতের চির পরাধীনতার পরিবর্তে সভ্যতাকেই উচ্চ স্থান দিয়েছিলাম। আমাদের ক্ষমতা শেষ হলেও আমাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃর্তিত্ব হবে, কারণ আমরা একটা এমন বৃহৎ নীতিবোধের স্মৃতিসৌধ রেখে যাব, যা মানুষের সব নির্মিতির চেয়ে মহত্ত্বর ও অবিনশ্বর।

উগ্রপন্থী দলের আইন সভার সদস্য মেকলে বলেছিলেন, বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে সমাজে যারা শাসক-শাসিতের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ

১। মকবুল আহমদ, লন্ডন। দৈনিক ইনিকিলাব, মার্চ, '৯৮।

করবে। তারা রক্ত-মাংসে গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় তাহলে আমাদের তরফ থেকে কোন রকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এ ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও প্রয়োজন হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এ অসাধ্য সাধন হবে।

সুতরাং সুকৌশলে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে পবিত্র কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরিয়ে দেয়। শুধু এদেশের মুসলমানদেরকেই নয়, এই ইংরেজরা যেখানেই তাদের আধিপত্য বিস্তার বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে সেখানেই তারা এই অপকর্মটি করেছে। মুসলমানদের ইহকাল ও পরকালের দিক-নির্দেশক পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শুধুমাত্র ছওয়াবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। ফলে মুসলমানেরা পরিণত হয়েছে মেরুদন্ডহীন জাতিতে। এক কথায় ভেজাইল্যা মুসলমানে। তাই মহাকবি ইকবাল বলেছেন ঃ

"ওঁরা বিশ্বে সম্মানিত হয়েছিল খাঁটি মুসলমান হয়ে, আর তোমরা ধ্বংস হচ্ছো কোরআন পরিত্যাগ করে।"

শুধু মহাকবি ইকবাল কেন? এরূপ বক্তব্য অনেক অমুসলিম মনীষীও রেখে গেছেন। একদিন এক খৃষ্টান বন্ধু বার্নার্ড শ'কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, "আপনি ইসলামের প্রতি যখন এতই অনুরক্ত তখন ইসলাম গ্রহণ করছেন না কেন?"

তিনি বলেছিলেন যে, "আমি এই ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি কিন্তু কোথায় সেই মুসলিম সমাজ যেখানে প্রকৃত মুসলমান হয়ে আমি বসবাস করতে পারবো।"

বছর দু'য়েক আগে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়- ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান-ইহুদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চতুর্মুখী আক্রমণ বা চক্রান্ত দেখে একজন আমেরিকান নাগরিকের ইসলাম ধর্ম বিষয়ে জানার আগ্রহ জন্মে। তিনি এই ধর্ম বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করে শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর এই নও-মুসলিম আমেরিকান আক্ষেপ করে বলেছিলেন- "মেঘ যেমন সূর্যকে আড়াল করে রাখে, মুসলমানরাও তেমনি ইসলামকে আড়াল করে রেখেছে।"

পবিত্র কোরআন পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের আজ বেহাল অবস্থা। সবচেয়ে বেহাল ও লেজে গোবরে অবস্থা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের। মুসলমানদের চিরকাল গোলামে পরিণত করার জন্যে তারা এদেশে তৈরী করে ছিলো দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি নৈতিক বির্বজিত বৈষয়িক অর্থাৎ স্যাকুলারিজম শিক্ষা, আর অন্যটি বৈষয়িক শিক্ষা বিবর্জিত মাদ্রাসা শিক্ষা। একদিকে ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কারণে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসছে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী আলেম; আর অন্যদিকে কলেজ-ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী বলে

সাহেব। মুসলমানদেরকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ইংরেজরা অত্যন্ত সুকৌশলে দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে। এর ফলে ইসলামের প্রকৃত আবেদন মোল্লা ও সাহেবদের উভয়ের কাছেই অনুপস্থিত। উভয়েই বিভ্রান্ত। মানবতার মহান ধর্ম ইসলাম হয়েছে বিতর্কিত। আক্ষরিক অর্থে এরা দু'টি ভাগে বিভক্ত হলেও প্রকৃত অর্থে উভয় দলই কিন্তু ঐ বিজাতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন। আর জাতি হিসাবে মুসলমানরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। আর এর মধ্যে যদি কেউ ইসলামের সঠিক বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেন, এরা তখন সাহেবদের কাছে হয়ে যান ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক। আর মোল্লাদের কাছে হয়ে যান কাফের। কবি নজরুলের ভাগ্যেও তা ঘটেছিলো। কবি নজরুল ইসলাম গানে, কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে ও বক্তৃতায় চেষ্টা করেছেন এই অধঃপতিত পরাধীন অনৈক্য বিভ্রান্ত মুসলমানদের জাগাতে। মহানবী (সাঃ) সর্ব যুগের সর্বকালের মহামানব। তিনি এসেছিলেন মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় নিশ্চিত করতে। জুলুম সরিয়ে ইনসাফ কায়েম করে দেখাতে। শান্তি ও সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে। মানবতার সুমহান কল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর বিশাল দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। এ জন্যে আমরা ধন্য। আমরা সৌভাগ্যবান। আমরা কল্যাণের সন্ধান প্রাপ্ত। তাই কবি তাঁর এই আগমনকে চিত্রিত করেছেন আশ্চর্য সুন্দর বন্দনা দিয়ে। যেমন ঃ

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন ঊষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে॥
মানুষে মানুষে অধিকার ছিল যে জন,
এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন।
মানুষের লাগি চির দীনহীন সাজিল যে জন
বাদশা ফকিরে এক সামিল করিল যে জন
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই যে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
(আজি) মাতিল বিশ্ব নিখিল মুক্তি কলরোলে।

আসিছেন হাবিবে খোদা, আরশ পাকে তাই উঠেছে শোর,
চাঁদ পিয়াসে ছুটে' আসে আকাশ-পানে যেমন চকোর,
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে,
তেমনি করে হরষিত ফেরেশতা সব উঠলো গেয়ে,-
দেখ   আজ আরশে আসেন মোদের নবী কমলীওয়ালা
হের   সেই খুশীতে চাঁদ-সুরুয আজ-হল দ্বিগুণ আলা॥

ফকির দরবেশ আউলিয়া যাঁরে
ধ্যানে জ্ঞানে ধরতে নারে
যাঁরা মহিমা বুঝতে পারে
এক সে আল্লাহ তালা॥

বারেক মুখে নিলে যাঁর নাম
চিরতরে হয় দোযখ হারান,
পাপীর তরে দস্তে বাঁহার
কওসরের পেয়ালা॥

মিম হরফ না থাকলে যে আহাদ,
নামে মাথা যার শিরীন শহদ,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন উজালা॥

★ ★ ★

সৈয়দে মক্কী মদনী আমার নবী মোহাম্মদ।
করুণাসিন্ধু খোদার বন্ধু নিখিল মানব-প্রেমাস্পদ॥
আদম নূহ ইবরাহিম দাউদ সোলেমান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য দিল আমার নবীর, তাদের কালাম হ'ল রদ।।
যাহার মাঝে দেখল জগৎ ইশারা খোদার নূরের,
পাপ দুনিয়ার আনল যে রে পুণ্য বেহেশতী সনদ॥

হায় সেকান্দর খুঁজল বৃথাই হায়াত এই দুনিয়ায়
বিলিয়ে দিল আমার নবী যে সুধা মানব সবায়।

হায় জুলেখা মজল বৃথাই ইউসেফের ঐ রূপ দেখে,
দেখলে আমার নবীর সুরত যোগীন হ'ত ভসম্ মেখে।
শুনবে নবীর শিরীন জবান, সাউদ মাগিত মদদ॥

ছিল নবীর নূর পেশানিতে তাই ডুবল না কিশতী নূহের,
পুড়ল না আগুনে হজরত ইব্রাহিম সে নম্রুদের
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ ক'রে নবীর পদ
দোজখ আমার হারাম হ'ল
পিয়ে কোরানের শিরীন্ শহদ্॥

★ ★ ★

মুসলমানদের স্বরূপ দেখে কবি আক্ষেপ করে তাঁর গানে লিখেছেন ঃ

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু জ্ঞান॥
যার মুখে শুনি' তওহিদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিও সালাম;
যার দ্বীন্, দ্বীন্ রবে কাঁপিত দুনিয়া জ্বীন্-পরী ইনসান,
স্ত্রী পুত্রের আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে কোরাবানী দিত প্রাণ, হায়, আজ তারা মাগে ভিগ্।
কোথা সে শিক্ষা-আল্লাহ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা,
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে ল'য়ে কোরআন॥

মুসলমানদের মোনাফেকী চরিত্র দেখে কবি নজরুল 'খালেদ' কবিতার এক স্থানে লিখেছেন ঃ

"খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই,- না, না, ব'সে ব'সে শুধু
মুনাজাত ক'রি, চোখের সুমুখে নিরাশ সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নামাজ প'ড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবাগো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, "প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেই নাই।"

তাই ইসলামের নির্ভীক তৌহিদের সর্বজয়ী বাণী নজরুলের কণ্ঠে চমৎকারভাবে ফুটেছে এভাবে-

"কোথা সে শক্তি সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম-শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার?
কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ ছাড়া করেনা কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
অন্যের দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে,
আসেনি ক দুনিয়ায় মুসলমান, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন, ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি যে সব আজ?

বিশ্বের বিস্ময় নবী ও রসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতার মুক্তি দূত বিশ্বনবী মুহম্মদ (সাঃ) এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন মানব জাতির জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন হিসাবে। কবি নজরুলের ভাষায় ঃ

"নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মোহাম্মদ রসূল
কুল-মাখলুকাতের গুলবাগে
যেন একটি ফোটা ফুল।".....

★ ★ ★

বেখবর ও মোনাফেক মুসলমানদের ভীরুতা-জড়তা লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে অগ্নি সঞ্চার করে কবি নজরুল গেয়েছেন ঃ

আনোয়ার! আনোয়ার
যে বলে সে মুসলিম জিব ধরে টানো তার।
বেঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার!

আনোয়ার! ধিক্‌কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার-
তলোয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার,
যারা ছিল দুর্দম আজ তার দিকদার!
আনোয়ার! ধিক্‌কার!

ইসলামের সাম্যের বাণী কবি নজরুলের গানে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি'
হে হজরত, বাদশাহ্ হয়ে ছিলে তুমি উপবাসী॥
(তুমি) চাহ নাই কেহ হইবে আমীর, পথের ফকীর কেহ
(কেহ) মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই, কাহারো সোনার গেহ
ক্ষুধার অন্ন পাইবে না কেহ, কারো শত দাস দাসী॥
(আজ) মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই
ধনী মুস্‌লিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই
(তাই) তোমারেই ডাকে যত মুসলিম গরীব শ্রমিক চাষী।
বঞ্চিত মোরা হইয়াছি আজ তব রহমত হ'তে
সাহেবী গিয়াছে, মোসাহেবী করি ফিরি দুনিয়ার পথে,
আবার মানুষ হব করে মোরা মানুষের ভালবাসি ॥

আল্লার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে কবি নজরুল গেয়েছেন ঃ

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ; যাঁহার তারিফ জগৎময়॥
আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥

কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার ধর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ।
"আল্লাহু আকবর' ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী
আখের মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ যেথায় রয় ॥

যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে তাদের উদ্দেশ্যে কবি নজরুল 'রণভেরী' কবিতায় লিখেছেন ঃ

ঝুটা দৈত্যেরে নাশি, সত্যেরে
দিবি জয়টীকা তোরা, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই হত্যায়।
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুসী লেখা আমাদের খুনে নাই!
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের মুখ চাই!
লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা।

পরাধীন আমলে মুসলমানেরা তাদের জাতিসত্তা হারিয়ে পরগাছা জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। নজরুল তাদেরকে নিজ জাতিসত্তা ও সাম্যের কথা স্মরণ করিয়ে লিখেছেন ঃ

"ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্যমৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত-বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তি ধারা
উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি'
আমরা সেই সে জাতি।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি ক ইসলাম,
সত্য যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমীর ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব এক সাথী

আমরা সেই সে জাতি।
নারীকে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতের বোরখা উতারি এনেছি আশার ভাতি-
-আমরা সেই সে জাতি।

ইতিহাস অসচেতন জাতি হীনমন্যতায় ভোগেন। তাই মুসলমানদেরকে তাদের গৌরবময় ইতিহাসের অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'খালেদ' শিরোনামে নজরুল একটি বিকট কবিতা লিখেছেন। কবিতার একস্থানে নজরুল লিখেছেন ঃ

"খালেদ! খালেদ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!
খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ব বিজয়ী, আমরা হ'টেছি পিছু।
তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা!

খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই,- না, না, ব'সে ব'সে শুধু
মুনাজাত ক'রি, চোকের সুমুখে নিরাশা সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নাজাম প'ড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবাগো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, 'প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেহ নাই।

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চষে!
হান্‌ফী ওহাবী লা-মজ্‌হাবীব তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল 'তল্‌পী তোল!'
ভিতরের দিকে যত মারিয়াছি বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া গরু ছাগলের মত!
খালেদ! খালেদ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশমন-মারা দু'টো পয়জারও হবে

খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি।
মওতের দারু পিইলে ভাঙেনা হাজার বছরী ঘুম?
খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম।
খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,
চাই না মেহ্দী, তুমি এসো বীর হাতে নিয়ে শম্‌শের!"

কবি নজরুল ইসলাম পবিত্র কলেমার মাহাত্ম্য এবং খাঁটি ঈমানদার মুসলমানের স্বরূপ কিরূপ-এর সফল চিত্র এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। যেমন ঃ

কলেমা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি॥

ঐ কলেমা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কলেমা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার সুখময় হয় তার-
মুসিবত আসে না কো, হয় না ক্ষতি॥

হরদম জপে মনে কলেমা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন,
দীলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি॥

এসমে আজম হতে কদর ইহার,
পায় ঘরে বসে খোদা আর রসুলের দীদার,
তাহার হৃদয়াকাশে সাত বেহেশ্‌ত ভাসে
তার খোদার আরশে হয় আখেরে গতি॥

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায়-
আমি কি তার ভয় করি-
পাক্কা ঈমান তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী॥
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পাল তুলে'
ঘোর তুফানকে জয় ক'রে ভাই
যাবই কূলে
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নামের,
গুণের রশি ধরি॥

খোদার রাহে সঁপে দেওয়া ডুববে না মোর তরী,
সওদা করে ফিরবে তীরে সওয়াব-মানিক ভরি।

দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত,
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ-যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহেশ্‌ত-বন্দরেতে রে
এই যে কিশ্‌তীতে চড়ি॥

মুসলমানদের যাকাত প্রদান সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন তাঁর কবিতার ভাষায় ঃ

দে জাকাত দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দীল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত॥
দেখ পাক কোরআন, শোন নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান।
তোর একার তরে দেন্‌নি খোদা দৌলতের খেলাত্ ॥

তোর দর-দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম,
আছে দৌলতের তোর তাদেরও ভাগ-বলেছেন রহীম।
বলেছেন রহমানুর রহীম, বলেছেন রসুলে করীম,
সঞ্চয় তোর সফল হবে, পাবি রে নাজাত ॥

এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে,
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবে-রাতে।
এই জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশতী সওগাত ॥

আজকে বিশ্বের মুসলমানেরা পবিত্র হজ্বের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে গেছেন। ফলে, মুসলিম উম্মাহ আজ মুখে আল্লাহ্'র আধিপত্য স্বীকার করলেও বাস্তবে আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ ধরেছে রাশিয়ার রশি, কেউ ধরেছে আমেরিকার রশি, কেউ ধরেছে বৃটিশের রশি, কেউ ধরেছে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র ও মানব রচিত ভ্রান্ত মতবাদের রশি। ফলে, বিশ্বের মুসলমানেরা পরিণত হয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত জাতিতে। তাই কবি নজরুল দুঃখ করে লিখেছেন ঃ

জাগে না সে জোশ ল'য়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ॥

যাহার তকবীর ধ্বনি
তক্‌দীর বদলালো দুনিয়ার,
না-ফরমানির জামানায়
আনিল ফর্‌মান খোদার,
পড়িয়া বিরান আজি সে বুলবুলিস্তান ॥

নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ঈমান,
নাহি আলীর জুল্‌ফিকর,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি বীর শহীদান॥

নাহি আর বাজুতে কুওত্‌
নাহি খালেদ মুসা তারেক,
নাহি বাদ্‌শাহী তখত্‌ তাউস
ফকির আজ দুনিয়ার মালেক,
ইস্‌লাম কেতাবে শুধু, মুস্‌লিম গোরস্থান ॥

আধুনিক মুসলমানদের নিস্পন্দ ধমনীতে ইসলামী শৌর্য-বীর্যের তপ্ত রক্ত প্রবাহের গতিবেগ সঞ্চারের মহান উদ্দেশ্যে এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানিয়ে কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উচুঁ করি মুসলমান।
দাওত্‌ এসেছে নয়া জমানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান॥
মুখেতে কলমা, হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া ইশক্‌ আল্লার
চল্‌ আগে চল্‌ বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ্‌
বাঁধা যে রে তোর পাক্‌ কোরান॥

নহি মোরা জীব ভোগ-বিলাসের,
শাহাদত ছিল কাম্য মোদের,
-ভিখারীর সাজে খলিফা-যাদের
শাসন করিল আধা জাহান-
তা'রা আজ পড়ে ঘুমায় বেহুশ
বাহিরে বহিছে ঝড়-তুফান ॥

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর্
মগ্‌রেবের আজ শুনি আজান।
জামাত্-শামিল হও রে এশা-তে
এখনো জমা'তে আছে স্থান॥

শুকনো রুটিরে সম্বল ক'রে
যে-ঈমান আর যে-প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক'রে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
'আল্লাহু আকবর' রবে পুনঃ
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান ॥

বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহবান ধ্বনিল কে বিষাণে?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!
নাচে পাপ-সিন্দুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!

তমসাবৃতা ঘোর' 'কিয়ামত' রাত্রি
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী!
দমকি 'দমকি' দেয়া হাকে, কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থর থর যামিনী!

লংঘি' এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে-
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন।

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সুরক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও,
কান্ডারী আহ্মদ, তরী ভরা পাথেয়!

আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর!
কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা'
দাঁড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ!

"শফায়াত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল
'জান্নাত' হ'তে ফেলে জুরী রাশ রাশ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী!
বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

ঘুমন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে জেহাদের জোশে জাগ্রত হবার আহ্বান জানিয়ে কবি নজরুল আরো লিখেছেন ঃ

খয়বর-জয়ী আলী হায়দর,
জাগো জাগো আরবার!
দাও দুশ্মন-দুর্গ-বিদারী
দু'ধারী জুল্ফিকার।

এস শেরে-খোদা ফিরিয়া আরবে-
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলী' রবে;
হায়দরী-হাঁকে তন্দ্রা-মগনে
করো করো হুঁশিয়ার।।
আল্‌বোর্জের চূড়া গুঁড়া-করা
গোর্জ আবার হানো,
বেহেশতী সাকী, মৃত এ জাতিরে
আবে-কওসর দানো।

আজি বিশ্ববিজয়ী জাতি যে বেহুঁশ,
দাও তারে নব কুয়ত ও জোশ্‌,
এস নিরাশার মরু-ধূলি উড়ায়ে
দুল্‌দুল্‌ আসওয়ার।

হাতে হাত দিয়ে আগে চল, হাতে
নাই থাক হাতিয়ার।
জমায়েত হও, আপনি আসিবে
শক্তি-জুল্‌ফিকার।।

আনো আলীর শৌর্য, হোসেনের ত্যাগ,
ওমরের মতো কর্মানুরাগ,
খালেদের মতো সব অসাম্য
ভেঙে করো একাকার।।

ইস্‌লামে নাই ছোট বড় আর
আশ্‌রাফ আত্‌রাফ,
এই ভেদ জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করো মিস্‌মার সাফ।

চাকর সৃজিতে চাকুরী করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে?

মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন-
এ জুলুম সহে নি ক ইসলাম,
সহিবে না আজো আর।।

★ ★ ★

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান।।
মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী জোশ্‌ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্‌ আল্লার
চল আগে চল বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ্‌
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরআন।।
নহি মোরা জীব ভোগ-বিলাসের,
শাহাদত্‌ ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান-
তারা আজ পড়ে ঘুমায় বেহোঁশ্‌,
বাহিরে বহিছে ঝড়-তুফান।।
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর্‌
মগ্‌রেবের আজ শুনি আজান।
জমাত-শামিল হও রে এশাতে
এখনো জমাতে আছে স্থান।।
শুকনো রুটিরে সম্বল ক'রে
যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক'রে

সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহু আক্‌বর রবে পুনঃ
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান।।

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বালা
গাজী মোস্তফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কী সুর্খ-তাজ।

রেজা পাহ্‌লবী সাথে জাগিয়াছে
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিসরী; জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল
ভুলি' গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ নেজাদ্ আরবে ইব্‌নে সউদ্,
আমানুল্লার পরশে জেগেছে কাবুলে নবীন আল-মাহমুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ বন্দী করিম রীফ কামাল।।
জাগে ফয়সল্ ইরাক আজমে, জাগে নব হারুন অল্ রশীদ,
জাগে বায়তুল্ মোকাদ্দেস্ রে জাগে শাম দেখ্ টুটিয়া নিঁদ,
জাগে না কো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল।।
মোরা আস্‌হাব কাহাফের মত হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ্ কোন কালে, তারি করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টাল্ মাতাল।

ইসলামের ঐতিহাসিক মর্মান্তিক ঘটনা মুহররম বা পবিত্র আশুরা ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত নিয়ে শুধু শোক, মাতম ও শুধু নফল এবাদত বন্দেগী করার শিক্ষা দেয় না। কবি নজরুল আশুরার প্রকৃত শিক্ষা ও মর্মবাণী তুলে ধরেছেন স্বচ্ছ আয়নার মতো অতি সুন্দর ও সহজ বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে। কবি বলেন ঃ

"হাসানের মত নিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের;
আস্‌গর সম দিব বাআরে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্!
সখীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা-কন্যায়,
কাশিমের মত দেবো জান্ রুবি, অন্যায়।
মোহর্‌রম! কারবালা! কাঁদো "হায় হোসেন!"
দেখো মরু সূর্য এ খুন যেন শোষে না!

বর্তমানে মুসলমানেরা আযান দেয়ার প্রথাকে একক অর্থে ব্যবহার করছেন । কিন্তু কবি নজরুল ইসলামের আযানের আহ্বানকে ব্যাপক অর্থে উপলব্ধি করেছেন তাঁর কবিতায়। যেমন ঃ

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই
নিঁদ-মহ্‌লার আঁধার-পুরে।
শুনছি আজান গগন-তলে
অতীত-রাতের মিনার চূড়ে।।

সরাই-খানার যাত্রীরা কি
"বন্ধু জাগো" উঠল হাঁকি?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখী
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে।।

আজ কি আবার কাবার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে;
নামল কি ফের হাজার স্রোতে
'হেরা'র জ্যোতি জগৎ জুড়ে।

আবার খালিদ তারিক মুসা
আন্‌ল কি খুন-রঙিন ভূষা,
আসল্ ছুটে হাসীন্ ঊষা
নও-বেলালের শিরীন্ সুরে।।

তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের
আরফাতে আজ জুটল কি ফের,
"লা শরীক্ আল্লাহ্"- মন্ত্রের
নামল্ কি বান পাহাড় তুরে।।

আঁজলা ভ'রে আনল কি প্রাণ
কারবালাতে বীর শহীদান,
আজকে রওশন জমীন-আস্‌মান
নওজোয়ানীর সুর্‌খ্ নূরে।।

মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। এই ঈদুল ফিতরের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিধৃত করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। যেমনঃ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
তুই আপ্‌নাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।।
তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ্

দে জাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাতে নিঁদ।।
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুস্‌লিম হয়েছে শহীদ।।
আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশ্‌মন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর্‌ বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ।
ঢাল্‌ হৃদয়ের তোর তশ্‌তরীতে শির্‌ণী তৌহিদের,
তোর দাওত্‌ কবুল করবেন হযরত, হয় মনে উমীদ।।

★ ★ ★

শহীদী ঈদ্‌গাহে দেখ্‌ আজ জমায়েত ভারি।।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি।।
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরোক্ক ইরাক,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি।।
ছিল বেহোশ যারা আঁসু ও আফসোস ল'য়ে।
চাহি ফিরদৌস্‌ তা'রা জেগেছে নও জোশ্‌ লয়ে।
তুইও আয় এই জমাতে ভু'লে যা দুনিয়াদারী।।
ছিল জিন্দানে যারা আজকে তা'রা জিন্দা হ'য়ে
ছোটে ময়দানে দারাজ-দিল্‌ আজি শম্‌শের লয়ে।
তক্‌দীর বদ্‌লেছে আজ উঠিছে তক্‌বীর তারি।

ঈদ উৎসব শুধু আনন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈদের উৎসব ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

"ঈদুল ফিতর আনিয়াছে তাই নব বিধান,
ওগো সঞ্চয়ী উদ্ধৃত যা করিবে দান
ক্ষুধার অন্য হোক তোমার।
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড় তব হাতে
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পেয়ালেতে
দিয়া ভোগ কর বীর দেদার।"

এটাই হলো ঈদুল ফিতরের মূলকথা। ঈদুল ফিতর ভোগের হলেও প্রকারান্তরে এটিও ত্যাগের উৎসব। বস্তুত, ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগের আশা করা যায়।

প্রতি বছর ঈদুল আজহা আমাদের দ্বার আসে নতুন শপথের বাণী নিয়ে। আল্লাহ মানুষকে পশু কোরবানীর মাধ্যমে মানুষের অন্তরের পশু প্রবৃত্তি কোরবানীর তাগিদ দিয়েছেন। কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো ভোগের নয়; ত্যাগের। কিন্তু কোরবানীর এ শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে ভোগের

প্রতিযোগিতা। এই ভোগের প্রতিযোগিতার কারণে সমাজে বা রাষ্ট্রে লোভ-লালসা, হিংসা, বিরোধ-সংঘাত, হানাহানি লেগেই আছে। কোরবানীর প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে থাকার কারণে এটি হয়েছে আমাদের জন্য আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব। তাই, কবি নজরুল ইসলাম কোরবানীর সেই মর্মবাণী তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। কবি বলেন ঃ

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দুর্বল! ভীরু! চুপ রেহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধ মন।
ওরে শক্তি হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।
আজ আল্লাহর নামে জান্ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

★ ★ ★

চাহিনাক গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দাম? ও দান ঝুট।
চাই কোরবানী চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শির চাই তোর তোর ছেলের
দেবে কি? কে আছ মুসলমান?

★ ★ ★

পশু কোরবানীর দিস তখন
আজাদ মুক্ত হবি যখন
জুলুম মুক্ত হবে রে দ্বীন।
কোরবানীর আজ এই যে খুন
শিখা হয়ে যেন জ্বলে আগুন,
জালিমের যেন রাখে না চিন।।
আমিন রাব্বিল আলামিন!
আমিন রাব্বিল আলামিন!

চারিদিকে অন্যায়-অবিচার দেখে নিজের মনকে অভয় মন্ত্র শুনিয়ে কবি নজরুল বললেন ঃ

ও মন কারো ভরসা করিস্‌নে তুই
এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন
ভাবনা কিসের, কিসের ডর
রোকে শোগে দুঃখে ঋণে

নাই ভরসা আল্লা বিনে
তুই মানুষের সহায় মাগিস্
(তাই) পাস্‌নে খোদার নেক নজর।
রাজার রাজা বাদশা যিনি
গোলাম হ, তুই সেই খোদার
বড় লোকের দুয়ারে তুই
বৃথাই হাত পাতিস্‌নে আর।
তোর দুঃখের বোঝা ভারি হ'য়ে
ফেলে প্রিয়জনও যায়রে চলে
(সেদিন) ডাকলে খোদায় তাহার রহম
ঝরবেরে তোমার মাথার পরে।।

সত্য, ন্যায়, ইনসাফ ও সুন্দরের পথে বিভ্রান্ত মানুষকে আহবান জানিয়ে কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

যাবি কে মদিনায়, আয় ত্বরা করি।
তোর খেয়া-ঘাটে এল পুণ্য-তরী।।

আবু বকর উমর খাত্তাব
আর উস্‌মান, আলি হাইদর,
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর,
পাপী সব নাই নাই আর ডর।
এ তরীর কান্ডারী আহ্‌মদ,
পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারী-গান
শোন্ ঐ "লা শরীক্ আল্লাহ!"
মোরা পাপ-দরিয়ার তুফানে আর নাহি ডরি।

শাফায়াত-পাল ওড়ে তরীর
অনুকূল হাওয়ার ভরে,
ফেরেশতা টানিছে তার গুণ,
ভিড়িবে বেহেশতী-চরে।

ঈমানের পারানী কড়ি আছে যার
আয় এ সোনার নায়,
ধরিয়া দীনের রশি

কলেমার জাহাজ-ঘাটায়
ফের্‌দৌস্‌ হ'তে ডাকে হুরী-পরী।।

পরম সত্ত্বা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে কবি নজরুল লিখেন ঃ

তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম-জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ।
দাও সেই হারানো সুলতানত্‌,
দাও সেই বাহু, সেই দিল্‌ আজাদ।।

দাও বে-দেরেগ তেগ্‌ জুল্‌ফিকার
খয়বর-জয়ী শেরে-খোদার,
দাও সেই খলিফা সে হাশ্‌মত
দাও সে মদিনা সে বোগ্‌দাদ।।

দাও সে হাম্‌জা সেই বীর ওলিদ
সেই ওমর হারুন-অল্‌-রশীদ,
দাও সেই সালাহউদ্দীন আবার
পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ।।

দাও সেই রুমী সাদী হাফিজ
সেই জামী খৈয়াম সে তব্‌রিজ
দাও সে আকবর সেই শাহজাহান
সেই তাজমহলের স্বপ্ন-সাধ।

দাও ভায়ে ভায়ে সেই মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্ত মন
হোক বিশ্ব-মুসলিম এক-জামাত
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত-চাঁদ।।

এরকম কালজয়ী ইসলামী কবিতা, গান ও বহু রচনা করেছেন কবি নজরুল ইসলাম। এইসব কবিতা-গানে পবিত্র কোরআন-হাদিসের কথাই বিধৃত হয়েছে বা প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। অথচ অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এগুলো হৃদয়ঙ্গম করার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি নায়েবে রসূল বলে কথিত অনেক নামসর্বস্ব আলেমেরই নেই। যখন কাজী নজরুল ইসলাম এঁদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন অথবা ইসলামের পরিপন্থী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা-গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, তখনই এরা কবি নজরুলকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে। আর অন্যদিকে স্যাকুলারিজম শিক্ষিত সাহেবরা কবিকে এইসব

গান-কবিতার জন্য সাম্প্রদায়িক বা মৌলবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন। আবার যখন কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

"দুর্গতি নাশিনী আমার
শ্যামা মায়ের চরণ ধর
যত বিপদ তরে যাবি
মাকে বারেক স্মরণ কর।"

তখন এইসব কবিতা-গান শুনে হিন্দু বাবুদের সাথে এই মুসলমান শিক্ষিত বাবুরাও হাততালি দিয়ে কবি নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক কবি বলে আখ্যায়িত করেছে।

মুসলমানদের মধ্যে এক দল নজরুলের লেখাকে নিন্দা জানিয়ে বললো, "ইসলামী ভাবধারা নেই, হিন্দু-ঘেঁষা", আর অন্য দল নিন্দা জানিয়ে বললো, "নজরুলের হিন্দু ভাবধারা নেই, বড্ড ইসলামী ঘেঁষা।" আর হিন্দুরা প্রথম দিকে নজরুলকে তাচ্ছিল্য করে বলতো 'মুচলমান লেখক! সে আবার লিখবে কি হে!' কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাঁর লেখায় যখন মুনশিয়ানার পরিচয় পেলো তখন তারা অভিযোগ উঠালেন- "নজরুল কাব্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা নেই।"

তাই কবি নজরুল প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁয়ের চিঠির জবাবে এক স্থানে বলেছিলেন ঃ

"আমার হয়েছে সাপের ছুচো- গেলা অবস্থা। 'সর্ব্বহারা' লিখ্‌লে বলে- কাব্য হ'ল না, 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট' লিখ্‌লে বলে- ও হ'ল ন্যাকামি! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কী? ও না লিখ্‌লে কার কি ক্ষতি হ'ত?

.... এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তা হ'লে মুসলমান কবি দিয়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি কোনকালেই সম্ভব হবে না- 'জৈগুন বিবি'র পুঁথি ছাড়া। বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিত কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দু ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। বাঙলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভূরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নেই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য-হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করছি।"[২]

কবির এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি নিজেই তাঁর অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের কবি হতে

২। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, দ্রষ্টব্য।

চেয়েছেন। কিন্তু তিনি হতে পারেননি।

ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের ৯৪ বছর আগে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন ঃ

“..... ব্রিটিশরা ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের ভিত ভেঙ্গে দিয়েছে, শিল্প-বাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই ধ্বংস করেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এই ধ্বংসের কাহিনীতে কলংকিত। বিরাট এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজাগরণের আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তাহলেও স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণের শুরু হয়েছে।”

কার্ল মার্কসের এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৫৩ সালের ৮ আগস্ট নিউইয়র্কের ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায়। এর প্রায় একশ’ বছর পর চল্লিশ কোটি লোক স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

কার্ল মার্কস-এর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই- কার্ল মার্কস যে সভ্যতার কথা বলেছেন, তা পবিত্র কোরাআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের হাতে গড়া সভ্যতা। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এই দেশে সভ্যতা, বৈভ্যতা ও কালচার বলতে কিছুই ছিলো না। অতঃপর ১৭৫৭ সালের পর বৃটিশের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে তা মুসলমানদেরই অগ্রণী ভূমিকা ছিলো। পরবর্তীতে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সূচিত হয় তাতে নবজাগরণ ছিলো বটে, কিন্তু সেই নবজাগরণের আলোকরশ্মি ছিলোনা। ফলে দু'দু'বার আজাদীর পতাকা বদলিয়েও আমাদের জাতিসত্তা কি তা নির্ণয় করতে পারিনি। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা কি এবং এর উদ্যোক্তা কারা-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বর্তমান বংশধরদের কাছে অজ্ঞাত। জাতীয় জীবনের সব বিষয় বিতর্কিত। এর ফলে জাতি আজ লক্ষ্যহীন, বিভ্রান্ত বৃটিশের তৈরী ভ্রান্ত শিক্ষার নীতির কারণেই কবি নজরুল তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছেন বা কি বলেছেন আমাদের মগজে ঢুকেনি। তাই নজরুলের যথার্থ মূল্যায়ন এদেশে কখনোই হয়নি। কারো কাছে তিনি হয়েছেন কাফের, কারো কারো কাছে হয়েছেন সাম্প্রদায়িক। এ জন্যেই হয়তো কবি নজরুল আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

“আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান,
কোথা সে মুসলমান?”

নজরুল-রবীন্দ্র কাব্যে মানবতা

"রবীন্দ্র সাহিত্য সার্বজনীন নহে..... রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দনও শুনিয়েছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত, জনসাধারণকে সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ গদ্যে, পদ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিক্ষিত মার্জিত সমাজের ভাষা। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষাকে তিনি যথা সম্ভব এড়িয়ে চলেছেন..... রবীন্দ্রনাথকে ঠিক জনগণের মানুষ বলা চলে না।"

- রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই কবিতা চর্চায় প্রবেশ করেন। তেরো বছর বয়স থেকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি সুদীর্ঘ ৬৭ বছর বিনা বাঁধায়, বিনা উপদ্রবে সাহিত্য চর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চা করেছেন জমিদারী স্টাইলে। পাইক-পেয়াদা, সখী-সাথী পরিবেষ্টিত হয়ে। বজরায় নদী ভ্রমণ করে প্রকৃতিকে দেখেছেন গানে, কবিতার ছন্দে, গল্প ও নাটকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সম্পদের প্রাচুর্যের মাঝে থেকে তিনি তাঁর বিশাল সাহিত্যকর্মে সমাজের চিত্র এঁকেছেন। তাই তাঁর আঁকা সমাজচিত্র অসম্পূর্ণ। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে মাসিক প্রবাসী লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব বিখ্যাত কবি। ঠাকুর বাড়ীর উজ্জ্বলতম রত্ন। জয়রাম, দর্পনারায়ণ ও দ্বারিকানাথ আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজদের আমীন ও দেওয়ানগিরি করে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং জমিদারী ক্রয় করে ও বিলেতী হৌসের অংশীদার হয়ে ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট নব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠাকুর বাড়ী কলিকাতার বাবু কালচারের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাবু কালচারের কৌস্তভ মণি; বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-শিরোপা নোবেল প্রাইজ ১৯১৩ সালে অর্জন করে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের চোখে মর্যাদামন্ডিত করেছেন। এ জন্যে বিশ্বসভায় তাঁকে নিয়ে আমরা করি গর্ব।

রবীন্দ্রনাথের মূর্তি স্মরণ হলেই তাঁর আলখেল্লা ও টুপী পরিহিত মূর্তিটিই আমাদের

স্মৃতিপটে বেশী করে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই আলখেল্লা ও টুপীর ভিতরে যে মানুষটি ছিলেন, তিনি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বে ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে যে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন, এটিও প্রতিষ্ঠিত সত্য, যেমন সত্য প্যান্ট-কোট-বুটধারী ইংরেজীয়ানায় চির অভ্যস্ত মধুসূদন ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী।"[১]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে ভারত পথিক, বিশ্ব পথিক নন; বাবু কালচারে সীমিত গন্ডির মধ্যেই রবীন্দ্র সাহিত্যকর্মের বিকাশ এবং এই সীমিত মধ্যবিত্ত সমাজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা; বিরাট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর কবি কর্মের সংযোগ নেই, পরিচয় নেই। রবীন্দ্র-দীপ্তিতে যখন বাংলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত ছিল মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো, তখনই 'লোক শিক্ষক ও জননায়ক' হিসেবে তাঁর মূল্যায়নকালে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন ঃ

"রবীন্দ্র সাহিত্য সার্বজনীন নহে..... রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দনও শুনিয়েছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত, জনসাধারণকে সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ গদ্যে, পদ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিক্ষিত মার্জিত সমাজের ভাষা। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষাকে তিনি যথা সম্ভব এড়িয়ে চলেছেন..... রবীন্দ্রনাথকে ঠিক জনগণের মানুষ বলা চলে না।"[২]

তাঁর বিরাট কবি-কর্মের মূল্যায়ন করেছেন, তাঁরই শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক শিশির কুমার ঘোষ। তিনি বলেছেন ঃ

"একজন শিল্পীকে জানার অর্থ হলো তিনি কি করতে চেয়েছিলেন তা জানা.... রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন না কেন, কল্পনার সূত্রে বোনাজালে 'আভিজাতিক ছন্দের' দোলা তাঁর রক্তে..... আভিজাত্যের উচ্চ মঞ্চ হতে নেমে এসে উদার জনসমাজের 'অখ্যাত জনের' সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের কাব্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিলম্বিত সৎপ্রয়াস.... জনগণের কবি হবার সাধ তাঁর মিটেছে.... বৃহত্তম জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা সম্ভব হয়নি।[৩]

তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গত অবস্থানের জন্যে তার চমৎকার গ্রন্থ 'সহজ পাঠে' নিম্নশ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল। এ কারণে মার্কসবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার স্কুল পাঠ্য তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন।

১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সার রমেশচন্দ্র মিত্র বলেছিলেন ঃ

'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই দেশের মগজ ও বিবেকের ধারক ও বাহক এবং তারাই অশিক্ষিত জনগণের পক্ষে কথা বলার প্রকৃত দাবীদার; জনস্বার্থের স্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক। প্রত্যেক যুগে এটাই সত্য যে, যারা বুদ্ধিজীবী তারাই শ্রমজীবীদের শাসন করবে।'[৪]

১। মাসিক প্রবাসী, ১৩২১ জৈষ্ঠ্য, পৃঃ ১৯৫-২০৩।
২। ভাষা ও সাহিত্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশ, ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৫
৩। রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য, শিশির কুমার ঘোষ ঃ সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ১৩৬৭, পৃঃ ৩৭, ৭৬
৪। Advanced Hist. of India, p. 869.

এ কথার প্রতিধ্বনি মেলে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি থেকে ঃ

'এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাঁকে কেউ দেয়নি যে, চাষ করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সংগে সম্মানে সমান। যেসব কাজে উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানব সমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশী একথা সুস্পষ্ট.... আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্ররা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই।'[৫]

এর চমৎকার জবাব দিয়েছেন জনাব আবদুল ওয়াদুদ তাঁর একটি গ্রন্থে। তিনি বলেছেন ঃ

ইসলামের কিন্তু এ শিক্ষা নয়। 'ডিগনিটি অব লেবার' বা শ্রমের মর্যাদা কথাটা ইসলাম এভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে, শ্রম করাও এবাদত বা উপাসনার সামিল ধরা হয়েছে। আর শূদ্রত্বে কারও অসন্তোষ নেই, এমন অদ্ভুত যুক্তি শুধু তারাই দিতে পারে যারা মানুষের আত্মাকে জন্মগত ছোট হিসেবে ভাবার পক্ষপাতি। জন্মগতভাবে কেউ ছোট বা বড় নয়, কর্ম ফলেই ছোট বা বড় হয়ে যায়, অতএব, বড়ত্ব ও মহত্ত্ব অর্জনের অধিকার দ্বিজ-চন্ডালের সমান।"[৬]

এ শিক্ষা নজরুল ইসলামের কবিতায় আরও সোচ্চার ঃ

'ওকে চন্ডাল চমকাও কেন, ও হে ঘৃণ্য জীব,
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র ওই শ্মশানের শিব।
আজ চন্ডাল কাল হতে পারে মহাযোগী সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ দানিবে করিবে নান্দী পাঠ।'

★ ★ ★

'যত নবী ছিল মেষের রাখাল তারাই ধরিল হাল
তারাই আনিল অমরবাণী- যা আছে, রবে চিরকাল।'

বিশ শতকের প্রথম দিকে নজরুল নির্যাতিত, শোষিত ও উৎপীড়িত জনগণের সংগে একাত্ম হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো লিখেছিলেন। সমাজের দুঃখী মানুষের একজন হিসাবে একজন বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সংবেদনশীল কবি হিসাবে অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর বিদ্রোহ। নজরুল কৃষকের উদ্দেশে লিখেছেন-

'গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।'

শ্রমিকদের উদ্দেশে লিখেছেন-

'হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়।
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কূলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি।'

৫। কালান্তর, শূদ্র ধর্ম, পৃঃ ১৮-২২১
৬। আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্তের সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৮২-৩৮৩

নজরুলের কবিতা ও গানের ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠেছে শোষিত, উৎপীড়িত ও ব্যথিত মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা। যেমন ঃ

'সারাদিন পিটি যার দালানের ছাদ গো,
পেট ভরে ভাত পাইনা ধরে আসে হাত গো।'

এছাড়া তিনি নির্যাতিত নিঃস্ব মানুষের পক্ষে লিখেছেন-

'তোমরা রহিবে তেতলার পরে
আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমাদের দেবতা বলিব
সে ভরসা আজ মিছে।'

১৯২৬ সালে মজদুর স্বরাজ দলের সম্মেলন হয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। এই সভায় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত জনগণের উদ্দেশে লিখেছেন-

'জাগো অনশন-বন্দী, ওঠোরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত।
যত অত্যাচারে আজি ব্রজহানি
হাকে নিপীড়িত জন-মন মথিত বাণী,
নব জনম লভি, অভিনব ধরণী ওরে ঐ আগত।'

কবি নজরুল তাঁর 'কুলি মুজুর' কবিতায় লিখেছেন ঃ

"আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বাড়িয়াছে দেনা, সুধিতে হইবে ঋণ।"

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"আজ নিখিলের বেদনা আর্তপীড়িতের খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ"

★ ★ ★

"মহামানবের মহাবেদনার আজ মহাউত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।"

কবি নজরুল 'সর্বহারা' কবিতায় লিখেছেন ঃ

"মাঝিরে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল।

শক্ত মাটির ঘায়ে হোক
রক্ত পদতল।
প্রলয় পথিক চলবি ফিরে
দলবি পাহাড় কানন গিরি,
হাঁকছে বাদল ঘিরি ঘিরি
নাচছে সিন্ধু জল।
চলরে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল।"

কাজী নজরুল 'শ্রমিকের গান'-এ লিখেছেন ঃ

"ও ভাই আমার মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লাখনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলেরে।
এবার জ্বালবে জগ্য কয়লা কাটা
ময়লা কুলির সেই অনল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।"

এ কবিতার শেষাংশে লিখেছেন ঃ

"ধর হাতিয়ার, সামনে প্রলয় রাতিরে
আয় আলোক স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার নায়ে চড়বি চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।"

নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে এই বিপ্লবী ও প্রতিবাদী গান লিখেও কবি নজরুল নোবেল প্রাইজ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। অথচ বিশ্ব কবি 'ভারত বিধাতা' কবিতার মাধ্যমে নোবেল প্রাইজ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। বলিহারী পাশ্চত্যের মানবতাবাদীদের মানবতাবোধ!

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজের অক্ষমতাকে স্বীকার করেছেন অকপটে। তাঁর 'সুরের অপূর্ণতা' তাঁকে করেছে পীড়িত। তিনি মনে করেছেন, 'সমাজের উচ্চ মঞ্চে' বসে 'সংকীর্ণ বাতায়নে' থেকে তিনি দেখেছেন জগৎ সংসারকে; চিরকালের সাধারণ মানুষ থেকে দূরে, 'সম্মানের চির নির্বাসনে' তাঁর অবস্থান। তিনি লিখেছেন ঃ

"চাষি খেতে চালাইছে হাল

তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার'
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা কবি আরো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানব সভ্যতায় শান্তি, স্বস্তি এবং কল্যাণ সাধন কোন মহামানবের বাণীর দ্বারা অর্জিত হওয়া আর সম্ভব নয়। তাকে অর্জন করবে অগণিত সংগ্রামী মানুষ। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।।"

"ওঠ! জাগ! বীরগণ। দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ।।
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার
জলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে।
যবনের রক্তে ধরা হোক প্লবমান
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান
যবন-শোনিত-বৃষ্টি করুক বিমান।
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক বলবান।"
- *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (নাটক, পুরুষ বিক্রম)*

পরাধীন ভারতে ইংরেজভক্ত রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

"…. ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে [illegible] নিন্দা করার [illegible] পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলুম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গবর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমগ্র ভারতবাসী যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণায়, বিরোধিতায় এবং আজাদীর সংগ্রামে একাকার, জমিদার রবীন্দ্রনাথ তখন সোনার হরিণের প্রত্যাশায় বৃটিশের সঙ্গে আঁতাতে ও তোষণে ব্যস্ত ছিলেন। একদিকে যখন অনার্য বাঙ্গালী সেনারা ইংরেজের দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে বারাসত সেনানিবাসে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে; অন্যদিকে আর্য কবি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় আর্যের পবিত্র পরশ নিয়ে মার অভিষেক পূর্ণ করার জন্যে-

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীস্টান
মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহাসাগরের সাগর তীরে।"

- বলে আকুল আহবান জানিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষে তাঁর প্রশংসায় এবং ইংরেজ বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন "ভারত বিধাতা" নামক সঙ্গীত। পঞ্চম জর্জকে ভারতের বিধাতা আখ্যায়িত করে

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

"জন-গণ-মন-অধিনায়ক, জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা
পাঞ্জাব-সিন্ধুগুজরাট-মারাঠা
দ্রাবিড়- উৎকল-বঙ্গ
বিন্দ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা
উচ্ছল-জলধি-তরুঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জন-গণ-মঙ্গলদায়ক, জয় হে
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে
জয় জয় জয়, জয় হে।"

বৃটিশের এই বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। নোবেল প্রাপ্তি উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র
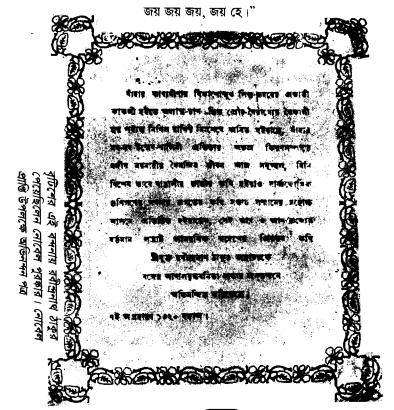
এ গানটি রচিত হয়েছিল ১৯১২ সালে পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, পরের বছরই অর্থাৎ ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৫ সালে পেয়েছিলেন 'নাইট উপাধি'। দুর্মুখের বলে ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত 'ভারত বিধাতা' কবিতার মাধ্যমে বৃটিশের বন্দনার জন্যই পুরস্কার পেয়েছিলেন। গীতাঞ্জলি একটি উপলক্ষ মাত্র। কারণ পঞ্চম জর্জ ছিলেন নোবেল পুরস্কার কমিটির প্রভাবশালী সদস্য। এ কমিটিতে পঞ্চম জর্জের প্রভাবও ছিল।

বিলেত থেকে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য এবং ইংরেজ কবি স্টার্জ মূর প্রস্তাব করে পাঠালেন যে, নোবেল প্রাইজ কমিটি যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বিবেচনা করেন। ওদিকে বিলেতেরই একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি পাঠিয়েছেন বিবেচনার জন্য। ফ্রান্স থেকে গল্পকার আনাতোল ফ্রাঁস আর জার্মানীর ঔপন্যাসিক পি. রাসেগ্গের তাঁদের বই পাঠিয়েছেন। কিন্তু কারো বই নোবেল প্রাইজ-এর জন্য মনোনীত হয়নি। সকলকে অবাক করে রবীন্দ্রনাথের 'গীতিঞ্জলি' 'নোবেল প্রাইজ' পেয়ে যায়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না- রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময়ে বাস্তব সত্য ছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতটি প্রমাণ করে ইংরেজদের কত প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিম্নোক্ত মন্তব্য রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচায়ক ঃ

> "রবীন্দ্রনাথের ও নোবেল প্রাইজের প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির কথা মনে আসে। এ ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির সমালোচনা করিতে যাইব না, কারণ আমরা অনধিকারী। কিন্তু অনধিকারী হইলেও, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক হিসেবে গীতাঞ্জলির সহিত যতটুকু পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তদনুসারে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, পার্সি উর্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরের অনেক কবি গীতাঞ্জলির কাব্য-সন্দর্ভে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের জ্ঞান, ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এক মধুরতর রস সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছেন। উভয়ের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইহা খুব সহজে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"[১]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ শাসকদের প্রশংসায় আরো যা লিখেছিলেন তা হলোঃ

"বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে
অভিষিক্ত করি, নিল চুপে চুপে
বণিকের মানদন্ড দেখা দিল
পোহালে শবরী রাজদন্ড রূপে।"

উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কার প্রদান বিষয়টি পাশ্চাত্যে দেশসমূহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

১। আলোচনা- নোবেল প্রাইজ, সম্পাদক, মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪" -মুস্তাফা নুরুউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৩৬৬।

হাসিলের স্বার্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। যে-সব প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তাদেরকেই শুধু নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। যা আমরা সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করছি। এ ছাড়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদদের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলেও এ অভিযোগের যথার্থতার প্রমাণ মেলে। সুতরাং এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির উৎস ছিল মাত্রাতিরিক্ত ইংরেজ তোষণ।

পরবর্তীতে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' পঞ্চম জর্জকে নিয়ে স্বাগত সঙ্গীতটি হয় বিশাল ভারতের স্বাধীনতা সঙ্গীত। আগেই বলেছি, এটা রচিত হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে, ১৯১২ সালে। ইংরেজদের ভারত ছাড়ার আগেই কবির মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি পঞ্চম জর্জ যখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন কবির লেখা এই কবিতায় পঞ্চম জর্জকে 'ভারতের ভাগ্য বিধাতা' বলে উল্লেখ করে সেটা উপহার দেয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় পঞ্চম জর্জকেই স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং তাঁরই স্তুতি করা হয়েছিল বলে ভারতীয় সাধারণ জনগণ ও রাজনৈতিক মহলে তখন খুব ঝড় উঠেছিল। ইংরেজরা চলে যাবার পরও এ নিয়ে কম তোলপাড় হয়নি। ষাটের দশকে আসামে এবং গত দশকে কেরলে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক ও পন্ডিতবর্গ এই কবিতার উদ্দেশ্য ও সারবস্তু নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী' যখন ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

"কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজনক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। .... ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করার এটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলুম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গবর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।"[২]

ইতি-

২৭ মার্চ, ১৩৩৩ — তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ

"সে কি উত্তেজনা! কি বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি পথের দাবি পড়ে ইংরেজের সহিষ্ণুতার

২। অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চারণ, কোলকাতা, পৃঃ ৩২৪।

প্রশংসা করেছেন। এ বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমার দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয়ই এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী'র যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।"[৩]

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ইংরেজ শাসনের মহিমা প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি ব্যবহারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। লেখকের অনুমতি নিয়েই সরকার শত শত কপি বিভিন্ন বন্দী নিবাসে আটক রাজবন্দীর নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে-গঞ্জে নাটক আকারে অভিনয় করান।। (অরবিন্দ পোদ্দার, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চারণ, কোলকাতা পৃঃ ৩২০)।

কলিকাতার মুসলমান শ্রমিক গাড়োয়ান ও গরীবের দল যখন ইংরেজকে মার! মার! করে ইট পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো তখন ইংরেজের দেশীয় দালালেরা তা সমর্থন করেনি। বরং এর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা রাজা' প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"কিছু দিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লৌহ খন্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল তাদের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রব্যের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজের প্রতি। তাহাদের যথেষ্ট শাস্তিও হইয়াছিল। .... কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলো একেবারে উড়ায়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক.... ।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ শাসকদের প্রীতিতে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে আরো লিখেছিলেন ঃ

"আমাদের বাল্যকালে ইউরোপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন অতুচ্চ সভ্যতা ও বিরাট বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য বিশেষতঃ ইংল্যান্ডের কারণ সে-ই এসব জ্ঞান আমাদের দ্বার দেশে এনে দিয়েছে।"[৫]

ইংরেজরা এদেশে যান্ত্রিক সভ্যতা এনেছে বটে; কিন্তু চিন্তার সভ্যতা মুঘলদেরই অবদান। এদেশে মুঘলরা যে কীর্তি রেখে গেছেন- বিশ্বের কাছে আজো বিস্ময়কর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র 'তাজমহল' ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। তাজমহলের সৌন্দর্যের বর্ণনা কয়েক ছত্রের মধ্যে। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিশাল অবদান তারা রেখে গেছেন, তাদেরকে অমানুষ থেকে মানুষ করেছেন- এ

৩। নিষিদ্ধ বাংলা, শ্রী শিশির কর, পৃঃ ২৪, ৩২, দরদী শরৎচন্দ্র, মনীন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল দ্রষ্টব্য।

৪। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৪২৮-২৯।

৫। 'পরিচয়' সংখ্যা কালান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি'র পুনঃমুদ্রিত অংশবিশেষ, পৃঃ ২১

সম্পর্কে রয়েছেন একেবারে নীরব। অথচ এককালের নৌ-দস্যু বলে কথিত এই ইংরেজরা এ দেশে নৈতিকতাবিরোধী এমন কোন অপকর্ম করেননি যে, তারা করেননি। শঠতা, প্রতারণা, ভন্ডামী, সম্পদ লুণ্ঠন, দুর্নীতি কোন কিছুই বাদ যায়নি। অথচ ওই নিষ্ঠুর ইংরেজদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সরব। প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তিনি ইংরেজদেরকে হত্যা করতে দেখে বলেছিলেন ঃ

"সন্ত্রাসবাদের মধ্যে বীরত্ব দেখা দিয়েছে বটে, তবু এই চুরি, ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা দেশভক্তি প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায় নয়।"[৬]

ইংরেজরা এ দেশে অত্যন্ত নির্মমভাবে বহু হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। এ জন্যে বিশ্ব কবির বিশ্ব হৃদয় আহত হয়নি। আজাদী আন্দোলনে যখন বিপ্লবীরা কিছু ইংরেজ হত্যা করে তখন তাঁর হৃদয় আহত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ চরকা কাটা এবং বিলাতী জিনিস বর্জনের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। যেমন অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ

"বৃটিশ বিরোধিতায় হয়তো হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ঘটবে, কিন্তু যে মুহূর্তে বৃটিশ রাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে সেই মুহূর্তেই আবার এই দুই জাতির আত্মকলহ শুরু হবে।" তিনি আরো বলেছেন, "দেশের শ্রেষ্ঠ ছেলেদের গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করেছেন। বিদ্যালয়ে যারা নিযুক্ত হচ্ছে তারা তত শ্রেষ্ঠ নয় এবং তারা শিক্ষার নামে অশিক্ষাই প্রচার করছে।" গান্ধীর চরকা কাটা আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "কলের যুগে চরকা নিয়ে বসে থাকলে স্বরাজ থাকবে না।" তিনি রোঁমা রোঁলাকে আরো লিখেছেন ঃ "গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার করার ইচ্ছা কারোর নেই, সকলেই তাঁর উপদেশে চরকা কেটে যাচ্ছে। চরকার মাধ্যমে কি করে স্বরাজ আসা সম্ভব সেই প্রশ্ন কেউ করছে না... যেনো বিজ্ঞানের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলে কোনো ভেদরেখা আছে। সে জন্য অসহযোগীরা প্রচার শুরু করেছে বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে।.... পাঞ্জাবের নৃশংসতা এবং খিলাফতের অবিচারের উপরেই এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কখনো বলা হয়নি ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন নির্ভর করে ভারতবর্ষের নৈতিক সমুন্নতি এবং বীর্যবত্তার উপরে।.... বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বাস্তব সত্য হলো, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন।" গান্ধীজীর বিলেতি জিনিস বর্জন আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ

"আজ ঘোষণা করা হয়েছে বিদেশী কাপড় অপবিত্র, অতএব তাকে দগ্ধ করার অর্থ শাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হলো। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা অর্থের নিয়মের উপরের কথা।"[৭]

৬। মোজাহারুল ইসলাম, আমি স্মৃতি আমি ইতিহাস, পৃঃ ৩৫৬-৫৭।
৭। মোজাহারুল ইসলাম, আমি স্মৃতি, আমি ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৫

বিভাগ-পূর্ব ভারতের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবী উঠলে বিশ্বকবি এর প্রতিবাদ করে বলেন ঃ "ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসন কায়েম হবে। সে জন্যে হিন্দুদের মারাত্মক ভুল হবে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়া"। রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির জবাবে রিয়াজুদ্দীন ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত কোলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুলতানে' ১৯২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রবীবাবু আতংক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আক্ষেপ করে বলা হয় ঃ

"রবীন্দ্র ঠাকুর পর্যন্ত এ ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে আমরা দুঃখিত। তাঁকে এরূপ বলতে শুনা গেছে, 'ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসন কায়েম হবে। সে জন্যে হিন্দুদের মারাত্মক ভুল হবে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়া। মহাত্মা গান্ধীকে মুসলমানেরা পুতুলে পরিণত করেছে। তুরস্ক ও খেলাফতের সাথে হিন্দু স্বার্থের কোন সংশ্রব নেই।"

উপসংহারে বলা হয় ঃ

"অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা একজন কবি, খ্যাতনামা কবি, বিশ্ববিখ্যাত কবি হিসাবে মানি.... কিন্তু তিনি রাজনৈতিক নন.... ভারতে মুসলিম শাসনের কল্পিত আতংকে তিনি আতংকিত (?)।"[৮]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ভীষণ রকম বৃটিশ অনুরাগী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তাঁর এক শোক প্রস্তাবে।

সেদিনটা ছিল ১৮২২ শকের ১১ মাঘ, খ্রীষ্টাব্দ ১৯০১। সকাল থেকে শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণ সমাজের একসপ্ততিতম সাম্বাৎসারিক অনুষ্ঠান। এই মাঘোৎসবের সান্ধ্যসভায় রবীন্দ্রনাথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মরণে দন্ডায়মান হয়ে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন এবং মহারাণীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

১৮২২ শকের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের বিবরণীতে জানাচ্ছে-

"ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়িকে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দন্ডায়মান হইয়া বিষয়টি পাঠ করেন।"

অতঃপর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে রচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে- সেটিই ভারতসম্রাজ্ঞীর প্রতি কবির শোকোচ্ছ্বাস।

অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি আমরা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলাম। লেখাটি তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৭ ফাল্গুন সংখ্যায় কিছু কিছু পরিবর্তনসহ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতীতে রবীন্দ্র-স্বাক্ষরিত এই রচনাটির শিরোনাম ছিল সাম্রাজ্যেশ্বরী; শিরোনামের নীচে লেখা 'একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবে পঠিত।'

৮। সাপ্তাহিক সুলতান, ১৯২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

তত্ত্ববোধিনীতে রবীন্দ্র রচনাটির কোনো শিরোনাম ছিল না। আমরা এখানে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাঠটিকেই মূল পাঠ রূপে গ্রহণ করলাম। ভারতীয় পাঠে যে কয়েকটি স্থলে পরিবর্তন আছে তা পাদটীকায় নির্দেশিত হল।

রবীন্দ্র রচনা। একটি দুষ্প্রাপ্য শোক প্রস্তাব।।

ভারতসম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া যিনি সুদীর্ঘকাল তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের জননী পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, যিনি তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া তাঁহার অগণ্য প্রজাবৃন্দের নতমস্তকের উপরে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা শান্তি এবং কল্যাণ যাঁহার অকলঙ্ক রাজদন্ডকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, সেই ভারতেশ্বরী মহারাণীর যে মহান পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রসাদে সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া অনিন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে ও প্রকৃতিপুঞ্জে হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন- অদ্য সমস্ত রাজসম্পদ পরিহারপূর্বক, ললাটের মনিক্যমন্ডিত মুকুট অবতারণ করিয়া একাকিনী সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের নিস্তব্ধ মহাসভায় গমন করিয়াছেন। পরমপিতা তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন!

মৃত্যু প্রতিদিন এই সংসারে যাতায়াত করিতেছে কিন্তু আমরা তাহার গোপন পদসঞ্চার লক্ষ্য করি না। সেই মৃত্যু যখন দুর্গম রাজসিংহাসনের উপর অবহেলাভরে আপন অমোঘ কর প্রসারণ করে তখন মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর বিরাট স্বরূপ কোটি কোটি লোকের নিকট পূর্ণ সূর্যগ্রহণের রাহুচ্ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্র সমস্ত পৃথিবীর উপর এই মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে; সাধারণ লোকের কুটীর-প্রাঙ্গণে যাহার গতিবিধি লক্ষ্য পথে পড়ে না, সেই আজ অভ্রভেদী রাজসিংহাসনের উপর দন্ডায়মান হইয়া আপনাকে সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছে। কিন্তু আমরা আতঙ্কে তাহার নিকট মস্তক অবনত করিব না। ত্রাসের এবং শোকের সমস্ত অন্ধকারপুঞ্জে অপসারণ করিয়া আমরা তাহাকে বন্দনা করিব যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ যাঁহার ছায়া অমৃত, মৃত্যু যাঁহার ছায়া!

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব-যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে যাঁহার দ্বারা জীবিত রহিতেছে এবং যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে অদ্য পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুশোকের মধ্যে তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর! কত সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারকা তাঁহার জ্যোতিঃকণায় প্রজ্বলিত ও চরণচ্ছায়ায় নির্বাপতি হইয়াছে- পৃথিবীর কোন মৃত্যু কোন্ মহৎশোকে তাঁহার মহোৎসবকে কণামাত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে? হে শোকার্ত, হে মরণভয়াতুর, অদ্য তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর!

আনন্দাদ্ধ্যেব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে,

আনন্দেন জাতানি জীবিন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি- তিনি পরম আনন্দ, সেই আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, সেই আনন্দের দ্বারাই জীবিত রহে এবং ধনী

দরিদ্র রাজা প্রজা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সচেতন অচেতন সমস্ত যাহা কিছু অহরহ তাঁহার অভিমুখে গমন এবং তাঁহার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।

অতীতকালের রাজাধিরাজগণ অদ্য কোথায়? কোথায় সেই দিগ্বিজয়ী রঘু, কোথায় সেই আসমুদ্র ক্ষিতিপতি ভরত! যদুপতেঃ কৃ গতা মথুরা পূরী, রঘুপতেঃ কৃ গতোত্তরকোশল! ধরিত্রীর সুবৃহৎ রাজমহিমা মহূর্ত্তেমহূর্ত্তে যাঁহার জ্যোতিঃসাগরে-বুদ্ধুদের ন্যায় বিলীন হইতেছে অদ্য আমরা তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত এই কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী তাঁহার সুচির জীবনের সমস্ত কৃতকর্ম যাঁহার চরণে স্থাপন করিয়া মুকুটবিহীন মস্তক নত করিয়াছেন আমরাও আমাদের জীবনের সমস্ত পাপ তাপ শোক সমস্ত ভক্তি প্রীত পূজা লইয়া অদ্য তাঁহারই সিংহাসনের পাদপীঠতলে দন্ডায়মান। তিনি আমাদিগকে বিচার করুন, দয়া করুন, চরিতার্থ করুন, এবং মৃত্যুর পরে পরিপূর্ণতর জীবনের মধ্যে তাঁহার অমৃতক্রোড়ে আমাদিগকে আহবান করিয়া লউন।[৯]

রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শোকবাণীতে যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তা দেখে মনে হয় না তিনি পরাধীন জাতির কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজ প্রীতির এখানেই শেষ নয়। আরো আছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে পারস্য ভ্রমণের সময় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> "১৯১২ খৃঃ যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ? আমি বলেছিলুম- 'য়ুরোপের মানুষকে দেখতে এসেছি।' য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলেছে, প্রাণের আলো জ্বলেছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানা দিকে প্রকাশ করছে।"[১০]

পারস্য ভ্রমণকালে একজন 'সম্মানযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক' তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইংরেজ জাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি বললেম তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best."[১১]

এই ছিল ইউরোপের ইংরেজ জাতি সম্পর্কে বিশ্ব কবির মূল্যায়ন। আর এই ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তাদের স্বজাতি বার্নার্ড শ' মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ

> "এমন ভাল কাজ এবং খারাপ কাজ নেই যা ইংরাজ করবে না। কিন্তু তুমি কখনোই তাদের অন্যায় বা ভুল করেছ বলতে পারবে না। ইংরেজের প্রতিটি কাজের পিছনে তার একটি আদর্শ থাকে। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় দেশ প্রেমিকতার আদর্শে যুদ্ধ করবে, সে যদি তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয় তা হলে তা বাণিজ্য করার আদর্শেই করবে এবং তোমাকে দাস বানিয়ে দাসত্ব করাতে হলে সে তার রাজকীয় আদর্শেই তা করবে।"

ইংরেজ জাতি সম্পর্কে এই দু'মনীষীর মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ মুজতবা

৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা।
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারস্য যাত্রী, পৃঃ ২৫।
১১। প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭।

আলীর বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন -

ইংরাজের জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কান মলার মত। সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার। দর্শন, অঙ্কশাস্ত্রে, সুপন্ডিত হোক মার্কসইজমের দ্বিগ্বিজয়ী কোটিল্যই হোক অথবা কয়লা খনির মজুরই হোক এই কানমলা স্বীকার করে। হৌস অব লর্ডস না পৌছানো পর্যন্ত দর্শন মিথ্যা। মার্কসিজম ভুল। শ্রমিক সঙ্ঘের দেওয়া সম্মান ভভুল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধা পাগল। তাঁর নাম বার্নার্ড শ'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘ আজাদী লড়াইয়ে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ত্যাগের ভূমিকা রেখেছেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর সমগ্র ভারত যখন বৃটিশ বিরোধিতায় ক্ষেপে ওঠে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবস্থায় থাকলেন নীরব। কিন্তু যখন জানতে পারলেন তাঁর এক আত্মীয়ও ঐ হত্যাকান্ডে মারা গেছে তখন তিনি বৃটিশের দেয়া 'নাইট' খেতাব মুখ রক্ষার স্বার্থে ১৯১৯ সালে বর্জন করেন। এ খেতাব ত্যাগ করে তিনি একটি গানও লিখেছেন। যেমন ঃ

"এ মণিহার
আমায় নাহি সাজে"।

তৎকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নাইট উপাধি বর্জনে তেমনটা প্রতিক্রিয়া হয়নি। কবির তৎকালীন সচিব শ্রী অমল হোম 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের কয়েক মাস পরের ঘটনা। ১৯১৯ সালেরই ডিসেম্বর। কংগ্রেসের সভা হচ্ছে অমৃতসরেই। সভামন্ডপ কাঁপিয়ে সকলে সব কিছু বললেন, কিন্তু কেউ রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের কথা কিংবা তাঁর উপাধি বর্জনের কথা মুখে আনলেন না। পরে দেখা গেল, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাবজেক্টস্ কমিটির সামনে একটা রেজোল্যুশন তৈরী করা হয়েছে; তাতে সরকারের বর্বরতার প্রতিবাদে ও দেশের সেবায় কে কি করেছেন তার একটা হিসেব ছিলো। সেখানেও কবিগুরুর নাইট উপাধি ত্যাগের নামগন্ধ নেই। এইসব দেখে শুনে অমল হোম নিজে একটা প্রস্তাবের খসড়া করে বহু চেষ্টা করলেন যাতে রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ না পড়ে। তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরুর বাবা মতিলাল নেহরু। তিনি খসড়াটি একবার আড়চোখে দেখে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। পরে জওহরলাল নেহরুকে বলেও কোনো সুরাহা হলোনা। এরপর একে একে সব বিখ্যাত দেশ নেতাদের পাকড়াও করেছিলেন শ্রী অমল হোম। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। গান্ধীও তখন অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। সব মিলিয়ে ফল এই দাঁড়িয়েছিলো যে, রবীন্দ্রনাথের উপাধি বর্জন সেদিনের রাজনৈতিক মহলে কোনো সাড়া জাগায়নি, আর ঐ রেজোল্যুশনেও কবির কোনো স্থান হয়নি। অমল হোম লিখেছেন, "পরে মহম্মদ আলী জিন্না সাহেবকে এ-সব কথা আমি জানাতে গেলে তিনি আমাকে বলেছিলেন- "তুমি আমাকে বললে না কেন?"[১২]

পরবর্তীতে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ঠিক এক বছর পরে ১৯২০ সালের

১৩ই এপ্রিলে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় অধিনায়ক ছিলেন কায়েদে আজম। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাণী চেয়েছিলেন ঐ সভার জন্য। কবি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে একটি দীর্ঘ ভাষণ লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, সেদিন রবীন্দ্রনাথ নিজ স্বজাতির কাছেই উপেক্ষিত হয়েছিলেন; অথচ একজন মুসলিম নেতা রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ মূল্যায়ন করে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্য এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে!

মৃত্যুর কিছুদিন আগে অর্থাৎ ৮০ বছর পূর্ণ হবার পর ১৯৪১ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজ মোহমুক্তি ঘটেছিলো। এ সম্পর্কে কবি বলেন ঃ

> "..... মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। .... এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপ স্বীকার করেছে রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"[১৩]

এসব ইংরেজ ভক্তের পুরুষেরাই পলাশী যুদ্ধের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তাদের ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার ফলেই সিরাজের পরাজয় ঘটে। মীর জাফর ছিলেন শিখণ্ডী; নেপথ্যে থেকে যারা কলকাঠি নেড়েছে আজ তাদের আসল পরিচয় উৎঘাটন জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ ঐ নেপথ্য নায়কদের অধঃস্তন পুরুষেরা আজো সক্রিয়। আজো তারা একই সর্বনাশা খেলায় মেতে আছে।

> এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
> অনায়াসে করিবে হরণ?
> তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত ভূমে
> পুরুষ নাহিক একজন?
> - *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (নাটক, পুরুষ বিক্রম)*

১২। হায়াত মামুদ, রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী, পৃঃ ৪৬।
১৩। 'পরিচয়' সংখ্যা কালান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির পুনঃমুদ্রিত অংশ বিশেষ, পৃঃ ২২ দ্রষ্টব্য; কাজী আঃ মান্নান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

কথিত আছে, নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পাটনায় পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নেন, তখন তাঁর মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কোথায় থাক, কেমন থাক জানবো কি করে?'

উত্তরে নবাব সিরাজ বলেছিলেন, 'মা তুমি যেখানে দেখবে একজন রাখাল হাতের লাঠি নিয়ে বৃটিশের বন্দুকধারী সৈন্যের সাথে লড়াই করছে সেখানেই আমি থাকবো।'

নবাবের এই বাণী সার্থকভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন কবি নজরুল। তিনি তাঁর কবিতায় সিরাজের আত্মা লুকায়িত সুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করেছেন। পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গার গান শুনিয়েছেন। স্বাধীনতার দীক্ষা দিয়ে সিরাজের পূর্বসূরীদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উজ্জীবিত ও উদ্বেলিত করেছেন। নবাবের সেই বার্তাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে নজরুলের কন্ঠে।

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য।"

ব্রিটিশ বিরোধী আজাদী আন্দোলনে নজরুলের ভূমিকা

"ওঠ ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকা-বাহী বীর সৈনিক দল। ওঠ,
তোমাদের ডাক পড়েছে- রণ-দুন্দুভি রণ-ভেরী বেজে উঠেছে।
তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উঁচু করে;
তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে।
পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক
ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর
প্রভুত্ব ঘোষণা করছে।..."

- কাজী নজরুল ইসলাম

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম আতংকে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের চাটুকারিতা এবং দালালীর মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী জনগণের পরোক্ষ বিরোধিতা করেছেন, অন্যদিকে সৈনিক কবি নজরুলের হাতের লেখনী অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষুরধার তরবারি। নজরুল প্রমাণ করেন কলম সৈনিকের অসির চেয়ে শক্তিশালী।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুলের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, আদর্শ ও ভাবের স্বাতন্ত্র্যতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় তাঁদের গানে ও কবিতায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তরে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান।
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

আর কবি নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতায় লিখেছেন ঃ

"বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
আমি সন্ন্যাসী, সুর সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।"

নজরুল এর সার্থকতা প্রমাণ রেখেছেন তাঁর সাহিত্য কর্মে। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ 'বিজলী' পত্রিকায় প্রথম 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহীর সেই আগুন-ঝরা লাইনগুলো ছিলো ঃ

'মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।'

এই কবিতা প্রকাশিত হবার পর বাঙালীর শিরায় যেন বয়ে গেল তরল অনল। এখন প্রশ্ন, কে এই বিদ্রোহের কবি। 'বিদ্রোহী' কবিতার পরই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন কবি নজরুল।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন ঃ

কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস সে এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ কথা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃংখল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পাবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।[১]

'বিদ্রোহী' কবিতা সেদিন বাঙালী তরুণ সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলো, এ সম্পর্কে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

"বিদ্রোহী' কবিতাটি এক সঙ্গে 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'-তে প্রকাশের সঙ্গে

১। শিশির কর, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও নজরুল, দ্রঃ মাসিক সফর, জুলাই-আগস্ট '৯৩ সংখ্যা।

বিষের বাঁশি বইয়ের প্রচ্ছদ

সঙ্গেই নজরুলের খ্যাতিতে বাঙালী সমাজ একেবারে টগবগ করে উঠল। তরুণ সমাজ তো বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল সকলের মধ্যে সেই মনোভাব- 'আপনারে ছাড়া কাহারে করিনা কুর্ণিশ।' সে দিনের কথা সমসাময়িক আর একজনের ভাষায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর রূপে দেখা গেল নজরুলের বিদ্রোহ বাণীতে। একটি আত্মা জগতের সমস্ত জিনিসের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে করতে ছুটে চলেছে, তার 'কোথাও বাধা নেই, মুক্তির উদ্দাম আনন্দে সে আজ দিশাহারা। কিন্তু তবু মহাবিদ্রোহীর এই ছুটে চলার কি কোনো দিন ক্লান্তি আসবে না? .... কিন্তু সে কবে!

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন ভাষায় আর কোন বাঙালী কবি চ্যালেঞ্জ জানাননি। সমাজের উৎপীড়নে এমন শপথ আর কারো মুখে তো শুনিনি। Must fight to the finish মন্ত্রে দীক্ষিত আর কোনো বাঙালী কবি শত্রুপক্ষকে এমন আহবান জানাননি।"[২]

কিছুদিনের মধ্যেই নজরুলের উপর সরকারী রোষ নেমে আসে। নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম যুগবাণী। ১৯২২ সালে বাংলা সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। এটি ছিলো একটি নিবন্ধের বই। 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা নজরুলের কয়েকটি নিবন্ধের একটি সংকলন। এর দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯২৪ সালে নজরুলের 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' নামক দু'টি কবিতার বই বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিষের বাঁশি'র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদে ছিলো, একটি রিক্তপাত্র কিশোর হাঁটু মুড়ে বসে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে। তাকে জড়িয়ে আছে তীক্ষ্ণ জিহবা বিশাল বিষধর। কিশোরের ভঙ্গিতে ভাবে ভয়ের বিন্দু-বিসর্গও নেই। সে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। আর তার বাঁশির সুরে জেগে উঠছে নতুন দিনের সহস্রাংশু সূর্য- যার আর এক নাম লোক চক্ষু, লোক প্রকাশক, ছবিটা এঁকেছেন কল্লোলের সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাশ, নজরুলের নিজের বর্ণনায়, 'প্রথিতযশা কবি শিল্পী আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু।'

এই 'বিষের বাঁশি' সম্পর্কে অচিন্ত কুমার বলেছেন ঃ

"এই বিষের বাঁশির বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।"[৩]

২। শিশির কর, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও নজরুল, দ্রঃ মাসিক সফর, জুলাই-আগস্ট '৯৩ সংখ্যা।
৩। অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত, জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃঃ ১৭৫।

অগ্নিবীণা বইয়ের প্রচ্ছদ

'বিষের বাঁশি' বইটি নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন মাতৃসমা রহমান সাহেবাকে। তাঁকে তিনি বাংলার অগ্নি নাগিনী মেয়ে বলেছেন ঃ

'তোমার মমতা-মানিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্বজননী। তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা দহে
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে।"

প্রবাসীর মত অভিজাত পত্রিকাও স্বীকার করেছে ঃ

কবিতাগুলো যেন আগ্নেয়গিরি প্লাবন ও ঝড়ের প্রচন্ড রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকাশিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।[৪]

শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, যিনি নজরুলকে 'গালির গালিচায় বাদশা' করে বসিয়েছেন, তিনিও মন্তব্য করেছিলেন ঃ

'স্বদেশী আন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হউক, তাহারা ঠিক সেইভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, পরবর্তী চারণ কবি তাহাকেই বলা যাইতে পারে।'[৫]

'বিশের বাঁশি' নিষিদ্ধ করেও বইটির প্রচার বন্ধ করা যায়নি। পরবর্তীতে পরাধীন আমলেই 'বিষের বাঁশি' থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। তৎকালে 'ভাঙার গান'-এর কবিতাগুলো আজাদী পাগল মানুষের মাঝে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

ভাঙার গানের পর 'প্রলয় শিখা' সরকারি রোষে পড়ে। কবির প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পরপরই বের হয় 'প্রলয় শিখা'। সন্তানের মৃত্যুতে কবি দিশেহারা। ফুলের মত সুন্দর সজীব বুলবুলের মৃত্যুতে বিপ্লবী কবি কেঁদে কেঁদে আকুল। যে আগুনে কবির বুক জ্বলছিলো, তাকেই যেন ঢেলে দিলেন 'প্রলয় শিখা'র শব্দে শব্দে, ছত্রে ছত্রে। এই বইটি কোন প্রকাশক প্রকাশ করতে সাহস করেনি। অগ্যতা কবি নিজেই বইটি প্রকাশ করেন। 'প্রলয় শিখা' প্রকাশ হবার পর ধাবমান হয়ে ছুটলো দেশের সর্বত্র। পুলিশ, গোয়েন্দা, সরকারী আমলারা তটস্থ। নোটের পর নোট চালাচালি হতে লাগলো।

৪। শিশির কর, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও নজরুল, দ্রঃ মাসিক সফর, জুলাই-আগস্ট '৯৩ সংখ্যা।
৫। পূর্বোক্ত।

সর্বহারা বইয়ের প্রচ্ছদ

অতঃপর 'প্রলয় শিখা' লেখার জন্য কবি নজরুল রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯৩১ সালে 'প্রলয় শিখা' সরকার নিষিদ্ধ করেন।

'প্রলয় শিখা'র একমাস পর নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ হলো 'চন্দ্রবিন্দু'। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো, ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে। বইটি মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কবিতা। ত ৎকালীন সমাজ ও রাজনীতিগত ভুল-ত্রুটির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ শ্লেষপূর্ণ হাস্য-রসের নির্মম কষাঘাত ফুটে উঠেছে এই কাব্য গ্রন্থে। দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলে নজরুলকে নানা উৎপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক চেতনা অন্য অনেক কবির চেয়ে বেশী। তাই দেখা যায়, হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীকে কেন্দ্র করে কবির 'প্যাক্ট' গানটি কত সার্থক হয়েছেঃ

'বন্দনা-গাডুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্ নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।'
'মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশের উঠিল চির জিজ্ঞাসা করুণ চন্দ্রবিন্দু।"

★ ★ ★

'দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের, রাজা
আংরেজ হারাম খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর।"
কাঁফ্রি চেহারা ইংরিজি দাঁত,
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে,
ভীষণ বম্বু চাষ করে ওরা
অস্ত্র আইন বাঁচাতে।'
'ডিম গোলাকার গোল টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিয়ে তার ধাড়ির দল,
তা নয় দিলে, অন্তঃ কিম?

যুগবাণী বইয়ের প্রচ্ছদ

দেখা যায়, এই গ্রন্থের লেখাগুলো দেশাত্মবোধক তীব্র ব্যঙ্গে ভরপুর। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে হিন্দু-মুসলমান মিলন বা স্বাধীনতা কোনটাই সম্ভব নয়। হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপের সুরে বার বার তা বলা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ঘোষণা করেন ঃ

'বোমা, মেরে মোর পায় না কো খুঁজে
আজও উদরে 'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভ্য ষাঁড়ের
সহিত হানিবে টকক্র?

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ঠাট্টা তামাশার ছবি লীগ অব নেশন, সর্দা বিল, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট।

চন্দ্রবিন্দুতে দুঃখের গানে কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

'আমার সুখের গৃহ শ্মশান করে
বেড়াস মা তায় আগুন জ্বালি।'
কিংবা
'আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
এবার ঐ চরণে শরণ দিও।
এ পুত্রহারা পিতার দুঃখ।

'চন্দ্রবিন্দু'র মধ্যে নজরুলের বিখ্যাত কোরাস 'দে গরুর গা ধুইয়ে' গ্রথিত হয়েছে। এ গানটি নজরুল প্রায়ই গাইতেন। যেমন ঃ

"দে গরুর গা ধুইয়ে!!
উল্টে গেল, বিধির বিধি
আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে,
মদ্দ করেন চড়ুই ভাতি।"

'চন্দ্রবিন্দু'-তে সংকলিত 'সর্দা বিল', 'লিগ-অব-নেশন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, রাউন্ড-টেবিল কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও প্রাথমিক শিক্ষা বিল শীর্ষক

সিন্ধু হিন্দোল বইয়ের প্রচ্ছদ

গানগুলি সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে নজরুলের চেতনা ও বোধের স্বাক্ষর বহন করে। এ সম্পর্কে সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নজরুল যখন 'চন্দ্রবিন্দু'র কবিতাগুলি লিখছিলেন, সে সময়ের স্মৃতিকথায় কবি জসিম উদ্‌দীন লিখেছেন ঃ

বুলবুলের মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম না। কলিকাতায় আসিয়া শোকাতুর কবিকে ডি এম লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাইলাম। দোকানে বেচাকেনার হট্টগোলের মধ্যে এক কোণে বসিয়া তিনি হাস্যরস প্রধান 'চন্দ্রবিন্দু' নামক বইটির পান্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলেন। পুত্র শোক ভুলিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, কবির সমস্ত অঙ্গে বিষাদের ছায়া। চোখ দু'টি কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলিয়া গিয়াছে।[৬]

'চন্দ্রবিন্দু' লেখার জন্য কবির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হয়নি। পরবর্তীতে এই বইয়ের বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু- নজরুলের এই পাঁচটি নিষিদ্ধ গ্রন্থছাড়া আরও অনেক লেখা সরকারের রোষ দৃষ্টিতে পড়েছিলো। যদিও শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি। যেমন- অগ্নিবাণী, ফনিমনসা, সঞ্চিতা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল প্রভৃতি। 'যুগবাণী'-তে কবি নজরুল 'কালা আদমীকে গুলি মারা' শিরোনামে প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

'একটা কুকুরকে গুলি মারিবার সময়ও এক আধটু ভয় হয়, যদিই কুকুরটা আসিয়া কোন গতিকে গাঁক করিয়া কামড়াইয়া দেয়! কিন্তু আমাদের এই কালা আদমীকে গুলি করিবার সময় সাদা বাবাজীদের সে -ভয় আদৌ পাইতে হয় না। কেননা তাহারা জানে যে, আমরা পশুর চেয়েও অধম। একবার এক সাহেবের গুলির চোটে আমাদের স্বগোত্র এক কালা আদমী মারা যায়, তাহাতে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কৌন মারা গিয়া?' একজন আসিয়া বলিল, 'এক দেহাতি আদমী হুজুর'! সাহেব দিব্যি পা ফাঁক করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওঃ হাম সম্‌ঝা ঠা, কোই আড্‌মি!' অর্থাৎ ঐ গ্রাম্য বেচারা সাহেবের বিড়াল-চোখে মানুষই নয়। মনুষ্যকে এত বড় ঘৃণা আর কেহ কোথাও প্রদর্শন করিতে পারে কি-না জানিনা। ইহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে জালিয়ানওয়ালাবাগে ও অন্যান্য স্থানে।"[৭]

এদেশীয় মানুষকে বিদেশী শাসক ইংরেজ কিরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতেন তার প্রকাশ পেয়েছে কবি নজরুলের উল্লেখিত ভাষায়।

'অগ্নিবীণা' গ্রন্থে নজরুলের প্রথম কবিতা অগ্নি-ঋষি। এই কবিতার পংক্তি হলো ঃ

৬। নজরুল স্মৃতি, সাহিত্যম, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ৮৫
৭। নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, যুগবাণী, পৃঃ ৬৪৮

ফণি-মনসা বইয়ের প্রচ্ছদ

"অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।
তাইত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন বেহাগ বাজে।
দহন বনের গহনচারী-
হায় ঋষি-কোন বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে করি
অগ্নি-মরুর মাঝে।

অগ্নিবীণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিদ্রোহী' যা পূর্বে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থটি সরকার বাজেয়াপ্ত না করলেও বাজারে বিক্রি করতে দেয়নি। যার কাছেই পুলিশ অগ্নিবীণা পেয়েছে তার কাছ থেকেই বই কেড়ে নিয়েছে।

'সঞ্চিতা' নজরুলের কাব্যগ্রন্থ। এই বইটিও নিষিদ্ধ করা হয়নি বটে; কিন্তু সরকারের বিষ নজরে পড়েছিলো।

'ফনিমনসা' বইটি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছিলো। কিন্তু পরে আর তা হয়নি। এই গ্রন্থের দু'টি কবিতার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

"ওরে ভয় নাই আর দুলিয়া উঠেছে
হিমালয় চাপা প্রাণ,
গৌরী শিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী।"

হিন্দু-মুসলিম কলহের কথাও কবি বেদনার সঙ্গে এ গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া।
সেই লাঠি কাল প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ-গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ-জেগেছে তো তবু-বিজয় কেতন উড়া।
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।

সর্বহারার কবিতাগুলোও সেদিন জনচিত্তে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। 'রাজা-প্রজা' কবিতাটির সর্বহারার লাইনগুলো তরুণদের মুখে মুখে ফিরতো ঃ

'মোদেরি বেতন-ভোগী চাকররে সালাম করি মোরা,
ওরে' পাবলিক সারভেন্টদেরে আয় দেখে যাবি তোরা।
কালের চাকা ঘোর,

দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে-চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদেরে দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়-
সমবেত রাজকণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়।

পরাধীনতার বেদনা রবি বাবুকে স্পর্শ না করলেও কবি নজরুলকে পাগল করে তুলেছিলো। ভোগবাদী কবি বাঁচার আকুল আকুতি নিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' আর মানবতার কবি নজরুল মৃত্যুর ভয়কে তুচ্ছ করে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে পরাধীনতার বেদনা ও দুঃখের কথা এবং শোষকের বিরুদ্ধে, শোষিতের পক্ষে শেষ পংক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

চক্রবাঁক বইয়ের ১ম সংস্করণের প্রচ্ছদ

"পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি,
রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায়,
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
তাদের সর্বনাশ।"

সর্বহারায় শুধু রাজা-প্রজাই নয়, এর ফরিয়াদ, কৃষাণের গান, ধীবরের গান, সর্বহারার গান, সর্বহারা প্রভৃতি কবিতাও সরকারের রোষের কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু লাইন এখানে তুলে ধরলাম ঃ

'সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে,
এ নহে এর বিধান'
(ফরিয়াদ, পৃঃ ৫১)

'কৃষাণের গান' কবিতায় কবি লিখেছেন ঃ

'(ও ভাই) আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানী দিই জান,
(আর) সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।'
(ঐ, পৃঃ ৫১)
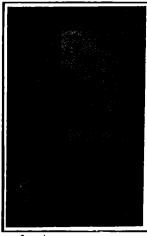
চক্রবাঁক বইয়ের ২য় সংস্করণের প্রচ্ছদ

আবার 'ধীবরের' গানে রয়েছে ঃ

"ঐ আঁশ-বটিতে মাছ কাটি ভাই
কাটিব অসুর এলে!
এবারে উঠবে রে সব ঠেলে॥"

এ গ্রন্থের বিষয়ে সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সর্বহারার প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই আছে বিপ্লবের সুর। 'সর্বহারা' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেন কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর তারকানাথ সাধু ১৯২৬ সালের ২২ ডিসেম্বর। পুলিশ ও গোয়েন্দা রিপোর্টেও বইটি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষেই সুপারিশ করেন। কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তা, গোয়েন্দা ও আইন বিশারদদের পরামর্শ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

নজরুলের ছোট নিবন্ধের বই 'রুদ্রমঙ্গল'-ও নিষিদ্ধ করার সুপারিশের তালিকায় ছিলো। কিন্তু সরকার এটা নিষিদ্ধ না করে প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'রুদ্র মঙ্গলে' মোট আটটি নিবন্ধ আছে- আমার পথ, মোহররম, বিষ-বাণী, ক্ষুদিরামের মা, ধুমকেতুর পথ, মন্দির ও মসজিদ, হিন্দু-মুসলমান।

বইয়ের ভূমিকায় আছে ঃ

"নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয় সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মাঝে মাকে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলছে আর চাবকাচ্ছে যে, দানব সে দানবও নয়, দেবতাও নয়। রক্ত মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায় ক্রন্দন বোধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙেছে- শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হতাশ-শক্তি নাই, সাহস নাই।"[৮]

ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর নির্মম শাসন, অমানবিক শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন যখন চরমে তখন নজরুলের প্রকৃত বিপ্লবী সত্তা গর্জন করে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন ঃ

'এদেশ ছাড়বি কিনা বল
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।"

★ ★ ★

৮। নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, রুদ্র মঙ্গল, পৃঃ ৬৮৭।

'মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র নিয়ে নয়,
মোরা জীবন ভর মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়।"

★ ★ ★

ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়।।
ওরে দৈন্যরে তোর সৈন্য করে
রণের করিস্ ভান,
খরস্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়-
'সাগর অভিযান'!

দোলনচাঁপা বইয়ের প্রচ্ছদ
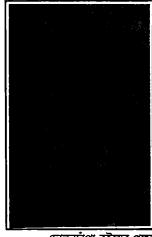
এভাবেই পরাধীন বাংলাভাষী তথা ভারতবাসীরা নজরুলের বিপ্লবী গানের মাঝে পেল স্বাধীনতার মন্ত্র ঃ

এই শিকল-পরা ছল মোদের্ এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল।।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় কর্‌তে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে কর্‌বো মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল।।

চরম বৃটিশ বিদ্বেষী ও আজাদী পাগল কবি নজরুল সম্পর্কে ভারতের নজরুল গবেষক 'শিশির কর' লিখেছেন ঃ

"নজরুলই বাংলার প্রথম দন্ডিত লেখক নন। তাঁর আগে বহু কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিকের উপর সরকারি রোষ পড়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য, মুকুন্দদাস, সখারাম গনেশ দেউস্কর। কিন্তু নজরুলকে নিয়ে যেমন দেশ জুড়ে আন্দোলন, বিক্ষোভ হয়েছে, তেমন অন্য কারো ক্ষেত্রে হয়নি। ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আগমনী' কবিতার জন্য নজরুলকে কারাদন্ড দেওয়া হলে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এমন ব্যাপক প্রতিবাদের নানা কারণ আছে। যে সব বাঙালী কবির বই ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে নজরুল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি। আর জনপ্রিয়তায় তিনি তো সমসাময়িক সকলের উপরে ছিলেন। সে যুগে তরুণদের মুখে মুখে ফিরত তাঁর অগ্নিবীণার, ভাঙার গানের কবিতাগুলো। তদুপরি জেলের অবিচারের প্রতিবাদে কবি যখন দীর্ঘদিন অনশনে ছিলেন, তখন স্বতঃই সারাদেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ..... নজরুলের কারাদন্ড হয়েছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ী' নামে একটি কবিতা লেখার জন্য। এর

বুলবুল বইয়ের প্রচ্ছদ

আগে রাজরোষে কবির বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, কিন্তু কারাদন্ড এই প্রথম। তাঁর নিবন্ধের বই 'যুগবাণী' আগেই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এর পরেও কবি কারাদন্ডের আদেশ পেয়েছিলেন- 'প্রলয় শিখা' রচনার জন্য। তবে সে দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়নি।"[৯]
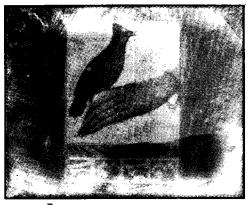
আনন্দ বাজার পত্রিকায় অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু'র আবির্ভাবে ১৫ জুলাই (১৯২২) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে লিখা হয়েছিলো ঃ

"শীঘ্রই প্রলংকর
ধূমকেত
দেখা দিবে
হুঁশিয়ার হউন।"

এরপর আনন্দ বাজার পত্রিকা 'ধূমকেতু'র আগমনী বার্তা লিখেন এভাবে ঃ

"প্রলংকর
ধূমকেতু
আসিতেছে
খবরদার হউন!!!"

"ধূমকেতু" ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি বের হয়। কবিতাটিতে নজরুল লিখেছিলেন ঃ

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,- আসবি কখন সর্বনাশী?......
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা-বোল নাকি-নাকি,
খাঁড়ায় কেটে কর্ মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি!
হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর্ মা পুরুষ, রক্ত দে মা, রক্ত দেখা!

তুই একা আয় পাগ্‌লী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য ক'রে
রক্ততৃষায় 'ময়-ভুখা-হু'-র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে'!......
অনেক পাঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা;
আয় পাষাণী, এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা!
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর ক'রে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা!...

'ময় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী'
কৈলাশ হতে গিরি-রানীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী।[১০]

এ কবিতাটি প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকারের তীব্র রোষানলে পড়েন কবি নজরুল। বিদেশী শাসক কবির বিরুদ্ধে জারি করেন গ্রেফতারি পরোয়ানা।

ঝিঙে ফুল বইয়ের প্রচ্ছদ

'ধূমকেতু' সরকার বিরোধী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে তা অবহিত হয়ে ২৩ জুলাই (১৯২২) মাদ্রাজ থেকে বারীন্দ্র কুমার কবি নজরুলকে চিঠি লিখে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন ঃ "গরম গরম লিখে জেলে যেয়ো না।"
কিন্তু আজাদী প্রিয় কবি ছিলেন নির্ভয়। ধূমকেতুতে গরম গরম লিখার কারণে পত্রিকা তৎকালে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিক্রির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। তরুণেরা দাঁড়িয়ে জগু বাবুর বাজারের মোড়ে অপেক্ষা করে কখন হকার ধূমকেতুর বান্ডিল নিয়ে আসে। পত্রিকা আসলে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে পত্রিকা শেষ। তা দেখে তৎকালীন ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুণে। শেষ পর্যন্ত 'আনন্দময়ী আগমনে' কবিতার জন্য কবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এ প্রসঙ্গে মুজাফ্‌ফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা'য় লিখেছেন ঃ
'ধূমকেতু'র অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের নামে মোকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা হলো 'আনন্দময়ীর আগমন'কে নিয়ে।"

কবি নজরুলের গ্রেফতারি পরোয়ানা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী মুজাফফ্‌র আহমদ লিখেছেন ঃ

"এর মধ্যে ধুমকেতুর অফিস তল্লাশির ও ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারা অনুসারে ধুমকেতু সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম ও তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা বার হয়ে গিয়েছিলো। তারিখ ১৯২২ সালের ৮ই নবেম্বর। কমরেড আবদুল হালিম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে এক দোকানে চা খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে ধুমকেতু অফিসে গেলাম। ৭ নং প্রতাপ চ্যাটুর্জ্যে লেনস্থ

১০। নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২১।

ছোটদের জন্য লেখা পুতুলের বিয়ে বইয়ের দুর্লভ চিত্র

ধুমকেতু অফিসে গিয়ে দেখলাম অতো সকালেও শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে ধুমকেতুর জন্য লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা গেলো। পুলিশ এসেছে ধুমকেতুর অফিসে তল্লাশির পরওয়ানা ও কাজী নজরুল ইসলামের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে। নজরুল তখন সমস্তিপুরে গিয়েছিলো বলে গ্রেফতার হয়নি। পুলিশ আসার মুহূর্তের ভেতরে বীরেনবাবু যে কোথায় উধাও হয়ে গেছেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিশ প্রথমে নজরুলকে খুঁজলো। আমরা জানালাম তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন, তখন পুলিশ আমাদের গভর্নমেন্ট অর্ডার দেখালো যে, ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখে ধুমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' শীর্ষক একটি ছোট লেখা বাজেয়াফৎ হয়ে গেছে। পুলিশ ওই সংখ্যার কপিগুলো নিয়ে যাবেন বললেন। তারপর বাড়িতে তল্লাসি হলো, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের "ধূমকেতু' যে কয়খানা পাওয়া গেলো তাই নিয়ে পুলিশ চলে গেছেন, আমাকে সার্চলিস্ট দিয়ে গেলেন।"[১১]

এ বিষয়ে আরো জানা যায়, ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক শিশির করের 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থ থেকে। তখন নজরুল ইসলাম সমস্তিপুর থেকে কুমিল্লা চলে গেছেন। পুলিশ তাকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কলকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে বিদ্রোহী কবির বিচার করা হয়। বিচারক সুইহোনও একজন কবি ছিলেন। ভাগ্যের কি পরিহাস, কবির বিচার কবির হাতেই হলো। বিচারক সুইনহোর নামে কলকাতায় একটি রাস্তাও আছে। কবি সুইনহো ১৯২৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মামলার রায় দেন। প্রখ্যাত আইনজীবী মলিন মুখোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে নজরুলের পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারক সুইনহো রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা, একজন কবি হয়েও সুইনহো আর একজন কবিকে সাধারণ কয়েদীর পর্যায়েই ফেলেন। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করেননি।[১২]

কাজী নজরুল ইসলাম আদালতে যে সাক্ষ্য দেন সেটিও এক অনন্য সৃষ্টি। ১৩২৯, ১৩ই মাঘ সংখ্যার ধুমকেতু'-তে সেটি ছাপা হয়। ইংরেজী তারিখ ছিলো ২৭শে জানুয়ারী ১৯২৩। ঐ পত্রিকায় 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে এটি বের হয়। এখানে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

১১। মুজাফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা দ্রষ্টব্য।

১২। শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল দ্রষ্টব্য।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ বইয়ের প্রচ্ছদ

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজ-কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

এক ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজ-বেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধ'রে সত্য–জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ-মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন– ন্যায়, ধর্ম। সে-আইন কোন বিজেতা মানব কোন বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরী করে নাই। সে-আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট; সে-আইন সার্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের । রাজার পক্ষে–পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি, আমার পক্ষে–আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র , আমার পেছনে রুদ্র। রাপার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোন রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ং-প্রকাশের বীণা, যে-বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন– চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরকাল ধরে থাকবেন। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্ধ করছে, সত্যের বাণীকে মূক করতে চাচ্ছে, সেও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে-আভাসে-ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহংকারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়! কিন্তু অহংকার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে!

যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে-যন্ত্রকে অপর কোন নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে-যন্ত্র যিনি বাজান, সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার

নতুন চাঁদ বইয়ের প্রচ্ছদ
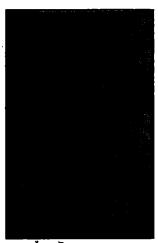
বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোন কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি- তার বাণী মরেনি। সে আজ তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই সে বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীর নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশী সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীরও নয় সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর- যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দী করবার মত পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই। রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তাঁর প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি- আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজনিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খ্রীষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য। তবু জিজ্ঞাসা করছি- এই যে বিচারাসন- এ কার? রাজার, না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই

বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্ম-প্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

ছায়ানট বইয়ের প্রচ্ছদ

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো– একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না– এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চীৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের আর একজনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হ'ত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলণ্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে আমার সম্মুখে এই বিচারক বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে এই সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,– কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,– আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,– তার জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয় সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের

চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তা হলে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ-মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তুর্য বেজে উঠেছিল; আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহা-রুদ্রের তীব্র আহবান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন..... প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা-চরণ মূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দন্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত উষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে-অমৃতের পুত্র আমি, হাসিগানের কালোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবে। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ, ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কি-না জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুতঃ'। আমি জানি-

"ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।"

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা।
৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩
রবিবার - দুপুর।

সেদিন আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইংরেজ বিচারকের সম্মুখে কবি নির্ভীক চিত্তে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, স্বরাজ আন্দোলনের কোনো বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এমন প্রকাশ্য আদালতে জবানবন্দী দেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিদ্রোহী কবির এই ঐতিহাসিক জবানবন্দী, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিচারাধীন থাকার সময় নজরুলকে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখা হয়। কারাদন্ডের পর তাকে প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তার 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সেটি জেলে নজরুল ইসলামের কাছে পাঠিয়ে দেন। এখান থেকে কবিকে হুগলি জেলে পাঠানো হয়। জেলের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে নজরুল ইসলাম অনশন করেন। জেল কর্তৃপক্ষ কাজীর দাবি মানতে গররাজি। আর নজরুল ইসলামও দাবি না মানলে অনশন তুলবেন না। এদিকে কবি দিন দিন কাবু হয়ে পড়েন। নজরুল ইসলামের দাবি মেনে নেয়ার দাবিতে দেশবন্ধু জনসভা ডাকলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯২৩ সালের ২১শে মে কলেজ স্কোয়ারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজাফফ্‌র আহমদ তাঁর 'নজরুল স্মৃতি'-তে লিখেছেন ঃ

"ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু, গোলদীঘির জনসভায় হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী প্রভৃতি সকলে দাবি জানালেন- নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।"

এদিকে রবীন্দ্রনাথও সেন্ট্রাল জেলে কাজীকে তার বার্তা পাঠান ঃ "গিভ আপহাঙ্গার স্ট্রাইকার, আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস ইউ।"

তবে, সে তার বার্তা শিলঙে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফেরত যায়। কারণ নজরুল তখন হুগলি জেলে।

নজরুল ইসলামের এই অনশন দেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নানা সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় এই উদ্বেগ প্রকাশ পায়। এ নিয়ে ১৯২৩ সালের ১৬ মে তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাকীয় লিখেন।

হুগলি জেলে প্রায়োপবেশন

"কাজী নজরুল ইসলাম, মৌলবী সিরাজুদ্দিন ও বাবু গোপালচন্দ্র সেন প্রায় একমাস পূর্বে হুগলি জেলের মধ্যে প্রয়োপবেশন করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি সেই অবস্থায় আছেন। খানসামা ইউনিয়নের সভাপতি মৌলবী সিরাজুদ্দিন নামাজ পড়িতেছিলেন,

এমন সময় জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেখানে উপস্থিত হন। মৌলভী সাহেব তাহাকে সেলাম করেন নি। ইহাতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট না-কি তাহাকে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি করেন। ইহার পূর্বেও জেলের মধ্যে অসহযোগী বন্দীদের উপর নানারকম দুর্ব্যবহার করা হইত, তাহাদিগকে মানুষের অব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হইত। এই সব দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্যই ইহারা তিনজন প্রায়োপবেশন করেন। অনেকদিন পরে গোপাল বাবুকে জোর করিয়া নাকের ভিতর দিয়া দুধ খাওয়ানো হইয়াছিল। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন নাই। ৫ই মে পর্যন্ত তাহাকে জোর করিয়া খাওয়ানো হয় নাই। ২৪শে এপ্রিল হইতে কাজী সাহেবের জ্বর হইতে আরম্ভ করে, এই জ্বর অবস্থায় এতদিন অনাহারে থাকিয়া তাহার শরীরের ওজন ১৩ সের কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাহার অবস্থা এতদূর খারাপ যে, যে কোন মুহূর্তে যে কোন দুঃসংবাদ আসিতে পারে।......

অনাহারে ও জ্বরে কাজী কাহিল হয়ে পড়েন। তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং শরীর দ্রুত খারাপ হতে থাকে। এই অবস্থাতেও কবি অবিচল থাকেন। কারো অনুরোধে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। শেষ পর্যন্ত মাতৃসমা বিরাজাসুন্দরী দেবী ছুটে এলেন কুমিল্লা থেকে। তিনি দীর্ঘপথ জল স্পর্শ করেনি। তারও শপথ, "পাগলকে না খাইয়ে কিছু মুখে দেব না।" শেষ পর্যন্ত ৩৯ দিন পর ১৯২৩ সালের ২২শে মে নজরুল ইসলাম অনশন ভাঙলেন বিরজাসুন্দরীর অনুরোধে। এরপর কবিকে বদলি করা হয় বহরামপুর জেলে।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের "কারা জীবনে কবি নজরুল" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "ডোরাকাটা হাফ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়ের ইজের, আর ঐ কাপড়েরই গামছার মতো গা মোছা চাদর, বিষম ফুটকুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কম্বলসহ এই অপরূপ পোশাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিতে সাজিয়ে কয়েদীর গদিতে ছেড়ে দিলো। কবি কলকাতার জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন। কবিকে আনা হয়েছিলে কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে, 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনলো বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেঁয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ চৈ করে কাটাতো। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলী ব্রিজের উপর উঠে জেলের কয়েদীদের দেখতো এবং নানা রকম উৎসাহিত করতো।"

হুগলী জেলের কয়েদীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের প্রতিবাদে জেল সুপার থার্সটনের উদ্দেশ্যে কবি নজরুল 'সুপার বন্দনা' শিরোনামে একটি বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখেন ঃ

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে।
তুমি ধন্য ধন্য হে।।
আ-কাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছ আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লাপ্‌সী শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।।

কবি নজরুল শিকল পরেই নজরুল শিকল ভাঙ্গার ও কারার লৌহকপাট লোপাটের গান করেছেন। তার প্রচন্ড প্রাণশক্তি জেলখানাকেও সজিব করে তুলেছিল। জেলের ভেতরে বসে তিনি গান বানাতেন, দলও গড়তেন। এসে জুটতো অন্য রাজনৈতিক বন্দীরা। হাতে পায়ে শিকল ঝনঝনিয়ে সকলে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গাইতেন-

"শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।"

যখন এক বন্দী অন্য বন্দীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ হল, নজরুল ইসলাম গান ধরতেন-

"কারার ওই লৌহ-কপাট
ভেঙ্গে ফেল করবে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।"

এখানে উল্লেখ্য, কবি নজরুল হুগলী জেলে অবস্থানকালে বাসের অযোগ্য 'সেল' তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিলো। অসহ্য গরমে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। এ ছাড়া এই সেল থেকে রহস্যজনকভাবে ১১ জুন ১৯২৩ সালে প্রথম বিষাক্ত সাপ বের হয়েছিলো। এরপরও দু'বার সাপ বের হয়েছিলো। তখন কবির ওজন ২৪ পাউন্ড হ্রাস পায়। এ সম্পর্কে ১৯ জুন ১৯২৩ তারিখে আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, "প্রায়োপবেশন আরম্ভ হইবার পর হইতে কাজী সাহেবের ওজন নাকি ২৪ পাউন্ড কমিয়া গিয়াছে। কাজী সাহেবের সেল হইতে একটা সাপ বাহির হইয়া পড়ে, অথচ এদিকে

নাকি কেহই ভ্রুক্ষেপও করে নাই। ১১ই তারিখে কাজী সাহেবের ঘর হইতে আর একটা সাপ বাহির হয়; তবুও তাঁহাকে সেই সেল হইতে সরান হয় নাই। সেলগুলি অসহ্য গরমের দরুন একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি সুপাররিনটেনডেন্ট নাকি বন্দীদিগকে সেই সেল হইতে স্থানান্তরিত করিতেছেন না। কারণ শীঘ্রই নাকি বৃষ্টি আরম্ভ হইবে।[১৩]

অবশেষে ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ এসডিও কোর্টের রায়ে কবি বেকসুর খালাস পান। কারামুক্তির পর কবি নজরুলের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বরিশাল থেকে প্রকাশিত সুধী রঞ্জন রায় মাসিক 'তরুণ-এ লিখেছেন ঃ

"মহাত্মা গান্ধী তখন রোগ শয্যায় শায়িত বহরমপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা সভা আহূত হইয়াছে। এই সভায় সদ্য কারামুক্ত কাজী উপস্থিত। প্রার্থনা হইয়া গেল। কে যেন বলিল ঃ 'মহাত্মার কারামুক্তির জন্যও এই সভা সমবেতভাবে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছে।"

কবির ভাব নিমগ্ন চক্ষু ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। উত্তর হইল ঃ

"রোগমুক্ত করিবার ভার ভগবানের উপর থাকে থাকুক- কারামুক্ত করিবার ভার এ হাত হইতে কাহারও হাতে সরাইয়া দিব না।"[১৪]

কবি নজরুল ইসলাম অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বাংলার কথা'র ১৯২২ সালে ২০ জানুয়ারী সংখ্যা 'ভাঙার গান' শিরোনামে এই গানটি লিখেছিলেন।

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নজরুল বিষোদগার করে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর্য্য কবি রবীন্দ্রনাথ যখন ইরেজ শাসকদের বন্দনায় ব্যস্ত তখন অনার্য কবি নজরুল ইসলাম বিপ্লবীদের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্যে 'ধুমকেতু' পত্রিকায় 'সারথীর পথের খবর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

> "সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ব স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝিনা। কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।" [১৫]

পরবর্তীতে গান্ধীর আপোষ ফর্মুলায় কবি নজরুল মর্মাহত হয়েছিলেন। বিদেশী শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে কোনো আপোষ করতে তিনি ছিলেন নারাজ। তিনি বলেছিলেন "কেবলমাত্র চরকা আন্দোলন বিপ্লবের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিবে।" তিনি এ বিষয়ে

১৩। শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৩০৯।
১৪। মাসিক তরুণ, বৈশাখ, ১৩৩১ দ্রষ্টব্য।
১৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৪।

কবিতার ভাষায় লিখেছেন-

"সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই
বসে বসে কাল গুনি,
জাগো-রে জোয়ার বাত ধরে গেলঃ
মিথ্যার তাঁত বুনি।"

এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ 'চরকা' আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন ইংরেজ শাসনের পক্ষে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তিমিত করার লক্ষ্যে। আর নজরুল ইসলাম 'চরকা' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো বেগবান ও তীব্র করার লক্ষ্যে।

কবি নজরুল ১৯২৫ সালে 'লাঙল' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সে সময়ে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার পরিবেশে নজরুল খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে কলিকাতার একটি হিন্দু মুসলিম মিলন সভায় সুভাষ বসুর অনুরোধে উদ্বোধনী কোরাস গেয়ে শোনালেন-

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

এই গান শুনে নেতাজী সুভাস বসু বলেছেন ঃ

"কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তার লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ। তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তার গান করে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছে হতো। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।"[১৬]

জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে সে সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিলো। সে সম্বর্ধনা সভায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র এবং সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র নজরুলের উচ্চ প্রশংসা করে যে ভাষণ দেন তা অবিস্মরণীয়।

বিদ্রোহী কবিকে লক্ষ্য করে বারীণ ঘোষ বলেছিলেন ঃ

"আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু'। দেশের যারা মেকী, তাদের গোঁফ ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিক, তোমার ধূমকেতু দেশের যারা সাচ্চা সোনা তাদের খাদ পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলুক....।"

বিপিন চন্দ্র পালন বলেছেন ঃ

"…. নজরুল কোথায় জন্মেছেন জানিনা, কিন্তু তাঁর কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই।.... মানুষে মানুষে একাত্ম সাধন এ অতি অল্প লোকেই করেছে।... নজরুল

১৬। পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

নতুন যুগের কবি। হাততালি দিয়ে নজরুলকে নষ্ট করবেন না। তাকে অগ্রসর হতে দিন। .... দেশে দুঃখ হয়.... শরৎ বাবু ও নজরুল ছাড়া গত দশ বছরের মধ্যে কোন ভাবুক লেখকের উদয় হয়নি। জাতির প্রাণে লাঙল এসেছে, নতুন ডেমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝংকারে তাই পাই।"

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁকে লিখেছেন ".... সৃষ্টি যারা করবার তারা করে; তুমি মহাকালের প্রলয় বিষাণ এবার বাজাও, কাজী ভায়া। অতীতকে আজ ডেবোও, ভয়কে আজ ভাঙ্গ, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক।"

নজরুল সম্পর্কে দিলীপ কুমার রায় বলেছেন ঃ

"একটা টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। সুভাষ একবার আমাকে বলেছিল ঃ ভাই জেলে যখন ওয়ার্ডার লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব। তখন বার বার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান- 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। ... কাজীর একটি গান যা সুভাষ ভালবাসতো- 'দূর্গম গিরি কান্তার মরু'। কাজী যখনই এ গানটি গাইতো, মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হয়ে উঠতো। কাজীর গান সুভাষের জীবনের প্রেরণা স্বরূপ।"[১৭]

হিন্দু মুসলিম ঐক্যের আহবানে সাড়া দিয়ে মিঃ জিন্নাসহ মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগ দিল, নজরুলও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবেশী সমাজের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ হিন্দু ধর্মভিত্তিক বহু গান রচনা করেছিলেন। ঐক্যের কবিতাও লিখেছিলেন। একথা আগেও উল্লেখ্য করেছি। সেই ঐক্য দৃঢ় করার জন্য দুই পক্ষের মধ্যে ১৯২৩ সালে যে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়, তাতে দুই সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু পরের বছর চুক্তিতে হিন্দু পক্ষে অন্যতম দস্তখতকারী শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশসহ সকল হিন্দু সদস্য বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভায় একযোগে ঐ চুক্তি সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আহূত কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত রোয়েদাদে বৃটিশবিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং গুরু-গম্ভীরভাবে রোয়েদাদে বৃটিশ কর্তৃক মুসলিম লীগের দাবীর স্বীকৃতির তীব্র নিন্দা করলেন, আর ভারতীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করেননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন আত্মীয় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার সারা জীবনের নীতি ও রীতি-ই ছিল প্রভু ভজন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তি নিকেতন'-এ তিনি 'কখনও দেশপ্রেম' বা 'রাজনীতি' ঢুকতে দেননি। বলেছেন দেশের চেয়ে বড় জিনিস আছে; শান্তি নিকতনে তারই সাধনা করা হয়।"[১৮]

এ জন্যই সেকালে অপর একজন বাঙ্গালী স্বধর্মীয় যতীন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের

১৭। আমি স্মৃতি ঃ আমি ইতিহাস, মোজহারুল ইসলাম, পৃঃ ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪।

১৮। ডঃ এস এম লুৎফর রহমান, বাঙ্গালী তেকে বাঙলাদেশীদের নজরুল, দৈনিক মিল্লাত '৯৩।

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে' গানটির প্যারডি লিখে এর শিরোনাম দেন- "পা-চাটাদের প্রার্থনা" (দ্রষ্টব্য নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধূমকেতু, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)। তাই নিরপেক্ষ গবেষকদের মতে, রবীন্দ্রনাথের জীবন চেতনায় এবং আবেগ-আকাঙ্খার মূল কথাই হ'ল "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।" এ তাঁর শুধু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিলনা; জাগতিক অনুভূতি, উপলব্ধি এবং কর্মনীতিও ছিল। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক অনুভূতি, উপলব্ধি এবং কর্মনীতি ছিল সর্ম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে তাঁর বক্তব্য হলো ঃ

"খড়ব কবর, তুড়ব শ্মশান-
মড়ার হাড়ে জাগবো প্রাণ।"

কিংবা

"আমি উপাড়ি ফেলব অধীন বিশ্ব
অববহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।"

ইংরেজদের প্রতি কাজী নজরুলের কিরূপ বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং তিনি কতোটা রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন তা অনুমান করা যায় তৎকালীন সাপ্তাহিক সওগাতে চানাচুর বিভাগে প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক রচনা পাঠ করলে। উদাহরণ হিসাবে কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি।

''হয় জান্‌তি পার না'' শিরোনামে কাজী নজরুল লিখেছেন ঃ

"হয় জান্‌তি পার না!"

সেদিন তুমূল তর্ক দুই নেতায়! যাকে বলে মেড়াটুঁস! একজন বলছিলেন ঃ

"আরে, ইতা কিতা কন! স্বরাজ আমাদের ত ওইয়াই গেছে! সেতুবন্ধ বাঁইন্দ্যা ফেল্‌ছি। এ্যাহন ফাল্ দিয়া উৎকা মাইর‍্যা হালার লঙ্কায় গিয়া পড়ুলেই অয়! সোলেমান বাদশার লাহান উ হালায় ত মইর‍্যা বুথ ওইয়া গ্যাছে। ঠ্যালা মারছেন কি- উপ্ পুত্ ওইয়া পইর‍্যা যাইবো!"

আর একজন বলছিলেন ঃ

"দেখুন, আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। একজন মিস্‌তিরী অস্ত্র তৈরী করত। সে একদিন দেশের রাজার কাছে এসে হাম্বাই তাম্বাই করতে লাগ্‌ল,- হুজুর, আমার মতন তলওয়ার তৈরী কর্‌তে পৃথিবীতে কেউ পারে না! রাজা বললেন, কি করে বুঝব? মিস্‌তিরী বললে, আমি আমার তলোয়ার দিয়ে এমন সাফ সাফ গলা কেটে দিব যে, সে জানতেই পারবে না, এমন ধার!

রাজার খেয়াল, লোক ধ'রে আনা হ'ল! মিস্‌তিরী আস্তে গলার ওপর দিয়ে তার তলোয়ার চালিয়ে দিলে! লোকটা কিন্তু তখনো দিব্যি দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে, যেন কিছুই হয়নি! রাজা বল্‌লেন, ওর যে গলা কাটা গেছে কি ক'রে বুঝ্‌ব? মিস্‌তিরী অমনি তার

নস্যির কৌটো থেকে এক চিম্‌টি নস্যি নিয়ে যেমনি লোকটার নাকে দেওয়া, অমনি হ্যাঁচ্‌চো- সঙ্গে লোকটার মাথাটা টুপ করে পড়ে গেল! .... কি মশাই বিশ্বাস হচ্ছে না?

আগের ভদ্রলোকই বলতে বলতে উঠে গেলেন, "আপনোগর প্যাঁটে মায়ের ডাকই হান্দায়নি, বুঝবোন কিমুন কইরা।"

"চারিদিক থেকে পাগ্‌লা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে" শিরোনামে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

ফ্যাসাদ কি শুধু সাহিত্যে, কৌন্সিলে, এ্যাসেম্লিতেই বেঁধেছে?- জোয়ান বুড়োর এ লড়াই পলিটিক্‌সে কংগ্রেস পর্য্যন্ত গড়িয়েছে!

সেখানেও মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি হ'তে নারাজ হয়ে তরুণ দলের প্রতিনিধি জওহরলাল নেহরুকে সুপারিশ করছেন ঐ গদির গদ্দিনশিন করবার জন্য।

হায় ব্রুতাস্‌, তুমিও! বুড়োদের বদন ক্রমেই ব্যাদিত হয়ে চলেছে।

'ডোমনী স্টেটাস' শিরোনামে নজরুল লিখেছেনঃ

ভারতমাতা এ কতদিন পদদলিতা দাসী ছিলেন। শুন্‌ছি তাঁর পুত্রদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তাঁর প্রভু না-কি তাঁর হাত-পায়ের কতক বাঁধন খুলে দিয়ে 'ডোম্‌নী স্টেটাস'-এর (Dominion Status) তক্‌মা পরিয়ে দেবেন।

ভারতমাতার বলদ (বলদানকারী!) পুত্রদের মধ্যে এই নিয়ে এরই মধ্যে মোচ্ছাবের ধূম লেগে গেছে! চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠ্‌ছে- 'মা ডোম্‌নী হবেন রে, মা ডোম্‌নী হবেন!'

মা-এর অবস্থা মা-ই জানেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে, তিনি বোধ হয় মনে মনে বল্‌ছেন 'এদের আঁতুর ঘরেই নুন খাইয়ে মারিনি কেন?'

ডোম্‌নীর ছেলেই বুঝিবা! হাতে যা বড় বড় ধামা!"[১৯]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলো 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থে প্রকাশিত হলে চরম নজরুল বিদ্বেষী ইংরেজ সমালোচকও কবি নজরুল সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছে "At the most conscious point of his age. নজরুল সম্পর্কে ইংরেজদের এই উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও লক্ষণীয়। এতেই প্রমাণিত হয়, নজরুল ইসলাম ছিলেন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ কালের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী কবি। বিংশ শতাব্দীর কোলে উনবিংশ শতাব্দীর সোনার উপহার। এ উপহার পেয়ে বাঙ্গালী জাতি যেমনি ধন্য, তেমনি হয়েছে গর্বিত, হয়েছে সার্থক। বিশ্বের বাঙ্গালীরা শক্তিমান জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কবি নজরুল রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘ কর্মময় জীবন ও সুযোগ পাননি। এছাড়া মুসলমান হবার অপরাধে এবং ইংরেজ বিদ্বেষী হবার কারণে তিনি নোবেল পুরস্কার এনে দিতে পারেননি বটে; কিন্তু তিনি যা বাঙ্গালীকে দিয়ে গেছেন বা দিতে চেয়েছেন, তা কবিগুরু দিতে চাননি বা পারেননি। এ জন্যেই রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে

১৯। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৭২১-৭২৪।

বিদেশী পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' এবং বিশ্ব পরিচিতি জুটলেও স্বজাতি কর্তৃক 'জাতীয় কবির' মর্যাদা তিনি পাননি বা আখ্যায়িত হতে পারেননি। অথচ তিনি জীবিত থাকা কালেই মুসলমান ও উদারপন্থী হিন্দু কর্তৃক কবি নজরুলকে জাতীয় কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই দু'টি গান দু'টি রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় কবির মর্যাদা হতে তিনি বঞ্চিত। অথচ কবি নজরুল আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি দেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় আসীন।

কবি নজরুল জেলখানায় অনশনরত তখন অনেকেই তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন কবি হয়ে আরেকজন কবির প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেননি। শুধু তিনি জেলখানায় তার বার্তা পাঠিয়ে নজরুল ইসলামকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অনুরোধের শেষ বাক্যটি ছিল "Our Literature claims you." রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর ট্রেলিগ্রামটি যখন কারাগারে পৌঁছে তখন প্রেসিডেন্সী জেল থেকে নজরুলকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো। Addressce not Found, লোক খুঁজে পাওয়া গেল না বলে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে টেলিগ্রাম ফেরৎ আসে। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে, "ওরা আমার বার্ত্তা ওকে দিতে চায় না, কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকিলেও ওরা নিশ্চয়ই জানে যে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইস্‌লামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।[১৯]

আজাদী আন্দোলনের পথিকৃত মানবতার কবি নজরুল বন্দনা গেয়েছেন সৃষ্টিকর্তার, দেশ ও জনগণের। বন্দনা করেছেন সাম্যের, কল্যাণের, সত্য ও সুন্দরের। নিপাত চেয়েছেন অকল্যাণ, পীড়ন, অশান্তি, মিথ্যা ও ভ্রান্তির। যেমন-

"জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক।
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক।
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক
সর্ব কল্যাণের পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক।
জয় হোক, জয় হোক।"

পরাধীন ভারতবাসীরা নজরুলের গানে ও কবিতায় পেল স্বাধীনতার মন্ত্র ও মুক্তির স্বাদ। নজরুলের শৃংখল ভাঙার সঙ্গীতে ভারতবাসীরা ভোগবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের-

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

তৎকালীন যুব সমাজ রবীন্দ্রনাথের ঘুম পাড়ানী কাব্যের ছন্দ প্রত্যাখ্যান করেন। তারা নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্বরে গেয়ে ওঠে-

"বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত শির
ওই শিখর হিমাদ্রির।"

পরাধীনতার শৃংখলে ঝিমিয়ে পড়া যুব শক্তিকে উজ্জীবিত করার জন্যে কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর
প্রলয় নতুন সৃজন বেদন
আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরের করতে ছেদন।"

এভাবেই নজরুল ইসলাম ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর অনলবর্ষী কবিতা ও গানে। নজরুল বিদ্রোহ করেছেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ করেছেন দাসত্বের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন আজাদী পাগল এক সৈনিক। পরাধীনতার গ্লানি ছিল তার অস্থি মজ্জায়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। নজরুলের এই শৃংখল ভাঙ্গার গান তখন আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তিনি সাহিত্য ভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর প্রতিবাদী গানে ও কবিতার মাধ্যমে। নজরুলের দীপ্তময় ভুবনের পাশে রবীন্দ্র ভুবনের ভরাডুবির আশংকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই শিউরে উঠেন। নিজকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং জনগণকে চমক লাগানোর লক্ষ্যে নজরুল ভুবনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু'র সারথী বিপ্লবী কবি নজরুল প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং আশীষের ভাষায়-

"আয় চলে আয় যে ধূমকেতু
আঁধারে আঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের ঐ দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।"

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথকতা

"আমি বংগভংগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস, এতদ্বারা পশ্চাদ্‌পদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্থ পূর্ব বংগের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ববংগের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হইতে চলিল, পূর্ববংগবাসীদিগের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আসাম প্রদেশও পূর্ববংগের সংগে ঘনিষ্ঠ সূত্রবদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে।"

-ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

১৯০৫ সালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বড়লাট কার্জন বাংলার চির অবহেলিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ও আসামকে একত্রিত করে পৃথক প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকাকে করা হয় প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী। এ প্রসঙ্গে উদারপন্থী হিন্দু লেখক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন-এর মন্তব্য প্রনিধাযোগ্য। তিনি বহু দিন পূর্বে বাংলায় বাস করেছিলেন। এ দেশের সমস্যাগুলো আর্থ-সামাজিক সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বংগভংগের পক্ষে জোরালো মন্তব্য করেছিলেন :

"আমি বংগভংগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস, এতদ্বারা পশ্চাদ্‌পদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্থ পূর্ব বংগের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ববংগের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হইতে চলিল, পূর্ববংগবাসীদিগের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আসাম প্রদেশও

বঙ্গভঙ্গ আন্দোনের অন্যতম নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম লীগ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং আজাদী আন্দোলনের পথিকৃত ঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ জন্ম ঃ ৭-৬-১৮৭১, মৃত্যু ঃ ১৬-১-১৯১৫।

"যখন আমি দেখিলাম আমার জাতি তথা আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর উম্মতগণ ধ্বংস ও বিলুপ্তির পথে আগাইয়া যাইতেছে; তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বরং আমি নিজেকে উৎসর্গ করিব, নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব; তবুও জাতিকে ধ্বংস ও বিলুপ্তির পথ হইতে রক্ষা করিব।"

-নওয়াব সলিমুল্লাহ

অমৃতসর, ২৭.১২.১৯০৮

পূর্ববংগের সংগে ঘনিষ্ঠ সূত্রবদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে।[১]

অথচ প্রশাসনিক বিভাগ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মর্যাদা পুরুদ্ধারের এই সম্ভাবনা দেখে উচ্চ বর্ণ হিন্দু এবং জমিদার বাবুরা এতোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন যে, ১৭৫৭ সালের পর এ-ই প্রথম তারা বৃটিশ 'প্রভুদের' বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করেন। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি গোখলে বলেছিলেন- "ঔরঙ্গজেবের পর হতে এ পর্যন্ত এতো নিকৃষ্ট শাসনকর্তা ইতিপূর্বে কখনও ভারত শাসন করেননি।" এমনকি এই উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদেরও আশ্রয় নিয়েছিলো।

বঙ্গভঙ্গ হবার পর হিন্দু দাদা বাবুদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের আসল নগ্ন চেহারা উন্মোচিত হয়েছিলো। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের কট্টর জাতীয়তার প্রকাশ ঘটেছিলো। স্বদেশ জাতীয়তাকে আরাধ্য দেবীতে পরিণত করা হয়েছিলো এবং এই আরাধ্য দেবীর জন্য প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সব পণ করা হয়েছিলো। যুগান্তর পত্রিকায় বলা হয়েছিলো ঃ

"হে বাঙ্গালী, তুমি কি নর-কীট হতে জন্মেছিলে?.... যখন বাঙ্গালাদেশ দু'ভাগ হল দেখে সাত কোটি বাঙ্গালী মর্মাহত হয়ে পড়লো, সেদিনকার কথা আজ একবার ভাব। সেদিন স্বদেশের জন্য কোটি কোটি হৃদয়ের ব্যথা যেমনি এক হল, অমনি মাতৃরূপিনী স্বদেশ শক্ত পলকের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ করিলেন, বাঙ্গালীও সর্বত্র আচম্বিতে 'বন্দে মাতরম' বলিয়া উচ্চঃস্বরে মাকে আহবান করিল।.... সেদিন যেন এক নিমিষের জন্যে বাঙ্গালীর কাছে মা আমার প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেদিন যে বাঙ্গালী বড়ই ব্যথা পেয়েছিল, ভেবেছিল মা বুঝি দ্বিখন্ড হয়েছে, তাই মা আত্মপ্রকাশ করে বলেছিলেন, আমি দ্বিখন্ড হই নাই, তোদের একত্র রেখে সহজেই শক্তিদান কর্তুম, আজ সেই বাঁধা ঘর শক্ররা ভেঙ্গে দিলে মাত্র; যেদিন আমার জন্যে স্বার্থ ও সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিতে অগ্রসর হবি, সেদিন আবার সেই শক্তি তরংগ মাঝে আমার দেখা পাবি, আমি মরি নাই।.. এসব বাঙ্গালী, আজ মার সন্ধানে বেরুতে হবে। সে বার মা আপনি এসে দেখা দিয়েছিলেন, এবার মার জন্য লক্ষ রুধিরাক্ত হৃদয়ের মহাপীঠ প্রস্তুত করে রেখে মাকে খুঁজে খুঁজে কারামুক্ত করে নিয়ে আসব।... একবার সকলে বুকে হাত দিয়ে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সমস্ত পণ করে আজ মার সন্ধানে বেরুতে পারবে কি-না? ...বাঙ্গালীকে 'বন্দে মাতরম' মাতৃমন্ত্র শিখাইতে হইবে।... সর্বাগ্রে মাকে সাক্ষাৎ বন্দনা কর, মাকে তাঁর উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে বিদ্যা, অর্থ, মোক্ষ ইত্যাদি সবই ক্রমশ আসিয়া পড়িবে।"[২]

জমিদার বাবুদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পূর্ববঙ্গের জমিদারীই ছিল একমাত্র ভরসা। সেই জমিদারী হাত ছাড়া হয়ে গেলে পথে বসতে হবে। পূর্ববঙ্গের জমিদারীর আয় থেকে শুধু সংসারই চলতো না, বাবুদের ব্যয়বহুল বিশ্ব ভ্রমণও হতো। বঙ্গভঙ্গের নামে

১। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, আত্মজীবনী, পৃঃ ১১০-১১।
২। স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ, পৃঃ ১৪২, ১৪৬।

শোষণের ক্ষেত্র হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন ব্যথিত এবং বিবেক দংশিত হয়েছিল। এছাড়া ঢাকার মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটলে বাংলার মুসলমান কৃষক প্রজারা সর্বদিক দিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে, চাষার ছেলে অফিসার হবে এবং হারানো মুসলিম রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মুসলমানদের সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে- এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। বঙ্গভঙ্গ আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি একাত্ম হয়ে হাত মিলিয়ে ছিলেন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির সাথে। বঙ্গভঙ্গের ফলে মজলুম বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে কল্যাণের একটি আবহ ঝিকমিক করে উঠেছিল। তাই পূর্ব বাংলায় নির্যাতীত মুসলিম জনগোষ্ঠি বঙ্গভঙ্গকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জুগিয়েছিলো। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপহাস ও বিদ্রুপাত্মকভাবে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

বঙ্গভঙ্গর পর যখন 'স্বদেশী' বাবুরা পূর্ব বংগে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আন্দোলন চালাতো, তখন ঃ 'কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী' প্রচারকের মুখে শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, পূর্ববংগে বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহ ভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না, তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উগ্রবাদী হিন্দুদের নিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে গোপন আঁতাতের ফলে মুসলমানদের জন্য আর পৃথক প্রদেশ হয়ে ওঠেনি। জনশ্রুতি রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নীতি ছিল-

"মুসলমানদের দেখতেও পারব না অথচ ওদের ভিন্নও থাকতে দেবনা, বঙ্গভঙ্গ হতে দেবনা, বঙ্গ মাতাকে ভাগও হতে দেবনা।"

ইতিহাস সাক্ষী, ১৭৫৭ সালের আগে এই পূর্ব বাংলায় বস্ত্র, চিনি ও নানাবিধ কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিলো। এমনকি চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণের কারখানাও ছিলো। তারা নিজেদের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে এগুলোকে ধ্বংস করে। বৃটিশেরা ১৯০ বছরে এ পূর্ব বাংলাকে শ্মশান বাংলায় পরিণত করে।

পূর্ব বাংলার অর্থকরী ফসল বলতে তখন ছিলো একমাত্র পাট। কিন্তু সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ৬৮,২৫৮টি তাঁতসম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অথচ এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বলে কথিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। আর পূর্ব বাংলার জনগণকে অত্যাচারী জমিদারেরা যেভাবে নির্মমভাবে শোষণ-নির্যাতন করেছে তা দেখে

৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খন্ড, পৃঃ৯১০-৯১১; পৃঃ ৮২৮ পৃষ্ঠাও দেখুন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে লিখিত)। দ্রঃ আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৮৩।'

হিন্দিভাষী জওহর লাল নেহেরুর বিবেকও দংশিত হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ করে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

"ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এরা ছিল গরীব প্রজা বা অতি ক্ষুদ্র ভূস্বামী। জমিদার সাধারণতঃ হত হিন্দু, গ্রামের বানিয়াও তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মুদি। কাজেই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারও করে নিতে ছাড়তো না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। কেননা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ তার মূলে রয়েছে এইখানে।"[৪]

অথচ সীমাহীন এই প্রজা শোষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবেক দংশিত হয়নি। হ্যাঁ, তাঁর হৃদয় দংশিত হয়েছিলো যখন বঙ্গভঙ্গের ফলে শোষণের ক্ষেত্র পূর্ব বাংলা হাত ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিলো। তিনি বাঙলা ও বাঙালীর প্রেমে গদ্‌গদ্ হয়ে তিনি রচনা করে ফেললেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" এ গানটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের রাতারাতি এই বাংগালপ্রীতি দেখে বড় লাট কার্জনেরও না-কি ভিমড়ি খাবার উপক্রম হয়েছিলো। বেচারা কার্জনে না-কি দিশেহারা হয়েছিলো এই ভেবে সত্যিকার বাঙ্গালী মুসলমানেরা, না হিন্দু বাবুরা।

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে কাশিম বাজারের জমিদার রাজা চন্দ্রের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ

"নতুন প্রদেশে হিন্দুগণ সংখ্যালগিষ্ঠে পরিণত হইবে। আমাদেরকে নিজ দেশে আগন্তুকের মত থাকিতে হইবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হইবে তা চিন্তা করিয়া আতংকিত হইতেছি।"[৫]

মহারাজা জাতি বলতে হিন্দুদেরই বুঝিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গ বিভাগ দিবস ১৬ই অক্টোবরকে 'শোক দিবস' করে।

কংগ্রেস শোক দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে-

(১) রাখী বন্ধন উৎসব প্রত্যেকের বাহুতে লাল ফিতা বাঁধিতে হইবে।

(২) উপবাসব্রত লালন করিতে হইবে।-- খুব সকালে সকলকে খালি পায়ে হাঁটিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে।

এই 'শোক দিবসে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বাণীতে বলেন ঃ

"এখন সময় হয়েছে, রাখী বন্ধনের তাৎপর্যকে বাংলাদেশের একটা সাময়িক ঘটনার সঙ্গে আবদ্ধ রাখলে চলবেনা। এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে

৪। জওহরলাল নেহেরুঃ বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, অনুবাদ- শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ৩৮১।

৫। দ্রষ্টব্য ঃ আহমদ আবদুল কাদের, বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের জাতিসত্তা থেকে বাংলাদেশ, পৃঃ ১৭৪)

পরিণত করতে হবে। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তা হলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে।"[৬]

এখানে উল্লেখ্য, গেরুয়া সুতো- শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় হিন্দু সম্প্রদায় প্রিয়জনের মনিবন্ধে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয়া হয়। তাকেই রাখি বন্ধন বলা হয়। রবীন্দ্রভক্তরা ইতোমধ্যেই আমাদের দেশে হিন্দু সংস্কৃতির এই 'রাখী বন্ধনের' প্রচলন করে ফেলেছে।

এই শোক দিবসের গঙ্গাস্নান অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেন। তার সাথে বাবুরা গগন পবন বিদারিত করে সমবেত কণ্ঠে ধারণ করলেন ঃ

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার স্থল
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক ,পূর্ণ হউক
হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক. পূর্ণ হউক
হে ভগবান।
ভাঙালীর মন, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।

এই সঙ্গীত শেষে কীর্তন উদ্যানে ও অন্যান্য স্থানে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, বঙ্গভঙ্গের আগে এই পূর্বাঞ্চলের মানুষকে জমিদার বাবুরা বাঙ্গাল বলে উপহাস করতো। আমাদের পূর্বসূরীদেরকে জুতা, ছাতা, পালকি, চেয়ার ব্যবহারের অযোগ্য ভাবতো। গরু ছাগলের সাথে বেঁধে কাচারি ঘরে চীৎ করে রাখাটা পরম কর্তব্য বলে মনে করতো, সেই তারাই বঙ্গভঙ্গ বাতিল হবার পর মুসলমান প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিন্দু-মুসলিম দু'টি প্রাণ তথা দু'বাংলার মিলনের প্রতীক রাখি বন্ধনী পরিয়ে দেয় মুসলমানদের হাতে।

একই দিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পার্শী বাগান মাঠে অখন্ড বাংলার 'বঙ্গভবন' স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৬। হায়াৎ মামুদ, কিশোর রবীন্দ্রনাথ, দ্রষ্টব্য।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নওয়াব সলিমুল্লাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্বাঙ্গীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, যেহেতু আমরা প্রতিষ্ঠা করিতেছি যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে যে বাঙ্গালী জাতির এতো সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।"[৭]

১৯০৮ সালে ৩০শে মে কোলকাতার যুগান্তর পত্রিকায় হিন্দুদের প্রতি এক উদাত্ত আহবান জানিয়ে বংগমাতার খন্ডনকারীদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বলা হয় ঃ

"মা জননী পিপাসার্ত হয়ে নিজ সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করছে, একমাত্র কোন্ বস্তু তার পিপাসা নিবারণ করতে পারে। মানুষের রক্ত এবং ছিন্ন মস্তক ব্যতীত অন্য কিছুই তাকে শান্ত করতে পারে না। অতএব, জননীর সন্তানদের উচিত মায়ের পূজা করা এবং তার ইপ্সিত বস্তু দিয়ে সন্তুষ্টি বিধান করা। এসব হাসিল করতে যদি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়, তবুও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত হবে না। যেদিন গ্রামে গ্রামে এমনকিভাবে মায়ের পূজা করা হবে, সেদিনই ভারতবাসী স্বর্গীয় শক্তি ও আশীর্বাদে অভিষিক্ত হবে।"[৮]

'বন্দে মাতরম'-এর খন্ডিত মা'কে অখন্ড করার জন্যে 'প্রাণ অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার'কে পণ করে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তার সাথেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিলো। ১৯০২ সালে তিনি (শ্রী অরবিন্দ) মারাঠী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তাঁর ছোট ভাই ও শ্রী যতীন মুখার্জীকে কলকাতায় পাঠান। এ সময়ে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলা বিপ্লবী দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন।[৯]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও একথা বলেছেন ঃ

"আমি দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানেরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল।[১০]

ইংরেজ এ দেশবাসীকে 'নেটিভ' বলে দূরে রাখতো, তার 'ডগস্ এন্ড ইন্ডিয়ান্স নট্ অ্যালাউড্' কথায় ছিলো শাসক সুলভ দম্ভ। ইউরোপের বাইরের সমাজকে তার ঘরে বসে 'নেটিভ' বলার মতো ঔদ্ধত্য আর হতে পারে না' তার দ্বারা মানবতারই অসম্মান করা হয়। কিন্তু হিন্দুর ঘৃণাটা আরও মর্মান্তিক, সে মুসলমানের সান্নিধ্যকে বর্জন করেছে ধর্মের ও আত্মার পবিত্রতা রক্ষার্থে। মানুষকে এর চেয়ে বড় অসম্মান আর কিছুতেই দেখানো সম্ভব নয়। অথচ মানবাত্মার সবচেয়ে বড় অবমাননা ও অসম্মান করেও হিন্দুরা আশা করেছিল মুসলমান তাদের অনুবর্তী হবে, 'বাবুদের' 'স্বদেশী' ডাকে সাড়া দিবে।

৭। আহসানুল্লাহ ঃ অখন্ড বাংলার স্বপ্ন, পৃঃ ৮২-৮৩।
৮। ইবনে রায়হান ঃ বংগভংগের ইতিহাস, পৃঃ ৬-৭।
৯। বাংলার বিপ্লববাদ, শ্রী নলিনী কিশোর গুহ, পৃ ৭৭, ৭৮।
১০। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, পৃঃ ৩৩।

এবং সেটা হয়নি বলেই রবীন্দ্রনাথও পরিণত বয়সে ক্রোধে ফেটে পড়ে সব দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের দোষী করে বলেছিলেন ঃ

আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে- তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অংক ফল না কষে ভাগেরই অংক ফল কষছে। দেশে এরা আছে, অথচ রাষ্ট্র জাতিগত ঐক্যের হিসেবে এরা না থাকার চেয়েও দারুনতর তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা তালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সবচেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল। (কালান্তর, পৃঃ ৩)

মুসলমানেরা কেন বিরোধিতা করেছিলেন বা তাতে যোগ দেননি এ সম্পর্কে গুরুতর ব্যথা রয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রী নলিনী কিশোর গুহ। তিনি বিপ্লবী দলের নতুন রিক্রুটদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যে রীতি-নীতির বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো ঃ

"বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে জমকালো প্রতিজ্ঞার নমুনা দেখাইয়াছেন, বিপ্লববাদীরাও সে প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে তাহারই অনুকরণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নেই। এখানে অনুশীলনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের নমুনা দিতেছি। এখানে পুলিন বাবু স্বীয় দীক্ষা বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বর্ণনা করিয়েছেন, পি, মিত্রের আদেশ মতে একদিন (কলিকাতায়) একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি, মিত্রের বাড়িতে তাহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দনাদি সাজাইয়া দ্বান্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি, মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম,- আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি, মিত্র আমার দক্ষিণে দন্ডায়মান হইলেন, উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি, মিত্রকে নমস্কার করিলাম।... পি, মিত্র যে পদ্ধতিতে আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন গুপ্তচক্রের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমিও অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার বাসায় দীক্ষা দিতাম। এক সঙ্গে দীক্ষা দিতে হইলে ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে' যাইয়া একটু জাঁক-জমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। অর্থাৎ সংযম হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ চিত্তে কালী মূর্তির নিকট আলীঢ়সনে বসিয়া মস্তকে গীতা ও অসি ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতাম' ... পুলিন বাবু দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকে পর্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনিযুক্ত কাঁচা দুগ্ধ সেবন করিতে দিতেন। এই সকল প্রতিজ্ঞা বা দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে বঙ্কিমের আনন্দমঠের অনুকরণ লক্ষ্য করিবার।"[১১]

একত্ববাদের প্রতি যে মুসলমানের একরত্তি ঈমান রয়েছে, সে কি পারে এইরূপে শপথ গ্রহণ করে বিপ্লবী দলে যোগদান করতে? অথচ পৌত্তলিকতার বিরোধী বলে কথিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদের সাথে জড়িত ছিলেন। এদের ডাকাতি, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা ইতিহাসে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এই সন্ত্রাসীরা বাঙ্গালীর শক্তিতে যা কিছু সম্ভব তার সবকিছুই প্রয়োগ করে।

কুমিল্লার এক জনসভায় নবাব সলিমুল্লাহর ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। পথিমধ্যে এক হিন্দু বাড়ী থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। ফলে, জনসভা পন্ড হয়ে যায়।

১১। বাংলায় বিপ্লববাদ, শ্রী নলিনী কিশোর গুহ, পৃঃ ৭৭,৭৮।

নবাব বাহাদুর ঢাকা ফিরে আসেন। কিশোরগঞ্জের (সাবেক ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা) জমিদার সন্তান শ্রী নীরদ চৌধুরী তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ

বিতর্কিত বিপ্লবী নেতা সূর্যসেন

> At about the same time we heard of the rioting in the town of Comilla, occanioned by the visit of the Nawab of Dacca. The conversation of the elders gave us the impression that although the trouble had been provoked and started by the Muslims, they and more particularly their Nawab had not come out of the affair with flying colours. The elders related with contemptuous amusement that as soon as a gun had been fired at the Nawab from a Hindu house, he had ran for dear life to Dacca. That was our version of the event, and we, the children, discussed with glee the flight and loss of face of Salimullah, the One eyed."[১২]

হিন্দু বাড়ী থেকে নবাবকে গুলি করা হয়েছিল- এর স্বীকৃতি উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ এদের উদ্দেশ্যে সংগ্রামী তৎপরতা চালানো হয়েছিলো নবাবকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় অন্য পন্থা অবলম্বন করা হলো। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধানো হলো। হিন্দুরা সশস্ত্র, মুসলমানরা নিরস্ত্র, তাই মুসলমান বেঘোরে প্রাণ হারাতে লাগল। পূর্ববঙ্গে ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, তার উল্লেখ রয়েছে নীরদ বাবুর উক্ত গ্রন্থের ২৯৪ পৃষ্ঠায় এভাবে ঃ

> Our enjoyment was all the more unqualified because behind this rioting we did not feel the presence of that organised and doctrinaire hatred which we had preceived distinctly as the background of the Hindu Muslim riting of 1906 and 1907 in East Bengal. The Calcutta Riot of 1910 was the outcome of sheer holiganism, a clean thing compared with what was to come afterwarads and thus it was great fun.[১৩]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, ১৯০৬ ও ১৯১৭ সালে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পেছনে সুপরিকল্পিত ও আদর্শগত কার্যকারণ ছিল; কিন্তু ১৯১০ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ছিল নিছক ভন্ডামী। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিল ভঙ্গভঙ্গ রদ। আতঙ্কিত মুসলমান অতঃপর হিন্দুদের আন্দোলনের বিরোধিতা করেনি। তারা খালি

১২। -Nirad C. Chaudhuri the Auto Biography of An Unknown Indian, Bombay, p. 238
১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৪

মাঠে গোল দিল।

অবশেষে মারমুখো হিন্দুদের ব্যাপক চাপের মুখে ইংরেজ সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের দাবী মেনে নিল।

১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এলে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন এবং ঢাকাকে আবার বলি দেন কলিকাতার জমিদার রবীন্দ্রনাথ বাবুদের বেদীমূলে। গ্রাসাচ্ছদনের জমিদারী ফিরে পেয়ে আনন্দে ডগমগ এবং রাতারাতি পূর্ব বাংলার চাষাভূষা মুসলিম প্রজাদের দরদে ও প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ কুম্ভরাশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য স্যার জন জেনকিন্স নতুনভাবে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের এবং কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। শাসন পরিষদের অনুমোদনের পর এই পরিকল্পনা ২০শে আগস্ট ভারত সচিব কিউর-এর নিকট প্রেরিত হয়। নতুন পরিকল্পনায় বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই বছর নভেম্বর মাসে ভারত সচিব বাংলাদেশ প্রদেশ পুনর্গঠনের নতুন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লী দরবারে বঙ্গ বিভাগ রদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই নতুন প্রদেশের রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মোঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী ঢাকার ঐতিহ্য আবার ঢাকা পড়ে যায়।

১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথরা বাংলা বিভাগ রোধ করেছিল। আবার ১৯৪৭ সালে এই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসুরীরা বাংলা ভাগের পক্ষে সমর্থন দেয়ায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী স্বজাতির এ মনোবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়ে উপহাসচ্ছলে বলেছেন ঃ

> "প্রথম বংগভংগের সময় আমরা কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের ফাঁপরে পড়িনি; এবং গণদেবতার রক্ষিতা নারী প্রেম আমাদের প্রথম বিভাগের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে, যেমন করেছে একদল নির্বোধ ও বর্বর অর্বাচীনকে বর্তমান বিভাগ করার অনুকূলে। আমার এখনও বেশ মনে আছে, বংগভংগ রদের আন্দোলন সময়ে একটি বাংলা সংবাদপত্রে এরূপ কার্টুন ছাপা হয়েছিল- লর্ড কার্জন একটি জীবিত নারীকে করাত দিয়ে দু'ভাগ করছেন। ...... আমার চিন্তা হয়, বর্তমানে সমান মনোবৃত্তিতে চালিত হয়ে এরূপ চিত্রও প্রকাশিত হয়ে থাকবে- লর্ড মাউন্টব্যাটেন নার্সের পোশাক পরে এক বৃদ্ধা নারীর প্রসবকালে সাহায্য করছেনএবং একটি সদ্যোজাত একহস্ত ও একপদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র নবজাতককে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরছেন।[১৪]

বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাবার ফলে মহাকবি ইকবাল দারুণভাবে মর্মাহত হন। তীব্র ভাষায় তিনি বৃটিশ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলমানদের আবার বাবুদের শোষণের শিকার হতে দেখে ক্ষোভে দুঃখে ইকবাল তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

১৪। দি অটোবায়োগ্রাফি অফ এন আননোন ইন্ডিয়ান, পৃঃ ২২২-২৩।

"উর্দ্দু বাবুদের মিলে গেলো ধুতি
আর লুট হলো পাগড়ি।"

আবার এরাই ১৯৪৬ সালে মুসলিম শাসনের আতংকে বৃহৎ ভারতের মাড়োয়ারীদের সাথে বিলীন হবার লক্ষ্যে বহু জননীর দেহচ্ছেদ করে এবং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে কোরাস কণ্ঠে আনন্দ চিত্তে গেয়ে উঠে–

"বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ
ভাগ হউক, ভাগ হউক, ভাগ হউক
হে ভগবান।"

আজ থেকে প্রায় ৭১ বছর আগে বংলা ১৩৩৪ সনে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের 'বন্দে মাতরম' কবিতাটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করে। নারী প্রতিমা পূজাকেই দেশমাতৃকারূপে উপস্থাপন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত আনন্দমঠ উপন্যাসে। প্রথমে জগদ্বাত্রী, পরে কালী শেষে দূর্গারূপে তুলে ধরেছেন দেশমাতৃকাকে। এই দেবী বন্দনায় তিনি রচনা করেছিলেন 'বন্দে মাতরম' কবিতাটি। এই কবিতাটি বৃটিশ ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্লোগান হয়েছিলো। শিরক বিধায় মুসলমানরা 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের চরম বিরোধিতার ফলে 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। অনেকে মনে করেন, গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত নয় বলেই বিরোধিতা করেছিলেন।

যা-ই হোক, পরবর্তীতে তাঁর 'জন-গণ-মন' গানটিই ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত ভাগ্যবান এ জন্য যে, জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবির মর্যাদা না পেলেও পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম দু'টি দেশে তাঁর সঙ্গীতই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গের মুসলমানেরা বিদেশী বেনিয়া ইংরেজ এবং তাঁর স্বজাতি হিন্দু দ্বারা যে নির্মম শোষণের শিকার হয়েছিলেন, এ সম্পর্কে একটি কথাও রবীন্দ্রনাথের মুখ বা কলম দিয়ে বের হয়নি। অথচ যখন দেখলেন শোষণের ক্ষেত্র হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখনই পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রেমে গদ্ গদ্ হয়ে বন্দে মাতরমের আদলে রচনা করলেন 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। অনেকে এই গানটিকে 'বঙ্গে মাতরম'-এর ফটোকপিই মনে করেন। ["বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা' রচনা করেছিলেন বাঙ্গালীর জন্য। মুসলমান তখন বাঙ্গালী ছিলোনা। তখন বাঙ্গালী হলে তাকে অবশ্যই আর্য হিন্দু হতে হতো।"]

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বসন্ত চ্যাটার্জী তাঁর বহুল প্রচলিত 'ইনসাইড বাংলাদেশ টু-ডে'

গ্রন্থে বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

(বাংলা অনুবাদ) "বাঙালী ভদ্রলোক সমাজ গঠিত হতো প্রধানত বাংলার তিনটি বর্ণহিন্দু যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও ক্ষত্রিয় দ্বারা। বৈদ্য হলো বিশেষ এক ধরনের বর্ণ হিন্দু; যাদের বলা হতো "অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ"- তারা পৌরহিত্য করতে পারতো। কায়স্থরা মূলত শূদ্র হলেও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সরকারী চাকুরী করার ফলে তারা স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী ছিল। তাই তারাও ভদ্রলোক বলে গণ্য হতো। শূদ্রদের কোন কোন বিচ্ছিন্ন সদস্য, যারা কয়েক পুরুষ যাবৎ অর্থ ও জ্ঞানের জন্য সমাজে নামী-দামী তারাও এই বিশিষ্ট সমাজের সদস্য হতে পারতো। তবে মূল কথা ছিল, বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণীর মর্যাদা পেতে হলে তাকে অবশ্য আর্য হিন্দু হতে হতো। অন্য কোন নিম্নশ্রেণীর মানবেতর হিন্দু উপজাতীয় বা মুসলমান, তা সে যত ভাল বাংলা বলতে পারুক না কেন বা যত উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন এরা কিছুতেই 'বাঙালী' বলে গণ্য হতো না।"[১৫]

আনন্দ মঠের 'বন্দে মাতরম'-এর সম্পূর্ণ গানটি নিম্নরূপ ঃ

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র-জ্যোস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভূজৈধৃত ত-খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহু বল ধারিণীং নমামি তারিনীম্
রিপু দল বারিনীং মাতরম্।।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিনী

১৫। বসন্ত চ্যাটার্জী, ইনসাইড বাংলাদেশ টু-ডে, চাঁদ এ্যান্ড কোং, নয়াদিল্লী, ১৯৭৩, পৃঃ ১৪৭।

কমলা কমল দল বিহারিনী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্ ।।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতা! ভূষিতাম্
ধরনীং ভয়নীং মাত্রম ।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটিতে যে ভাব প্রকাশ করেছেন ঠিক তেমনি কিছুটা হেরফের করে একই ভাব প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার সোনার বাংলা' গানটিতে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে শেরেকী।

ভারতীয় ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডঃ ভবানী ভট্টাচার্য তাঁর 'সোসিও পলিটিক্যাল কারেন্টস ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"The conception of the goddess Kali and Durga, as Bepin Chandra Pal observer, correctedwith this Mother Cult. Kali is the symbolized image of a stage of human evolution when society was torn with tribal conflicts, She stands in the bloody desolution of war, holding the dripping heads, of men who have falten in the struggle, revelling in carrage, darkened by the passion of a fighting humanity, a dreadful goddess bestriding the prostrate body of Siva, the symbol of the good, her lord and lover. At a higher stage of racial evolution Kali is no longer herself, She has taken the form of Durga, the ten armed goddess. She is the symbol of organisation, harmony and unity......

Concerned in different symbolic forms the Mother was the soul India. The structure of the country the mountains and risers and plains was her physical embodiment.....[১৬]

উপরের বক্তব্যে দেখা যায় যে, কালী ও দূর্গা থেকে মাতৃবাদ এসেছে। 'মা' হচ্ছেন ভারতের আত্মা। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট ইত্যাদি দেশের গঠন হলো মায়ের শারীরিক প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ দেশ মাতৃকার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'মহেন্দ্র ভক্তি ভরে জগদ্ধাত্রীরূপিনী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই পথে আইস, ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পিছু পিছু চলিলেন– ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালী মূর্তি দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।' মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, 'কালী'। ব্রহ্মকালী অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান তাই মা কংকাল মালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন

১৬। দ্রঃ ওবায়দুল হক সরকার, সাপ্তাহিক বিক্রম, ২৮ মার্চ-৩ এপ্রিল সংখ্যা, '৯৪

হায় মা! ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'হাতে খেটক খর্পনর' কেন?

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র বল, 'বন্দে মাতরম'। বন্দে মাতরম বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল।" মা কালীর (দেশমাতৃকা) মলিন বদন দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের "ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল।" আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা'য় লিখেছেন-

'মা তোর বদনখানি মলিন হলে
ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি।'

মা কালীর মলিন বদন দেখে ব্রহ্মচারী যেভাবে নয়ন জলে ভাসছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথও নয়ন জলে ভাসছেন। সোনার বাংলা দেশমাতৃকা সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

'চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে-
মরি হায়, হায়রে-
ও মা অগ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।।'
কী শোভা কী ছায়া গো,
কী স্নেহ কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো-
মরি হায়, হায়রে-
মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি।।

আমাদের এই আকাশ, এই বাতাস সব আল্লাহর সৃষ্টি। কোন মা'র সৃষ্টি মনে করা অর্থ আল্লাহর সাথে অন্যের অংশী স্থাপন। আল্লাহ নর বা নারী কোনটিই নন, তাঁর কোন আকার নেই, কিন্তু মা বলার সাথে সাথে একটি নারী মূর্তি চোখে ভেসে ওঠে। আল্লাহর কোন অবয়ব নেই, কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতে বলা হয়েছে মা তোর বদনখানি মলিন হলে ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রহ্মচারী (মায়ের সন্তান) কালী মূর্তির মলিন বদন দেখে নয়ন জলে

বঙ্কিমের জীবদ্দশায় মুদ্রিত বন্দেমাতরম সংগীতের চিত্ররূপ

ভেসেছিল। কাজেই মুসলিম বিরোধিতার পটভূমিকায় রচিত এই সঙ্গীতটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করায় ১৯৩৭ সালে মুসলমানেরা প্রবল আপত্তি জানায়। মুসলমানদের প্রবল আপত্তির কারণে পরবর্তীতে তা পরিত্যক্ত হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর "অতীত দিনের স্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

........ভারতের সর্বত্র এই সঙ্গীতের প্রতিবাদে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী মুসলমানগণ মুখর হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসী মহল বিচলিত হয়ে উঠলেন কিন্তু নিজেদের গোঁ ছাড়লেন না। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরমে'র মহাত্ম্যকীর্তনে তাঁরা অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। তাতে মুসলমানদের প্রতিবাদ তীব্র এবং অধিকতর ব্যাপক হয়ে উঠলো মাত্র। সম্ভবতঃ কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অতঃপর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন। তিনি এ সঙ্গীতের প্রথম চার লাইন রেখে বাকী অংশ বর্জন করতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, প্রথম চার লাইনকে দূর্গার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ না করে দেশমাতৃকার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে এবং ওটুকু জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এ পরামর্শ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাদের মতে বন্দনা বা পূজা একমাত্র বিধাতা (খোদা) ছাড়া আর কাউকে মুসলমানেরা করতে পারেন না। তা ছাড়া যে-পটভূমিকায় এ-সঙ্গীত রচিত হয়েছে এবং এ-সঙ্গীতের সাথে মুসলিম-বিরোধিতার যে যোগ (এসোসিয়েশন) মুসলমানেরা তা ভুলে যেতে পারে না। হিন্দুরা জাতীয় সঙ্গীত হয়তো এটা হতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের জাতীয় সঙ্গীত এটা কিছুতেই হতে পারে না।

শুধু 'বন্দে মাতরম' নয়, আরো এক ব্যাপারে মুসলিম তরুণদের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার 'শ্রীপদ্ম' মনোগ্রাম। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে এই 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রামের তীব্র প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম তরুণ মহলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রামের বিরোধিতার মূলে মুসলিম তরুণদের যুক্তি ছিল এই যে, 'শ্রী' হচ্ছে সরস্বতীর অপর নাম, আর 'পদ্ম' হচ্ছে তাঁর আসন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই হিন্দু-প্রতীকী মনোগ্রাম মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না শুধু এই কারণে নয় যে এটা হিন্দুয়ানী-প্রভাবিত, বরং এ কারণেও যে, এর আইডিয়াটা পৌত্তলিক যা তৌহিদবাদী মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ 'শ্রীপদ্ম' মনোগ্রাম সম্পর্কে মুসলমানদের এ আপত্তিও মেনে নিতে চান নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মনোগ্রাম তারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। মনোগ্রাম থেকে 'শ্রী' বর্জিত হয় এবং 'পদ্ম'ও রূপান্তর গ্রহণ করে।[১৭]

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আওয়ামী লীগ নেতা মুস্তফা সরওয়ার বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আরোপের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"আমি বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত বাণী পাঠ করে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" নামক রবীন্দ্র সঙ্গীতটি জাতীয় সংগীতে পরিণত করার পেছনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরিকল্পনার কথা আলোচনায় বলেছিলাম।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আম্রকাননে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে এই 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' গঠনকালে সরকারীভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে

১৭। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃঃ ১৪৫-৪৬।

বিশ্বভারতীর আদর্শ হইতে 'শান্তম্', 'শিবম্', 'অদ্বৈতম্' শব্দত্রয় পরিহার

সরকারী বিলের দফাওয়ারী আলোচনাকালে পার্লামেণ্টে তুমুল বিতর্ক

নয়াদিল্লী, ১লা মে—আজ পার্লামেণ্টে পুনরায় বিশ্বভারতী বিলের দফাওয়ারী আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্দেশক এক তফশীলে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রসঙ্গে ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ বিলের মূল উদ্দেশ্যাবলীর তফশীল হইতে 'শান্তম্', 'শিবম্' ও 'অদ্বৈতম্' অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদর্শের দ্যোতক উক্ত শব্দ তিনটি বর্জনের প্রস্তাব করিলে শিক্ষা সচিব মৌলানা আজাদ তাহা স্বীকার করিয়া লন। শ্রী বি পি ঝুনঝুনওয়ালা (বিহার) উক্ত শব্দ তিনটি পুনরায় সংযোজনের দাবী জানাইয়া এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রায় ৩ ঘণ্টা তুমুল বিতর্কের পর ৮৪-৩৪ ভোটে উহা অগ্রাহ্য হয়। বিতর্ক প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কে টি শাহ ও অধ্যাপক শিব্বনলাল সাক্সেনা বলেন যে, উক্ত শব্দত্রয় বর্জন করিলে মহাকবির আদর্শের প্রতি চরম অবমাননা হইবে। পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব বলেন যে, 'অদ্বৈতবাদ' একটি বিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলীতে অনুরূপ বিশিষ্ট তত্ত্বের প্রচার অবাঞ্ছনীয়।

সত্যযুগ পত্রিকার একটি পাতা

আমাদের ধর্মীয় পরিপন্থী অনেক পৌত্তলিক শব্দ চাপিয়ে দিলেও হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় পরিপন্থী শব্দ পরিহার করেছে। 'সত্যযুগ' পত্রিকার কার্টিংটি এর প্রমাণ।

এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল।

'১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুসহ আমরা অনেকেই যখন জেলে ছিলাম তখন ৭ই জুনের সফল আন্দোলনের পর এই দেশ স্বাধীন হলে জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু ইচ্ছা করেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' [১৮]

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় সঙ্গীত সমগ্র জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হলো এবং সমগ্র জাতি স্বীকার করে নিল বাংলাদেশের আকাশ বাতাস সব এক 'মা'-এর, আল্লাহ্ তায়ালার নয়। দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্, কিন্তু বাংলার মুসলমান স্বীকার করলো সার্বভৌমত্বের মালিক 'মা'। জনাব মুস্তফা সরওয়ারের তথ্য সঠিক হলে বলা যায়, ১৯৩৭ সালে বৃটিশ-ভারতে হিন্দুরা শিরকী জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৭১ সালে এসে তারা পুরোপুরি সফল হয়েছে।

আরেকটি তথ্যে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে। জানা যায়, শেখ সাহেব-এর প্রিয় গান ছিলো ডিএল রায়ের 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা'। জেলখানায় না-কি প্রায়ই এই গানটি তিনি গুন্ গুন্ করে গাইতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো এই গানটিই জাতীয় সঙ্গীত করার। তিনি 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সঙ্গীত করার বিরোধী ছিলেন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। খন্ডিত ভারতের খন্ডিত পাকিস্তান, অর্থাৎ বাংলাদেশ তাঁর কল্পনায় ছিলো না। বঙ্গভঙ্গ হয়েছিলো ঠিকই, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' বঙ্গভঙ্গ রদ করে আবার অখন্ড বাংলায় পরিণত করে। শেখ সাহেব একান্তভাবে চেয়েছিলেন 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হোক। তিনি পাকিস্তানের জেলে থাকাবস্থায়ই না-কি ভারতের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীত করা হয়।

"আমার সোনার বাংলা"কে জাতীয় সঙ্গীত করা হয়েছে দেখে শেখ মুজিব বলেছিলেন ঃ "তোরা এ কি করেছিস? আমি চেয়েছিলাম 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।"[১৯]

এ সম্পর্কে অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুনের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, শনিবার বাংলাদেশ টেলিভিশনে রাত ৯টায় "আ-মরি বাংলা ভাষা" অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুন বাংলা ভাষার উপর বেশ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ আমদানির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে আপত্তি করেছিলেন তাও উল্লেখ করলেন। অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন শীর্ষস্থানীয়া ব্যক্তিত্ব। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত "দু'টি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি এও লিখেছেন ঃ

১৮। মুস্তফা সরওয়ার, দৈনিক খবর, ২৬শে মে, ১৯৯০।
১৯। দ্রষ্টব্য ঃ সত্য-অপ্রিয়, সত্যবাদী, দৈনিক সংগ্রাম, ১২/৪/৯৭।

"বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এইসব আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গী হয়েছেন বার বার। আমরা যে শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য লড়ছি তা নয় ঐ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে পাঁচদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল ইসলামের গানের আসর হয়েছে। প্রতিদিন গানের শেষে একটি করে গানে শ্রোতাদের কণ্ঠ মিলাবার আহবান থাকতো। কোনদিন 'আমার সোনার বাংলা' কোনদিন 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা', কোনদিন 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী' ইত্যাদি। তখন কি জানতাম যে, সেই প্রিয় গানগুলোর ভিতর থেকেই দু'খানি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আর জাতীয় গীতি হিসেবে দেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জন করবে। জাতীয় গীতি কোনটি, এ বিষয়ে পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগবে। কারণ এর কোন প্রচার হয়নি। শুনেছি 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত প্রিয় গান। এ গান শুনতে শুনতে সর্বশরীর কেমন শিহরিত হয়, দেশের জন্য প্রীতির বোধে পূর্ণ হয় সে আমরা জানি। দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর ১০ জানুয়ারী দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু না-কি বলেছিলেন- আহা! 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা' গানটাকে জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) করা গেল না। তার পরে এই গানখানিকে 'জাতীয় গীতি' (National Song)-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল।

ঊনিশ শ' পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জাতীয় সঙ্গীতই বুঝি এই বদলায় তো সেই বদলায়। জাতীয় গীতির খবর আর রাখে কে?"[২০]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সনজীদা খাতুন উল্লেখ করেছেন যে, 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা' গানটি ছিল 'বঙ্গবন্ধুর একান্ত প্রিয় গান'। গানটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ওযে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন উজ্বল ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে
পাখীর ডাকে জাগে

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখা কুঞ্জে২ গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে২ ধেয়ে

২০। সনজীদা খাতুন ঃ দু'টি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ১৯৯৬।

তারা ফুলের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
এমন স্নিগ্ধ নদীর নাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হড়িৎ ক্ষেতে আকাশতলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস তাহার দোলে॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত উপরোক্ত জাতীয় সঙ্গীতে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে মাতৃ মতবাদ তুলে ধরা হয়নি, শিরকও নেই বললেই চলে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত 'নবজাতক' পত্রিকায় বলা হয়েছে ঃ

"বাংলাদেশের জাতীয়তা আজ ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলাকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইতিহাসের এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা যে, একই কবির রচিত দু'টি সঙ্গীত দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। এর পরেও ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীর উপর আঘাত হানবে কে? রবীন্দ্রনাথ এই দুই দেশকে যে রাখী বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন, সেই বাঁধন নিশ্চয়ই অটুট থাকবে।"[২১]

বৃটিশ আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদেরও হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং হিন্দুদের দেব-দেবীর বিশেষ করে সরস্বতীর বন্দনা করতে হতো। বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে বলতে হতো-

'জয় জয় মহারাণী
সবিনয়ে তোমা নমি;
জুড়িয়া দু'খানি হাত,
করি তোমায় প্রণিপাত।'

ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রীদের 'সরস্বতী'র বন্দনা করতে হতো এভাবে-

'সরস্বতী ভগবতী, মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব, মোরা যাই ঘর।
ঝিকিমিকি ঝিকিরে সুবর্ণের চক,
পাত-দোত নিয়ে চল, জয় গুরুদেব।'

এখন সেই বেনিয়া গোষ্ঠী বৃটিশ সরকারও নেই; অখন্ড ভারতও নেই। আজ আমরা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসী। অথচ পরোক্ষভাবে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শিশু থেকে বুড়োকে পর্যন্ত দেবীর স্তুতি বা বন্দনা গাওয়ানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

২১। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নবজাতক (কলকাতা) ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা ঃ অষ্টম বর্ষ ঃ জাতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ঃ ১৩৭৮ পৃঃ ১৭৬।

বঙ্গভঙ্গের আদেশ বহাল রাখার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদ করার বৃটিশ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ভেঙ্গে পড়েন।

বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের প্রথম প্রবক্তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব সলিমুল্লাহ'র অন্যতম সুযোগ্য সহযোগী নওয়াব আলী চৌধুরী।

উল্লেখ্য, নবাব সলিমুল্লাহ'র পূর্ব পুরুষেরা ইংরেজদের দালালী করেছেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব-সূরীদের পাপ খন্ডাতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে। নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার মুসলিম জাগরণে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন। আজকের ন্যায় অতীতেও যে-সব মুসলিম মনীষী মুসলমানদের ন্যায্য দাবীতে অটল থাকতে চেয়েছেন, তাদেরকেই চিত্রিত করা হয়েছে গোঁড়া ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িকরূপে। আর একই দাবী হিন্দু নেতারা করলে, তখন তা রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে উদার নৈতিকতার স্থান দখল করে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হতো। নবাব সলিমুল্লাহকেও এসব অভিধায় অভিযুক্ত হতে হয়েছিলো।

১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবী পেশ করেন। অন্যতম দাবীটি ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। হিন্দুদের চক্রান্তে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ভারতের বড়লাট নবাবকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। কিন্তু অন্যান্য উগ্রবাদী হিন্দু নেতাদের সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ আশ্বাসেরও চরম বিরোধিতা করেন।

১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রতিবাদ সভা ডাকে। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ তিনি ছিলেন জমিদার। তিনি মুসলমান প্রজাদের মনে করতেন লাইভ স্টক বা গৃহপালিত পশু।[২২]

কাজেই বাংলার মাটি, বাংলার জলের জন্য একবছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমে গদ্ গদ্ হয়ে গান লিখলেও এক বছর পর বাংলার কৃষকদের ছেলে শিক্ষিত হবে তা তিনি সহ্য করেননি। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে নবশিক্ষিত মুসলমান সমাজকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সন্তানদের শিক্ষিত হয়ে বুদ্ধিজীবী হলে চিরকাল সেবাদাস করে রাখা যাবে না। একথা চিন্তা করেই বোধ হয় হিন্দু বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা সেদিন আতংকিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উগ্রবাদী হিন্দুরা কতটা ক্ষিপ্ত হয়েছিল এর প্রমাণ পাওয়া যাবে সেকালের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, বিবৃতি ও পত্রিকার ভাষ্য থেকে।

১৯১২ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বড় লাটের সাথে বর্ধমানের স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিমন্ডলী সাক্ষাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করার পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তির জাল বিস্তার করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে আভ্যন্তরীণ বঙ্গ বিভাগ-এর সমার্থক, তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক; তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তারা কোন মতেই উপকৃত হবে না।[২৩]

সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশিক্ষিত ও কৃষক বহুল পূর্ববঙ্গের শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হবে; পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষানীতি ও মেধার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না।[২৪]

এছাড়া হিন্দু সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং সভার সিদ্ধান্তগুলো বৃটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করতে থাকেন। বাবু গিরিশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বড় লাট হার্ডিঞ্জের কাছে ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করেন।[২৫]

আশ্চর্যের বিষয়, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মিছিলে শরীক হয়েছিলেন মানবতার কবি দাবীদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও।

২২। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, দি অটোবায়োগ্রাফী অব আননোন ইন্ডিয়ান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
২৩। Report of the Calutta University Commission Vol-iv, pt-ii-p-133.
২৪। ঢাকা প্রকাশ, ১১ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী-১৯১২।
২৫। Report of the Calcutta University Commission।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিন পরও হিন্দুরা এটিকে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গোক্তি করতো। এই সূত্রে পশ্চিম বাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আরও একটি কথা স্মরণযোগ্য, তা হলো ঃ 'পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কালচার নেই। এদের কালচার হচ্ছে এগ্রিকালচার। এমনি পটভূমিতে ১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ নবাব সলিমুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন। এ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নবাব সলিমুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। অনেকের মতে নবাবের অকাল মৃত্যুর কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী এবং ঐ সতর্কবাণী।

মৃত্যু সম্পর্কে নবাবের দুধমাতা (নবাবের মৃত্যুর পরও অনেক দিন বেঁচে ছিলেন) এবং ঢাকার কাদের সর্দারের উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিহাসবিদ গবেষক কবি ফারুক মাহমুদ এ গ্রন্থাকারকে বলেছেন ঃ "হিন্দুদের চক্রান্তের ফলে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বড়লাটের সাথে নবাবের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে বড় লাট নবাবকে ধমক দেন। নবাবের সাথে সব সময় একটি ছড়ি থাকতো। সে ছড়ি দিয়ে নবাব বড় লাটের টেবিলে আঘাত করেন। এ নিয়ে চরম বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে বড় লাটের ইঙ্গিতে তার দেহরক্ষী নবাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন এবং গুরুতর আহত অবস্থায় নিশ্ছিদ্র প্রহরায় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তিনি প্রাণ হারান। বড় লাট জনসাধারণের কাছে নবাবের স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণ করার জন্যে কড়া সামরিক প্রহরায় নবাবের লাশ তার কলিকাতার বাসভবনে নিয়ে যান এবং প্রচার করেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নবাবের মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীতে কড়া সামরিক প্রহরায় নবাবের লাশ ঢাকায় আনা হয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজনকেও লাশ দেখতে দেয়া হয়নি। সামরিক প্রহরায় বেগম বাজারে তাঁকে দাফন করা হয়। শোনা যায়, দাফন করার পরও বহুদিন নবাবের কবরস্তানে সামরিক প্রহরা বিদ্যমান ছিল।

১৯১৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নবাব সলিমুল্লাহর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে শক্ত হাতে হাল ধরেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। সেই ১৯১১ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষণার দিন থেকে ১৯২০ সালের ২৩শে মার্চ-এ বড় লাটের আইন সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাস হওয়ার দিনটি পর্যন্ত তিনি বিরামহীন প্রচেষ্টা চালান। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। অবশেষে কট্টর হিন্দু নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়টি নবাব দেখে যেতে পারেননি। এছাড়া জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীও (চাঁদ মিয়া) পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। অথচ আজ নবাব সলিমুল্লাহর নামে একটি হল আছে বটে; কিন্তু

কায়েদ আযম জিন্নাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী ও জমিদার চাঁদ মিয়ার কোন স্মৃতি চিহ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নেই।

শোনা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে মূর্তি প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। গত দু'দশকে কলা ভবনের সামনে, সড়ক দ্বীপে, শামসুন্নাহার হলের পূর্ব পার্শ্বে প্রভৃতি এলাকায় কয়েকটি মূর্তি প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছে। কোন কোনটি প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্থিক অনুদানও বরাদ্দ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিবেকানন্দ, গান্ধী, নেহেরু, সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে বিবেকানন্দের মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে। মূর্তি স্থাপন করা, মূর্তি পূজা করা সম্পূর্ণরূপে শিরক। আর শিরক হচ্ছে ভয়ংকর পাপ। মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মুসলমানরা কিভাবে এ পাপ সহ্য করবে- তা ভেবে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকেই।

আর যাঁদের আন্দোলনের ফসল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অনেকে তাঁদের নামই জানে না। তাঁদেরকে নিয়ে কোন আলোচনা বা স্মৃতি সভা হয় না। আলোচনা বা স্মৃতি সভা হয় বঙ্কিম, সূর্যসেন ও রবীন্দ্রনাথদের নিয়ে। যাঁদের কল্যাণে চাষার ছেলে থেকে আজকে যারা ভাইস-চান্সেলর, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, আমলা, রাজনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, বিচারপতি, শিল্পপতি, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক- পরিচালক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, সে-সব কৃতি সন্তানেরা আজ উপেক্ষিত, নিন্দিত। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন তাঁরাই আজ নন্দিত। হায়রে দুর্ভাগা দেশ! হায়রে দুর্ভাগা জাতি!

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে রবীন্দ্র বাবুরা। বর্তমানে করছে মুসলমান নামধারী রবীন্দ্র ভক্তরা।

বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> 'রবীন্দ্রনাথের মাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সাধনা, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার কিংবা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার বর্বর অহংকার হচ্ছে পায়ের তলায় জমি শূন্য, শেকড় শূন্য, নির্বোধের অহংকার।'[২৬]

সচেতন মহলের মতে, দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের এই মন্তব্যে নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন করারই কথা। তারা স্বভাবতই বিশ্বাস করবে 'রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব'। এই বিশ্বাসের পরিণাম কি হবে তাও ভেবে দেখা সময়ের দাবী।

২৬। সরদার ফজলুল করিম ঃ রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব ঃ দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ ২৪ ফাল্গুন, ১৩৯৬।

যৌবনে কবি কাজী নজরুল ইসলাম

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির-আমাদের ;
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।"
বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক!
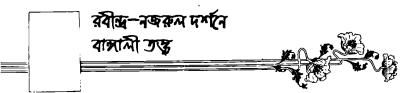
The only possible national language for inter Provincial inter-course is Hindi in India.

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক রক্তের বিনিময়ে, চরম মূল্য দিয়ে বাঙ্গালীরা আজ বিশ্বের কাছে স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার দু'যুগ পরেও বাঙ্গালীরা জানেনা তাদের আদি পরিচয়। বাঙ্গালী জাতির আদি পুরুষ ছিলেন কারা?

আমাদের দেশের রবীন্দ্র বলয়ের বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন 'বাঙ্গালী হতে হলে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই অলিখিত দেবতার স্তরে স্থান দিতে হবে'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'মহা ভারতকে' আর্য জাতির ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের ইতিহাসে আর্যগণ বাংলা এবং বাঙ্গালীর যে পরিচয় ও চিত্র এঁকেছেন তা একান্তই হিংসাত্মক, বিদ্বেষমূলক এবং অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও গ্লানিকর।

বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালী জাতির আদি ইতিহাস লিখতে গিয়ে নিছক গাঁজাঘুরি এক পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে জারজ প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কাহিনীটি হলো-

বাঙ্গালী জাতি আদি পুরুষ অসুর রাজ বলিরাজা ছিলেন না-কি নিঃসন্তান। তাই নদী দিয়ে ভেসে আসা অর্ধমৃত আর্য পুরুষ লম্পট দীর্ঘ তনুকে রাজা তার রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে সেবা-যত্ন করে, দুধ-মাখন খাওয়ায় এবং নিজ স্ত্রীকে যৌন উপভোগ করতে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করিয়ে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ তনুর ঔরষে অসুর রাণী সুদুফার গর্ভে নাকি বাঙ্গালীর জন্ম।

এই কাহিনীতে সত্যতার লেশমাত্র থাকতে পারে না। কারণ বলিরাজার রাজত্বে সন্তান উৎপাদন করার মতো পুরুষের অভাব থাকার কথা নয়। এছাড়া অসুরদের কাজে আর্যরা বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। এছাড়া অসুরেরা আর্যদের চেয়ে অধিক বীর্যশালী ছিল- আর্যদের ধর্মগ্রন্থে না-কি এর বর্ণনাও রয়েছে।

মহাভারতের মতে, বাঙ্গালীরা 'দীর্ঘতমা মুনির' জারজ সন্তান। মহাভারতে বলা হয়েছে দীর্ঘতম মুণি, ঋষি, উতসা ও মমতার পুত্র। মমতা যখন গর্ভিনী ছিলেন তখন

তার দেবর, দেব পুরোহিত বৃহস্পতি ভাবীর সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাবী বলেন, আমি ইতোমধ্যেই তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হতে গর্ভিনী হয়েছি। বৃহস্পতি তথাপি ভাবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গম অভিলাষ চরিতার্থ করে। গর্ভস্থ শিশু তখন নিজের পা দ্বারা শুক্র প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেয়। বৃহস্পতি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে জন্মান্ধ হওয়ার অভিশাপ দেন। বৃহস্পতির অভিশাপে দীর্ঘতমা মুণি জন্মান্ধ হন। অন্ধ হলে কি হবে, কামধেনুর কাছে গো-ধর্ম শিক্ষা করে দীর্ঘতমা মুণি অত্যন্ত কামুক ও লম্পট হয়ে পড়ে। যত্র-তত্র, যার-তার সাথে সঙ্গমরত হওয়ায় প্রতিবেশী স্ত্রী, পুত্র সকলেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন। একদিন বিরক্ত হয়ে স্ত্রী প্রদ্বেষী ও পুত্ররা তাকে কলার ভেলায় বসিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে দীর্ঘতমা গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে চলে আসেন। সেখানে গঙ্গাস্নান করছিলেন সেই অঞ্চলের রাজা 'বলি'। বলি রাজা দীর্ঘতমাকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে আসেন। এদিকে, বলিরাজা ছিলেন নপুংসক এবং সন্তান জন্মদানে অক্ষম। দীর্ঘতমা মুনিকে স্বাস্থ্যবান দেখে বলিরাজা স্বীয় সুন্দরী স্ত্রী সুদেষ্ণাকে তার দ্বারা সন্তান উৎপাদনে নির্দেশ দেন। রাণী সুদেষ্ণা এবং দীর্ঘতমা মুণির অবৈধ মিলনে জন্ম হয় পাঁচ পুত্রের। এই পাঁচ পুত্রের নাম রাখা হয় অংগ, বংগ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সূহ্ম। তাদের নামেই নাম পেল বংশধরেরা এবং তাদের বাসভূমিগুলো। অর্থাৎ বাংগালী হলো আর্য ঋষি দীর্ঘতমার জারজ সন্তান বংগের বংশধর। বংগদেশ হলো সেই বংগগোষ্ঠীর বাসস্থান। বাংগালীর রক্তে আর্য-অনার্যের ভেজাল রয়েছে। তাই তারা শংকর জাতি। অবৈধ সূত্রে আর্যদেব আত্মীয় বিধায় বাংগালীর যা কিছু কৃতিত্ব তাতে তাদেরও অংশ রয়েছে। অন্য কথায়, তাদের পুণ্য রক্তের ভেজাল রয়েছে বলেই বাংগালীর এত সব কৃতিত্ব।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"বাংলা দেশে আর্যদিগের আগমনের পূর্বে যারা বাস করতো তাদের সভ্যতা আদৌ উচ্চস্তরের ছিলোনা। কলিকাতাবাসী আর্য ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন যে, কোল, ভীল, হাড়ী, ডোম, সাঁওতালরা না-কি বাঙ্গালী জাতির আদি পুরুষ।"[১]

বঙ্কিম বাবুও গর্ব ও অহংকার করে বলেছেন ঃ

"তাহাদের (আর্যদের) শোণিত বাংগালীর শরীরে আছে যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি সকল শ্রেষ্ঠ হয়েছিল, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বইছে।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্র আদি বাঙ্গালী বলতে আর্য ব্রাহ্মণ হিন্দুদেরই বোঝাতেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য। আর তিনের বাইরে এক চতুর্থ জাতি, বাঙ্গালী মুসলমান।"

১। আরিফুল হক, দৈনিক ইনকিলাব।
১। পূর্বোক্ত।

প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর রূপ

চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালী মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা অনুযায়ী বাঙালী মুসলমানের স্থান চার নম্বরে, শূদ্রেরও নীচে। আর রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে মহাভারতকে যদি আর্য ইতিহাস বলে মেনে নেতে হয়, তা হলে বাংলাদেশ হবে এক জারজ মুণির জারজ সন্তানের দেশ এবং বাঙালী জাতি সকলেই জারজ সন্তান। জারজ সন্তানের গ্লানিকর পরিচিতি কি মেনে নেবে স্বাধীনচেতা এই সংগ্রামী জাতি?

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, বাংগালী জাতির আদি পুরুষেরা আর্য ও দ্রাবিড়দের চেয়ে অধিক উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। ছিলেন তাদের চেয়ে অনেক সুসভ্য। আর্যগণ দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের অধিবাসী দ্রাবিড়গণকে রাক্ষস বলেছেন, কিন্তু পূর্ব ভারতের বাংলার বলিরাজাকে বলেছেন, অসুর অর্থাৎ প্রাচীন আসর দেশী। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গালী জাতির আদি পুরুষেরা ছিল আসরিয়া সভ্যতা উদ্ভূত। খৃষ্ট-পূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসুরাজ তুকুনাতিনিবনব কর্তৃক আর্যরা বিধ্বস্ত হয়।

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজান্ডার যাদের ভয়ে ভীত হয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সম্ভবত পবিত্র কোরআন মজিদে এদেরকেই জুলকারনাইন বলা হয়েছে। এরাই বীর বাঙ্গালীর আদি পুরুষ। আর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। তিনি ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে 'বাঙলা' নামে খ্যাত পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বিলায়েত-ই-লখনৌতি' নামে খ্যাত পশ্চিম বাংলা ও উত্তরবঙ্গ দখল করে সমগ্র ভূখন্ডের 'বাঙ্গালাহ' নাম করেন। আর তখন থেকেই বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসীগণ বাঙ্গালী হিসাবে পরিচিত হতে শুরু করে।

এক সময় আর্যরা বাংগালীকে অসুর ও দস্যু বলে আখ্যায়িত করেছে। বাংগালীর ভাষাকে বলা হয়েছে অসুরের ভাষা, পক্ষীর ভাষা। ইতরের ভাষা বলে বঙ্গ ভাষাকে আর্য পন্ডিতেরা 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দিতেন। হাড়ি ডোমের স্পর্শ হতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন, বঙ্গভাষা তেমনি আর্য সমাজে অপাংক্তেয় ছিল। ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার

পাত্র ছিল। এমনকি, আর্য্য ব্রাহ্মণেরা শ্লোক রচনা করেছিলেন "অষ্টাদশ পুরাণ মনি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়ং মানবং শ্রুত্বা রোরবং নরকং ব্রজেং"। অর্থাৎ, অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করবে, তারা রৌরব নামক নরকে গমন করবে।"

পরবর্তীতে এরাই হয়ে যায় একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বলতে বাংলা ভাষী হিন্দু জাতি এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতে পৌত্তলিক সংস্কৃতিকেই বোঝানো হয়েছে। আর সে জন্যই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খন্ডে শ্রীকান্তের সাহস বল-বীর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল' ম্যাচ। সন্ধ্যা হয় হয় মগ্ন হইয়া দেখছি। হঠাৎ ওরে বাবা এ কিরে। চটাপট শব্দ এবং মারো শালাকে ধরো শালাকে।"

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী বলতে হিন্দুদেরই বুঝিয়েছেন।

অথচ বাঙ্গালী জাতি ও ভাষা প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলমানদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। এটা কোন মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা নয়। আজ থেকে ষাট বছর আগে হিন্দু লেখক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন সওগাত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে অকপটে স্বীকার করে গেছেন। শুধু দীনেশ চন্দ্র সেন কেন, অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক, গবেষক, লেখকও এ বিষয়ে একমতই পোষণ করে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা বাঙ্গালিত্বকে তাদের ধর্মীয় দর্শন বা সংস্কৃতিতেই আবদ্ধ রাখতে চায়। মুখে বাঙ্গালিত্বের বড়াই করলেও চিন্তায় ও কর্মে স্ববিরোধী। ভাষা ও জাতি তাদের কাছে গৌন; ধর্মই মুখ্য। তাই তো দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে ভাষা ও বাঙ্গালিত্বকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে বৃহৎ ভারতের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো।

ঢাকা ভার্সিটির অধ্যাপক এস, এম, লুৎফর রহমানের মতে, রবীন্দ্রনাথের চোখে বাঙ্গালীর হীনতা যত বড় হয়ে উঠেছে, অন্য কোন বাঙ্গালী কবির কাছে তা হয়নি। মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ইংরেজ হবার জন্য নয়; হিন্দুত্বের গ্লানি মোচন করার জন্য। কিন্তু রবীন্দ্র চেতনা ছিল হিন্দুত্ব নয়; বাঙ্গালিত্বের গ্লানিতে ভরপুর। তিনি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে তৃপ্তি পাননি; গ্লানি বোধ করেছেন। আর সে জন্যেই তিনি লিখেছেন-

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানষ করনি।"

এ আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের সাময়িক কোন বিরাগ থেকে উৎপন্ন হয়। কারণ, এই অনুভূতি তিনি অন্যত্রও প্রকাশ করেছেন। তাই "দুরন্ত আশা' কবিতায় তিনি পুনরায়

আক্ষেপ করে লিখেছেন-

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুঈন
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন...."

তা হ'লেই তিনি খুশী হতেন, আনন্দ পেতেন। বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালী হয়ে জন্মগ্রহণের দীনতা তাঁকে ভোগ করতে হতো না।

আর কাজী নজরুল্লের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো ভিন্নরূপ। তিনি "বাঙালীর বাঙলা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে "বাঙালির বাংলা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট-সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যু ভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্রা কেবল অন্ধকার পথে, ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়, দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়, বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ অর্থাৎ ক্ষাত্র-শক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রাণ সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগলো না বলে দিব্যশক্তি কোন কাজে লাগলো না- বাঙ্গালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদগীরণ করলো না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্ব গুণের প্রধান শত্রু তম গুণকে প্রবল ক্ষাত্র শক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবন শক্তিকে চির জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, ব্যাধিতে, অভাবে, দৈন্যে দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মত জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুণি-ঋষি যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তারা সর্ব দৈব্য শক্তির লীলা নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদ গুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে মাঠে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী।

বাংলার জল নিত্য প্রাচর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোন দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোন দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ-আল্লাহ্, ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বালার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে, ঝিলে ঝিলে, পুকুরে, ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃ-ভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্যা সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ, ধান, পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উল্টো তাদের দাসত্ব করি, এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লিখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুণি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলী-গাজীর দগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি। এখানে যা শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতামন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে, তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর, বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর, বিদেশীর দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ্ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে, হায় তারা এই অপমান, এই দাসত্ব বিদেশী দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য- যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারলো না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করলো বলে তার এই দুর্গতি তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা-তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না" এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ ঐশ্বর্য! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে- তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ

করবো, সংহার করবো।"

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও ঃ

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির-আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।"
বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক![৩]

কবি নজরুল ইসলাম বাঙালী হয়ে, বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় কোন রকম হীনমন্যতা বা গ্লানি বোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নিজকে ধিক্কার দিয়ে বেদুঈন হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেননি। বাঙালীকে ভাবেননি মানবেতর কোন প্রাণী।

"কবি নজরুল 'মানুষ' বাঙালীর মনুষ্যোচিত দোষ-গুণের সমালোচনা করেছেন। তাদের দোষ সংশোধন এবং গুণের বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা ক'রেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ 'অ-মানুষ' বাঙালীকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখেননি। তিনি-

"দাস্যমুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগ মদে দোদুল কলেবর।"

বাঙালীকে ধিক্কার দিয়েও নিজে চিরকাল সেই বাঙালী-ই থেকেছেন। "দাস্য সুখে হাস্যমুখ" "প্রভুর পদে, সোহাগমদে দোদুল কলেবর" এক বিশ্ব পরিচিত বাঙালী। তাই নজরুল যখন এ দেশের যুব সম্প্রদায়কে লুটেরা শাসক ইংরেজদেরকে তাড়ানোর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করছেন; বরীন্দ্রনাথ তখন ১৯২২ সালে বোম্বাই শহরে একটি রাজনৈতিক বক্তৃতায় বিট্রিশ রাজশক্তিকে ভারত ত্যাগ না করার আহবান জানান। অথচ সেই সময় যুবক নজরুল 'ধূমকেতু'-তে ছড়াতে থাকেন-বিপ্লব এবং বিদ্রোহের বাণী। অথচ অনেকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই না-কি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও স্বাধীনতার অনুপ্রেরণাদায়ক এবং কবি নজরুল ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীল ও খন্ডিত কবি।

মুসলমানদের মাতৃভাষা-প্রীতিই এ উপমহাদেশে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধ করেছে। পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের পর মুসলমানরা যেমন ১৯০ বছর আজাদী সংগ্রামের লড়াই করেছেন, ঠিক তেমনি এরা বাংলা ভাষা সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের জন্যও লড়াই করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা আজকে যেমন হিন্দি ভাষার কাছে

৩। নবযুগ ৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে প্রাগৈতিহাসিক ভাষায় মর্যাদা দানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁরই উপস্থিতিতে এক সভায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন, ঠিক তদ্রুপ আগেও এরা সংস্কৃতি ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা ভাষার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছেন। সুতরাং বাংলা ভাষার অগ্রযাত্রায় মুসলমানদের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ শাসিত ভারতে ১৭৯টি ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তখন ইংরেজী ভাষা ছিল রাজভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাই স্বাধীন ভারতে তার মর্যাদা কি হবে, তা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। হিন্দু ভারতের নেতা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীই সর্বপ্রথম প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। সবচেয়ে কৌতূহলের ব্যাপার যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম সে প্রশ্নের জবাব দেন। গান্ধীর এই চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন- The only possible national language for inter Provincial inter-course is Hindi in India.[৪]

তার এ উক্তি নিয়ে বাংলাভাষী হিন্দুদের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া জাগেনি। আর তা জাগবার কথাও নয়। কারণ, হিন্দিকে ভারতের একমাত্র সাধারণ ভাষা করার স্বপ্ন হিন্দু ভারতের অনেক পুরানো। সতেরো-আঠারো শতকের ছত্রপতি শিবাজীর 'এক ধর্ম, এক রাজ্য এক সিংহাসন' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু জাতি এতে এক বাক্যে সাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি, বরং তিনি কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহযাত্রী ছিলেন।

এক ধর্ম এক রাজ্য এক সিংহাসন- এই বাণীর প্রথম উদ্যোগ্তা ছিলেন ব্রাহ্ম নেতা ব্রহ্মাণন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ১২৮০ সালে (১৮৭৪ খৃঃ) 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় সর্বপ্রথম তিনি তাঁর এ প্রস্তাব পেশ করেন (৫ই চৈত্র, ১২৮০/১৮৭৮)। এর দ্বিতীয় প্রস্তাবক রাজা রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৯ খৃঃ), তৃতীয় প্রস্তাবক শ্রী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬)। এরই ভাবশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর শেষ প্রস্তাবক কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৮)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমকালীন 'সুলভ সমাচারে' (৫ই চৈত্র, ১২৮০) ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র বলেন ঃ

'ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা লাভের উপায় কি- যতদিন সমস্ত ভারতবর্ষে এক

৪। রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৭৮।

ভাষা না হইবে ততদিন কিছুতেই একতা সম্পন্ন হইবে না। এখন যতগুলো ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দি ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র একতা সম্পন্ন হতে পারে।"

বলা বাহুল্য, এ ভারত হিন্দু ভারত। ভারতীয় সকল হিন্দু নেতা বা বুদ্ধিজীবী মহলে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা সে লক্ষ্যে সকল কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যায়। ১৮৭৯ খৃঃ শ্রী রাজ নারায়ণ বসু এ লক্ষ্যে কাজ করেন এবং তিনি "The Old Hindu's Hope" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে তা বাংলা সংস্করণে "বৃদ্ধ হিন্দু আশা" নামে সর্বত্র প্রচারিত হয় (১৮৮৬ খৃঃ)। শ্রী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কর্মকান্ড একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

শুধু তা-ই নয়, বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিভাগে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি সমগ্র সরকারী দফতর থেকে ফারসী হরফ বিতাড়িত করে সেখানে দেবনাগরী হরফে হিন্দি প্রবর্তনে কৃতকার্য হন (১৮৮০)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ফারসী ও দেবনাগরী হরফের দ্বন্দ্ব প্রবল হওয়ায় এ আন্দোলন বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ভূদেব বাবুর পথেই আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। সর্বশেষে আসেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)।

১৯১৮ সালে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দি সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি পেশ করেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীতেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ পন্ডিতগণ সে সভায় হাজির হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রস্তাবে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথমে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তাকে ভারতের অন্যতম সাধারণ ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চে। শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি একথা বলেননি। একজন ভাষাতাত্ত্বিক-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।[৫]

পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই ১৯২১ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য লিখিতভাবে দাবি উত্থাপন করেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। দাবি নামায় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলে ঃ

"ভারতের রাষ্ট্রভাষা যা-ই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে।"

১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে মাওলানা আকরম

৫। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনায়, মুহাম্মদ আবু তালিব, পৃঃ ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩।

খাঁ সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায়ই তাদের লেখা ও কথা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন বাংলা ভাষা আজ রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের পতাকা আজ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। কবি নজরুল বলেছিলেন-

"শির নেহারি আমারি নত শির।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর বংশধরেরা ইংরেজ শাসকদের তোষণ এবং হিন্দু ভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করলেও গুটি কয়েক মীরজাফর ছাড়া কবি নজরুলের জাতি কখনো বিজাতীয়দের কাছে শির নত করেনি। তাই, যে রবীন্দ্রনাথ বিধাতার কাছে "সাত কোটি সন্তানেরে মানুষ করনি" বলে আক্ষেপ করেছেন, তারা আজ একটি পতাকা এবং মানচিত্রের অধিকারী হয়েছে। বিশ্বের দরবারে নিজেদেরকে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচয় দেয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে মুসলমানদের অসাধারণ বিস্ময়কর ভাষা-প্রীতি ও মমত্ববোধের কারণেই। আমাদের দেশের কতিপয় মুসলিম নামধারী রবীন্দ্রভক্ত বুদ্ধিজীবী তা স্বীকার না করলেও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই কৃতজ্ঞ চিত্তে তা স্মরণ করেন। এখানে সবার বক্তব্য দেয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

সেই অবিভক্ত বাংলার বিধান সভায় নব-নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরাই ছিল খাঁটি বাঙালী। এর আগে রাজনীতিতে আসতেন শুধু বড় বড় জমিদার, উকিল, ব্যারিস্টার বা রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর। তাদের পোশাক হয় সাহেবী অথবা চোগা চাপকান। মুখের ভাষা সব সময়ই ইংরেজী কিন্তু গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিরা বিধান পরিষদে নিয়ে এলেন বাংলা ভাষা। লুঙ্গির ওপরে পাঞ্জাবি পরে আসতেও তাদের দ্বিধা নেই। পশ্চিম বাংলার দিকের মুসলমানরা তো ধুতিও পরেন নিয়মিত। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বাংলা ভাষায় পেশ করতে লাগলেন। তখন নিয়ম ছিল কোনো সদস্য বাংলায় বক্তৃতা করলে তা রেকর্ড করা হতোনা। বক্তব্যের সারাংশ ইংরেজীতে তর্জমা করে দিতে হতো। তাই সই, তবু তারা বাংলা বলবেনই।

বাঙালী হিন্দু নেতারা ততদিনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ধরেছেন বটে, কিন্তু বক্তৃতার সময় ইংরেজীর ফোয়ারা ছোটান। কে কি বললেন, সেটা বড় কথা নয়। কে কত জোরালো ইংরেজির তুবড়ি ছোটাতে পারেন, সেটাই যেন গর্বের বিষয়। হিন্দু নেতাদের মধ্যে এ রকম

৬। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৯৭।

একটা হীনমন্যতা ছিল যে, সর্বসমক্ষে বাংলা বললে লোকে যদি ভাবে যে, লোকটা ইংরেজি জানেনা। শিক্ষিত মুসলমানদেরও বালাই নেই, যাঁরা ইংরেজিতে ভালো বক্তা, তাঁরাও ইংরেজী ছেড়ে প্রায়ই শুরু করতেন বাংলায়। স্বয়ং ফজলুল হক ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকের চেয়েই উঁচুতে, তিনি মাঝে মাঝেই ইংরেজির বদলে শুধু বাংলা নয়, একেবারে খাঁটি বরিশালী বাঙাল ভাষায় কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না।"[৬]

বাংলা ভাষার প্রতি হিন্দু নেতাদের মমত্ববোধের অভাবে এবং হীনমন্যতার কারণে ১৯৪৭ সালের পর ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা হলো তারা তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু এদেশের বাংলা ভাষী মুসলমানেরা তা মেনে নেয়নি। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে তারা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাই আজকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীরা বাংলাকে হিন্দিবাসীদের কাছে বলি দিয়ে কলকলিয়ে হিন্দি বলে, আর মুসলমানেরা উর্দুকে ঝেটিয়ে বিদায় করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বাংলা বলতে ও বাঙ্গালী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছত্রপতি শিবাজীর 'এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক সিংহাসন' প্রতিষ্ঠায় বিভোর হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন তিনি কখনো দেখেননি। তাই তিনি দু'বাংলার জনগণকে বঙ্গভঙ্গ রদ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, তাঁর কবিতায়। যেমন-

"চলরে চল সবে
ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহবান।"

সুতরাং আজকে যারা রবীন্দ্র প্রেমে দিওয়ানা হয়ে তাঁকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের দিক-নির্দেশক বলে অভিহিত করছেন এবং অষ্ট প্রহর তাঁর বন্দনা করছেন, তাদের অন্তনির্হিত উদ্দেশ্য যে সৎ নয় তা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে তারা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে এদেশে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন 'এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক সিংহাসন' প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। ইতোমধ্যে এর আলামতও স্পষ্টভাবে জাতির কাছে দীপমান হচ্ছে।

১৭৫৭ সালের পর যে-সব মুজাহিদ মুসলমানেরা আজাদীর লড়াইয়ে শহীদ হয়েছেন শুধুমাত্র মুসলমান হবার অপরাধে সে-সব কৃতিমান পুরুষদের কথা শোনা যায় না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম আজাদী লড়াইয়ে শাহাদতবরণকারী হাবিলদার রজব আলীসহ পাঁচশ' অজানা মুক্তিযোদ্ধা একসাথে আত্মত্যাগ দিয়েছিলেন। অথচ এঁদের নাম ইতিহাসে নেই। বর্তমান বংশধরদের কাছে এঁরা অজ্ঞাত। বর্তমান বংশধরদের কাছে শুধু তুলে ধরা হচ্ছে সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীনদের কথা। এটা যে কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ, ভূদেব চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই অপপ্রয়াস তা না বললে সত্য গোপন করা হবে।

পলাশী পূর্ব বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে প্রকৃত সোনার বাংলার মানচিত্র। পলাশী উত্তর ইংরেজ ও রবীন্দ্রনাথদের জন্য এই বাংলা সোনার বাংলা হলেও সাধারণ জনগণের ছিলো শ্মশান বাংলা.

রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা!

সোনার বাংলা ছিল মুসলমান ও অনার্য শূদ্র জনসাধারণের বাংলা। তারা ছিলেন দক্ষ জনশক্তি। নিজেদের দক্ষ হাত আর পরিশীলিত মনন ও মেধার পরশেই তারা মাটির বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করেছিলেন। মুসলিম শাসন কায়েমের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীর বাংলা ছিল ব্রাহ্মণ্য শাসনের দষ্ট-পিষ্ট বাংলা, মুসলমান শাসনের পরবর্তী ২ শত বছর ছিল বৃটিশ ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণে-নির্যাতনে নিঃশেষিত বাংলা।"

- ইতিহাসবিদ ফারুক মাহমুদ

আমরা প্রায়ই একটি গান শুনে থাকি। গানটি হচ্ছে ঃ

"বিশ্ব কবির সোনার বাংলা
নজরুলেরই বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যেন নাইকো শেষ।"

উল্লেখিত গানে যে কথা ও ভাব প্রকাশিত হয়েছে আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা অবৈধ। এই জমি ও দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক কোন কবি, কোন নেতা বা জনগণ নয়। আজকে শিকড়ের সন্ধানের নামে অনেক রীতি, নীতি-পদ্ধতি বিজাতীয়দের কাছ থেকে ধার করে এনে এদেশে চালু করা হয়েছে যা প্রকারান্তে পৌত্তলিকতারই সামিল।

গানে বলা হচ্ছে "বিশ্ব কবির সোনার বাংলা"-এ অবাস্তব কথাটি কখনই কম-বেশী ইতিহাস সচেতন জনগণ মেনে নিতে পারেনা। কারণ, সোনার বাংলার অস্তিত্ব ছিল একমাত্র মুসলিম শাসনের সাড়ে পাঁচশ' বছর। সে সময়ই ছিলো সোনার বাংলার প্রকৃত রূপ। সে রূপ দেখার সৌভাগ্য যেমন কবি নজরুলের হয়নি; ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও হয়নি।

এককালে কবি নজরুলের পূর্বসূরীরা এই বাংলাকে সাড়ে পাঁচশ' বছর শাসন করে ফলে-ফুলে, ধন-ধান্যে, সম্পদে-প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলো। বিশ্ববাসী তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলো। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এই বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিরূপ

ছিলো,.ইতিহাসের পাতা থেকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

এদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ছিল খুবই করুণ। সেন-রাজকুল শাসিত বাংলাদেশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ

“চরিত্রহীনতা, বিলাস-লালসাময় জীবন, স্তুতিবাদপূর্ণ আত্মপ্রশংসা শোনা আর সভানন্দিনীদের নিয়ে নিরঙ্কুশ ভোগ-বিলাসের পরিবেশে সেকালের রাজসভাগুলি কোন স্তরে পৌঁছেছিল তার অসংখ্য নিদর্শন ছড়ানো আছে সমকালীন কাব্য-কবিতায়, চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, শিলালিপিতে ও দানপত্রে। ...... সেখানে অবিচ্ছিন্ন অভাব-দারিদ্র্য শোষণ অত্যাচার অবিচার।”

দেশের নিম্নস্তরের আপামর জনসাধারণের কবিরা চর্যাপদে বিবৃত করেছেন পার্বতীর দুঃখভরা আর্তি, বর্ণনা করেছেন অভাব ও দারিদ্র্য ভরা সাধারণ মানুষের ঘর-সংসারের দৃশ্য ঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ-সংসার বড়ছিল জাঅ।
দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামাঅ॥

টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (যে খাদ্য প্রায় প্রস্তুত, তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে)।

ঐতিহাসিক অতীন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ

“একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্য বিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ আতিশয্য। কাব্য কবিতাগুলির অধিকাংশই যৌন কামবাসনায় মদির ও মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরল রুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মিলন; --অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। ... সমস্ত বাংলাদেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষণে মৃত্যু যন্ত্রণায় অভাবদৈন্য-পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে-

“বাল কুমার ছঅ মুন্ডধারী
উবাঅহীনা মুই এককু নারী।
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী
গই ভবিত্তি কিল কা হ্মারী ॥

আমার বালক পুত্র ছয় মুন্ডধারী। আমি এক উপায়হীনা নারী। আমার ভিখারী (স্বামী) অহর্নিশ কেবল বিষ খায়। কী গতি হবে আমার।”[১]

সংক্ষেপে এ-ই ছিল প্রাক মুসলিম যুগের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট।

১। ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃঃ ১৩০-১৩১, দ্রষ্টব্য আসকার ইবনে শাইখ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, প্রসঙ্গ অধ্যায়, পৃঃ ৯, ১০)।

বহিরাগত মুসলমানেরা এদেশে এসে অন্যান্য বহিরাগতদের ন্যায় সীমাহীন লুণ্ঠন, নির্যাতন চালায়নি। বরং মুসলিম শাসকেরা বর্ণ প্রথা উচ্ছেদ করে। অনাচার-দুরাচার দূর করে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন গড়ে তোলেন। অসাম্প্রদায়িকতার নজির স্থাপন করেন। শিক্ষায়, সভ্যতায় ও সম্পদের প্রাচুর্যে এদেশকে প্রকৃত সোনার বাংলায় পরিণত করেন।

সেই সোনালী দিনে বাংলার কৃষকের ঘরে গোলা ভরা ধান ছিল। গোয়ালে গরু ছিল। পুকুরে মাছ ছিল। ঘরে ঘরে চরকা ছিল। অন্ন বস্ত্রের কোন অভাব ছিলোনা বাঙ্গালীর। একদিন যারা ভাতের জন্য আক্ষেপ করতো তারাই তখন মনের আনন্দে চরকার গান গেত-

"চরকা আমার নাতি-পুতি
চরকা আমার প্রাণ
চরকার দৌলতে মোর
গোলা ভরা ধান।"

★ ★ ★

"বাপেতে কিনিয়া দিত
অগ্নি পাটের শাড়ী
সেই অঙ্গে পইরা থাকি
জোলায় পাচুড়ি।"

আর 'মসলিন' কাপড়কে নিয়ে রচিত হয়েছে কত কথা, কত গান, কত উপাখ্যান। ময়মনসিংহ গীতিনাট্যে এই মসলিনের বর্ণনা রয়েছে এভাবে-

"হাতেতে লইলে শাড়ী
মুঠিতে মিলায়
মিরিত্তিকাতে (মাটি) থুইলে শাড়ী
পিঁপড়ায় লইয়া যায়।"

আরেক কবি বলেছেন ঃ

"শূন্যেতে থুইলে শাড়ী
শূন্যেতে উইড়া যায়।"

মুসলিম শাসনামলে বাংলার সম্পদ-প্রাচুর্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিলো-এর নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় বিদেশী পর্যটকদের লেখায়।

১৫১৪ সালে চীনা রাজকীয় প্রতিনিধিদের সাথে আগত মা'হুয়ান বলেন, "এই বিশাল বিস্তীর্ণ দেশে বিপুল সম্পদ ও অঢেল ঐশ্বর্য রয়েছে"।

প্রতিনিধি দলের এক সদস্য বর্ণনা করেছেন, "দেশটি সুসভ্য ও সম্পদশালী। তারা

আমাদের রাজদূতকে সোনার থালা ও গামলা এবং সহকারী দূতকে রূপার থালা-গামলা উপহার দিয়েছিলেন। সঙ্গে আগত অন্যান্যদেরকে সোনার ঘণ্টা, কোমরে সাদা রশি সজ্জিত ও রেশমের কারুকাজ করা দীর্ঘ গাউন দেয়া হয়েছিল"।

তাদের অন্য একজন লেখেন, "সপ্তস্বর্গ এই রাজ্যে পৃথিবীর স্বর্ণরাজি ছড়িয়ে রেখেছে"।

অন্যান্য চীনা দূতেরা লেখেন ঃ বাংলা মুলকে পুরুষ-রমণী উভয়ে মাঠে কাজ করে। তাদের শস্যের মওসুম শেষ হলে, অবসর সময়ে তারা কাপড় বোনে। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনী বাবর নামা'য় বলেছেন যে, বাংলা মুলক অঢেল প্রাচুর্যের দেশ। বাংলার অধিবাসীদের প্রিয় হবি হচ্ছে, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করা আর মৃত্যুকালে তা সন্তান-সন্ততিদেরকে দিয়ে যাওয়া। এভাবে প্রত্যেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক হয়ে তা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখে।

সম্রাট হুমায়ুন বাংলার আক্রমণ করলে শেরশাহ গৌড় থেকে তার বিত্ত-সম্পদ রোহতাস্-এ সরিয়ে নেন। এ কাজে তার হীরা-জহরৎ, মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য বহনের জন্য ২শ' ঘোড়া ও উট প্রয়োজন হয়েছিল। [সূত্র ঃ মাখজান-ই-আফগান, পাণ্ডুলিপি পৃঃ ২/ক]

অতঃপর হুমায়ুন গৌড় নগরীতে প্রবেশ করে উহার সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দেখে এতোই বিস্ময়াবিষ্ট হন যে, তিনি নগরীর নতুন নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ'।[২]

পরবর্তী সোয়া দুইশ' বছরে ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে কয়েক ডজন পর্যটক বাংলা মুলক সফর করেছেন। সাড়ে পাঁচশ' বছরব্যাপী মুসলিম সুশাসনের ফলে বাংলায় তখন স্বর্ণ-রৌপ্যের ছড়াছড়ি। ষোল শতকের শেষভাগে আগত চীনা পর্যটকরা বলেছেন যে, বাংলা মুলকে দৈনন্দিন বাণিজ্যিক লেন-দেনেও স্বর্ণমুদ্রা 'মোহর' ব্যবহৃত হতো এবং এখানকার মুসলিম সওদাগররা এতো সৎ যে, ১০ হাজার মোহর পরিমাণ ক্ষতি হয়ে গেলেও তারা ওয়াদা খেলাফ করে না। পাশাপাশি, সমসাময়িককালের বিভিন্ন মংগল কাব্য গ্রন্থে দেখা যায় যে, বর্ণহিন্দু বেনিয়ারা বিদেশী ক্রেতাদেরকে নানাভাবে ওজনে, মানে ও পরিবেশনে প্রতারণা করতো।[৩]

সমগ্র মুসলিম আমলে শিল্প-বাণিজ্যের অভাবিত উন্নতির ফলে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ২৫টির বেশী টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০) ও সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৪-৩১) কর্তৃক পবিত্র মক্কা-মদীনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ও

২। মোহর আলী, হিস্টোরী অব দি মুসলিমস অব বেংগল, ভঃ ১/খ,, পৃঃ ৯২৬, আবদুর রহীম, সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিস্টোরী অব বেংগল, পৃঃ ৪০৩]।

৩। [বংশীদাস, 'মনসা মংগল কাব্য' (চক্রবর্তী সম্পাদিত), পৃঃ ৩৮০-৯০ এবং মুকুন্দ রাম, 'চন্ডীমংগল কাব্য', পৃঃ ১৯১]

পরিচালিত মাদ্রাসা ও এতীমখানার জন্য বাংলা থেকে নিয়মিত স্বর্ণমুদ্রা পাঠানো হতো। ১৫৯৩ সালে আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, বাংলার অধিবাসীরা সোনার মোহর হাতে রাজস্ব প্রদান কেন্দ্রে হাজির হয়ে নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করতো।

১৬৪০ সালে আগত পর্যটক সিবাস্তিয়ান মানরিক বলেন, বাংলায় তখন স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার এত বেশী ছড়াছড়ি ছিল যে, বিত্তবান ব্যবসায়ীদের অনেকে ধামা বা ঝুড়ি ভর্তি করে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা মেপে হিসাব করতেন। ঢাকায় কয়েকটি গৃহে তিনি স্বচক্ষে এভাবে মুদ্রা মাপতে দেখেন বলেও উল্লেখ করেন। মানরিক আরো লিখেছেন যে, শাহজাদা শুজার সুবাদারী আমলে গৌড়ের একজন কৃষক মাটির তলা থেকে তৎকালীন ৩ কোটি টাকা মূল্যের মোহর ও পাথর উদ্ধার করেছিলেন।

বাংলা মুলুকে তখন জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম দ্রব্যাদি এবং সর্বাধিক শান-শওকতপূর্ণ বিলাসপণ্য বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটার পর বাকী সব কিছুই বিদেশে রফতানি হতো। উচ্চমানের চীনা মাটির থালা-বাসন ইত্যাদি এবং কিছু সৌখিন সামগ্রী ছাড়া কোন দ্রব্যই বিদেশ থেকে আনতে হতো না। ফলে, হাজার হাজার কোটি টাকার পণ্য রফতানীর বিনিময়ে বছরের পর বছর ধরে কেবল স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা- জহরৎ আর মণি-মরকতই আমদানি হতো। সারা পৃথিবীর স্বর্ণরাশি এভাবে বাংলা মুলকে এসে আটকে পড়ার পরিস্থিতি লক্ষ্য করেই পর্যটক আলেকজান্ডার ডাউ লিখেছিলেন ঃ

> "ইংরেজরা আসার আগে বাংলা মুলক ছিল এমন একটি বদ্ধ ডোবা, যেখানে সারা বিশ্বের রাশি রাশি স্বর্ণ এসে তলিয়ে হারিয়ে যায়- তা আর কোন দিনই ফিরে পাওয়া যায় না বা দেখা যায় না।"[৪]

১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মুসলিম শাসনের পাঁচশত চুয়ান্ন বছরের মধ্য থেকে প্রথম ৫০ বছর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বছর ধরে বাংলা-মুলকে জীবন ধারণের জন্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ছিল কল্পনাতীতভাবে কম। ১৭৫৭ সালের পূর্বে মুসলিম বাংলায় চাল কোন দিনই টাকায় ৪ মণের কম বিক্রি হয়নি- সুবাদার শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮) এবং নবাব শুজাউদ্দিনের আমলে (১৭২৭-৩৯) টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেতো। ১ মণ লবণের দাম ছিল ৪ পয়সা। একখানি সাধারণ শাড়ীর মূল্য ছিল আধা পয়সার কম।[৫]

২০টিরও বেশী মুরগী কেনা যেতো ১ টাকায় এবং মাছ এতো সস্তা ছিল যে, মনে হতো মাছের কোন মূল্যই নেই। ১৭৫০ সালের দিকে বাংলা মুলকে স্বামী-স্ত্রী ও ৩টি সন্তান নিয়ে গঠিত একটি পরিবার ১ টাকা ৪ আনায় ভাত-মাছ-গোশত-দুধ-চিনি-ঘি ইত্যাদি খেয়ে, সাধারণ কাপড় পরে একমাস চালিয়ে দিতে পারতো। অথচ একজন

৪। আলেকজান্ডার ডাউ, ইন্দোস্তান, পৃঃ ১১২, দ্রষ্টব্য- ফারুক মাহমুদ, ইতিহাসের অন্তরালে, পৃঃ ১১৯।
৫। ভি,সি,সেন, পৃঃ ২৩৩, উদ্ধৃতি আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫১৪)।

সাধারণ কারিগর বা দক্ষ শ্রমিকের আয় ছিল তার থেকে কয়েকগুণ বেশি। বিপুল পরিমাণ রফতানির বিনিময়ে ব্যাপকভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হওয়ায়, বাড়তি উ ৎপাদনের কারণে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য কম থাকলেও ১৭৫৭-এর পূর্ববর্তী ৫০ বছরে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পে একজন দক্ষ কারিগর মাসে সাত টাকা আট আনা, মধ্যম শ্রেণীর কারগরি ৫ টাকা ও সাধারণ কারিগর ৩ টাকা রোজগার করতো। সুতা কাটার কাজে নিয়োজিত একজন দক্ষ মহিলা মাসে ৩ টাকা, মধ্যম মানের মহিলা ২ টাকা এবং অপটু বা পার্ট টাইম মহিলা ১২/১৪ আনা উপার্জন করতেন।[৬] এসব তাঁতী কারিগরেরা প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। তারা নিজেরা উৎপাদন কার্যে নিজেদের পুঁজি ব্যবহার করতেন। সুতরাং পারিশ্রমিকের পাশাপাশি তারা বিনিয়োগজনিত মুনাফাও অর্জন করতেন। যে-কোন দেশে, যে-কোন একটি সেক্টরে বর্ধিত শ্রম-মূল্য অন্যান্য সেক্টরের শ্রম-মূল্যও বাড়িয়ে দেয়। ফলে, বাংলার সকল প্রকার শিল্পে ও অন্যবিধ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরিও তখন এর সাথে সাজুয্য রক্ষা করে নির্ণিত হতে থাকে। "ইংরেজ কোম্পানীর অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের দলিল-পত্র থেকে জানা যায় যে, একজন পাইক পিওন বা কুলি মাসিক ২ টাকা, একজন দারোয়ান ২ টাকা ও পাল্কী বাহক শক্ত কাজের জন্য ১২ টাকা মাহিনা পেতো। ১৭৫৭ সালে কুলীদের দৈনিক মজুরি পরিশোধের জন্য কোম্পানি এক আনা মানের মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। ১৭৫৯ সালে কোম্পানি নানা শ্রেণীর অদক্ষ শ্রমিকের মাসিক মজুরি নির্ধারণ করে দেয়। তাতে খানসামা (বাবুর্চি) ৪ টাকা, খিদমতগার (ভৃত্য) ৫ টাকা, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ৫ টাকা, ধোপা ৩ টাকা, নাপিত ১ টাকা ৮ আনা, ঘোড়ার সহিস ২ টাকা, মালী ২ টাকা, চাকরানী ২ টাকা এবং সেবিকা ৪ টাকা হিসাবে মাহিনা পাবে বলে স্থিরীকৃত হয়। দক্ষ শ্রমিক যেমন সুতার, ঘরামী ও ওস্তাগার ইত্যাদির মাহিনা বাজারে আরো বেশী হারে প্রচলিত ছিল"।[৭] ১৭৫৮ সালে কলকাতা দুর্গ নির্মাণের সময়ে সাধারণ কুলী জোগালদারকে মাসিক ৩ টাকা হারে মজুরি দেয়ায় তারা সবাই কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা শহর ছেড়ে চলে যায়। ১৭৫৭ সালের পূর্বে একটি মোহরের মোটামুটি মূল্য ছিল ১০ টাকার সমান। সুতরাং দেখা যায়, অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে সংসার চালিয়েও একটি তাঁতী পরিবার স্বামী-স্ত্রী মিলিত রোজগারে প্রতি বছর অন্তত ৮/১০টি সোনার মোহর, একটি দক্ষ শ্রমিক পরিবার ৫/৬টি মোহর ও একটি অদক্ষ শ্রমিক পরিবার ২/৩টি সোনার মোহর সঞ্চয় করতে পারতো। তাই বলা চলে, সারা বাংলায় প্রতিটি ঘরেই তখন অন্তত দুই একটি করে হলেও সোনার মোহর বা সোনার গহনা সঞ্চিত ছিল।

আর শিক্ষা ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলো। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। সম্রাটের সংস্কারের ফলে ১৭৫৭ সালের আগে

৬। এন. কে সিংহ, বেঙ্গল এন্ড ওয়ার্ল্ড ট্রেড, পৃঃ ১৮৪-৮৭।
৭। আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৫।

এই বাংলাদেশেই ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল তথা মকতব ছিলো। ওয়াকফ, আয়মা, লাখেরাজ সম্পত্তির আয় থেকে এইসব মকতব পরিচালিত হতো। সে সময় বাংলাদেশের শিক্ষার হার ছিলো শতকরা ৭০ ভাগ। সোনারগাঁয়ে ছিলো আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। বহু বিদেশী ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতে আসতো। সংক্ষেপে এই ছিল প্রকৃত সোনার বাংলার অর্থনৈতিক চালচিত্র।

১৭৫৭ সাল পর্যন্ত কবি নজরুলের পূর্বসূরীদের সৃষ্ট সোনার বাংলার প্রকৃত রূপ। আর এই সোনার বাংলাকে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী এবং তাদের-প্রভু এককালের জলদস্যু বলে কথিত ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠি যৌথভাবে এ দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও সীমাহীন নির্মম প্রজাপীড়ন করে সোনার বাংলাকে শ্মশান বাংলার পরিণত করেছিলো। কি হারে, কিভাবে সোনার বাংলাকে শ্মশান বাংলায় পরিণত করেছিলো কিঞ্চিৎ বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি।

বাংলার এই সম্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল বিদেশী শুকুনদের। সম্পদের আকাশচুম্বী প্রাচুর্যের মোহে মগ, ফিরিঙ্গি, বর্গী, ফরাসী ও ইংরেজরা রীতিমত পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে এদেশে আসতে থাকে। শুরু হয় এদেশের সম্পদ লুটপাট। আর বাঙ্গালীর ভাগ্যে নেমে আসে অনাকাঙ্খিত বিপর্যয়। মগ ফিরিঙ্গি হামলার পর শুরু হয় বর্গিদের আক্রমণ। এদের ভয়ে দুর্ধর্ষ নওয়াব সৈন্যরা পর্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। মানুষ বর্গীদের নামে শিউরে উঠতো। বাংলার মায়েরা তখন বর্গীদের ভয় দেখিয়ে তাদের সন্তানদের ঘুম পাড়াতো। তাদের কণ্ঠে ঘুম পাড়ানীর গানে এবং ছড়ায় বর্গীদের কদর্য রূপ প্রকাশ পেতো ঠিক এভাবে-

"ছেলে-ঘুমালো পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে।"

পরবর্তীতে ইংরেজ ও জমিদার রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীদের চক্রান্তে হারাতে হয় স্বাধীনতা। এদের সীমাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মুসলিম আগমনের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় তৎকালীন অর্থনীতির করুণ চিত্র প্রকাশ পায়। তিনি লিখেন-

"ভাত না পেয়ে উদর ভোরে
কত দুঃখী গেল মরে।
চেলের (চাল) বাজার সস্তা করে
দেয়না রাজা ঢেড়া পেটে।
ঘরে হাড়ি ঠনঠনাস্তি
মশা মাছি ভনভনাস্তি

শীতে শরীর কনকনান্তি
একটু কাপড় নাইকো পিঠে॥
দারাপুত্র হনহনান্তি
অস্তি নাস্তি ন জানান্তি
দিবারাত্রি খেতে চান্তি
আমি বেটা মরি খেটে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বসূরী জমিদারের প্রভু ইংরেজদের সহায়তায় কিরূপ নির্মম শোষণ, নির্যাতন করেছে- সেই বর্বরতার কাহিনী অত্যন্ত নির্মম ও বেদনাদায়ক। এখানে কিঞ্চিত নমুনা উল্লেখ করছি।

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে আলীনগর সন্ধির অপমানজনক শর্ত ও ১০ই জুন তারিখে সম্পাদিত "বিশ্বাসঘাতকতা চুক্তি" দলিলে কোলকাতার পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগনা এলাকা ইংরেজদেরকে দেয়া হয়। কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরদেরকে লেখা কোলকাতা কাউন্সিলের এক পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিকরা জানান যে, জমিদার উহার অন্তর্ভুক্ত ৪,৩৪,৮০৪ বিঘা জমির খাজনা বিঘাপ্রতি আট আনারও কম হারে ২,২২,৯৫৮ টাকা ১০ আনা ১ পাই দিতেন।

পলাশী যুদ্ধের পর তারা নিজেরা খাজনা আদায়ের ঝামেলা এড়াবার জন্যে ২টি পরগণার রাজস্ব নিলাম ডাকার মাধ্যমে ইজারা দেন। দেখা যায় নব্য হিন্দু কোটিপতি বণিকেরা প্রথম বছরেই উক্ত এলাকা ৭,৬৫,৪০০ টাকায় নিলামে ডেকে নেয়। পরে নিলামে টাকার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইজারাদারেরা প্রথম বছরই প্রজাদের কাছ থেকে বিঘাপ্রতি ২ টাকা বারো আনা আদায় করে।[৮] ফলে ইংরেজরা দেখতে পান, বাণিজ্যের চেয়েও ভূমি-রাজস্বে নির্ঝামেলা বিপুল মুনাফা মেলে। এর ফলে দেশের রাজস্বকে ব্যবসায়ে পরিণত করার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠে।

১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারা বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা প্রদানের ওয়াদায় বাংলার দীওয়ানী ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সে বছরই শিখন্ডী নবাব নাজমুদ্দৌলার কাছ থেকে বার্ষিক বৃত্তি মঞ্জুরীর বিনিময়ে বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতাও নিয়ে নেন।

বর্ণহিন্দু জমিদার ও মনসবদারেরা ১৭৫৬ সালের কোলকাতা যুদ্ধের সময় থেকে ইংরেজদেরকে দেশীয় সৈন্য সরবরাহ করতে থাকেন। অতঃপর বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত ১১টি যুদ্ধে তাদেরকে নিয়ে ইংরেজরা বিজয়ী হবার অবকাশে সে-সব দেশীয় হিন্দু সৈন্যরা সরবরাহকারীদের চেয়ে ইংরেজদের প্রতি অধিক অনুগত হয়ে ওঠে।

এমতাবস্থায় ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হবার পরই ১৭৬৫ সাল থেকে কোম্পানি সরকার,

৮। আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।

প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায়, খারিজ হওয়া প্রশাসনিক ও সামরিক জায়গীরসমূহ সরকারের খাজনা বা খাস সম্পত্তিসমূহ এবং ছোটখাটো মুসলমান জমিদারীগুলো সব মিলিয়ে প্রায় ৬ শত পরগনা ১০ সালা ও ৫ সালা ইজারা ভিত্তিতে নিলাম করতে শুরু করেন, আর নব্য হিন্দু ধনিক বণিকেরা তা খরিদ করতে থাকেন। বাংলার ১৬৬০টি পরগনার প্রায় ১ হাজার পরগনা ছিল হিন্দু জমিদারীভুক্ত। সে সময়ে মাত্র ১৫টি জমিদারীভুক্ত ছিল ৬৫৬টি পরগনা। নাটোর জমিদারীতে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ১৩৯টি, আলীবর্দী খাঁর আমলে ১৬৪টি এবং ১৭৬৫ সালের পর ১৮১টি পরগনা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯] সে-সব বড় জমিদারীর কোনটি নিলামে উঠেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। রাজা-মহারাজারা এবং নিলামপ্রাপ্ত নতুন জমিদারেরা সরকার নির্ধারিত বর্ধিত খাজনার দোহাই দিয়ে নিজেরাও প্রজা ঠেংগিয়ে বিপুল বিত্ত সংগ্রহ করেছিলেন।

সব মিলিয়ে খাজনার পরিমাণ হয়েছিল প্রতি বিঘায় ৪/৫ টাকা। ১৫ বছরে টাকার মুদ্রামান অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল ধরে নিলেও তখনকার ১ টাকা এখনকার ১ হাজার টাকার সমান। এক বিঘা জমিতে ৪/৫ হাজার টাকা খাজনা অবিশ্বাস্য। তবুও সত্য।

অথচ আশির দশকে বাংলার বাবু মহারাজা জমিদারেরা কোম্পানী সরকারকে খাজনা দিতেন ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউন্ড, কিন্তু তারা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড, অর্থাৎ মীর জাফরের শাসনামলের তুলনায় ১৬ গুণ এবং মুর্শীদকুলীর নবাবী আমলের (তৃতীয় দশকের) তুলনায় ৩২ গুণ।[১০]

হ্রাসপ্রাপ্ত মুদ্রামানের হিসাবে ধরলেও প্রতি বিঘা জমির খাজনা দাঁড়ায় উহার মোট উৎপন্ন ফসলের ৩/৪ গুণ। অবস্থা দাঁড়ালো এই, জমি না চষলে সাত পুরুষের সঞ্চিত সোনা-দানা, কাঁসা-পিতল বিক্রি করে ৩ গুণ দামে চাল কিনে খাওয়া যায়। কিন্তু জমি চষলে চালের দামের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি খাজনা দিতে হয়। ১৭৬৯ সালের মধ্যেই বাংলার কৃষকদের অনেকেই চাষাবাদ বর্জন করতে বাধ্য হয়। অগত্যা নব্য জমিদারেরা জোর করে জমি গছাতো। এমনও শোনা যায়, অসাবধানতাবশত কোন কৃষকের লাঙ্গল কোন জমিতে পড়লে তা চাষ করতে বাধ্য করতো। জমিদারবাবুরা মুসলমান প্রজাদিগকে কিরপ শোষণ-নির্যাতন করতো তা অবর্ণনীয়। ইতিহাসের পাতায় তাদের নির্মমতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানে অসংখ্য নিদর্শন থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি মাত্র।

১৭৯৯ সালের লর্ড ওয়েলেসলি শহরবাসী অলস কর্মবিমুখ নতুন জমিদারদের সাহায্যকল্পে উৎপীড়নমূলক 'হকতম' বা সপ্তম আইন জারি করেন। এ আইনের মাধ্যমে জমিদারদের দেয়া হয় সীমাহীন স্বৈরতন্ত্র কর্তৃত্ব। ১৭৯৯ সালের ৭ নং রেগুলেশনের

৯। কে. পি. সেন, বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ৯৬
১০। পি. ই. রবার্টস, পৃঃ ৫১।

কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ ঃ

১। জমিদার সরকারী অনুমতি ছাড়াই প্রজাকে বন্দী করতে পারবে।

২। জমিদার বকেয়া খাজনা উদ্ধারকালে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এহেন বাজেয়াপ্ত সম্পর্কে আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।

৩। বাকী খাজনা উদ্ধারকল্পে প্রজাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করতে পারবে।

৪। জমিদার প্রজাকে কাছারিতে ডেকে আনতে বাধ্য করতে পারবে। সে জন্য দৈহিক নির্যাতনের অভিযোগে প্রজা কোন ফৌজদারী মামলা রুজু করতে পারবেনা।[১১]

উল্লেখিত আইন জারির ফলে জমিদারেরা মুসলমান প্রজাকে কতভাবে যে শোষণ করা হতো এবং কর অনাদায়ে কীরূপ নির্মম অত্যাচার করা হতো এর বিস্তারিত বিবরণ সূচনাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তিতুমীরের এবং রবীন্দ্র যুগে মুসলমান প্রজাদের উপর কিরূপ নির্যাতন হতো এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করছি ঃ

এই হিন্দু জমিদারেরা কালী পূজা, দুর্গা পূজা, চড়ক পূজায় মুসলমানকে জবরদস্তিমূলক শুধু চাঁদা আদায় করেই ক্ষান্ত হয়নি, তৎকালীন জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় তার মুসলমান প্রজাদের উপর হুকুম জারি করেছিল- পাকা মসজিদ বানাতে এক হাজার টাকা, কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশ' টাকা, ফি দাঁড়ির জন্য আড়াই টাকা, গোঁফের জন্য পাঁচ শিকা জমিদার সরকারের ঘরে জমা দিতে এবং গো হত্যা করলে তো ডান হাতই কেটে দিতো।

এর প্রতিবাদ করায় হিন্দু জমিদারেরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। নীল চাষকে উপলক্ষ্য করে হিন্দু জমিদারেরা তিতুমীরের বিরুদ্ধে কিরূপ হীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল- এর একটি দৃষ্টান্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি। কর্নেল স্টুয়ার্ট তিতুমীরের হুজরা ঘরের সম্মুখস্থ প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি সাদা তহবন্দ, সাদা পিরহান ও সাদা পাগড়িতে অংগ শোভা বর্ধন করতঃ তসবিহ হাতে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন। স্টুয়ার্ট মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে পথপ্রদর্শক রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন এই ব্যক্তিই তিতুমীর? একে তো বিদ্রোহী বলে মনে হয়না?

রামচন্দ্র বললো, এই ব্যক্তিই বিদ্রোহী তিতুমীর। নিজেকে তিতু বাদশাহ বলে পরিচয় দেয়। আজ আপনাদের আগমনীতে ভঙ্গি পরিবর্তন করে সাধু সেজেছে।

অতঃপর স্টুয়ার্ট রামচন্দ্রকে বল্লেন, তিতুকে বলুন আমি বড়োলাট লর্ড বেন্টিং-এর পক্ষ থেকে সেনাপতি হিসাবে এসেছি। তিতুমীর যেন আত্মসমর্পণ করে। অথবা তিনি যা বলেন হুবহু আমাকে বলবেন। রামচন্দ্র তিতুমীরকে বললো, আপনি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এখন জপমালা ধারণ করেছেন, আসুন তরবারি ধারণ করে বাদশাহর যোগ্য পরিচয় দিন।

১১। কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য, রাজা রামমোহন ঃ বঙ্গ দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৮৭

তিতুমীর বলেন, আমি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। হিন্দুদের ন্যায় আমরাও কোম্পানী সরকারের প্রজা। জমিদার নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্যে এবং মুসলমান নামধারীদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানাবার জন্যে সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।

তিতুমীরের জবাব শোনার পর রামচন্দ্র স্টুয়ার্ডকে দোভাষী হিসাবে বললো, বিদ্রোহী তিতুমীর বলছে, আত্মসমর্পণ করবে না, যুদ্ধ করবে। সে বলে যে, সে তোপ ও গোলাগুলির তোয়াক্কা করে না। সে বলে যে, সে তার ক্ষমতা বলে সবাইকে টপ টপ করে গিলে খাবে। সে-ই এ দেশের বাদশাহ, কোম্পানী আবার কে?[১২]

এমনই ধুরন্দর ও চালবাজ ছিলো রবীন্দ্রবাবুর পূর্বসূরী স্বজাতি বামচন্দ্র বাবুরা। এই রামচন্দ্র দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পরিবর্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে তিতুমীরকে শুধুমাত্র লাঠি ও তীর সড়কি দিয়ে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। অবেশেষে হিন্দু জমিদারদের এই চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে তিতুমীরকে শাহাদতের অমৃত সুধাই পান করতে হয়েছে।

এ তো গেল খাজনা আদায়, খাজনা অনাদায়ে প্রজা পীড়নের কথা। এবার বাবুরা ও ইংরেজরা কিভাবে 'সোনার বাংলা'কে 'শ্মশান বাংলায়' পরিণত করেছে তা বলছি। কাপড়, রেশম, আফিম, সল্টপিটার, চিনি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ বাজারে ধান-চাল, লবণ, পান-সুপারীর ব্যবসায়ে কোম্পানী সরকার সরকারী মনোপলি কায়েম করেন। বর্ণহিন্দু জমিদার ও তাদের প্রশাসনিক কর্মচারীদের সহায়তা বর্ণহিন্দু গোমস্তা, দালাল ও ফড়িয়াদের মাধ্যমে তারা ব্যবসা চালাতে থাকেন। হিন্দু কর্মচারীরাও মানোপলির সুযোগে কোম্পানীর পক্ষচ্ছায়ে ধান-চালের ব্যবসায় লাভবান হতে থাকে। বর্ধিত লাভের সাথে সাথে তাদের লোভের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, ১৭৭০ সালের মাঘ মাসেই তারা সারাদেশের ধান-চাল কিনে গুদামজাত করে ফেলে। এমনিতেই কৃষকেরা খাজনার ভয়ে চাষবাস ছেড়ে দেয়ায় সে বছর ফসলের পরিমাণ হ্রাস পায়। তার উপর মনোপলি। ফলে জ্যৈষ্ঠ মাসেই দেশের নানা স্থানে মানুষ মরা মানুষের গোশত খেতে শুরু করে।[১৩]

দেশের নানা স্থানে আষাঢ় মাসের মধ্যেই ইংরেজ কোম্পানী সরকারের হিসাব মতেই প্রতি ১৬ জনের ৫ জন ও শ্রাবণের শেষ নাগাদ ১৬ জনের ৬ জন লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।[১৪]

ভাদ্র মাসের দিকে গুদামের শস্য বাজারে আসায় এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হার কমতে থাকে। বছর শেষে দেখা যায়, বাংলার প্রায় তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে এক কোটিরও বেশি মারা যায়।[১৫]

১২। শহীদ তিতুমীরঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী পৃঃ ৯৫-৯৬।
১৩। (Willum Hunter, Annals of Rural Bengal, অনুঃ ওসমান গনি, পল্লী বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ২৩)।
১৪। হান্টার ঐ পৃঃ ৩৩।
১৫। হান্টার ঐ পৃঃ ২৯।

আর এর মধ্যে অন্তত ৭৫ লাখ মুসলমান। আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হলো 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার তিনভাগের একভাগ লোক মরেছে, চাষের চরম অবনতি ঘটেছে। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস হিসাব কষে এবং কড়া চাপে নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশি টাকা আদায় করেছেন, রাজস্বের শতকরা একভাগও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য খরচ করেননি। বরং বাখরগঞ্জ জিলার ২২,৯১৩ মণ চাল বিক্রয় করে ৬৭,৫৯৩ টাকা মুনাফা লুটেছেন, ঢাকার ৪০,০০০ মণ চাল বাঁকীপুরে সেনানিবাসে গুদামজাত করেছেন।[১৬]

এখানেই শেষ নয়। বাংলায় ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কায়েম হবার সাথে সাথে কোলকাতা নগরীতে দাস ব্যবসাও জমজমাট হয়ে ওঠে।[১৭]

'৭৬-এর মহা মন্বন্তরে বাংলায় ১ কোটি লোকের মৃত্যু হবার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমান পরিবারগুলো কোন কোনটিতে দু'একজন করে এতিম বালক-বালিকা জীবিতাবস্থায় বেঁচে ছিল। বাবু বণিকেরা সারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করে "বড় বড় নৌকা বোঝাই করে কলকাতায় নিয়ে এসে খোলা বাজারে জমায়েত করে" এবং ইংরেজ সিনিয়র পার্টনারদের মাধ্যমে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দেয়।[১৮]

এভাবে, মুসলমানদের হাত থেকে শাসনদন্ড কেড়ে নিয়ে তাদের বিত্তবৈভব লুণ্ঠন করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে ঝাঁকে ঝাঁকে হত্যা করে, বাংলার পুঁজি ও শিল্প একই সাথে বিলেতে পাচার করে দিয়ে সেই সঙ্গে মুসলিম সন্তানদেরকেও ক্রীতদাসরূপে চালান করে দিয়ে রাজা-মহারাজা বাবুরা তাদের অন্তর্দাহ আংশিকভাবে নিবৃত্ত করেন। ইতিহাসে পলাশীর ঘাট পেরিয়ে প্রথম বাঁকে এটাই বাংলার শ্মশান হবার করুণ বাস্তব চিত্র।

এ প্রসঙ্গে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন ঃ

আঠারো শতকের ক্রান্তিলগ্নে এপার-ওপার মিলিয়ে চার দশক, তখন কি সোনার বাংলা ছিল? হ্যাঁ, তখন এক সোনার বাংলার অভ্যুদয় ঘটছিল, আরেক সোনার বাংলা অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী শঠতা-বঞ্চনা, লুট-তরাজ, সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহের অশ্রু ও রক্তের সয়লাবে সৃষ্ট দুর্গন্ধপুরীর কদর্মের নীচে তলিয়ে যাচ্ছিল। নতুন সোনার বাংলা মাথায় করে নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন যারা তাদের মধ্যে ছিলেন (১) লক্ষ্মীকান্ত বড়ার, (২) দত্তরাম দত্ত, (৩) রাম মোহন পাল, (৪) মথুরা মোহন সেন, (৫) নিত্যচরণ সেন, (৬) রাম সুন্দর পাইন, (৭) স্বরূপ চাঁদ, (৮) জগমোহন শীল, (৯) আনন্দ মোহন শীল, (১০) স্বরূপ চাঁদ আঢ্যা, (১১) কানাই লাল বড়াল, (১২) সনাতন শীল, (১৩) রাজা রাম মোহন রায়, (১৪) দর্প নারায়ণ ঠাকুর, (১৫) লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুড় ধর, (১৬) মতিলাল শীল, (১৭)

১৬। আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৫৩
১৭। কে, কে, দত্ত, হিস্টরী অব বেঙ্গল সুবাহ।
১৮। আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৮) রামহরি বিশ্বাস, (১৯) সুখময় রায়, (২০) রাম চরণ রায়, (২১) রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ নব্য কোটিপতিবৃন্দ ও তাদের বিশ্বস্ত অনুগত সাথী-স্যাঙাতেরা। (এম আর আখতার মুকুল, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি)।

উনিশ শতকের আগা-গোড়াই বর্ণহিন্দু বাবুদের সোনার বাংলা ছিল আরেকটু বেশি আরাম দায়িনী- নির্ঝঞ্ঝাট। ম্লেচ্ছ মুসলমান ও অস্পৃশ্য শূদ্ররা একেবারেই মনুষ্য পদবাচ্য ছিল না। এ দু'টি হতভাগ্য ভূমিস্মাৎ সম্প্রদায়ের বুকের উপর পূর্ব পুরুষের পেতে দেয়া জাজিমে-তোষকে শুয়ে-বসে কাটানো তাদের জীবন ছিল একেবারেই নিরপুদ্রব। তাদের রচিত কবিতা, প্রহসন, গল্প, উপন্যাসের সর্বত্রই দেখা যায়, বাবুদের জীবনে কেবল তিনটি কাজই ছিল- আহার, নিদ্রা ও মৈথুন; মৈথুনের প্রয়োজনে স্বকীয়া ও পরকীয়ার ছড়াছড়ি। এ-সবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কোন অভাব তারা বোধ করতেন না এবং তা তাদের উপার্জন করতেও হতো না। প্রয়োজনের আগেই ডাকপিয়নই পৌছে দিতো। জমিদার, মহাজন, নায়েব, গোমস্তাদের সব বাড়ীতেই খাদ্যের ছিল ছড়াছড়ি। উনিশ শতকের পাঁচের দশকের কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভোজনে-রমনে মুখর 'বাংগালী' পরিবারের রকমারী ব্যঞ্জন-ব্যসন উপাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মুখস্ত করাও রীতিমতো সময়সাধ্য ব্যাপার। তাদের একাধিপত্যের সোনার বাংলা তখন স্বর্গীয় দেবতাদের অনুসরণে লীলালাস্যে মুখরিত থাকলেও বৃহৎ বাংলার সবটাই তখন অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্ধকারের আড়ালে 'নেড়ে ও নমোর' বীভর্ৎস ভাগাড়। শূদ্রের ভয়াল শ্মশানের পাশাপাশি মুসলমানদের নিঝুম গোরস্তানের নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশ।

এবার উনিশ শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ রবীন্দ্রযুগে সোনার বাংলার অবস্থা কিরূপ ছিলো ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত দিচ্ছি।

অর্থ পিচাশ হৃদয়হীন এই বাবু জমিদারদের প্রজাপীড়নের রবীন্দ্রযুগেও আঠার ও উনিশ শতকের প্রথম দিকের ন্যায় অব্যাহত ছিলো। হিন্দু জমিদারদের ঘন ঘন খাজনা বৃদ্ধি, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পূজা পার্বন ও পূন্যাহের ইত্যাদি সম্পর্কিত খরচ আদায়ে সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো। জমিদার বাবুদের এই জুলুমের নির্মমতা দেখে লেখক মুনসী রিয়াজুদ্দীন একটি কবিতা লিখেছিলেন ঃ

নিরদয় জমিদার পীড়ন করিয়া
খাজনা ছাড়াও অর্থ লইছে কাড়িয়া।।
পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বলি করিছে শোষণ।
যে শোষণ তাহাদের পক্ষে চিরন্তন।।
পূজা পার্ব্বনের নামে টংকা আদায়।
করিছে নায়েবগণ বিষম বেজায়।
গোমস্তা পেয়াদা মৃধা তহশীলদার।
সবাই নবাবজাদা জুলুম সবার।।

এই জমিদার বাবুদের অত্যাচার সম্পর্কে ইব্রাহীম খাঁ তাঁর 'বাতায়ন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

জমিদার বাড়ীতে প্রজার কোন সম্মানের আসন ছিলনা। মোড়ল গোছের দু'চারজন প্রজা জমিদারের বাড়ী বা তার কাছারীতে গেলে বসবার জন্য কাঠের টুল কিংবা মোড়া পেত, বাকি সবাইকে বসতে হত পাটি কিংবা চাটাইয়ে। কাছারীর নিতান্ত পাতি কর্মচারীও প্রজাকে 'তুমি' ছাড়া বলত না। জমিদার অনেক স্থল সমাজের কর্তা ছিল। অপরাধ পেলে জরিমানা হতে শুরু করে কানমলা, জুতা মারা সবই চলত। শুনেছি, সেকালে কোন এক জমিদার বাড়ীতে ছিল এক বড় নিম গাছ। তার নাম ছিল আক্কেল সেলামী গাছ। বাকি খাজনা বা অন্য কোন অপরাধ থাকলে প্রজাকে ঐ গাছে বেঁধে জুতা মারা হত। দুই হাত লম্বা একটি জুতা ঐ মহৎ উদ্দেশ্যে বানিয়ে কাছারীর মালখানায় রেখে দেয়া হত। মালখানা জমিদার কাছারীর হাজতখানা বিশেষ ছিল। কোন কোন সময় অপরাধী প্রজাকে হয়তো জরিমানা বা বাকি কর আদায় সাপেক্ষে বন্দী করে রাখা হত। কোন কোন হিন্দু জমিদার তাদের জমিদারীতে গরু জবেহ হতে দিত না। মুছলমান প্রজারা অন্য এলাকায় গিয়ে গরুর গোশত খেয়ে আসত। গাঁয়ে দলাদলি থাকলে গরু জবেহর খবর হিন্দু জমিদারের কানে যেতে দেরী হত না। অপরাধ প্রমাণিত হলে কঠিন শাস্তি হত। হেমনগরের জমিদার একদিন পুকুরে স্নান আহ্নিক করে দুপুরের খাওয়ার জন্য বাড়ীর মধ্যে চলেছেন, এমন সময় তার এক প্রজা সেলাম দিয়ে গলায় কাপড় নিয়ে তার সামনে হাজির। তার এই স্নানরত শুচি অবস্থায় যে কোন মানুষ তার সামনে গেলে বা তার পথে ছায়া ফেললে তিনি ভয়ানক বিরক্ত হতেন। তার মধ্যে প্রজাটি ছিল মুসলমান। প্রজা বলল, কর্তা সেলাম। বড় জরুরি সংবাদ আছে।

কি?

ঐ তো সেদিন কর্তা আমাদরে গাঁয়ের মানুষকে গরু জবা'র জন্য জরিমানা করলেন, তারা ফের গরু জবাই করেছে। ওহ! (কানে আঙ্গুলি প্রদান)

'কর্তা আমাকে ইনাম দিতে হবে, আমি খুব কৌশলে সব দেখে এসছি।'

'সে কেন?'

'ওরা কর্তার ডরে বাড়ীর মধ্যে গোপনে গরু জবাই করেছিল, আমি দেউড়ী ফাঁক করে ফুচকি দিয়ে সব দেখে এসেছি।'

'তারই জন্য ইনাম? আচ্ছা দিচ্ছি।'

'ভজন শিং কোথায় রে?'

'এই তো কর্তা, আমি এখানে।'

'এই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে মালখানায় দে।'

আমার ডরে আমার প্রজারা গোপনে কি করছে না করছে, তা এ ব্যাটা খুঁজে খুঁজে দেখে এসে আমার স্নান নষ্ট আর খাওয়া বন্ধ করে কেন? বিকালে ওর বিচার আমি নিজে বসে করব।[১৯]

এইভাবে হিন্দু জমিদারেরা বিভিন্ন ছল-ছুতায় গরীব মুসলমান প্রজাদের উপর

১৯। ইব্রাহীম খাঁ রচনাবলী, পৃঃ ১২৮, ১২৯।

অমানবিক হৃদয়হীন জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে।

শুধু হিন্দু জমিদারেরাই নয়, হিন্দু মহাজনেরা নানা ছল-চাতুরীর মাধ্যমে গরীব কৃষকদের ঋণের ফাঁদে ফেলে সর্বস্বান্ত করেছে। এ সম্পর্কে ইব্রাহিম খাঁ-এর স্মৃতিচারণ থেকেই উদ্ধৃতি দেয়া যাক।

> আমাদের ছোট বেলায় পল্লীর মহাজনেরা কি জীব ছিল আজকের তরুণেরা তা কল্পনা করত পারবে না। তখন শুনেছিলাম এক নীরব ভয়াবহ ভূতের কাহিনী। নাম ছিল তার ভ্যামপায়ার। ভ্যামপায়ার রাতের অন্ধকারে কবর হতে উঠে আসত নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘুমন্ত মানুষের পাশে। তারপর ঘুমন্ত মানুষকে সে বাতাস দিত যাতে তার ঘুম না ভাঙে, তারপর তার বুকের রক্ত চুষে খেতে শুরু করত। রক্ত নিঃশেষ হলে ভূত চলে যেত ঃ অভাগার অসাড় দেহ বিছানায় পড়ে থাকত।

আমাদের মহাজনেরা মানুষ ভ্যামপায়ার ছিল। চার-ছয়-আট গাঁ পর পরই এদের পাওয়া যেত। এরা প্রথমে চুপি চুপি চাষীদের বাড়ী যেত পরম হিতৈষীর মত নিতান্ত মোলায়েম ভাবে কথা শুরু করতো ঃ

নছর ভাই, পালের বদল যে মরে গেল, আর একটা তো কিনতে হয়। নইলে যে হাল কানা হয়ে যাবে।"

'কি দিয়ে কি করি, কাকা? হাত একদম খালি। তাই ভাবছি, গাইটা দিয়েই এবার বলদের কাজ চালিয়ে নিব।'

'তা পার। কিন্তু একটা কথা। গাই দিয়ে হাল বাইলে চাষ তো ভাল হবেনা, ক্ষেত্রে শস্য কম হবে। তাছাড়া, যার দুধ খেয়ে আমরা বাঁচি, তাকে হালে জুড়লে উপরওয়ালা কি খুশী হবে, নছর ভাই?'

'সবই তো বুঝি, কাকা; কিন্তু উপায় কি?'

'উপায় অতি সহজ। কাল সকালে যেয়ো, টাকা যা দরকার হয় দিয়ে দিব। এমন অসময়ে যদি তোমাদের একটু উপকার না করতে পারি, তবে আমরা আছি কেন, তাই বল?'

আর এক মহাজন আস্তে আস্তে বাইরে বাড়ি দিয়ে যায় আর ডেকে বলে, 'বাড়ী আছ, ফরীদ ভাই? অ-ফরিদ ভাই? বলি ছেলে তো আল্লার রহমে বড় হল, এখন তার বিয়ের দাওয়াতের জন্য যে আমরা চেয়ে আছি।'

'ছেলের তো বিয়ে দিতেই হয় ভাই, আর তার জন্য ছেলের মায়ের জুলুমও কম নয়। কিন্তু দুই-চার বছর কষ্ট করে টাকা না জমিয়ে বিয়ের কাজে হাত দেই কেমনে?"

শোন ফরীদ ভাইর কথা! আরে টাকা জমানোর জন্য এতকাল শুভ কাজ ঠেকে থাকবে, তবে আমরা আছি কেন? টাকা এনে বিয়ে সেরে ফেল, তার পরে আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে ধার শোধ করে ফেলো।

নছর, ফরীদ দুইজনেই টাকা আনে। দুইজনেই চক্রবৃদ্ধি হারে মাসে শতকরা আড়াই

টাকা সুদে দলিল করে দেয়। মহাজনেরা তাদের তাকিদের নামও করেনা। খাতক টাকা দিতে চাইলে বরং বলে, 'আরে অত ব্যস্ত হলে কেন'? আমাকে কি পর মনে কর নাকি? সোনার চাঁদ নাতি ঘরে এসেছে, টাকা যদি হাতে হয়েই থাকে, তবে তা দিয়ে এখনকার মত ওর একটা ভাল আকিকার মজলিস কর। এর জন্য ফের দু'চার টাকা কম পড়ে তো যেয়ো, চালিয়ে দিব।'

মহাজন মাঝে মাঝে দলিল বদলিয়ে নেয়। তারপর যখন বোঝা অতোলা হয়ে উঠে, তখন তার জমি ধরে টান দেয়। বলতো, 'ভাইরে তোমার জমি তোমার হাতেই থাক কেবল বর্গার ভাগ শস্যটা আমার বাড়ীতে দিয়ে এস।'

দশ বছর আগে যে চাষী ছিল চৌদ্দ বিঘা জমির মালিক, সে এখন হয় চার বিঘার মালিক আর দশ বিঘার বর্গাদার, যার জমি ছিল আট বিঘা, সে হয় দিন মজুর; যার তাতে দিন না চলে, সে মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে চলে যায় আসামের জঙ্গলের পানে। এই কৃষকদের পানে চেয়েই সেকালে মুনশী রিয়াজুদ্দীন লিখেছিলেন ঃ

"তুমিই শস্যের রাজা, ভূমির মালিক।
সকলের চেয়ে তব গৌরব অধিক॥
তোমার শ্রমের ফলে সকলেই খায়।
কিন্তু তোমা পানে কেহ ফিরিয়া না চায়॥"

সুদী কারবারের অসম্ভব লাভ দেখে ছোট ছোট জমিদার, তালুকদার, চাকুরিয়া এদের অনেক মহাজনী শুরু করে দিল। তখনকার দিনে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ, ডি-এসপি শ্রেণীর চাকুরিয়া এই রকম সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের ছেলেদের মধ্য হতেই গবর্নমেন্ট বেছে নিযুক্ত করত। কাজেই মহাজনের জুলুমের বিরুদ্ধে খাতক নালিশ করলে থানায়, আদালতে সর্বত্র সহানুভূতি মহাজনেরাই পেত। খাতকের দিকে বড় কেউ চোখ তুলে চাইত না। আসল একশ' টাকা পনর বছরে চব্বিশ হাজার টাকায় পরিণত হয়েছে, আর মহাজন তারই ডিক্রী পেয়েছে, এমন ঘটনাও তো দেশে ঘটেছে। ......মহাজনের অত্যাচারে দেশের কৃষকেরা যতই ভূমিহীন হয়ে পড়তে লাগল, ততই তারা জমির খোঁজে বাইরে যেতে শুরু করল।[২০]

এই অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। এমনকি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর Glimpses of World History (বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে) গ্রন্থে ইংরেজ আমলে এদেশের মুসলমান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এরা ছিল গরীব প্রজা বা অতি ক্ষুদ্র ভূস্বামী। জমিদার সাধারণত হত হিন্দু, গ্রামের বানিয়াও

২০। ইব্রাহীম খাঁ, বাতায়ন, ১৩৫-১৩৭।

তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মুদি। কাজেই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারও করে নিতে ছাড়তো না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। কেননা, হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ তার মূলে রয়েছে এইখানে।[২১]

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অকপটে এই সত্যকে স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য কর্মে এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আছে যাঁরা একদিন এই দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা।

নজরুলের পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে এইসব ঘৃণ্য বক্তব্য ও মন্তব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং শিবাজীর ন্যায় এক ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ছিলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচর্চার মূল উপজীব্য। তাই এদেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কথা সুখ-দুঃখের কথা লেখার সম্ভবত তিনি সুযোগ পাননি। এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ফারুক মাহমুদ তাঁর 'ইতিহাসের অন্তরালে' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> সোনার বাংলার সেই সোনার সন্তানদের ৭৫ শতাংশ লোকও তখন দু'বেলা 'নুন-লংকা পান্তা ভাত' জোটাতে পারেনি। নিজেরা গামছা পরেছে, ছেলেমেয়েরা উলংগ থেকেছে, বৌ-ঝিয়েরা ভাগাভাগি করে ডুমা (চার/ ছয় হাত লম্বা দেড় হাতবহরের এক প্রকার মোটা শাড়ী) পরেছে। সোনার হরিণও স্বপ্নে দেখা যায়। বাংলার মানুষের চোখে সে স্বপ্ন দেখার শক্তিও তখন ছিল না।
>
> তবু তো 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি তখনই লেখা হয়েছিল- ১৯০৬ সালে। এ গান যিনি লিখেছিলেন ঠিকই লিখেছিলেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল সোনার চামচ মুখে নিয়েই। বৃটিশ অনুগ্রহে ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্বত্বাধিকারী বহুসংখ্যক ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কয়লা খনির মালিক প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, জোড়াসাঁকোর জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথও তৎকালীন অন্যান্য কোলকাতায়ী বাবু বুদ্ধিজীবীদের মতোই বাংগালী ও বাংলা বলতে শুধুমাত্র শিক্ষিত "সংস্কৃতিবান' বর্ণহিন্দু সমাজকেই বুঝতেন। মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কারের পর বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাংলার লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, পৌরসভা ও গভর্নরের উপদেষ্টা পরিষদে প্রবেশাধিকার পাবার পরই কেবল তিনি এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করেন এবং ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমনফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে বাংলার প্রশাসনে মুসলমানদের প্রাধান্য ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়াতে ১৯১৮ সাল থেকে 'কালান্তরের' প্রবন্ধগুলোতে মুসলমানদের প্রতি উদার আচরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন- তার আগে ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনিও তাঁর কোন লেখাতেই মুসলমানদেরকে বাঙ্গালী বা মানুষ বলে মেনে নেন নি। যা হোক, তখনো বৃহৎ বাংলার শতকরা বিশজন বর্ণহিন্দুর জন্য সোনার বাংলা থাকলেও বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে সোনার বাংলা ছিল না। তবু স্বদেশ প্রেম ঈমানের অংশ-এর অনুসারী মুসলমান সমাজ দুস্থ-দরিদ্র বাংলাকেই দাদা-পরদাদাদের কাছে শোনা এককালের 'সোনার বাংলা' ভেবে তার দুঃখে কেঁদেছেন।

২১। জওহরলাল নেহেরু ঃ বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে, অনুবাদক শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ৯, পৃঃ ৩৮১।

..... তবে সেই সোনার বাংলার ভেতরটা ছিল রাংতায় ভরা, বাইরে দু'আনা আন্দাজ সোনার পালিশ এদের এনে দেয়া নব্য সোনার বাংলার ইংগ-বংগ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা উনিশ শতকীয় বাবু বুদ্দিজীবীরা নিজেদের গৌরব-গাঁথা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেকালে তাদের কোন লেখায় হারিয়ে যাওয়া সোনার বাংলার জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ তো দূরের কথা, সে সম্পর্কিত উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায় না। বাবুদের সোনার বাংলায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে মুসলমান ও শূদ্রদের আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবেশের অধিকার না থাকায় সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তারা ছিলেন অনুপস্থিত। ফলে আসল সোনার বাংলার পুরা খবরই গুম হয়ে যায়। বাবু বুদ্ধিজীবীরা সে ইতিহাস ভালভাবেই জানতেন। সে যুগের ফারসী ভাষায় লিখিত ও রক্ষিত ইতিহাস তারা পড়তে পারতেন। এ ছাড়া পিতা-পিতামহদের সূত্রে তারা তা অবহিতও ছিলেন। তবু তারা তা গুম করে গেছেন। এটা বাবুদের ভুল ছিল না- ছিল তাদের সচেতন প্রয়াস। কেননা, সোনার বাংলা যে সত্যি সত্যি এককালে ছিল এবং তা ছিল ১৭৫৭ সালের পূর্বে একটানা ৫ শত বছর ধরে- এ কাহিনী প্রকাশ পেলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতো, সেই সোনার বাংলার বিলুপ্তি ঘটলো কিভাবে, কবে, কাদের দ্বারা, কাদের যোগসাজশে? কথা উঠতো, এ ক্ষেত্রে যারা অপরাধী, নিশ্চিতভাবেই তারা বাংলার জনসাধারণের, বাংলার দুশমন।[২২]

অবশ্য বাবুরা বাংলার ইতিহাস গুম করলেও বাইরের পৃথিবীতে তা গোপন ছিল না। প্রাচ্যের মহাচীন, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জাহান এবং ইউরোপ মহাদেশের নানা দেশে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা আসতেন সোনার বাংলায়। তাদের ভ্রমণ কাহিনীতে বিধৃত হয়ে আছে সোনার বাংলার সমৃদ্ধির আসল চিত্র। এমনকি ইংরেজ পন্ডিতেরা নিজেদের রচনায় লুটতরাজকে জাস্টিফাই করার জন্য বানোয়াট ইতিহাস দাঁড় করালেও তাদের বাণিজ্যিক লেন-দেনের হিসাব সংক্রান্ত পত্রাবলী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে সোনার বাংলা শ্মশান বানাবার কার্যক্রমের প্রমাণ গেঁথে রয়েছে। ইতালীর বণিক লুডোভিকো ডি বার্থেমা, ফরাসী বণিক জীন ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার, ফরাসী বণিক পর্যটক ফ্রাংকয়েস বার্নিয়ার, ওলন্দাজ বণিক স্টাভোর্নিয়াস, মরক্কোর মুসাফির ইবনে বতুতা, পর্তুগীজ বণিক পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা ও সিবাস্তিয়ান মানরিক প্রমুখের সফরনামা গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবার ফলে সোনার বাংলার অকল্পনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির কাহিনী পলাশী যুদ্ধের দুই এক শত বছর আগে থেকেই ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে মশহুর ছিল। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মনীষী কার্ল মার্ক্স এসব সূত্রের বরাতেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তার তথ্য-সমৃদ্ধ রচনায় দেখিয়ে দেন যে, ভারতের তথা বাংলার অপরিমেয় পুঁজি ও বিত্ত-সম্পদ লোপাট-পাচার হয়েই বৃটিশ বিশ্ব-বাণিজ্যের পুঁজি গঠন করেছে- সোনার বাংলার সমৃদ্ধি স্থানান্তরিত হয়ে বৃটেনকে সমৃদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলার বাবু বুদ্ধিজীবীরা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন-অনেকে আবার বিকৃত ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার প্রয়াসও পেয়েছেন। এটা না করে তাদের উপায় ছিল না। কেননা, এ বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গেলে লোপাট-

২২। ফারুক মাহমুদ, ইতিহাসের অন্তরালে, পৃঃ ৮৫

পাচারের বিশ্বস্ত দালাল হিসেবে তাদের পূর্বপুরুষদের চরিত্র সামনে এসে যায়।

চলতি শতকের চতুর্থ দশক অবধি সোনার বাংলা হারিয়ে যাওয়ার সব কাহিনীই এভাবে বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসে অনুচ্চারিত ছিল। ইতিহাস গবেষণার মতো শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য তখনো বাংলার কোন মুসলমান ঘরের কোন সন্তান আয়ত্ত করতে পারেন নি।

এখানে এতো কিছু বলার উদ্দেশ্য হলো, এগুলোই সঠিক ইতিহাস। বাবু জমিদার ও ইংরেজদের পীড়নের নির্মমতার ইতিহাস। বলা বাহুল্য, এই শোষণ এবং পীড়নের শিকার হয়েছিল যে প্রজাসাধারণ, তার সিংহভাগই ছিল মুসলমান কৃষক। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানেরা এই শোষণ ও পীড়ন সহ্য করে গেছে। জমিদার বাবুরা সাত মহলা রাজপ্রাসাদে মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রঙ্গিন মদিরার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাইজির নূপুর নিক্কনের সাথে তাল ঠুকতেন, তখন সলিমুদ্দি-কলিমুদ্দি প্রমুখরা রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদায় অস্থি চর্মসার দু'টি বলদের সাহায্যে বাবুর ভোগের জন্য খেটেই যাচ্ছে।

খাজনা অনাদায়ে কোন প্রজাকে কাছারীতে ধরে আনলে সে প্রজা অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেতে পারতো না। পরিবারের সদস্যদের সামনেই কানমলা, জুতা মারা সবই চলতো। খাজনা বাকি বা অন্য কোন অপরাধ থাকলে গাছে বেঁধে জুতা মারা হতো। মুসলমান প্রজাদের ধরে এনে পরিবার-পরিজনদের সামনেই মুসলমান লাঠিয়াল দিয়ে নির্মমভাবে পিটানো হতো। নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে জমিদারের কাছে প্রজারা করজোড়ে বলতো "হুজুর বাহাদুর ক্রীতদাসের কথা শুনুন, আমরা না খেয়ে মারা যাবো। আমরা আপনার ক্রীতদাস, আপনার ছাওয়াল, হুজুর আমাদের বাপ-মা, আমাদেরকে বাঁচতে দিন। এতদ্‌সত্ত্বেও জমিদারদের অত্যাচার থেকে প্রজারা রেহাই পেতো না। পরিজনদের আহাজারি, কৃষকের করুণ আর্তি জমিদারদের কঠিন হৃদয় নরম হয়ে দয়ার উদ্রেক হতো না। এসব ইতিহাস পাঠ করলে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠবেই। দু'একটাকে ধরে এনে রাজপথে চাবুক লাগাতে কার না মন চায়? আমাদের পূর্বসূরীদের উপর নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে কে না চায়?

আমাদের নতুন বংশধরদের একটা বড় সমস্যা তাদের কাছে আমাদের সঠিক ও অবিকৃত ইতিহাস নেই। আমাদের ঘরে-বাইরের শত্রুরা শুধু ইতিহাস বিকৃতির কুকর্মেই লিপ্ত নয়, ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার সর্বনাশা প্রচেষ্টায়ও নিয়োজিত। একটা চিহ্নিত মহল এ রকম হাস্যকর কথাও বলতে চাচ্ছে যে, আমাদের সব কিছুই '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে শুরু।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা নিরপরাধ ঘুমন্ত মানুষকে ট্যাংক চালিয়ে হত্যা করেছে। আর রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী জমিদার বাবুরা আমাদের পূর্বপুরুষদের শোষণ, নির্যাতন ও নির্মমভাবে হত্যা করেছে একশ' নব্বই বছর। এখনো আমাদের পূর্বসূরীদের আহাজারি ও আর্তনাদ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। এখনো বাতাসে কান পাতলে

শহীদ তিতুমীর ঃ আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার

পাকসেনাদের ট্যাংকের গড় গড় শব্দ এবং ইংরেজ জমিদার বাবুদের চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ শোনা যাবে। এখনো বাতাসে ভেসে বেড়ায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের আহাজারি ও আর্তনাদ। এই আহাজারি ও আর্তনাদ যাতে বর্তমান বংশধরেরা শুনতে বা জানতে না পারে, সে জন্যে তাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে খন্ডিত ইতিহাস। তাই বর্তমান বংশধরেরা জানতে পারছেনা একদিন তাদের পূর্বসূরীরা পাকা মসজিদ বানালে এক হাজার টাকা, কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশ' টাকা, ফি দাড়ির জন্য আড়াই টাকা, গোঁফের জন্য পাঁচসিকা জমিদার সরকারে জমা দিতে বাধ্য করা হতো এবং গো-হত্যা করলে ডান হাত কেটে নেয়ার হুকুম ছিল। বর্তমান বংশধরদের কাছে এসব ইতিহাস অজ্ঞাত তাদেরকে এসব ইতিহাস জানাতে হবে।

এককালে জমিদার বাবুরা মুসলমান লাঠিয়াল দিয়ে মুসলমান প্রজাদের পিটাতো। এখন ঠিক সেভাবে পিটায় না বটে; কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে জমিদার রবীন্দ্র বাবুদের এ দেশীয় সেবাদাস মুসলিম রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী দিয়ে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস আড়াল করে ভেড়া-ছাগল বানিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ, আমাদের পূর্বসূরীদেরকে যে-ভাবে নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ করেছে, সে ১৯০ বছরে কাহিনী বিস্মৃত হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হাজার বছর আগে পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যায়নি। বংশানুক্রমে সেই পরাজয়ের চূড়ান্ত প্রতিশোধ গ্রহণে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই আমাদের স্বকীয়তা এবং জাতিসত্তা চিরতরে মুছে ফেলে রবীন্দ্র দর্শনের মাধ্যমে বাঙ্গালিত্বের নামে হাজার বছরের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চলছে চতুর্মুখী আয়োজন।

গত হাজার বছরের ইতিহাস যদি নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে জাতির কাছে তুলে ধরা

যেতো, তাহলে বর্তমান বংশধরেরা বাংলাভাষী কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালেও জমিদার রবীন্দ্রনাথদের বিরুদ্ধে যুব সম্প্রদায়ের ঘৃণার উদ্রেক অথবা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হতো কি-না জানিনা। তবে এটুকু বলা যায়, তাদের গানে "বিশ্ব কবির সোনার বাংলা" এই বাক্যটি কণ্ঠ দিয়ে বের হতোনা। বের হতো "বিশ্ব কবি করেছে শ্মশান, নজরুলেই বাংলাদেশ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলার প্রকৃত রূপ দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। তিনি শুধু বাংলার বাইরের দিকটা দেখেছেন। কিন্তু ভিতরেরটা দেখেননি। আর দেখলেও সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতার কারণে না দেখার ভান করেছন। হীনমন্যতা ত্যাগ করে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি যদি দেখতেন তা হলে এদেশের বঞ্চিত মানুষের কাহিনী তাঁর বিরাট সাহিত্য ভান্ডারে স্থান পেতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রাকৃতিক রূপ দেখেছেন; কিন্তু শোষণের বীভর্ৎস রূপ দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বসূরীদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মানুষের গোস্ত মানুষে খাওয়ার নির্মম চিত্র দেখেননি। দেখলেও সারা জীবন না দেখার ভান করেছেন। কারণ এই সীমাহীন শোষণের হোতা ছিল তাঁরই স্বজাতি এবং বেনিয়া ইংরেজ। এরা এই বাংলার চিরায়ত প্রাকৃতিক রূপকে লুণ্ঠন করতে পারেনি। যদি পারতো তাহলে তাও লুণ্ঠন করে এদেশকে শ্রীহীন করতো। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সাহিত্য ভান্ডারে বাংলার চিরায়ত প্রাকৃতিক রূপের প্রতিচ্ছবি থাকলেও জমিদার ও ইংরেজ বাবুদের প্রজা-পীড়ন ও শোষণের প্রতিচ্ছবি তার সাহিত্য ভান্ডারে অনুপস্থিত। কারণ, এই অপকর্মগুলো যে তাদেরই সৃষ্ট- ইতিহাসে এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরীরা অতীতে যা পারেন নি তাঁর পূর্বসূরীরা তা সম্পন্ন করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ বাংলার চিরায়ত প্রাকৃতিক রূপকে লুণ্ঠন করে এ দেশকে শ্রীহীন বা মরুভূমি করতে পারেনি। এখন নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে তা করছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে, তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট যে, নজরুলের পূর্বসূরীরা এই বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করেছিলো। আর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বসূরীরা ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করে এই সোনার বাংলাকে শ্মশান বাংলায় পরিণত করেছিলো। অথচ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যারা আমাদেরকে চিরকাল গোলাম বা দাস বানিয়ে চাষা-ভূষা করে রাখতে চেয়েছিলো, তাদের নামে আজ জয়গাঁথা গাওয়া হচ্ছে। আর যাঁরা ১৭৫৭ সালের পর একদিনের জন্য আজাদী আন্দোলন থেকে বিরত থাকেন নি, যাঁদের অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও রক্তের ফসল এই স্বাধীনতা, যাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমরা আজ চাষার বেটা থেকে সাহেবের বেটায় উন্নীত হয়েছি ইতিহাসে তাঁদের ঠাঁই নেই। ইতিহাসে তাঁরা বিস্মৃত। তাই এই দেশীয় যে-সব সেবাদাস রবীন্দ্র ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হয়ে কোকিল কণ্ঠে বলে থাকেন- "বিশ্ব কবির সোনার বাংলা" তাদের উদ্দেশ্যে শুধু এটুকুই বলা যায়- "কার শিন্নি খাও তোমরা মোল্লা চিনো না।"

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামন্তবাদী প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। তাঁর দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধি এবং জোর-জবরদস্তি করে তা আদায়ের বিরুদ্ধে ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে শিলাইদহে প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছিল।"

-অমিতাভ চৌধুরী

পেছনের অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি জমিদারদের কুকীর্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এবার জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বভাব-চরিত্রে নাকি অত্যন্ত ভালো লোক ছিলেন বলে লোকে তাঁকে নামের আগে 'মহর্ষি' শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র কিরূপ ছিলো ঠাকুরের পরিবারের সদস্য অবনীন্দ্রনাথের মুখ থেকেই শোনা যাক। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারকালীন সময়ের বর্ণনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> তখন পরগনা থেকে টাকা আসত কলসীতে করে। কলসীতে করে টাকা এলে পর পর সে টাকা সব তোড়া বাঁধা হতো। ...কর্তা দাদামশায় তখন বাড়ির (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) বড় ছেলে, মহাসৌখিন তিনি তখন বাড়ির ছেলে। ও বাড়ি থেকে রোজ সকালে একবার করে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পেন্নাম করতে আসতেন তখনকার দস্তুর ছিলো ওই ... তা কর্তা দাদামশায় তো যাচ্ছেন বৈঠকখানায় বাপকে পেন্নাম করতে- যেখানে তোড়া বাঁধা হচ্ছে সেখানে দিয়েই যেতে হয়। সঙ্গে ছিল হরকরা- তখনকার দিনে হরকরা সঙ্গে সঙ্গে থাকত জরির তকমা পরা, হরকরার সাজের বাহার কত; এই যে এখানে এসেছি তখনকার কালে হলে হরকরাকে ওই পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, নিয়ম ছিল তাই। কর্তা দাদা মশায় তো বাপকে পেন্নাম করে ফিরে আসছেন। সেই ঘরে যেখানে দেওয়ানজি ও আর আর কর্মচারীরা মিলে টাকার তোড়া ভাগ করছিলেন, এখানে এসে হরকরাকে হুকুম দিলেন- হরকরা দু'হাতে দুটো তোড়া নিয়ে চলল বাবুর পিছু পিছু। দিওয়ানজিরা কী বলবেন, বাড়ির বড়ো ছেলে, চুপ করে তাকিয়ে দেখলেন। এখন হিসেব মেলাতে হবে- দ্বারকানাথ নিজেই হিসাব নিতেন তো। দুটো তোড়া কম। কী হল।
>
> আজ্ঞে বড়ো বাবু....
>
> ও আচ্ছা-[১]

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতি রাণীচন্দ ঃ ঘরোয়া, পৃঃ ২৩-২৪।

পৌঢ় জমিদার রবীন্দ্রনাথ

পরবর্তীতে প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জমিদারী চালিয়েছেন। কিন্তু বুড়ো বয়সে এই বিশাল জমিদারীর দায়িত্ব কোন্ ছেলের হাতে অর্পণ করবেন তা নিয়ে মহাভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি কবে মারা যান কে জানে? তিনি ভাবলেন, রবি-কে জমিদারির কাজের মধ্যে না টানতে পারলে আর চলবে না। না হলে এতো বড়ো জমিদারি সব ছারখার হয়ে যাবে। বড়ো ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক মানুষ, বিষয়কর্ম বুঝেও না, দেখেও না। কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। হয়তো বলা হলো, জমিদারিতে গিয়ে খাজনা আদায় করে আনো। তিনি গিয়ে প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে খাজনা মওকুফ করে তো দিলেনই, এমনকি নিজের পকেট থেকে টাকা-পয়সা দিয়ে এলেন তাদের। সতেন্দ্রনাথ সরকারি কাজে আজ এখানে, কাল ওখানে, হয়তো ছুটিতে কেবল দিন কয়েক বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের কাছে কাটিয়ে যান। তাঁর পক্ষে জমিদারি দেখা মোটেই সম্ভব নয়। জ্যোতিন্দ্রনাথেরও সংসারের কাজে টান কম। হেমেন্দ্রনাথ মারা গেছেন; অন্য দুই ছেলে অসুস্থ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত জমিদারি দেখবার উপযুক্ত আর কোনো ছেলেই তো তাঁর নেই! পাক্কা জহুরীর যেমন খাঁটি স্বর্ণ-হীরে চিনতে কষ্ট হয়না, ঠিক তেমনি পাক্কা জহুরীর ন্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জমিদারী চালোনোর জন্য বেছে নেন।
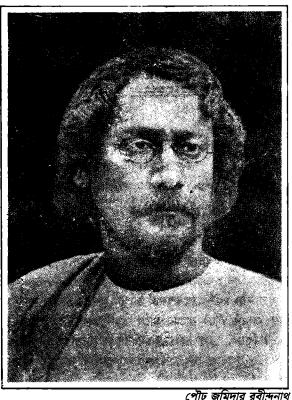
আমরা জানি, কবিদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও আকাশের মতো উদার থাকে। কিন্তু জমিদারদের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও সংকীর্ণমনা হয়। হয়তো ব্যতিক্রম কিছু থাকে।

কিন্তু ইতিহাসে এঁদের সংখ্যা খুবই কম।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকীর্ণমনা ছিলেন কি-না জানিনা; কিন্তু তিনি যে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁকে জমিদারী তদারকী করার মনোনয়নই তা প্রমাণ করে।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁরই স্বজাতি অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামন্তবাদী প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। তাঁর দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধি এবং জোর-জবরদস্তি করে তা আদায়ের বিরুদ্ধে ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে শিলাইদহে প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছিল।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্তী একবার বিশাল জমিদারীর একটি ক্ষুদ্র অংশ দরিদ্র প্রজাসাধারণে জন্য দান করার প্রস্তাব করেছিলেন। ঠাকুর মশায় ইজি চেয়ারে আধ শোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বলেছিলেন- "বলো কি হে অমিয়! আমার রথীন তাহলে খাবে কি?"[৩]

একবার না-কি খাজনা মওকুফের ফলে এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের। যা রবীন্দ্র ভক্তরা প্রজাদের প্রতি তাঁর মহানুভবতা প্রমাণ করে থাকেন। কিন্তু ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারীতে খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন একথা তাঁরা বলেন না। গরীব মুসলমান প্রজারা তাঁর পায়ে পড়লো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে তা আদায় করলেন। পরে সেই বাড়তি আয়ের টাকায় মার্কিন কোম্পানীর কাছ থেকে ডেবরাকোল জমিদারী খরিদ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত প্রবন্ধকার শ্রী অরবিন্দু পোদ্দার লিখেছেন ঃ

> "জমিদার জমিদারই। রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধি, প্রজা নির্যাতন ও যথেচ্ছ আচরণের যেসব অস্ত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদার শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছিল, ঠাকুর পরিবার তার সদ্ব্যবহারে কোনও দ্বিধা করেনি। এমনকি জাতীয়তাবাদী হৃদয়াবেগ ঔপনিষদিক ঋষি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি এবং হিন্দু মেলার উদাত্ত আহবানও জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শ্রেণীস্বার্থ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।"[৪]

গত বছর প্রজাপীড়ক জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ডঃ আহমদ শরীফ পশ্চিম বাংলার 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকায় একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এই ইন্টারভিউটি পরবর্তীতে আমাদের দেশের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় দু'কিস্তিতে যথাক্রমে ২৪ এপ্রিল ও ১লা মে '৯৭ পুনঃ প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ ইন্টারভিউয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কটাক্ষ করে বলেছেন-

..... হিন্দুর কথা ভাবুন। সবগুলো বাপ খ্যাদানো, মায়ে তাড়ানো বদমাহশ। কোলকাতা শহরে এসে টাকা পয়সা করেছে। দ্বারকানাথের কথা স্মরণ করুন।

২। জমিদার রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, দেশ, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা ১৪৮২।

৩। অন্নদা শংকর রায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃত, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, আবু জাফর, বইঘর, চট্টগ্রাম ১৯৮৫।

৪। শ্রী অরবিন্দু পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ ও রাজনৈতিক গ্রনথ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের একটি দুর্লভ ছবি

দ্বারকানাথ হচ্ছেন embodiment of corruption। আর তাঁর সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সততার প্রতিমূর্তি। সে রকম রাজ নারায়ণ বসু, কেশব সেনরা কার সন্তান? এঁদের বাবারা ইংরেজ কোম্পানির সাথে নানা রকম corruption-এ যুক্ত থেকে টাকা পয়সা করে তাঁদের সন্তানদের হিন্দু কলেজে পড়িয়েছেন। তাঁদের সন্তানরা জ্ঞানী গুণী হয়েছে। Aminities of life সব পেয়ে গেছে। কাজেই সে তো আর তার বাবার মতো ইতরামি করবে না।

"আমাদের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তার সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনও ক্রটি নেই, এটা কোনও কথা হল। অথচ পাওয়া যায়। অন্নদা শঙ্কর রায় বলেছেন, 'শান্তি নিকেতনে' একটি চাকরি পেয়ে তার সরকারী চাকুরী ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন জমিদার মর্জির, ঠিক নেই কখন আবার চাকরি নষ্ট করে দিলে তার খাবার অভাব হবে। রবীন্দ্রনাথ ইনটলারেন্ট ছিলেন। যে মাস্টার রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করতেন তার চাকরি থাকত না। ..... রবীন্দ্রনাথের আরো একটি লোভ ছিল পৌরহিত্যের লোভ।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন, পায়ে দলেছেন দেবেন ঠাকুর। এটাই রেকর্ড করেছিল হরিনাশ মজুমদার। যিনি মহর্ষী বলে পরিচিত, তিনি এ রকমভাবে মানুষকে পদাঘাতে দলিত করেন। গ্রাম জ্বালাবার কথাও আছে। আবুল আহসান চৌধুরীর কাছে এর সমস্ত ডকুমেন্ট আছে। সমগ্র ঠাকুর পরিবার কখনো প্রজার কোনও উপকার করে নই। স্কুল করা, দীঘি কাটানো এসব কখনো করে নাই। মুসলমান প্রজাদের চিট করার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তার 'গ্রাম্য বার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের প্রজা পীড়নের কথা লেখে ঠাকুর পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিল।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর অভিযোগ শধু ডাঃ আহমদ শরীফই করেননি। এককালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব কামরুদ্দীন আহমদ "পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভাব ছিল এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা। কেবলমাত্র চাঁদার উপর নির্ভর করে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব ছিল না। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য এদের অবলম্বন করতে হল ডাকাতির পথ। নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অনুশীলন দল প্রায় তিরিশ বছর ধরে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।.....

১৯০৬ সালে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় দল স্থাপিত হয় কলকাতায়। অধ্যাপক অরবিন্দু ঘোষ ও তাঁর ভাই রাবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে। এর নাম হলো 'যুগান্তর' দল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।"[৬]

৫। দৈনিক বাংলাবাজার, ১৪ এপ্রিল ও ১ মে '৯৭ দ্রষ্টব্য।
৬। কামরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, পৃ, ৫.৬।
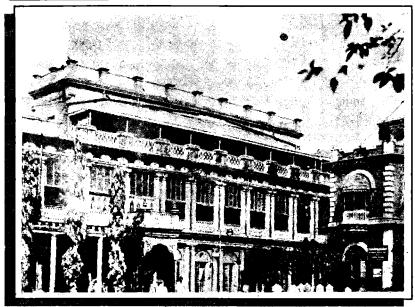
সংস্কারের পর বর্তমানে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী।

মহর্ষির দেবেন্দ্রনাথের তৈরি শান্তিনিকেতন বাড়ীর সামনে কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে বর্ণিত গুরুতর অভিযোগগুলো কোন মৌলবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীর নয়। একজন বামপন্থী লেখক; অপরজন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন নেতা। সুতরাং বর্ণিত অভিযোগগুলো যে অতিরঞ্জিত বা বিদ্বেষপ্রসূত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ডঃ সুপ্রকাশ রায় দেখিয়েছেন; কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার গত শতকে এবং এ শতকের প্রথম দিকে অত্যাচারী শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিভাবে তারা তাদের জমিদারীতে প্রজা আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছিলেন ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীর সহযোগিতায়। মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিঃস্ব দীন প্রজাকুলের উপর অন্যান্য জমিদারের সাথে পাল্লা দিয়ে কেমন করে ট্যাক্স বাড়িয়ে গেছেন এবং আদায় করেছেন তা আজ কারো অবিদিত নয়। শুধু তাই নয় জমিদারী প্রথার পক্ষে নির্লজ্জভাবে কবি ওকালতি করে তিনি বলেছেন -"জমিদারী উঠে গেলে গাঁয়ের লোকেরা জমি নিয়ে লাঠালাঠি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে মরবে।"

পদ্মার চরের মুসলমান প্রজাদের কাবু করার জন্য নমশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিও কবির মাথা থেকেই এসেছিল। এছাড়া পুত্র রথীন্দ্রনাথের শখের কৃষি খামারের প্রয়োজনে গরীব মুসলমান চাষীর ভিটে মাটি দখল করে তার পরিবর্তে চরের জমি বরাদ্দের মহানুভবতাও (?) কবি দেখিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ সাহিত্যচর্চার জীবনে প্রজাদের নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন 'দুই বিঘা।'

এ কবিতার একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

"এ জগতে হায় সেই বেশী চায়
আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত
কাঙালের ধন চুরি।"

তবুও আমাদের সান্ত্বনা এই যে, উক্ত কবিতায় জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিবাদী বক্তব্য না থাকলেও প্রজাদের জন্য তাঁর আক্ষেপ রয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দুই বিঘা' কবিতা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হলো ঃ

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন বাংলাদেশের প্রধানত তিনটি অঞ্চলের কুঠিবাড়ি থেকে তাঁর জমিদারী পরিচালনা করেন। কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ, পাবনা জেলার শাহজাদপুর এবং রাজশাহী জেলার পতিসরে তাঁদের জমিদারীর কুঠিবাড়ি ছিলো। এখনো তা বিদ্যমান রয়েছে। কবি সবচেয়ে বেশি দিন থেকেছেন শিলাইদহে। এ কুঠিবাড়িতে গেলে স্থানীয় লোকেরা কুঠি সংলগ্ন বাগানের একটি অংশকে দেখিয়ে বলে, 'এটাই হচ্ছে উপেনের দুই বিঘা জমি।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রফেসর ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান "রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

শিলাইদহ কুঠি বাড়ী

'পদ্মা' বোট ঃ
এই বোটে 'চৈতালী' ও 'ছিন্নপত্রে'র অধিকাংশ লিখিত হয়
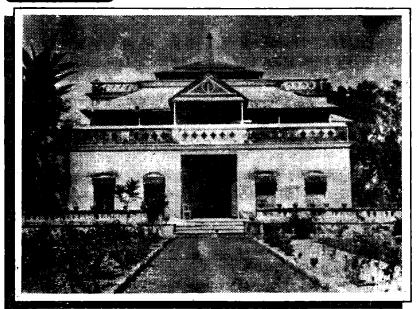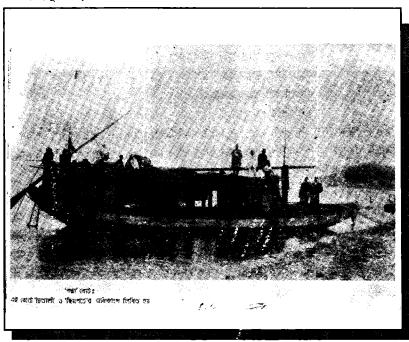
"আমি এবং যশোর শিক্ষা বোর্ডের যোগ্য চেয়ারম্যান মরহুম হারুনুর রশীদ সাহেব প্রায় আঠার বছর আগে (বর্তমানে ২৭ বছর) শিলাইদহের কুঠিবাড়ি দেখতে গিয়াছিলাম। 'উপেনের জমি' বলে কথিত অংশটি লোকজনের সাহায্যে মেপে আমরা আনুমানিক দু'বিঘার মতই হবে বলে দেখতে পাই। জমিটির অবস্থান এমন যে, এটি কুঠিবাড়ির মূল বাগানের সঙ্গে যোগ করার ফলে সমগ্র বাগানটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান আকার লাভ করেছে। "দেশতে পেলাম দুই বিঘে প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান হইবে টানা"- জমিদার বাবুর উক্তিটির সঙ্গে লোক প্রবাদের মিল আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। জমিদার রবীন্দ্রনাথের কোন প্রতাপশালী পূর্বপুরুষ, শিলাইদহের দরিদ্র এবং অসহায় একজন কৃষকের শেষ সম্বলটুকু জমিদারী বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য হয়ত আত্মসাৎ করেছিলেন। যারা সমাজে সুবিচার পায়না, যাদের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, উপেন তাদেরই একজন। তাঁর বাচনে কবি আমাদের শুনিয়েছেন জমিদারের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী ঃ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। ভয়ঙ্কর এ সত্যটি উচ্চারিত হয়েছে আর একজন জমিদারের কণ্ঠ থেকে। জমিদারের উদ্ধৃত মুখোশকে কলমের খোঁচায় ছিঁড়ে ছরকট করেছেন তথাকথিত অত্যাচারী জমিদার রবীন্দ্রনাথ 'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।'

"দুই বিঘা জমি" কবিতার রচনা হল ৩১মে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাস। এ সময় শিলাইদহে বসেই প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিচালনায় লিপ্ত ছিলেন। ১৩৩৩ সনের আষাঢ় মাসে লিখিত 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে কবি জমিদারের শোষণের কথা স্পষ্ট করেই বলেন ঃ

> "আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে।[৭]

উল্লেখ্য, শিলাইদহ জমিদারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার পুরুষের। কাজেই 'দুই বিঘা' জমির ঘটনাটি যে তাঁর পূর্ব পুরুষদেরই সৃষ্ট তা বলাই বাহুল্য।

ইংরেজদের নয়া চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় হিন্দু জমিদার শ্রেণী হলো বাবু ও ভদ্রলোক এবং মুসলমানরা হলো চাষা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ঠিক এই অর্থেই শব্দ দু'টির ব্যবহার করেছেন। জমিদার-নন্দন রবীন্দ্রনাথ মুসলমানকে জানতেন রায়ত হিসেবেই, তাঁর কর্তব্য হিন্দু জমিদারদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তাদের করুণা ভিক্ষা চাওয়া। শোষিত প্রজারা শোষক জমিদার-মহাজনকে পিতা-মাতা জ্ঞানে তাদেরই মঙ্গল কামনায় আল্লাহর কাছে আরাধনা করবে-এই ছিল জমিদার-নন্দনের স্বাভাবিক

৭। কাজী আবদুল মান্নান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৫৭, ১৫৮, পৃঃ ২৯৮।

জমিদারী এলাকায় প্রজাদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে সর্বাধিক ব্যবহৃত বিখ্যাত বাড়ী 'উদয়ন'

জীবন দর্শন। তাঁর নিম্নের উক্তিটি লক্ষণীয়-

"যখন কোন কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ত তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লাহর দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু হৃদয় স্পর্শ করে না।"[৮]

বাংলা-ভাষী জমিদার বাবু রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা'য় আক্ষেপ বা অনুশোচনা রয়েছে কিন্তু জোরালো কোন বক্তব্য নেই। কারণ এই রবীন্দ্র বাবুরা বাঙ্গালী জমিদার তথা বানিয়া হয়ে প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তাদের রক্ত শুষে নিয়ে সাধের 'শান্তি নিকেতন' গড়ে তুলেছিল। অথচ পূর্ব বাংলায় কৃষক প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন বোধ করেননি।

এই প্রজাপীড়ক জমিদার সম্পর্কে কবি নজরুলের প্রতিবাদী বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেছেন-

"মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাহারাই হন।"

যারা কয়েক বছর আগে ছিল শাসক শ্রেণী তারা হলো কৃষক। যারা হিন্দু গোমস্তা নগণ্য পদে নিযুক্ত ছিল কর্নওয়ালীসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা বনে যায় জমিদার বাবু। রাতারাতি হয়ে যায় জমির মালিক। আর জমির চাষী হলো প্রকৃত মুসলমান। তাদের লক্ষ্য করেই কবি নজরুল বলেছেন-

"সন্তান সম পালে যারা জমি
তারা জমি-দার নয়।"

অন্যদিকে মজলুম জনগণের পক্ষে কবি নজরুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে বলেছেন-

"ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।"

ইংল্যান্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর দিল্লীতে হিন্দু কবি সাহিত্যিকরা আলোকজ্জ্বল উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। সে সময় ভারতে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। এর প্রতিবাদে দেশের কোন কোন স্থানে হরতাল পালিত হয়েছিল। প্রজাদের অনাহারের দুঃখ তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়ে রেখাপাত করেনি। মানবতার ছবি ভেসে উঠেনি। তিনি তখন ছিলেন প্রভু ইংরেজ প্রেমে বিভোর। প্রায় আশি হাজার লোকের উপস্থিতিতে কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন ভারত বিধাতা ইংরেজদের গুণগানে ছিলেন মুখর। অথচ কবি নজরুল সেদিন কুমিল্লায় ভুখা-নাঙ্গাদের মিছিলে যোগ দিয়ে গেয়ে ছিলেন জাগরণী সঙ্গীত-

৮। আবদুল ওয়াদুদ, মধ্যবিৎ সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৪১৯।
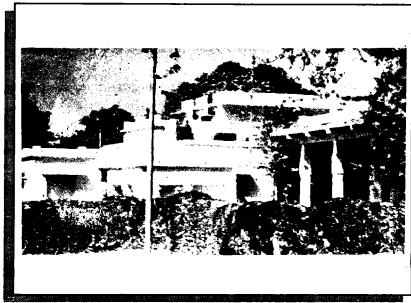
কবির আমলে তৈরি (১৯১৯-২২) শান্তিনিকেতনে প্রথম পাকা বাড়ী 'কোনার্ক'
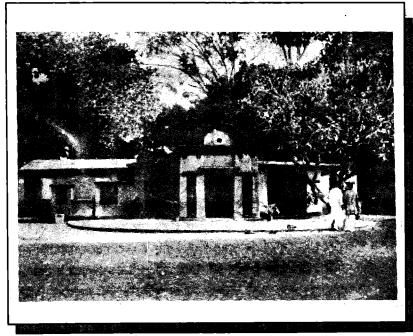
উত্তরায়ণে মাটির বাড়ী 'শ্যামলী'

"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
সন্তান দ্বারে উপবাসী
কার তরে জ্বালো উৎসব দীপ
দীপ নিভাও।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯২ সালে শিলাইদহ জমিদারী এস্টেটের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালের নবেম্বরে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি শিলাইদহ জমিদারির দায়িত্ব অর্পণ করেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে। কেননা শিলাইদহের জমিদারী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে শিলাইদহ ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারী ছাড়া প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রকৃতি নেই।"[৯]

কিন্তু প্রজারা রবীন্দ্রনাথের জমিদার সুলভ স্বভাব দেখলেও আসমানদারি স্বভাব দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রজাদেরকে সন্তানতুল্য বলে আখ্যায়িত করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রজাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বা কল্যাণে তার হাত ছিলো একেবারে মুষ্ঠিবদ্ধ। প্রজাদের মঙ্গলার্থে এমন কোন প্রশংসনীয় কর্মকান্ডের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসে নেই। তবে সস্তা জনপ্রিয়তা এবং মানুষকে চমক লাগানোর জন্য অনেক ভালো ভালো, সুন্দর সুন্দর কিছু কথা বলে গেছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনা মৈত্রেয়ী দেবী বর্ণনা করেছেন এভাবে-

"আজকাল এই ঘোর কমিউন্যাল বিদ্বেষের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে কই, একবিন্দু অভিযোগ করার কারণ কখনো ঘটেনি। যখন প্রথম গেলুম, দেখলুম বসার বন্দোবস্ত অতি বিশ্রী। ফরাস পাতা রয়েছে উচ্চ জাতের হিন্দু আর ব্রাহমনদের জন্য, আর মুসলমানরা ভদ্রলোক হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে নয়তো ফরাস তুলে বসবে। আমি বললুম সে কখনো হবে না, সবাই ফরাসে বসবে। ঘোর আপত্তি উঠল, ব্রাহমনরা তাহলে বসবে না। আমি বললুম বেশ তাহলে বসবে না কিন্তু এ ব্যবস্থা চলবে না, তাতে যাদের জাত যাবে তারা না হয় নিজেদের শুচিতা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন।"[১০]

অন্নদা শঙ্কর রায় কবির একটি আচরণের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রজারা তাঁকে যে সব উপঢৌকন দিয়েছিল, প্রথম দিন তিনি সে সব নিয়েছিলেন, কেননা ওটা একটা প্রথা। কিন্তু পরদিন তিনি সেগুলি ফিরিয়ে দিলেন, কি লজ্জা! আমার পিতার শ্রাদ্ধে আমি নেব তাদের উপহার! এই বলে তিনি তাদের অবাক করে দিলেন। বোধ হয় এমন অপূর্ব উক্তি ভূ-ভারতের কোনো জমিদারের মুখে শোনা যায়নি।[১১]

৯। রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ২৪, পৃঃ ৪২৭
১০। মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১৪২-৪৩।
১১। অন্নদা শঙ্কর রায়, প্রবন্ধ সমগ্র, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১০৮।

জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নির্মম সত্য কথা বয়ান করে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোন যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপুট ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়-এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"[১২]

জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সচিব অমিয় চক্রবর্তী

উপরোক্ত কথাগুলো যে মনের কথা নয়, চমক সৃষ্টির জন্য কথার কথা। কবির জমিদারির এলাকায় এ কথার প্রতিফলন কখনো দেখা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশি ভাগ প্রজা ছিলো পূর্ব বাংলায়। এই পূর্ব বাংলার মুসলমান প্রজাকূল থেকে খাজনা আদায় করে পশ্চিম বাংলার কলিকাতায় শান্তি নিকেতন, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নোবেল প্রাইজ-এর পুরো অর্থও ব্যয় করেছেন বিশ্ব ভারতীতে। কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রজা কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ছিলো একেবারে মুষ্টিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ ছিলো সুবিধাবাদিতা এবং স্বার্থপরতা। যার কারণে স্বদেশী যুগের নেতৃবৃন্দ তাঁকে কখনোই বিশ্বাস করেননি, এমনকি তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

যারা জমিদার রবীন্দ্রনাথকে ভক্তির আতিশয্যে "আত্মার আত্মীয়" বলে অভিহিত এবং দেবত্ব আরোপ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে যুৎসই জবাব দিয়েছেন 'বিক্রম'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মাসুদ মজুমদার। তিনি সাপ্তাহিক বিক্রমে ১২-১৮ মে '৯৮ সংখ্যায় "রাজনীতির হিং টিং ছট" নিয়মিত কলামে লিখেছেন ঃ

কবি রবীন্দ্রনাথের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত হলো। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান বহুমাত্রিক এবং অনন্যসাধারণ। জীবনবোধে ব্রাহ্ম, আচরণে হিন্দু,

১২। কালান্তর, পৃঃ ২৯৪।

অবয়বে জমিদার হলেও কবি প্রতিভা তাঁকে গুরুর মর্যাদা দিয়েছে। 'ঋষী' তাঁর আর এক পরিচয়। নোবেল পুরস্কারের খ্যাতি ও বিশ্বভান্ডারে তার উপস্থিতির সাথে আমাদের ভাষা-সাহিত্যের অহংকার অনস্বীকার্য।

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ঢাকাকেন্দ্রিক জাতি সত্তার বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তার গান 'সোনার বাংলা' আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। অখন্ড ইতিহাসের সাথে এ সংগীত আমাদের বৈপরিত্যকে উৎকটভাবে তুলে ধরে। বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্তত তাই বলে।

আবেগের আতিশয্যে ভরা প্রধানমন্ত্রীর বাণী-বক্তব্য, তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ভাষণ, অপরাপর ভক্তদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে যে দেবত্ব আরোপ করা হয়- তাতে প্রমাণিত হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী রবীন্দ্রনাথ। সেই অর্থে বাঙালীর জনকও তিনি। 'বঙ্গবন্ধু' এবং তাঁর কন্যা ও রবীন্দ্র ভক্তরা তাঁরই অনুপ্রেরণায় পথ চলেছেন, চলছেন। আমার মনে হয় দেবত্ব আরোপের সময় তারা কেউ এ কথাটি ভাবেননি।

যদি ভাবতেন তাহলে আকাশ ও মহাকালস্পর্শী শব্দমালা দিয়ে এতটা দেবত্ব আরোপ করতেন না, সাহিত্যের শাখা-প্রশাখায় তার গর্বিত উপস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইতি টানতেন।

আরেকটি প্রসঙ্গ আমার কাছে অসহ্য। আমাদের দেউলে বুদ্ধিজীবীরা জমিদার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যখন বেশি মাতামাতি করেন তখন ভাবতে কষ্ট হয় শাহজাদপুর, শিলাইদহ, নওগাঁর কুঠিবাড়িতে 'ক্ষুধিত পাষাণের' ভেতর কত না নিপীড়িত প্রজার আহাজারী লুকিয়ে আছে। পূর্ব বাংলার কত সম্পদই না ঠাকুর বাড়ির সিন্দুকে জমা পড়েছে।

আমি একজন মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। কিন্তু কোন জমিদারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাবার প্রশ্নই উঠে না- কারণ পূর্ব বাংলার গণমানুষকে জমিদারী প্রথার নির্মমতা থেকে উদ্ধার করার জন্য শেরে বাংলার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রজাস্বত্ব আন্দোলনের ইতিহাস আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিনের চেয়ে কম প্রোজ্বল নয়।"[১৩]

"যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তরবার
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।
এই বার বীরগণ, কর সবে দৃঢ় পণ
মরণ শয়ন কিম্বা যবন, নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শয়ন,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন!"

-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (পুরুষ নাটক, বিক্রম)

জমিদার ওয়াজেদ আলী খাঁন পন্নী (চাঁন মিয়া)

বৃটিশ বড়লাট (ভারতের) লক্ষ্মৌতে ভারতবর্ষের সমস্ত জমিদারদের এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। জমিদাররা তাদের পাদুকা জোড়া বিছানো কার্পেটের বাইরে রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু জমিদার চাঁন মিয়া পাদুকা পায়ে রেখেই সগর্বে উক্ত সম্মেলনের চেয়ারে গিয়ে বসেছিলেন। তখন বড়লাট বলে উঠেছিলেন, Bravo!. You are the most honourable Zaminder in the sub-continent.

এই জমিদার চাঁন মিয়া পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলমানদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এমনকি প্রজা কল্যাণে নিজের জমিদারী পর্যন্ত দান করে গিয়েছিলেন। অথচ বর্তমান বংশধরেরা তাঁর নামই জানে না। যারা আমাদেরকে কাক-কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন, শূয়োর-ইতর বলে গালি দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ঘটা করে পালন করা হয়; কিন্তু যাঁদের কল্যাণে আমরা 'চাষার বেটা' থেকে 'সাহেবের বেটায়' পরিণত হয়েছি সেই চাঁন মিয়াদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে কোন স্মৃতি বা স্মরণ সভা হয় না। দুর্ভাগ্য এ দেশের! দুর্ভাগ্য এ জাতির

সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ

'দুনিয়ায় এত জায়গায় রবির আলো পড়ে কিন্তু বাংলাদেশের
মুসলমানদের ঘরে সেই আলো পড়েনা।'

-আবুল মনসুর আহমদ

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে না-কি এক সাংবাদিক প্রশ্ন রেখেছিল ঃ বিশ্বে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি কোনটি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, মুসলমান।

পরে আবার প্রশ্ন রেখেছিলেন, উৎকৃষ্ট জাতি?

এর জবাবেও বলেছিলেন, মুসলমান।

অর্থাৎ, একজন নিকৃষ্ট মুসলমান এমন কোন হীন কাজ নেই সে করতে পারে না। আবার একজন সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান জীবন বিপন্ন হলেও সামান্যতম নৈতিকতাবিরোধী কাজ করতে পারে না। সুতরাং দেশে দেশে বহু নিকৃষ্টমানের মুসলমানের অস্তিত্ব যেমন রয়েছে; ঠিক তেমনি উৎকৃষ্টমানের ঈমানদার মুসলমানও রয়েছে। নিরপেক্ষ গবেষকরা বলে থাকেন- রবীন্দ্রনাথ চিরায়ত সাহিত্যে এতো রচনা করেছেন যে, এক জীবনে পড়ে শেষ করা যাবে না। অথচ এই বড় মাপের বিশ্ব কবির হৃদয়টি ছিল সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতায় পরিপূর্ণ। তাঁর বিশাল সাহিত্যকর্মে কিছু নিকৃষ্ট মুসলমানের চরিত্র স্থান পেলেও উৎকৃষ্ট মুসলমানের চরিত্র স্থান পায়নি। সাহিত্যের প্রয়োজনে কিছু নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান চরিত্র এনে উদারতা দেখিয়েছেন বটে; কিন্তু উগ্র হিন্দু চরিত্রের মুখ দিয়ে মুসলমান জাতির প্রতি বিদ্রুপাত্মক ও কুৎসিত সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানের চরিত্র এনে তাদেরকে লম্পট, বর্বর, দুঃশ্চরিত্র, মাতাল ও অত্যাচারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন উঁচু দরের কবি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর রুচিহীন সাহিত্যিকদের ন্যায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে অশালীন, অশোভনীয় ও অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ প্রজা ছিল পূর্ব বাংলায়। আর এর সিংহ ভাগই ছিল মুসলমান গরীব প্রজা। জওহরলাল নেহেরুর লেখায় জমিদার-মহাজন কর্তৃক মুসলমান প্রজাদের শোষণের কাহিনী প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় তা প্রকাশ পায়নি। মুসলমান হবার অপরাধে তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঠিক চিত্র তাঁর লেখায় নেই। তাই প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ আক্ষেপ ও

দুঃখ করে বলেছেন, 'দুনিয়ায় এত জায়গায় রবির আলো পড়ে কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের ঘরে সেই আলো পড়েনা।' তিনি অভিযোগ করেছিলেন, রবি, এত জায়গায় আপনার আলো পড়ে অথচ বাংলাদেশের অর্ধেক জায়গায় আপনার আলো পড়ে না কেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র জীবনে ১২টি উপন্যাস লিখেছেন। ১২টি উপন্যাসের মধ্যে 'গোরা' (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬) ও ঘরে বাইরে ১৯১৬) প্রকাশিত হয়। উপন্যাস তিনটিতে মুসলমান চরিত্র আনা হয়েছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে। এসব উপন্যাসে মুসলমান পরিবার বা সমাজের কোন পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি আঁকা হয়নি। কোন চরিত্রকেও দেয়া হয়নি বিস্তৃত পরিসরে। চারক-বাকর, মাঝি-মাল্লা, ঝগড়াটে লাঠিয়াল, গুন্ডা, ডাকাত, চোর, চামার ইত্যাদি চরিত্রে মুসলমানদেরকে চিত্রিত করেছেন। গোরা, চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে উপন্যাসের চরিত্রে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের উদারতার চিত্র এঁকে নিম্ন অথবা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিয়েই অথবা পাঠানকে সামনে রেখে চাতুর্যতার সাথে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মুসলমান চরিত্রের কলঙ্ক লেপন করেছেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাসের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে তাঁর চাতুর্যতা প্রকাশ পাবে। প্রথমে 'গোরা' উপন্যাস-এর অংশবিশেষ দিয়ে শুরু করছি।

> 'চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীল কুঠির বিরোধের অন্ত নেই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে। কেবল এই চরঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করে বাধ্য করতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের নেতা ফরু সর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিশ ঠেঙাইয়া সে জেল খেটে আসিয়াছে। তার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়। কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানেনা। এবার নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল- আজ মাসখানেক হয় নীলকুঠি ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুট করে। সেই উৎপাতের সময় ফরু সর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন একটা লাঠি বসিয়াছিল যে, ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ফরু সর্দারকে তাই আবার জেলে যেতে হয়েছে। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে তার পরিবার ও গোটা গ্রাম। এই দারুণ দুর্দিনে ফরুর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িইয়াছে এক বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী। হিন্দু ও মুসলমানের জাত ধর্মগত পার্থক্যকে তারা বিন্দুমাত্র বড় করে না দেখে নির্দ্বিধায় বুকে টেনে নিয়েছে ফরু সর্দারের পুত্র তমিজকে। আচারনিষ্ঠ ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে নাপিতের এই কাজ অপবিত্র ও অনাচারমূলক বলে প্রতীয়মান হওয়ায় বিচলিত বোধ করিয়াছে ধর্মপ্রাণ গোরা।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ উপন্যাসে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদেরকে বিদ্রোহী ও উৎপাতকারী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। সবাই ইংরেজ সরকারের বশ্যতা

স্বীকার করলেও চরঘোষপুর গ্রামে অধিবাসী মুসলমান হওয়ায় ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। চরের ফসলকে কেন্দ্র করে নীলকুঠির ম্যানেজারের লাঠিয়ালদের মধ্যে সংঘর্ষে ফরু সর্দার ডান হাতে লাঠির আঘাত পান। পরবর্তীতে চিকিৎসায় তার ডান হাত কেটে ফেলতে হয় এবং জেলে যেতে হয়। এ দুর্দিনে ফরু সর্দারের পরিবারের পাশে স্বজাতীয় কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী। এরা জাত ধর্মগত পার্থক্য মানে না। নাপিত পরিবার ফরু সর্দারের ছেলে তমিজকে আশ্রয় দিয়েছে। এ কাজকে আচারনিষ্ঠ ও রক্ষণশীল হিন্দু সামাজের অধিপতি গোরাকে দিয়ে অপবিত্র ও অনাচারমূলক আখ্যায়িত করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গোরা' উপন্যাসে আরো খিলেছেন-

> 'বিনয় কোন কালে চা খায় না। মুসলমানের তৈরী পাউরুটি বিস্কুট খাওয়াও অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে।'

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন চামড়ার ব্যবসার সাথে যুক্ত অচ্ছ্যুত প্রায় কিছু শ্রমজীবী মুসলমানকে। সনাতম ধর্ম শাসিত হিন্দু পরিবার ও সমাজে তাদের একেবারে অচ্ছ্যুত হিসাবে দেখা যায়। নাস্তিক জগমোহনের হাতে ঘটায় তাদের সামাজিক অমর্যাদার অবসান। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী জগমোহন তাদের দেন জাগ্রত দেবতার মর্যাদা। জগমোহন যখন তার ঘরে এই মর্যাদারিক্ত মুসলমানদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন, তখন তার আচারনিষ্ঠ অনুজ হরিমোহন তাতে আপত্তি জানায়। জগমোহন তখন তাকে পরিহাস করে বলেছেন ঃ

> "ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না, তোমরা যাহাকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়। তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। .....এই চামার মুসলমান আমার দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এক এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহাদের সামনে ভোগ্যের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোন দেবতা তাহা পারে না।"

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান চরিত্রকে আর্থিক বঞ্চনার শিকার এবং পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত করেছেন বটে। কিন্তু পাশাপাশি ডাকাতির মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ জমিদার নিখিলের বিশ্বস্ত কর্মচারী কাসেম সর্দারকে গ্রেফতার করেছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, কাসেমই প্রকৃত দোষী। সান্ত্বনা হিসাবে কবি এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন দরিদ্র মুসলমান প্রজা ও কর্মচারীরা সততা সম্পর্কে জমিদার নিখিলের কোন সন্দেহ ছিল না। তাই কাসেমকে আশ্বস্ত করে সে বলেছে ঃ

> 'কাসেম আমি তোমাকে সন্দেহ করিনে। ভয় নেই তোমার বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটাতে দেবো না।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১টি ছোট গল্পে মুসলমান চরিত্র এঁকেছেন। এখানে মুসলমানদের

সম্মানজনক স্থান হয়নি। কোন মুসলমানের চরিত্র আঁকতে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত চরিত্রই এঁকেছেন। এখানে গল্পের কাহিনীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

মুসলমানীর গল্পটির বিষয়বস্তু হলো ঃ

এক ব্রাহ্মণের ঘরে কমলা নামে সুন্দরী এক কন্যার জন্ম হয়। সে সময়ে কোন ঘরে সুন্দরী কন্যার আগমনকে আপদ বলে বিবেচনা করা হতো। কারণ তারা ডাকাত দস্যু দ্বারা অপহৃত হতো। ডাকাতরা অবশ্য মুসলমান মোল্লার দলভুক্ত ছিল। বিয়ের রাত্রিতে যখন কমলা তারতরির মাঠ দিয়ে শ্বশুরালয়ে যাচ্ছিল তখন মধু মোল্লার ডাকাতদল কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তারা যখন কমলাকে নিয়ে যেতে উদ্যত তখন হবির খাঁ এসে তাদের বাধা দেয়। হবির খাঁর বাধা না মেনে উপায় নেই, কারণ মুসলমানেরা তাকে পয়গম্বরের মত ভক্তি করে। হবির খাঁ কমলার আপত্তি সত্ত্বেও তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়। সে এক নবাবজাদা কোন এক নবাব এর রাজপুতানী ব্রাহ্মণীকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল তার অন্দরমহলে। কিন্তু সে তার হিন্দুত্ব বজায় রাখার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। তার জন্য ভিন্ন মহল, পূজারী ব্রাহ্মণ, শিবমূর্তি, হিন্দু দাস-দাসীর ব্যবস্থা করেছিল। হবির খাঁ নবাবের সে রাজপুতানী রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র। হবির খাঁ মায়ের ধর্ম নেয়নি। কিন্তু মাতৃপূজা অব্যাহত রেখেছেন। সে ভাগ্য বিড়ম্বিত হিন্দু মহিলাদেরকে তার মার স্মৃতি বিজড়িত মহলে স্থান দিয়ে থাকে। হবির খাঁ যে মহত্ত্ব তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তা তার মুসলমান পিতার কারণে নয়। হিন্দু মায়ের কারণে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার ছিলেন এবং নিজে জমিদারী পরিচালনা করতেন। তার প্রজাদের ৮০% ছিল মুসলমান। একই দেশে একই আকাশের নীচে বাস করে সম্ভাব্য সকল রকম শোষণ-পীড়ন, চালিয়েও মুসলমানদের সম্পর্কে কবির পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতাও ছিল। কোন মুসলমান একজনকে যত ভক্তি-শ্রদ্ধাই করুন না কেন, তাকে পয়গম্বর মনে করে না। অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তানদের নাম সব সময়ই অর্থবহ হয়ে থাকে। কিন্তু নবাবজাদা হবির খাঁর নামের অর্থ হয় না। বন্দী বীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "মুসলমানদের যুদ্ধ- ধ্বনি নাকি দিন দিন গর্জন।" মুসলমানেরা দিন দিন গর্জনে যুদ্ধ করে না। তাদের যুদ্ধ ধ্বনি হল "নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর।" এই ধ্বনিকে কবি 'গর্জন' অভিহিত করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছেন। ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। অনেকে মনে করেন তিনি যে মুসলমানির গল্পের খসড়া রচনা করেছিলেন তা যতটা না ছিল তার মুসলিমপ্রীতির কারণে তার চাইতে বেশি ছিল বৃদ্ধ বয়সে ভীমরতির কারণে। তিনি সুস্থ মাথায় দ্বিতীয়বার খসড়াটি পড়ার সময় পেলে হয়তো চূড়ান্ত না করে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতেন।

উল্লেখ্য, এই গল্পটি কবিগুরু ১৯৪১ সালের আষাঢ় মাসে, খসড়া তৈরী করেছিলেন। আর তিনি মারা যান ১৯৪১ সালের শ্রাবণ মাসে। তাই গল্পটি চূড়ান্ত করার সময় পায়নি। পরবর্তীতে সংকলক খসড়া গল্পটি গল্পগুচ্ছে ঢুকিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জীবন ধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু গীতা, উপনিষদের ভক্ত। হিন্দু দর্শনের প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত ভিত্তি তাঁকে মুসলিম বিদ্বেষী করে তোলে। যেমন ঃ

ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহাম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ।"

রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীতে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে- 'দয়া করে হরি জন্ম দিয়েছে নীচ যবনের ঘরে।'

রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্পের শুরুতে রয়েছে ঃ

'আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লাখ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য সেনা। বন্যার মধ্যে একটি অশ্বথ বৃক্ষের মতো হিন্দু বীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু এবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয় ধ্বনির ভূমি শয্যা হইবে এবং আজিকার এই অস্তাচলবর্তী সহস্র রশ্মির সাহিত্য হিন্দুস্তানের গৌরব সূর্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।'

'হর হার বোম বোম' কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসিহস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রি দেবীর কর নিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রু সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইলো? বলিতে পার কাহার প্রতাপে এই অসনি যবন সৈন্য প্রচন্ড বজ্রাহত অরণ্যনীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রনিন্দিত 'হর হর বোম বোম' শব্দে তিন লাখ ম্লেচ্ছ কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সামনে ব্যাঘ্র আক্রান্ত মেষ যুথের ন্যায় শত্রু সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইলো।

দুরাশা তাঁর অপর একটি ছোট গল্প। বদ্রাউনের নবাব গোলাম কাদের খাঁ পুত্রী নুরউন্নিসা ব্রাহ্মণ যুবক সেনাপতি কেশর লালের প্রেমে পাগলপারা। যুদ্ধে কেশব লাল গুরুতরভাবে আহত। পুরুষের বেশে পালিয়ে নুরউন্নিসা কেশরলাল পদপ্রান্তে উপস্থিত। কেশরলাল জল চাইলেন। নুরউন্নিসা গাত্রবস্ত্র ভিজিয়ে তার মুখে জল শিঞ্চন করতে থাকলেন। কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়ে তার পরিচয় জেনে কেশরলাল সিংহের মত গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, বেঈমানের কন্যা বিধর্মী। মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করলি। অতঃপর নুরউন্নিসা যোগীনী সেজে সংস্কৃত ভাষা শিখে ৩৮ বছর কেশরলালের ধ্যান করে তাকে লাভ করতে ব্যর্থ হন। পরে 'নমস্কার বাবুজীর' পরিবর্তে সেলাম বাবু সাহেব বলে তার মুসলমানী পরিচয় তুলে ধরে। এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন সাধ্যমত সাধন ভজন করেও মুসলমানদের হিন্দু সমাজে প্রবেশের আশা দুরাশা মাত্র। তাই গল্পের নাম দুরাশা।

"হিন্দু জাতি অন্য সর্বনাশ সইতে পারে, কিন্তু জাতিনাশ সইবে না"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন একটি ছোট গল্পে। তিনি লিখেছেন ঃ

"এক আধুনিক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান হোটেলে যেয়ে সব রকম খাবার গ্রহণ করতেন, কিন্তু অন্ন নয়, কারণ বাবুর্চির রান্না ভাত তাঁর গলায় নামে না।"

বলা বাহুল্য, হিন্দু জাতিরই এটি সনাতন সংস্কার।

'বিচারক' গল্পে যবনের রক্তে 'পাগল' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"প্রভু কেন আজি কহে রঘুনাথ,
অসময়ে পথ রুখিলে হঠাৎ।
চলেছি যবন করতে নিপাত।
জোগাতে যমের খাদ্য।"

অথচ এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই 'বন্দীবীর' কবিতায় শিখদের ধর্মীয় উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের নিষ্ঠুর এবং রক্ত পাগল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

'হোলি খেলা' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে হীনতার, অরুচির পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। যেভাবে তিনি অত্যন্ত অশোভনীয় ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা তৃতীয় শ্রেণীর কবিকেও হার মানিয়েছে। মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব ও ঘৃণা তাঁর যে কত প্রবল ছিল- এ কবিতায় তা পাওয়া যায়। পাঠান কেসর খাঁর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি এক অবাস্তব কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বকবি জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বসে পাঠান সেনাপতি কেশর খাঁকে একজন কামুক, লোলুপ, লম্পট পুরুষ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি কিরূপ মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন এর কুৎসিত স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর কাল্পনিক 'হোলি খেলা' কবিতার ছত্রে ছত্রে। এই কবিতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

"পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে
কেতুন হতে ভুনাগ রাজার রাণী,
লড়াই করি আশ মিটিছে মিঞা?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানি
পত্র পড়ি কেসর ওঠে হাসি
রঙ্গিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।

পাঠান সাথে হোরি খেলবে রাণী
কেশর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।”
....
শুরু হল হোরির মাতামাতি
উড়তেছে কাক রাঙ্গা সন্ধ্যাকাশে
....
চোখে কোন লাগছে নাকো নেশা
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ
বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরুগুলি
কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি
তেমন করে কাঁকন বাজছে না
....
কেসর কহে “তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা।”
রাণী কহে, “আমারো সেই দশা”
একশো সখি হাসিয়া বিবশা-
পাঠানপতির ললাটে সহসা
মারেন রাণী কাঁসার থালাখানা।
পাঠানপতির চক্ষু হল কানা।
....
বিনা মেঘে বজ্ররবের মত
উঠল বেজে কাড়ানাকাড়া।
....
বাতাস পেয়ে ওড়না গেল উড়ে
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কেরে
বাহির হল নারী সজ্জা ছেড়ে
একশত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।
....

কেতুন পুরে বকুল বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।"

কবির ভাষায় ভারত মুসলমানদের জন্য বধ্যভূমি। এখান হতে আর জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথ 'মনিহার' গল্পে এক মুসলমান মাঝির নামাজ পড়ার দৃশ্য এঁকেছেন এভাবে-

"তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে.... বোটের ছাদের উপরে মাঝি নামাজ পড়িতেছে। পশ্চিম জ্বলন্ত আকাশ পটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় রেখায়, সোনার রং হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আরেক আভায় মিলাইয়া যাইতেছিল। .... মাঝি নামাজ পড়া শেষ করিয়া রন্ধন কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছে।"

পৃথিবীর প্রতিটি অমুসলিম দার্শনিক, চিন্তাবিদ মুসলমানদের নামাজের রীতি-নীতি, পদ্ধতি দেখে এবং মাহাত্ম্য শুনে অভিভূত হয়েছেন। ব্যক্তিগত-সমষ্টিগত কল্যাণ, স্বর্গীয় পবিত্রতা ও সৌন্দর্যবোধ যে নামাজের মধ্যে রয়েছে তা অমুসলিম মনীষীরাও স্বীকার করেছেন। এমনকি গান্ধী-নেহেরুর দৃষ্টিতেও নামাজ সাম্যের, ভ্রাতৃত্বের ও গণতন্ত্রের প্রতীক বলে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় এবাদত নামাজকে নিয়ে কোন মন্তব্য নেই। শুধু মনিহার গল্পে মাঝির নামাজের দৃশ্য সংযোজন করে সান্ধ্যকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র এঁকেছেন মাত্র। এটাকে অনেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইসলাম প্রীতির নমুনা হিসাবেও উপস্থাপন করে থাকেন।

ডঃ আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ উপাসনায় পৌরহিত্যে ও ধর্ম দেশনায় সারা জীবন নিষ্ঠাবান ছিলেন। হিন্দু পুরাণের দেব-দেবী তাঁর চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করেছিল। অধিকার করেছিল তাঁর আবেগের জগৎ। তাই তাঁর জীবন দেবতাও নারী বা দেবী স্বরূপ। তাঁর সাহিত্য চিত্রকলা ও বাক প্রতিমা পুরাণ প্রভাবিত, তাঁর জীবন চেতনা ও জগত ভাবনাও গীতা মহাভারত বলয়ভুক্ত। ... প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত্র, মারাঠা ও শিখ ইতিবৃত্ত উপকথা নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সাড়ে সাতশ' বছরের পুরনো দেশজ কিংবা বিদেশাগত দরবেশ বা শাসক মুসলিমের কোন ব্যক্তিগত কৃতি কিংবা গুণমান- মাহাত্ম্য তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমনকি আকবর বাদশা কিংবা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি-রাজিয়া আনারকলি-নূরজাহানও নন। ছয়শ' বছর ধরে প্রবল প্রতাপ এমন এক বিদ্যা ও বিত্তবান কৃতি-কীর্তি বহুল জাতির বা সম্প্রদায়ের কিছুই তাঁর (তাজমহলই ব্যতিক্রম) আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারেনি, এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল।[১]

১। বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা, উত্তরাধিকার, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৬।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য কবিরা যেখানে গোত্রের বাইরে যেতে পারেননি, নজরুল সাহিত্য সেখানে সর্বত্রগামী, এখানেই নজরুল সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যতা। পারস্যের কোন এক কবি বলেছিলেন, কবির খোঁজ করতে হলে সরাইখানায় নয়। দিনান্তে তার তাঁবুতে খোঁজ করো, কবির দেখা পাবে। পৃথিবীর কোন কবিই তাঁর সম্প্রদায়ের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। এমন যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ তিনিও আপন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে এসে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায়ের তাঁবুর খোঁজ নিতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই বোঝা যায়, ফারসী কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প বয়সেই ঘটেছিল। কিন্তু শেখ সাদীর কবিতা অনেককে অভিভূত করলেও বিশ্ব কবিকে অভিভূত করতে পারেনি। এটা ছিল বিশ্বকবির মনের সংকীর্ণতা এবং শেখ সাদীর প্রতি চরম অবজ্ঞা।

শেখ সাদী'র কবর দেখতে যাবার সময় তিনি কবি সম্পর্কে একটি মন্তব্যও করেননি। সাহিত্যিকদের মতে, সাদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত কবিতার প্রতি কোন আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথের ছিলো না। 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথকে সাদীর সমাধি প্রাঙ্গণে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। অথচ শেখ সাদীর কোন কবিতা নিয়ে কোন মন্তব্য পারস্যযাত্রী গ্রন্থে নেই। অনেকের ধারণা যে, শেখ সাদীর ফার্সী কাব্য-কবিতার সাথে রবীন্দ্রনাথের কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো না। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পারস্য ভ্রমণকালের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌঁছেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাবরসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক, তার বাণী সকল মানুষের। আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।"

কবি হাফেজের কবর দেখতে যাবার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন- "অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম, পিতার তীর্থস্থানে আমার মানস অর্ঘ্য নিবেদন করতে।"[২]

.....১৭ই এপ্রিল (১৯৩২) আজ অপরাহ্নে সাদী'র সমাধি প্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনা সভা।.... চা খেয়ে গেলেম সাদী'র সমাধি স্থানে। পথের দুই ধারে জনতা। কালো কালো আঙরা খায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা. মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের পোষাক য়ুরোপীয়, কচ্চিৎ দেখা গেল পাগড়ী ও লম্বা কাপড়।....
সাদী'র সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েছে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাৎ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভায় গিয়ে আসন নিলুম। চত্বরের সামনে সমুচ্চ প্রাচীর অতিসুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারস্যযাত্রী' পৃঃ ১০৯।

হয়েছে, মেঝের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তর, সূর্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ওপারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেছে- অধিকাংশই কালো কাপড়ে আবৃত স্ত্রী লোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।....

কবি হাফেজের সমাধি পরিদর্শন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবরণ হলো ঃ

'অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরুলুম, পিতার তীর্থ স্থানে আমার মাস অর্ঘ নিবেদন করতে। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চল্‌ছে পুরানো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই করা জালির কাজের একটা মন্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিশ-রাজত্বের-অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধি রক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ্। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চক্ষু বুজে এই গ্রন্থ্ খুলে যে কবিতাটি বেরুবে তা থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্ণরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিলো। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরুল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানী ও কয়কনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দীষ্ট হয়।

প্রথম অংশ। মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে সে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ ঃ স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিক নামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে, তবে ভরসা রেখো মনে, ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌছল, এখানকার এই বসন্ত প্রভাতের সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্ত দিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দু'জনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজাল আমাকে বাঁধতে পারেনি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত শত বৎসর পরে জীবন মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে (ফিরে) এলুম।....[৩]

সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা

৩। 'পারস্য', রবীন্দ্র রচনাবলী ২২শ খন্ড, পৃঃ ৪৫৮-৬১, ৫১৩।

জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্য নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে।

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'আলো পাব কী উপায়ে' তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে .... কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে। সেই সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজ বুদ্ধি, তারা বলে দরজা খুলে দাও। ভালো হও ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হলো পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচার বিচারের কড়াকড়ি সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উদ্যম ফুরোয়নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিলো না।[৪]

[পূর্ণ সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থের যথাস্থানে দেয়া হয়েছে]

আমি রাজাকে জানালুম তাঁর রাজত্বে সম্প্রদায়বিরোধের হিংস্র অসভ্যতা এমন আশ্চর্য শৌর্যের সঙ্গে উন্মূলিত হয়েছে, আজকের দিনে এইটেতে আমি সকলের চেয়ে মুগ্ধ। একবার যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন, এই আকাঙ্ক্ষা আমি তাঁকে নিবেদন করলুম। তিনি বললেন, পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করতে যাবার পূর্বে নিশ্চয় তিনি যথাসম্ভব এশিয়ার পরিচয় নিয়ে যাবেন।

শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুম। এ কথা সকলের মুখে শুনি, রাজা বিদ্বান নন, য়ুরোপীয় কোনো ভাষাই তাঁর জানা নেই, পারসিক ভাষা লিখতে পড়তে পারেন, কিন্তু ভালোরকম নয়। অর্থাৎ তাঁর বুদ্ধিশক্তি বিচারশক্তি বইপড়া বিদ্যার অনেক উপরে।

পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-উপলক্ষে উপহারস্বরূপে আমার নিজের কতকগুলি বই রেশমের আবরণে প্রস্তুত করা ছিল। সেই সঙ্গে নিজের রচিত একটি চিত্রপটে পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাংলা কবিতা ও তার ইংরেজি তর্জমাটি লিখে দিয়েছিলুম-

আমার হৃদয়ে অতীত স্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা-ধরানো কালের পরশ
বাঁচোয়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জ্বেলেছ নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো-
এসেছি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারস্য যাত্রী, পৃঃ ১১০, ১১১)

৫ই মে তেহরানের জনসভায় আমার প্রথম বক্তৃতা। খানিকটা আমি ইংরেজিতে বলি, তার পরে তার তরজমা হয় পারসিতে, এই রকম দু-রঙা দু-টুকরো তালি দেওয়া আমার বক্তৃতা।[৫]

রবীন্দ্রনাথকে পারস্যে যে বর্ণাঢ্য রাজকীয় সম্বর্ধনা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো

৪। পারস্যে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২শ খন্ড, পৃঃ ৪৮৪।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারস্য যাত্রী, পৃঃ ১১০, ১১১, ১১২)।

হয়েছে তা অতুলনীয়। কবিকে তাঁরা যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন একজন কবি হিসেবে; কোন ধর্মের কবি হিসাবে নয়। রবীন্দ্রনাথ পারস্য থেকে ফিরে এসে ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতা নিয়ে 'পারস্য যাত্রী' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থের কিছু কিছু স্থানে এমন মন্তব্য ও বক্তব্য রেখেছেন তা কোন ভদ্রতা, সৌজন্যতা ও উদারতার পরিচায়ক নয়। ইশারা-ইঙ্গিতে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা রেখেছেন। বাজে মন্তব্য, উপহাস-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করেছেন। তাঁদেরকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ বলে অভিহিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

তিনি একজন মোল্লার (তাঁর ভাষায়) প্রশ্নের জবাবে ঘরের সব জানালা খুলে দিয়ে আলো আসার সুযোগ দেয়ার নসিহত করেছেন। সেই আলোতে সত্যকে জানার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তাঁর সাহিত্য কর্মে সব জানালা কি খোলা ছিলো? জবাব একটাই। 'না'। সেখানে শুধু পৌত্তলিকতা ও বহুত্ববাদীই স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চৌহদ্দিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ধর্মের স্থান পেলেও ইসলাম ধর্ম ছিলো একেবারে নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ ঘটেনি। কারণ তিনি মুখে উদারতার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনটা ছিলো সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ। কারণ সেখানে হিন্দু ধর্মের জানালা খোলা রাখলেও ইসলামের জানালা ছিলো বন্ধ। ইসলামের আলো রবীন্দ্র ঘরে প্রবেশ করেনি। সেই আধো অন্ধকারে বসে তিনি অসত্যের অসুন্দরের পূজা করেছেন। সত্য ও সুন্দরের পূজা করার ভাগ্য তাঁর কপালে জুটেনি। তাই দেখা যায়, হিন্দুকূলোদ্ভব রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসন-কোণে
ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকিস রাখিস আপন মনে
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিকল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাঙ্গনে পৌত্তলিকতার দ্বার বা জানালা উন্মুক্ত থাকলেও ইসলামের দ্বার ছিলো একেবারে রুদ্ধ। মানবতার মহান ধর্ম ইসলামের আলোয় আলোকিত হতে পারেনি তাঁর সাহিত্যকর্ম। কিন্তু নজরুলের দ্বার ছিলো সর্বধর্ম, সর্ব মতের জন্য উন্মুক্ত। তাই নজরুল লিখেছেন ঃ

"রসূল নামের ফুল এনেছি যে
আয় গাঁথবি মালা কে?
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাতালাকে।।"

পাশাপাশি তিনি লিখেছেন ঃ

“করবো মায়
ডরবো কায়?
ধরবো পা'য় কার সে আর
বিশ্ব-মা'ই পার্শ্বে যার।

....

ঘরে ঘরে আজি দীপ্ জ্বলুক
মার আবাহন গীত চলুক। (আগমনী)
দেখ মা আবার দনুজ-দলিনী
আশিব-নামিনী চন্ডী-রূপ
ইত্যাদি।

(রক্তাম্বর ধারিনী মা)

সুতরাং নজরুলের সাহিত্যের দ্বার বা জানালা ছিলো সবার জন্য উন্মুক্ত। তাঁর সাহিত্যে ঘরের জানালা দিয়ে মুসলমানদের আলো-বাতাস যেমন প্রবেশ করেছে, ঠিক তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের আলো-বাতাসও প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। উন্মুক্ত আলো-বাতাসে সাহিত্য চর্চা করেছেন বলেই তিনি ছিলেন আকাশের মতো উদার; সাগরের মতো বিশাল। তাই ধর্ম-বর্ণ সকলের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার কথা সমভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর সাহিত্যের পাতায়। আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ঘরের জানালা সবার জন্য উন্মুক্ত না থাকার কারণে আধো আলোতে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। সে আলো তাঁকে সত্যের ও সুন্দরের সন্ধান দিতে পারেনি। যে নিজেই আলো থেকে বঞ্চিত, সে অন্যকে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান কখনো দিতে পারে না। অথচ তিনি পারস্য গিয়ে তাদেরকে ঘরের সব জানালা খুলে দেয়ার নসিহত করে এসেছেন। হাস্যকর কথাই বটে!

পারস্যের 'মোল্লারা' আমাদের দেশের 'মোল্লাদের' মতো অর্ধশিক্ষিত বা অগভীর শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। তাঁরা ইসলামী ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। (আর রবীন্দ্রনাথের কাছে অগাধ পান্ডিত্যের মাপকাঠি হলো কলকলিয়ে ইংরাজী বলা ও জানা) বৃটিশের কুশিক্ষা নীতির কারণে আমাদের দেশের মোল্লাদের নাস্তানাবুদ করতে পারলেও সে দেশের মোল্লাদের নাস্তানাবুদ করা এতো সহজ নয়। কারণ ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; সমগ্র বিষয়ে এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। কাজেই এই দর্শনে যারা অগাধ পান্ডিত্য রাখেন তাদেরকে তর্কে হারানো কখনোই সম্ভব নয়। কারণ সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার কখনো এক হতে পারে না। সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আলোর উপস্থিতিতে অন্ধকার বিদূরিত হতে বাধ্য। কাজেই

পারস্যে গিয়ে বোধ হয় একজন ইসলামী বিশেষজ্ঞের (তাঁর ভাষায় মোল্লা) পাল্লায় পড়ে নাস্তানাবুদ হবার উপক্রম হয়েছিলো। পাণ্ডিত্য জাহির করতে ব্যর্থ হয়ে নিজকে ভরাডুবি হতে রক্ষা করতে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে "..... মোল্লাদের তর্কের শেষ নেই" বলে কেটে পড়েছেন। যদি তিনি সেখানে মোল্লাদের নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম হতেন তাহলে তাঁর কৃতিত্বের জন্য "পারস্য যাত্রী" বইতে সগর্বে তা প্রচার করতেন।

পারসিকরা ইংরেজী জানে না বলে রবীন্দ্রনাথের প্রভু ইংরেজদের ন্যায় বিদ্যান ও সভ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তৃতা তরজমার মাধ্যমে প্রচার করায় ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাদের শিল্পকর্মে যে রুচিবোধ, সৃষ্টিশীলতা, মননশীলতা সৌকর্যের ও সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর দেখে বিশ্ববাসী প্রশংসা কুড়ালেও রবীন্দ্রনাথকে ততোটা আকৃষ্ট বা অভিভূত করতে পারেনি। মুখ রক্ষার জন্য কিছু কিছু শিল্পকর্মের প্রশংসা করা হয়েছে বটে; কিন্তু 'পারস্য যাত্রী' গ্রন্থে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে মনে হয় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পারস্যের শিল্পকর্ম দেখিয়েছে।

কে না জানে, শেখ সাদী'র রচনা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও প্রশংসিত। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "ফরাসী কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প বয়সেই ঘটেছিল।" এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি ফারসী পড়তে ও বুঝতে পারতেন। পড়তে ও বুঝতে পারা সত্ত্বেও শেখ সাদী'র কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বিশ্বের অগণিত কবিতা প্রেমিক ও কবিকে শেখ সাদী'র কবিতা অভিভূত করলেও এই বিশ্বকবিকে অভিভূত করতে পারেনি। এটা ছিলো বিশ্ব কবির মনের সংকীর্ণতা এবং শেখ সাদী'র প্রতি চরম অবজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্ম-অহংকারী একজন কবি। তাঁর অহমিকা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছে সোনার তরী কবিতায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই
ছোট এই তরী
আমারি সোনার ধানে
ভরিয়া গিয়াছে তরী।"

অর্থাৎ সৃষ্টি দিয়েই এই পৃথিবী ভরে গেছে। সেখানে আর কারো স্থান নেই। দাম্ভিবতা আর অহংকারবোধ আর কাকে বলে!

মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের বিদ্বেষ ভাব, হিংসা, হানাহানি ও সংঘর্ষে মহাকবি ইকবালের হৃদয় বিষিয়ে উঠেছিলো। মুসলমানেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। এই আত্মঘাতী বিরোধের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মহাকবি ইকবাল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লিখেছিলেন ঃ

"আঙিনা ভাগ করা ছাড়া ভারত উপমহাদেশের শান্তি-শৃংখলা অব্যাহত রাখার ও ভারতীয়

মুসলমান জনসমাজকে এবং ইসলামের বিরাট অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার আর কোন পথ নেই।"

এর জবাবে ৭ জুলাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম ছাত্র সমাজ এবং কবি ইকবালকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় বলেন-

"ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান,
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তানে?"[৬]

অবশ্য মহাকবি ইকবালের মৃত্যুতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবিস্মরণীয় শোকবাণী দিয়েছিলেন। তিনি শোকবাণীতে বলেছেন ঃ

"বিশ্ব সাহিত্য দরবারে ভারতবর্ষের স্থান অতি নগণ্য। এ অবস্থায় স্যার ইকবালের মত বিশ্ব সমাদৃত কবিকে হারানো ভারতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে ভারত ও বিশ্ব সাহিত্যের সাহিত্যিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো অদূর-ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হওয়া কঠিন।"

এছাড়া রবী ঠাকুরের আরেকটি পত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। এটি লিখেছিলেন ইকবালের রচনাবলীর মুখবন্ধে হায়দরাবাদে ডঃ মুহাম্মদ আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"ইকবালের কাব্য যে খ্যাতি অর্জন করেছে তা বিশ্ব সাহিত্যে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। কোন কোন সমালোচককে আমার ও ইকবালের কাব্যের তুলনামূলক বিচার করতে দেখে আমি সত্যিই দুঃখিত। সাহিত্য কাল ও সময়ের উর্ধ্বে...... আমার আরও বিশ্বাস, আমি এবং স্যার মুহম্মদ ইকবাল সত্য ও সুন্দরের দু'জন সেবক। আর আমরা সেই সীমায় যেয়ে মিশে যাই, যেখানে মানবের চিত্ত ও মস্তিষ্ক বিশ্ব মানবের দরবারে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর উপহার এনে উপস্থিত করে।"

এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতার ভাষায় একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"হায় ওরে মনিব হৃদয়
বার বার
কারও পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়
নাই নাই
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে
এক হাটে লও বোঝা শূন্য করে দাও অন্য হাটে।"

৬। আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৪৩।

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি ইকবালকে লক্ষ্য করেই যে কবি রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

প্রখ্যাত লেখক আব্দুল ওয়াদুদ বলেন ঃ

মাওলানা যিয়াউদ্দিন ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো মুসলিম মনীষীর সাথে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল; ইসলাম ও মুসলমান সমাজের সদর-অন্তর সব কিছু ছিল তাঁর নখ দর্পণে। এ ছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল সাদী, রুমী, জামী, হাফিজের কাব্য-সাহিত্যের সাথে। তিনি পারস্য দেশও সফর করেছিলেন এবং সে দেশের বিগত মুসলিম সাধক ও মনীষীদের সম্পর্কে জ্ঞানও আহরণ করেছিলেন। তবুও ইসলামের কোন মহৎ শিক্ষা, মুসলমান সমাজের কোনও মহৎ ব্যক্তিত্ব, কোন চিত্র বা চরিত্র তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর কবি মানসকে উদ্বুদ্ধ করেনি কবিতার বাণী মূর্তিতে বিকশিত করতে। হিন্দু ও বৌদ্ধের কতো অজ্ঞাত অশ্রুত পৌরাণিক কাহিনী, শিখ, মারাঠা, রাজপুতের কতো উপকথা বাণী মূর্তি পেলো তাঁর কথা ও কাহিনী, তাঁর বিপুলাকার কবিতা কর্মে, শুধু বেড়ার পাশের মুসলমানই রয়ে গেল অপাংক্তেয় ও উপেক্ষিত, ইসলামই রয়ে গেল তাঁর কবিতার ভাষায় অনুচ্চারিত ও অবজ্ঞাত।[৭]

বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য রচনা রয়েছে। কিন্তু তাঁর বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারে 'ইসলাম ধর্ম' ও 'বিশ্বনবী' হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কোন রচনা নেই। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশেষ দিনগুলোতে বিধর্মীয় শাসকেরা গতানুগতিকভাবে কিছু বাণী দিয়ে থাকেন। ঠিক সে-ভাবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে সারা জীবনে তিনটি বাণী দিয়েছিলেন। এই বাণী তিনটি প্রচারিত হয়েছিল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের শেষ দিকে। প্রথম বাণীটি দিয়েছিলেন ১৯৩৩ সালের ২৬শে নভেম্বর। ঐ দিন পয়গাম্বর দিবস উপলক্ষে বোম্বাই শহরে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভাতে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন।

স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। এ বাণীটি ১৯৩৪ সালের ২৫শে জুন কলকাতা বেতার থেকে সম্প্রচারিত হয়।

তৃতীয় বাণীটি দিয়েছিলেন নয়াদিল্লীর জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত পয়গাম্বর সংখ্যায় ১৯৩৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। শান্তি নিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা বাণীটি পাঠিয়েছিলেন।

লেখক-অনুবাদক সৈয়দ মুজিবউল্লাহ বলেছেন ঃ

"মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী শান্তি নিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার লেখায় ইসলাম ও বিশ্বনবী সম্পর্কে কোন কথা নেই কেন? উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'কুরআন পড়তে শুরু করেছিলুম, কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেনি। আর তোমাদের রসূলের জীবন চরিতও ভাল লাগেনি।'[৮]

৭। আবুল ওয়াদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৯৩।
৮। সৈয়দ মুজিব উল্লাহ, বিতন্ডা, পৃঃ ২২৯।

বিশ্বের মহান ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের জীবন চরিত সমালোচনার জন্য হলেও আংশিক বা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে এসব মনীষীরা সমালোচনা তো দূরে থাক পবিত্র কোরআনকে মানবজাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক এবং কোরআনের অনুশাসনই একমাত্র সত্য বলে অভিহিত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, একজন সফল বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক, আইনবিদ, যোদ্ধা, সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান 'ইসলাম'-এর প্রবর্তক বলে ঘোষণা করেছেন। এমনকি তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেউ নেই বলেও স্বীকার করেছেন। আর লিউ টলস্টয় তো সারা জীবন বিশ্ব নজির The Sayings of Prophet (SM) গ্রন্থখানা সব সময় পকেটে রাখতেন এবং সুযোগ পেলেই পাঠ করতেন। মৃত্যুর পরও এ গ্রন্থখানা তাঁর বুক পকেটে পাওয়া গিয়েছিল। অথচ নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিশ্বকবি পবিত্র কোরআন পড়বার সুযোগ দীর্ঘ জীবনে পাননি। বিশ্ব নবীর চরিত বিশ্ব কবির ভালো লাগেনি। এর পরও বাম ও বামপন্থী রবীন্দ্রপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথের কিছু উপন্যাস ও ছোট গল্প থেকে মুসলিম চরিত্রের উদাহরণ টেনে বিশ্ব কবির ইসলামী চেতনার উন্নাসিকতায় মাঝে মাঝেই পত্র-পত্রিকায় ডুগডুগি বাজায় এবং রবীন্দ্রনাথের মুসলিম-প্রীতি রয়েছে বলে আনন্দে আহলাদিত হয়। এসব বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে দৈনিক মিল্লাতে উপ-সম্পাদকীয় কলামে বেশ কয়েক বছর আগে প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলামিস্ট ওসমান গনি লিখেছিলেন ঃ

> শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামাজ পড়তেন, ঈদের নামাজ পড়ে এসে নিজ হাতে গরু কুরবানি করতেন এবং তিনি হজ্বও করেছিলেন, বাংলাদেশের অন্ধ রবীন্দ্রভক্তদের এখন শুধু এইটুকু প্রমাণ করতেই বাকি আছে।
>
> এখানকার মুসলমানদের কাছে তাদের 'গুরুদেব' বাবুকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ইদানীং তারা যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাতে হঠাৎ কোনও দিন তারা যদি ঘোষণা করে বসেন যে, সাম্প্রতিক গবেষণায় তারা ঐ তথ্য আবিষ্কার করেছেন তাহলে তা খুব বিস্ময়কর হবে বলে মনে হয় না। আর এ কথাতো সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ সুন্নতি লেবাস পরতেন, মুখে দাড়ি রাখতেন এবং মাথায় টুপি পরতেন। সুতরাং এইসব নজির গবেষণালব্ধ তথ্যের পোষকতায় ব্যবহার করে তারা অতি সহজেই তাদের বক্তব্য জোরদার করতে পারবেন। এই সম্ভাবনা আমার কাছে অন্তত খুব অলীক বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, মাত্র কিছুদিন আগে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে প্রথমবারের মত সরকারী উদ্যোগে যে রবীন্দ্র মহোৎসব হয়ে গেল সেখান থেকে ফিরে এসে ঢাকার একখানি বহুল প্রচারিত প্রায় ধর্মনিরক্ষে দৈনিকের একজন বিদ্বান কলামিস্ট লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ছিলেন না, তিনি ছিলেন তৌহিদবাদী ব্রাহ্ম। তৌহিদবাদী মুসলমানের কাছে পৌত্তলিক হিন্দুর চেয়ে তৌহিদবাদী ব্রাহ্ম অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য, স্পষ্টতঃ এই আশাতেই কলামিস্ট সাহেব ঐ তুরুপের তাস মেরে দিয়েছেন।.... কোন মুশরিকরা যে আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'মুসলিম বেশে কোলাহল' করছে তাদের সনাক্ত করতেও আশা করি তাদের তেমন তকলিফ হবে না। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বানিয়ে গৃহকোণে বসিয়ে কেউ যদি গৃহদেবতা হিসাবে তার পূজা-অর্চনা করতে চান

এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পাদোদক পান করে মহাপুণ্য অর্জন করতে চান, তাহলে কেউ তাতে আপত্তি জানাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তেত্রিশ কোটি ব্রাহ্মণ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যারা লা শরিক আল্লায় বিশ্বাসী তৌহিদবাদী মুসলমান হিসাবে প্রমাণের চেষ্টা করছেন, তারা নিজেরা মুসলমান হয়ে থাকলে নিজেদের ঈমান-আকিদাই শুধু বরবাদ করছেন না, এই দেশে রবীন্দ্রনাথের দাফন কাফনের বন্দোবস্তও পাকাপোক্ত করে ফেলছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবন থাকলে অনুমান করি তার এইসব অন্ধ ভক্তদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতেন।[৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চল। মুসলিমদের মানবিক আচরণে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলিমদের সপক্ষ শক্তি ছিল। এই দুই সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ কল্পে বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের কলির দেবতা ইংরেজদের দিয়ে পলাশীর যুদ্ধের ১০/১২ বছর পর যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, সে মহাদুর্ভিক্ষে ১৭৭০ সালে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মারা যায়। এই এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ। এ দুর্ভিক্ষ উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরও কেশাগ্র স্পর্শ করেনি। অথচ তথাকথিত রবীন্দ্রান্ধদের মানবতার কবির কোথাও এ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কোন কবিতা নেই। তাই বলতে হয়, অতি চমৎকার তাদের রবীন্দ্রান্ধতা, অতি চমৎকার তাদের মানবতার খেতাব।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রথমে 'মুহম্মদী তরিকা'র আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম-বিরুদ্ধ আচরণসমূহ নির্মূল করতে তৎপর হন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে নবলদৃপ্ত শিখ-শক্তি মুসলমানদের আযান দেওয়া, ঈদের জামাত করা, গো-জবেহ করার বিরুদ্ধতা করতে থাকে। বাংলাদেশেও হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তিতুমিয়া হিন্দু জমিদারের হাতে প্রবল বাঁধা পেয়েছেন মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার কর্মে। মুসলমান প্রজাকে হিন্দুর পূজা-পার্বনে নিয়মিত চাঁদা দিতে বাধ্য করা হতো, স্কুল-কলেজে সরস্বতীর পূজা করা হতো হিন্দুর ধর্মীয় উৎসব হিসাবে এবং মুসলমান ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা দিতে হতো, অথচ মুসলমান ছাত্ররা 'মিলাদুন্নবী' করতে চাইলে অনুমতি মিলতো না। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমান ছাত্রদের সংগে এক বেঞ্চে বসতেও ঘৃণা প্রকাশ করে কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেছিল, 'মহাশয় আমরা মুসলমান ছাত্রদের নিকট বসিতে পারিব না; কারণ তাহাদের মুখ হইতে বড় পেঁজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।' বিষয়টির সহজ মীমাংসা করেন অধ্যাপক হরিশচন্দ্র কবিরত্ন মুসলমান ছাত্রদের বাম বেঞ্চে বসার ব্যবস্থার করে।[১০]

প্রত্যেক সরকারী কর্মের উদ্বোধন হতো বৈদিক কণ্ঠপাঠ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্মত

৯। দৈনিক মিল্লাত, ৯/৭/৯০।
১০। প্রবাসী, ১৩৩২ কার্তিক, পৃঃ ৪৮।

আচার-অনুষ্ঠানের। মুসলমান ছাত্রদের বাধ্য করা হতো 'বন্দে মাতরম' গান করতে এবং গান্ধীর ফটো পূজা করতে।

এক সময় অধ্যাপক আঃ হাইকে লক্ষ্য করে হিন্দু অধ্যাপকেরা বলতেন ঃ

'এসব চাষার ব্যাটারা টাই ঝুলিয়ে কলেজে মাস্টারী করতে এসেছে।'

হিন্দু নেতারা মুসলমানদিগকে বলতেন ঃ

'মুসলমান ইনসান হো তো জানোয়ার কৌন হো'।

অর্থাৎ, মুসলমানরা মানুষ হলে জন্তু কে? বাংলার মুসলমানদের কোন কালচার নেই, আছে এগ্রিকালচার। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন লাইভস্টক। তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধিতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এলাকায় মুসলমান প্রজাদের গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কাত্যায়নী পূজার চাঁদা মুসলমান প্রজাদের দিতে বাধ্য করেছিলেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পূজারী' কবিতায় স্পষ্টভাবে তাঁর অবস্থানের কথা উচ্চারণ করে লিখেছেন-

"বেদ ব্রাহ্মণ-রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।"

এই কবিতা তৎকালে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদেরও বিদ্যালয়ে হেলে-দুলে মুখস্থ করতে হতো। তা সত্ত্বেও এইসব হিন্দু মনীষীর সাহিত্য কর্ম পড়ে আমাদের কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকেরা বিব্রতবোধ করেন না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক আখ্যায়িত করার দুঃসাহস দেখান না। তাদের সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে কুসংস্কার ও পুরানো বাজে কথা বলে উপহাস-বিদ্রূপ করেন না। এইসব লেখককে বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বলে মনে হয় না। হিন্দু ধর্মীয় অন্ধ হিসাবে তাদেরকে আখ্যায়িত হতে হয়নি আমাদের দেশের অধ্যাপকদের দৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথ নিজকে নিরাকার একত্ববাদে বিশ্বাসী জাহির করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত কাব্য ও দর্শনের উৎসমূল ছিলো উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস থেকেই তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, দ্রোপদী, অহল্যা, উর্বশী, মেনকা, শিবাজী সবই যেমন সাম্প্রদায়িক। অথচ 'উর্বশী' বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে বিবেচিত। হোমার, ভাজিল, কালিদাস, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম, শেক্সপীয়র সবার ব্যাপারেই একথা নিতান্ত সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে এমনটি বলা যাবে না। কারণ, তিনি তাঁর ধর্মবোধের বাইরে এক চুলও বিচরণ করার ব্যাপারে ছিলেন কৃপণ।

অনেকে বলে থাকেন, 'রবীন্দ্র সাহিত্য' যারা অধ্যয়ন করে না তারা সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, মৌলবাদী, সংকীর্ণমনা ও মূর্খ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এ

কথাগুলো অতি রবীন্দ্রভক্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে কবি বলে থাকেন-

"বেদ-ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে আর পূজা পরিবার।"

সে কবির সমর্থকেরা যতো বড় পন্ডিতই হোন না কেন তাদেরকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন শিক্ষিত মূর্খ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

জীবন সায়াহ্নে এসে কবি রবীন্দ্রনাথ কিছু সত্য কথা বলেছেন এবং মুসলমানদের প্রতি যে অবহেলা ও অবিচার করা হয়েছে এর জন্য অনুশোচনামূলক বক্তব্য রেখে গেছেন তাঁর কবিতায় ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে। ১৯৪১ সালের ২১ জানুয়ারী লিখিত 'ঐক্যতান' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমি বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অকপট সাধুতায় তাঁর কবিকর্মের সফলতা এবং বিফলতাকে স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই কবিতা রচনার দশ বছর চার মাস আগে, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।" (রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৫৯)।

এ থেকে অনেকে মনে করেন 'ঐক্যতান' কবিতা কবির আত্মসমালোচনা। এর আগে ১৯৩৩ সালে তিনি 'কালান্তর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কি, তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেই জন্য যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেইসব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। ... রচনায় কোন অংশ সূক্ষ্ম, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্টা তৎসাময়িক, কোন্টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই।"[১১]

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুটা সাম্প্রদায়িক প্রভাবও কাটিয়ে উঠতে পেরে মুসলমান জাতির বৈশিষ্ট্য ও অধিকার উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের প্রকৃত চরিত্রও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়।

উল্লিখিত তথ্যে যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব দেখা যায়, তেমনি আবার তাঁর

১১। কালান্তর, পৃঃ ৩৩৭-৩৮।

ভাষাতেই তিনি লিখেছিলেন ঃ

"হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিস্তার নেই।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন ঃ

"তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণ্য করিবার তো কোন বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতি-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন ঃ

"আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই, অতএব, তাহারা আমাদের হিতৈষীতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না।"

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য। আর হিন্দুদের 'গোরক্ষা-কে সমানে রেখে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ইংরেজদের কারসাজি। .... আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোক জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরুক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার কোন প্রমাণ নাই। ...... স্বদেশী যুগে আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না....। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোন দিন হৃদয়কে এক হতেই দিই নাই।" এদিকে একটা প্রকান্ড বিচ্ছেদের খড়গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কতশত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান এই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি তথাপি আরও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। গোড়া হইতে ইংরেজের স্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতার চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। .... এইটুকু (পার্থক্য) কোন মতেই না মিটিয়ে গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না।"[১২]

এক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের দারুণ ভক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্ধভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, যা অন্য কোন কবি লেখককে দেননি। রবীন্দ্রনাথ

১২। রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খন্ড, ৬২৮-২৯ পৃঃ।

ঠাকুর কট্টর সাম্প্রদায়িক লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ', 'সাহিত্যে কর্মযোগী', 'সাহিত্যে মহারথী', 'ভগীরথের ন্যায় সাধনাকারী', 'বাংলা লেখকদিগের গুরু' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। এ ছাড়া এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গানটিও ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুবই প্রিয়। এই গানটি কবি নিজেই সুর করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছেন। পরবর্তীতে এই গানটি যখন কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসাবে মনোনীত করার প্রস্তাব ওঠে মুসলমানরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বুঝলেন যে, মিলিত হিন্দু-মুসলমান সকলে এই গানকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না, তখন কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বয়ং আপত্তি করেছিলেন যাতে ওটা জাতীয় সঙ্গীত না হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই অধিবেশন কলিকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই সভায় সভাপতি ছিলেন রহমতুল্লাহ।

"..... সমগ্র 'বন্দে মাতরম' গানটি কংগ্রেসের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে সর্বজাতির গ্রহণীয় নয় বলে মত প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ উগ্রপন্থীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরমের' প্রথম স্তবক কংগ্রেসে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয় (১৯৩৭)"।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ইংরেজকে যে তিনি মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজের বিচার মানেই অবিচার, আর হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নেতৃত্ব ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ আগস্ট 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক নিজের লেখা যে প্রবন্ধটি কবি কলিকাতার টাউন হলে পড়েছিলেন, সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন ঃ

"দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব- তাঁহাদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব- তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ আরও বুঝতে পারলেন এবং অকপটে তা স্বীকার করে তাঁর নিজের ভাষায় বললেন ঃ

".... একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খন্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতার একই সমচেষ্টায় মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।"[১৫]

১৯২০-২১ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও

১৩। ডঃ এম মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, পৃঃ ২৬৯, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবন কথা, পৃঃ ২৬০-৬১।

১৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৬১২।

১৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৫০২।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বুঝেছিলেন যে, ঐ মিলন স্থায়ী হবে না। কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্র মুসলমানদেরকে উন্নতির ধাপ হতে চরম অবনতিতে নামানো হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' নামে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন, "হিন্দু-মুসলমানের 'মিলন' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' প্রয়োজন আগে।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের শক্তি এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা অনুভব করে লিখেছেন ঃ

"বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশী। সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে....."[১৭]

ডাঃ কালিদাস নাগ বিলেত থেকে পত্র মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন- "হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কি?" সেটা ছিল ১৯২২ সাল। পত্রোত্তরে কবি লিখেছিলেন ঃ

"খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু। সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজেরে বেড়া তুলে রেখেছে...। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মত মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছুই নেই।"

চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেন ঃ

"আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"[১৮]

আজ থেকে আটান্ন বছর আগে ১৩৪৬ সালের ২৫শে বৈশাখ (অক্টোবর ১৯৩৯) 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় ঃ

"ঢাকা ১০ই অক্টোবর ঃ শিবালয় থানার অন্তর্গত ভাবলা গ্রামের মঙ্গল ফকির নামে জনৈক মুছলমান ভদ্রলোক এবার মহাসমারোহে দূর্গাপূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। পূজায় হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।"

"মঙ্গল ফকীর" নামক "মুছলমান ভদ্রলোক" দূর্গাপূজার অনুষ্ঠান করার ফলে বাংলার 'জাতীয়তাবাদী' কেন্দ্রগুলিতে আনন্দের বান ডাকিয়া যায় এবং তাঁহারা সকলে সমবেতভাবে মঙ্গল ফকীরের এই 'উদার মহান অসাম্প্রদায়িক' মানসিকতার মাঙ্গলিক কীর্ত্তন করিতে থাকেন।"[১৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মুসলমান তার নিজস্ব ধর্মীয় সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে বিধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন বা অনুসরণ করার কোন বিধান নেই। এটা সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী।

এখানে লক্ষণীয় যে, মঙ্গল ফকীর তার ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে মহাসমারোহে উদযাপন করেছেন বলে 'আনন্দ বাজার' গোষ্ঠি আনন্দে আহলাদিত হয়ে

১৬। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১৪শ খন্ড, পৃঃ ৩৫৩-৫৮, ৩৬২।
১৭। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, দশম খন্ড, ৫২৩ পৃঃ।
১৮। শ্রী সত্যেন সেন ঃ পনেরই আগস্ট, পৃঃ ১১০-১১৪।
১৯। মাওলানা আকরাম খাঁ, মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৩৮৬।

তাকে উদার, মহান 'অসাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কোন হিন্দু যদি মহাসমারোহে 'ঈদুল ফিতর' বা 'ঈদুল আজহা" পালন করতো তাহলে কি 'আনন্দ বাজার' গোষ্ঠি ঐ হিন্দুকে আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে 'উদার, মহান, অসাম্প্রদায়িক' বিশেষণে বিশেষিত করতো? না, কখনোই নয়। বরং ঐ হিন্দুকে ধর্মচ্যুত, সমাজচ্যুত করে ছাড়তো। ঠিক তেমনি, 'আনন্দ বাজার' গোষ্ঠির অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পূর্বেও উল্লেখ করেছি, ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও দর্শন প্রতিটি অমুসলিম মনীষীকে অভিভূত ও আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর কাছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও দর্শন ভাল লাগেনি। তাঁর ভাল লেগেছিল, তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল লালন শাহের জীবন ও দর্শন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের প্রতি এতোই অনুরুক্ত ছিলেন যে, তিনি নিজ উদ্যোগে লালনের গান সংগ্রহ করেছেন, প্রকাশ করেছেন, আলোচনা করেছেন। লালনের ভাষা ও ছন্দের অসাধারণ প্রাণবানতার প্রশংসা করেছেন। এমনকি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন-একথাও তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

......"এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরাই আপন মানব জীবনে ও বাক্য প্রচারে এই বিরুদ্ধতায় সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যে-সব উদার চিত্তে সেই ধর্ম সঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীনকালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবীদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এইসব তীর্থ চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ, সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন, তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাদের শিক্ষায়। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণাই স্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।[২০]

সুতরাং মুসলমান শাসন আমল থেকে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ চলে আসছে- রবীন্দ্রনাথের এ তথ্য সঠিক নয়। যা হোক, তিনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন তা হলো

২০। সূত্র ঃ লালন শাহ ও লালন গীতিকা এবং হারামনি, মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।

এই ধর্মীয় বিরোধ মীমাংসায় অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাদের শিক্ষায় নয়, বাউল সাহিত্যে সম্প্রদায়ে সেই সাধনা দেখেছেন। এ বাউল গানে না-কি হিন্দু-মুসলমান কাউকে আঘাত করেনি। কোরান-পুরাণ ঝগড়া বাধেনি। উভয় সম্প্রদায়কে এক করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুল বলতে যে ইসলাম ধর্মকেই ইঙ্গিত করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরোক্ষভাবে তিনি বাউল দর্শন থেকে অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা নেবার নসিহত করেছেন। এসব কথার অসারতা ইতিহাসের দিকে নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি ফিরালে পাওয়া যাবে। এ দেশে ধর্মীয় বিরোধ আর্যদের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। মুসলিম শাসকেরা তাদের ধর্মীয় উদারতা দিয়ে এ বিরোধের অবসান ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে যা ঘটেছিল তা ছিল কতিপয় কট্টর উগ্রবাসী হিন্দু নেতার অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ। ইংরেজ শাসনামল থেকে বরং এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। আমাদের দেশে বৃটিশ আমল থেকে বাউলবাদ-সুফীবাদের নামে বিভিন্ন মনগড়া দর্শন মুসলমানদের মাঝে চাপিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল। লালনের জগা-খিচুড়ি মতবাদ রবীন্দ্রনাথের এক ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই সহায়ক। এছাড়া লালনের গান ইসলাম ধর্মীয় দর্শনের সাথে যে সাংঘর্ষিক কিছু গানের কলি উদ্ধৃত করলেই তা স্পষ্ট হবে। যেমন ঃ

"পার কর, চাঁদ গৌর আমায়, বেলা ডুবিল
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনত রয়ে গেল।
আছ ভব নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কান্ডারী।....
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গৌর, হে,
কুলে দিয়ে ছাই
ফকীর লালন বলে শ্রীচরণে দাসী হইব।"

উল্লেখিত গানে লালন শাহ্ আক্ষেপ করে বলেন যে, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাঁর জীবন বিফল হলো। গৌর নিতাইকে পেলে মুসলমানী ত্যাগ করে তাঁর শ্রীচরণের সেবায় রত হবেন। লালন শাহের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কীয় গানে তিনি বলেছেন-

কৃষ্ণপ্রেম করব বলে, ঘুরে বেড়াই জনম ভরে
সে প্রেম করব বলে ষোলআনা
এক রতির সাধ মিটল নারে।
রাধারাণীর ঋণের দায়
গৌর এসেছে নদিয়ায়
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর নিতাই।

লালনের এমন কিছু গান রয়েছে যা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উল্লেখিত গানের ন্যায় এমন কিছু গানও রয়েছে যা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী ভাবের উপাদানে পরিপূর্ণ।

পৃথিবীতে যতো ধর্ম মত প্রচলিত রয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় দর্শনে মানবতার কথা বলা হয়েছে। গানে, কবিতায়, সাহিত্যে, মানবতার বন্দনা বা জয়গান করা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোন প্রতিফলন নেই। বৈপরিত্যই চোখে পড়ে। একমাত্র ইসলাম ধর্মই গত চৌদ্দশ' বছর যাবত প্রকৃত মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখে এসেছে। রবীন্দ্রনাথদের দৃষ্টিতে না পড়লেও বিশ্বের অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে তা প্রতিভাত এবং প্রশংসিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্মানজনক আপোষকামিতায় উৎসাহিত করে। কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রশ্নে কোন আপোষ ইসলামে নেই। অথচ লালন গানে পৌত্তিলকতার প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান। কাজেই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ভক্তরা পৌত্তলিকমনা লোক লালন শাহের মতবাদকে মুসলিম সমাজে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা অতীতেও করেছে, বর্তমানেও করছে। এ জন্যেই ইসলামের নাম শুনলে যাদের গায়ে জ্বর আসে, তাদের কাছে লালনের গান যেন সঞ্জীবনী সুধা, অমৃতের বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লালন এবং তার গান যে কত প্রিয় ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় লালন গবেষক মরহুম মুঃ মুনসুর উদ্দিনের বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন ঃ

> একদিন লালন শাহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কবির কাছারীতে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত না করে কাছারী থেকে নীরবে চলে আসেন। ভুলক্রমে লালন তাঁর সাপমুখো লাঠিখানা রবীন্দ্রনাথের কাছারীতে ফেলে আসেন। এই লাঠির মালিকের অনুসন্ধান করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনকে পান। পরবর্তীতে তিনি যখনই শিলাইদহ অবস্থান করতেন তখন প্রায়ই লালনকে বোটে এনে গান শুনতেন।[২১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গানে অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতার মুক্তির সন্ধান পেলেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অবস্থান ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাঙ্খিত নব হিন্দুত্ব বা নব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতন। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে। ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদের পুনরুদ্ধার মানসে ত্রিপুরার মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেব মানিক্যকে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ

> "আমি ভারতীয় ব্রহ্মাচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই- .....বিদেশী স্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ।"[২২]

এরপরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না-কি অসাম্প্রদায়িক, অখণ্ড বাংলার কবি, মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণার উৎস্য, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি। অন্যদিকে কবি নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও খন্ডিত বাংলার কবি।

২১। মু, মুনসুর উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান: দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৯।
২২। রবীন্দ্র জীবনী দৃষ্টব্য, বাংলার জাগরণে উদ্ধৃতঃ পৃঃ ১৫৮।

অসাম্প্রদায়িক কবি নজরুল

"গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে, কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ,
অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে
ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

-কাজী নজরুল ইসলাম

শাসনযন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সমান মর্যাদা দিতে গিয়ে মোঘল সম্রাট আকবর মুসলিম সংস্কৃতি এমন কি ইসলামের মৌলিক নীতিতেও অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি চিরাচরিত সালাম প্রথা বিলোপ করে 'আল্লাহু আকবর' অর্থাৎ আকবরই আল্লাহ এবং উত্তরে 'জাল্লে জালালুহু' বলার নিয়ম প্রচলন করেন।

হিন্দুরা এতেও আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন প্রভু! আমরাই আপনাকে 'দিল্লীশ্বরৌ-জগদীশ্বরৌ' বলে সম্বোধন করি। আপনি সালাম বিনিময়ের সময় 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করলেন কেন? আল্লাহ তো হিন্দুবিরোধী শব্দ, অতএব ওটা তুলে দিন।

আকবর হিন্দুদের কথায় সায় দিয়ে ঘোষণা করলেন আজ থেকে আল্লাহ এবং সালামের পরিবর্তে 'আদাব' শব্দ ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত সৃষ্ট সেই 'আদাব' আজও সালামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই প্রথা মোঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে এ দেশে চলে আসছে। কিন্তু কোন হিন্দু সাক্ষাতে কোন মুসলমানকে ভুলেও সালাম দিয়ে সম্ভাষণ জানায় না। হিন্দুরা পূর্বপুরুষদের ঐহিত্য অনুযায়ী আল্লার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আদাব বা নমস্কার দিয়েই সম্ভাষণ জানায়। অন্যদিকে কোন মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যকর্মে শুধু 'আল্লাহ' শব্দই ব্যবহার করেন না, ঈশ্বর ভগবান শব্দও ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু কোন হিন্দু লেখক তাদের সাহিত্য কর্মে ঈশ্বর ভগবান ছাড়া ভুলেও 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেন না। করলেও তা ব্যবহার হয় ব্যঙ্গাত্মক অর্থে। ঠিক তেমনি হিন্দু লেখক-সাহিত্যিকরা মুসলমান চরিত্রকে অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরে চিত্রিত

করেছেন। শুধু তা-ই নয়, মুসলমানদেরকে অত্যন্ত রুচিহীন, কুৎসিত ও অশালীনভাবে শূয়ার, অরণ্য, নর, বানর, পারশী পামর, দূরাত্মা, দূরাচার, ধর্মজ্ঞানহীন, দস্যু, দুর্দান্ত, ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি বলে গালি দিয়েছেন। তবুও তারা না-কি অসাম্প্রদায়িক। কারণ এরা যে হিন্দু। কিন্তু মুসলমান সাহিত্যে এরূপ কুৎসিত গালির কোন প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও এরা সাম্প্রদায়িক। কারণ এরা যে মুসলমান। সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার কথা বাদ দিলাম, হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখা পাঠ করলেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে কারা সাম্প্রদায়িক। কারা সাম্প্রদায়িকতার উস্কানীদাতা। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দেশমাতাকে কালিমাতার প্রতিরূপ কল্পনা করে লিখেন, "ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে বাঁ হাত করে শংকাহরণ" তখন আর সেটা অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার স্পীরিটকে ক্ষুণ্ন করে না। কিন্তু মানবতাবাদী একত্ববাদে বিশ্বাসী কবি নজরুল যখন স্বধর্মে উদ্বেলিত ও উজ্জীবিত হয়ে লিখেন-

"আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।
আমার কিসের শঙকা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।"

তখন এসব কথা হয়ে যায় অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বিরোধী। কাজী নজরুল ইসলাম 'হিন্দু মুসলমান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন ঃ দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারবার গুরুদেবের ওই কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে এ প্রশ্নও উদয় হয় যে, এ -ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ওই সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায় তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক -তারাই হয়ে ওঠে পশু। যে-সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে-শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেইসব পশুদের দেখে- যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র-বেশি ভীষণ। এ হিসেবে মানুষও পড়ে ওই শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু, বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দু-ই ভেতরে থাকলে কি রকম হিংস হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

প্রশ্ন ছিলো এই যে, ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয়, টিকিতে

ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দূরন্ত ইচ্ছা! -ন্যাজ গজাল না ব'লে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল!

সে দিন মানব-মনের পশু-জগতে না জানি কি উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মতো কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করল!

মানুষের চিরন্তন আত্মীয়তাকে এমনি ক'রে বৈরিতায় পরিণত করা হ'ল দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া ক'রে। ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দু-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ওই দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পন্ডিত্ব! তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাধবে না, কারণ তাঁরা দু'জনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওকে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্যে যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেনি, আমি হিন্দুর জন্যে এসেছি, আমি মুসলমানের জন্যে এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্যে এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্যে এসেছি-আলোর মতো, সকলের জন্যে। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিষ্ট ক্রিশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ–খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন, জাতীয় সম্পত্তি! আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি! আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়; ও বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়। আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় আলাদা আলাদা সূর্য ওঠে! স্রষ্টা নিয়েও ঝগড়া চলছে সেই রকম। এ বলছে আমাদের আল্লা; ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গরু-ছাগল! আর তার বিচারের ভার পড়ছে জাস্টিস স্যার আবদুর রহিম, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ওপর! আর বিচারের ফল মেডিক্যাল কলেজে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে!

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটি হিন্দু না মুসলমান। একজন

মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু- তার জন্যে তো তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি- আমারই মতো একজন মানুষকে।'

কিন্তু আজ দেখছি কি? ছোরা খেয়ে যখন খায়রু মিঞা পড়ল, আর তাকে যখন তুলতে গেল হালিম, তখন ভদ্র সম্প্রদায় হিন্দুরাই ছুটে আসলেন, "মশাই করেন কি? মোচলমানকে তুলছেন। মরুক ব্যাটা।" তারা 'অজাতশ্মশ্রু' হালিমকে দেখে চিনতে পারেনি যে, সে মুসলমান। খায়রু মিয়ার দাড়ি ছিল। ছোরা খেয়ে যখন ভুজালি সিং পড়ল পথের উপর তাকে তুলতে গিয়ে তুর্কীছাঁট- দাড়ি শশধর বাবুরও ঐ অবস্থা।

মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে, মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই।

মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হয়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারী এবং মুজিবর রহমান সাহেব হবেন তঞ্জিম তব্‌লিগের প্রেসিডেন্ট?.....

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, একটা বলদ যাচ্ছে, তার ন্যাজটা গেছে খ'সে। ওরই সাথে দেখলাম, আমার অতি বড় উদার বিলেত-ফেরত বন্ধুর মাথায় এক য়্যাব্বড় টিকি গজিয়েছে।

মনে হ'ল, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে!

এছাড়া 'মন্দির ও মসজিদ' শিরোনামে একটি অসাধারণ প্রবন্ধে কাজী নজরুল লিখেছেন ঃ

'মারো শালা যবনদের!' 'মারো শালা কাফেরদের!'- আবার হিন্দু-মুসলমানী কান্ড বাঁধিয়ে গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্যে যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম- তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া ও কালী ঠাকুরাণীর নামে লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, 'বাবা গো, মা গো!' মাতৃ-পরিত্যক্ত দু'টি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর?

ভবিষ্যৎ তাহার জন্যে প্রস্তুত হইতেছে!

সেই রুদ্র আসিতেছেন, ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ওই মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভাঙিয়া

সকল মানুষকে এক আকাশের গুম্বজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, স্রষ্টার আপনি-মোড়ল 'প্রাইভেট সেক্রেটারি'রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া, টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে। ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এলকোহল পান করিয়াছে।

পুসিফুট জনসন মাতালদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বহু মার খাইয়াছেন।

মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা-মুসাকে যে-সব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে -ঈসা-মুসা- মুহম্মদদের মতো মানুষকে!

যে-সব অবতার-পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের কল্যাণের জন্যে আসিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদেরই মাতাল পশু শিষ্যেরা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দানখানায়, গীর্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরী-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম- প্রায় ওই সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল-অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলী বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভর্ৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত। হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ।

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পরটিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই ঘুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে! উহার ল্যাজ সমুদ্রপাড়ে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্র পাড়ের বুনো বাঁদরের মতো লাল!

দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা কালীর মন্দির কালী আসিয়া, আগলাইলেন না! মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গুম্বজ টুটিল!

আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, 'আবাবিলের' প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার ওপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায় হত খায়রু মিঞাকে হিন্দু মনে করিয়া 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলী খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ

বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যে, উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

মারামারি চলিতেছে। উহারি মধ্যে এক জীর্ণ শীর্ণা ভিখারিনী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, "বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু! এই মাত্র এসেছে বাছা আমার! আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই!" তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা! এই ত চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই।"

ভিখারিনী নিস্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কি দৃষ্টি! চোখ দুটো তার যেন তারার মত জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা! এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহারই দিকে- যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, "পেটের ক্ষুধা এত প্রচন্ড বলিয়াই ত দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয়।"

যে-লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়ত ওই শিশুর গোপন পিতা। সে না হয়, তারই একজন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অথবা তাহারই মত মানুষ একজন ওই শিশুর জন্মদাতা!

ঐ যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই মতো দুর্ভাগিনী ভুখারিনীদের চোখ, অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ-তৃপ্তি বিশ্ববাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে, তাহার শিশুর সাথে আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যেই চাহিতেছে।....

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা ছয়টি দিয়াছিলাম। -ভিখারিনীর শুষ্কচক্ষে হঠাৎ অশ্রুপুঞ্জ দুলিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর ছেলে কোথায়?" সে উর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, "বাবু, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?" আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা, জমা

হয় ওই ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিনী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া "যাদু আমার সোনা আমার" বলিয়া উন্মাদিনীর মতো চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন।- এই তাহার যাদু, এই তাহার সোনা! ভিখারিনী ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটিকে আবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল "বাবু ওই পয়সা কয়টি দিয়ে সেদিন একটা খারাপ-হয়ে-যাওয়া বার্লির টিন কিনেছিলুম। এ-কয়দিন ছেলেটাকে দিয়েছি ঠান্ডা জলে গুলে শুধু ওই পচা বার্লি; আমিও খেয়েছি একটু করে -যদি আমার বুকে দুধ আসে! দুধ এল না এই হাড়-চামড়ার শরীরে! এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে! শেষে আর বার্লিও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল! ভালই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড় লোকের ঘরে জন্মায় যেন। একটু পেটে দুধ খেয়ে বাঁচবে।"

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে!

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্তানের দিকে।....

কাল এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লক্ষ সন্তানের মরা লাশ বুকে ধরিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্তানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনও মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ-কোলে আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটা প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ত তলবের মতো দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মদান্ধদের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তাহার তখন ইট-পাথর লইয়া বীভর্ৎস মাতলামি শুরু করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইঁট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইঁট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লক্ষ অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! ইহারা মানুষের চেয়ে ইঁট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে! ইহারা ইঁট পূজা করে! ইহারা পাথর-পূজারী!

ভূতে-পাওয়ার মতো ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মসজিদে পাইয়াছে! ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

যে-দশ লাখ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,- তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ-স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি!

মানুষের কল্যাণের জন্যে ঐসব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্যে মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের

হেতু হইয়া উঠে-যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু- তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ। সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা জ্বালা মহামন্দিরের আঙ্গিনাতলে!

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ। সেই মন্দির-মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্যে দুইশত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের ঋণ যদি দুইশত মানুষের মাথা দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তবে বাঙালী জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ করিয়া মানুষ খসিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে শোষণ- দৈত্যের পেষণে, এই মহা ঋণের পরিশোধ হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির-মস্‌জিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষেরই পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া; শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু'চামচ জল-বার্লি। যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! যাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে!

আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভূখারীদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ওই মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলো? কেন সে ভূমিকম্প আসেনা পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র-যিনি মানব-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ওই ভজনালয়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কার চিহ্ন ঐ টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির-মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার হাজার, আসে তার জন্যে ছপ্‌পর ফুঁড়িয়া নেতার দল- গো-ভাগাড়ে শুকুনি পড়ার মতো! -শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না!

মানুষের পশু প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল-ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা ওই দশ লক্ষ অকাল মৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ের পড়া শুকুনির দলকে!

আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত

হইতেছে উর্ধ্বে-স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।"

এই ছুঁৎমার্গ সম্পর্কে কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

একবার এক ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখিয়াছিলাম, ডাক্তার-বাবু রোগীর টিকি-মলে স্টেথিস্কোপ বসাইয়া জোর গ্রাম্ভারী চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন! আমাদের রাজনীতির দন্ডমুন্ড হর্তাকর্তা বিধাতার দলও আমাদের হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিল না হওয়ার কারণ ধরিতে গিয়া ঠিক ঐ ডাক্তার বাবুর মতই ভুল করিতেছেন। আদত স্পন্দন যেখানে, যেখান হইতে প্রাণের গতি-রাগ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে স্টেথিস্কোপ না লাগাইয়া টিকি-মূলে যদি ব্যামো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ, রাজনীতির দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিলনের চেষ্টা করাও তেমনি হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ। সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আসমান-জমিন তফাৎ। প্রাণে প্রাণে পরিচয় হইয়া যখন দুইটি প্রাণ মানুষের গড়া সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয়-ভীতি দূরে সরাইয়া সহজ সঙ্কোচে মিশিতে পারে, তখনই সে মিলন সত্যিকার হয়; আর যে-মিলন সত্যিকার, তাহাই চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোন একটা বিশেষ কার্য উদ্ধারের জন্য চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া বাহিরে প্রাণভরা বন্ধুত্বের ভান করিলে সে-বন্ধুত্ব স্থায়ী তো হইবেই না, অপরন্তু সে-স্বার্থও সিদ্ধি না হইতে পারে, কেননা মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনও কোন কার্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না।

এখন কথা হইতেছে, আদত রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ, অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুঁৎমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারী। মানুষের সৃষ্টি শৃঙ্খল বা সমাজ-বন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই "সম্ভবামি যুগে যুগে" রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও হাদিসে সেই জন্য প্রতি শত-বর্ষে একজন করিয়া "মুজাদ্দিদ" বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। "বেদাৎ" বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারকদের মহান লক্ষ্য।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মত একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁহাদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উল্টাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সত্য হয়ত একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কি আর মুক্তি হইবে না? বাঙলার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই "ম্লেচ্ছ" শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়! মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে

ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! কি ভীষণ অসামঞ্জস্য! আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহনপূত কালাপাহাড়ের দলকে সেই জন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আহবান করিতেছি, এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে, "আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!" আমরা যে ধর্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকারভাবে স্বধর্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপন হইতেই আসে। যত ছোঁয়া-ছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভন্ড বক-ধার্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা এক ট্রেনে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দনধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায় টুপী ও পাগড়ী দেখিয়াই ছোওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পন্ডিতজী বেদ বা ঐরূপ কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঐ ভদ্রলোকদের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কান্ড দেখিয়া চড়ক গাছ! আমরাও তখন সহজ হইয়া পন্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পন্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলতিলক হইয়াও কি করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়া কেন একেবারে দশ হাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি হিন্দু ধর্মকে ভালোবাসি ও সত্য বলিয়া জানি বলিয়া বিশ্বের সকলকে, সকল ধর্মকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোন ধর্ম নাই। তবে ধর্মের যে ঘটাটা দেখ, তাহা অন্তরের দীনতা-হীনতা ঢাকিবারই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র!" ইহা বানানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর-বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা- মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা। সেদিন নারায়ণের পূজারী বলিয়াছিলেন, "ভাই, তোমার সে-পরম দিশারী তো হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়,- সে যে মানুষ!" কি সুন্দর বুকভরা বাণী! এ যে নিখিল কণ্ঠের সত্য-বাণীর মূর্ত প্রতিধ্বনি! যাঁহার অন্তর হইতে এই উদ্বোধনী বাণী নির্গত হইয়া বিশ্বের পিষ্ট ঘৃণাহত ব্যথিতদের রক্তে রক্তে পরম শক্তির সুধা-ছড়াইয়া দেয়, তিনি মহা-ঋষি, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! যদি সত্যিকার মিলন আনিতে চাও ভাই, তবে ডাক- ডাক, এমনি করিয়া প্রাণের মহা-আহবানে বিপুল সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা মাথা কুটিয়া মরিলেও তো প্রাণের সাড়া কোথাও পাইবে না, যাহাকে পাইয়া তাহারা

উল্লাসে নৃত্য করিবে তাহা বাহিরের লৌকিক "ডিটো" দিয়া মাত্র। অন্তরের ডাক মহাডাক। ডাকিতে হইলে প্রথমে বেদনায়- একেবারে প্রাণের আর্ত তারে গিয়া এমনি করিয়া ছোঁওয়া দিতে হইবে। আর তবেই ভারতে আবার নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিবে।

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগন তলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া- মানব! তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম!" দেখিবে, দশদিকে সাবভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই দেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্খা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলে ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গন্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ- তুমি সত্য।

মহাত্মা গান্ধীজী ধরিয়াছেন এই মহাসত্যকে, তাই আজ বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন আনন্দের নাচ নাচিতেছে। তোমরা রাজনীতিক যুক্তি-তর্কের চটক দেখাইয়া লেখাপড়া-শেখা ভন্ডদের মুগ্ধ করিতে পার, কিন্তু অমন ডাকটি আর ডাকিতে পারিবে না। আমরা বলি কি, সর্বপ্রথমে আমাদের মধ্য হইত এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিনে সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সে স্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন, মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে,- মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, "ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই!" কি ভীষণ প্রতারণা। মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখন্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়। এসো, যদি পার, তোমার স্বধর্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মত উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো। এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায় দলিয়া মানুষের মত উচ্চ শিরে তোমার মুক্তবিধার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষঃ লইয়া। সে মহা-আহবানে দেখিবে আমরা হিন্দু-মুসলমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব। আমরাই ভারতে আবার অখন্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে-রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু "টু" করিবে, তাহার গর্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে, তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া ফেল। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাক চাই,- ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক!"

কবি নজরুল ইসলামের এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দু'টো এখানে উপস্থাপন করলাম এই জন্য যে, মানবতার স্বপক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি যে উচ্চমার্গের বক্তব্য রেখেছেন তা অতুলনীয়। হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন রেখা অতিক্রম করে যে ঘৃণা, ক্ষোভ, আক্ষেপ ও ধিক্কার প্রকাশ করেছেন, বাস্তব চিত্র এঁকেছেন- অন্য কোন

কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় তা বিরল। কথায় কথায় তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং রবীন্দ্রভক্তরা নজরুলের এইসব রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রবন্ধ দু'টিতে কবি নজরুল সাম্প্রদায়িকতা ও মানবতা বিরোধীদের চিত্র এঁকেছেন, তারা কারা? তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে ঐ ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের প্লাটফর্মেই। এদের কাছে হিন্দুদের জান-মাল যেমন নিরাপদ নয়; ঠিক তেমনি মুসলমানদেরও জান-মালের নিরাপত্তা নেই। এরা রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে ধর্মনিরপেক্ষতা-ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা- সাম্প্রদায়িকতা চিৎকার করলেও তারা নিজেরাই সাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধী। গত দুই শত একচল্লিশ বছরের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস তাই বলে। এ ধরনের লোক যেন হিন্দুদের মধ্যে আছে; ঠিক তেমনি মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে।

একজন সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। এ ধর্মে যে যত বড় ধার্মিক; সে ততো বড় অসাম্প্রদায়িক। আর অন্যান্য ধর্মে যে যতো বড় ধার্মিক; সে ততো বড় সাম্প্রদায়িক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদেরকে ইতর শ্রেণীর সাথে তুলনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদেরকে কাক-কুকুরের সাথে তুলনা করেছিলেন। আর কবি নজরুল দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন-

"এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান,
মুসলিম তার নয়ন-মনি হিন্দু তাহার প্রাণ।"

সেকালে 'ধূমকেতু'র জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকার নজরুল সম্পর্কে লিখেন- "নজরুল ছিলেন খাপখোলা তলোয়ার। সাম্প্রদায়িকতার নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করেননি। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হয়েছে এবং কবির নিকট এই সমস্যার সমাধান চেয়েছেন-তখন তিনি বলেছেন, যে-ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?" কথাটা সত্য এবং বাস্তব। কিন্তু প্রবল আদর্শবাদী নজরুল কবি রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যে সান্ত্বনা লাভ করেননি। তাই ১৯২৬ সালের মে মাসে, কৃষ্ণনগরে (বর্তমান ভারতের বাংলা রাজ্যে) কংগ্রেস-এর প্রাদেশিক সম্মেলনে, চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট (ঐক্য চুক্তি) বাতিল হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, তিনি তার বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ। সন্তান মোর মার।"

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এস. এম. লুৎফর রহমান লিখেছেন ঃ

বস্তুতঃ গভীর দূরদৃ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক এক মহান জাতীয় কবির মতোই সেদিন তিনি "কান্ডারী হুঁশিয়ার" শীর্ষক যে গান রচনা করে গেয়ে শোনান-তা যদি তৎকালীন কংগ্রেসের নেতাদের কানে ঢুকতো, তা হলে পরবর্তীকালে দেশ বিভক্ত হতোনা। কিন্তু কবির বাণী ও

হুঁশিয়ারী বাঙালী হিন্দুদের একাংশকে সেদিন বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। যখন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রশ্ন এসেছে তখন সূত্রানুযায়ী গোটা বাঙলা অখন্ড থাকা সম্ভব থাকলেও কংগ্রেস কর্মী সংঘের জিদ্ এবং প্রচার-প্রচারণার কারণে জাতীয় কবির বাণী ফলপ্রসূ হয়নি।[১]

১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গাকে লক্ষ্য করে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'অগ্রদূত' পত্রিকাতেও নজরুল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তার অগ্নিঝরা কবিতা লিখেন-

'আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শুকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন অভিযান করবি শুনি?"

হিন্দুদের বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক উৎসবে ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি আলাদা হয়ে বসতেন। কোন মুসলমানের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। বহরমপুরে ডঃ নলীমাক্ষ সান্যালের বিয়ের বরযাত্রী বন্ধু বান্ধবরা নজরুলকে সাথে করে বিয়ের আসরে উপস্থিত হলে গোঁড়া হিন্দুরা আপত্তি করে উঠে দাঁড়ান। নজরুল অন্যত্র কিছুক্ষণ কাটিয়ে অপমানের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গীতের শিষ্য উপাপদ ভট্টাচার্যের সহায়তায় পুনরায় আসরে এসে 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি অভিনব সুরে সকলকে শুনিয়ে দেন। উক্ত গানের কয়েকটি লাইন-

"জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত-জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে?
জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি,
ভাবলি এতেই জাতির জান
তাইত বেকুব, করলি তোরা
এক জাতিকে একশ' খান।"

নজরুল অন্যত্র লিখেছেন-

"মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন
রান্না করে কার না বাড়ি
গা ছুঁলে তার লোম ফেলেনা,
ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি।"

বিশ্ব কবি "শিবাজী উৎসব" কবিতার মাধমে ভারতবর্ষে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কবি নজরুল স্বপ্ন দেখেছেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী

১। তথ্য সূত্রঃ ডঃ সে, এম লুৎফর রহমান, 'বাঙালী' থেকে বাংলাদেশী'দের জাতীয় কবি নজরুল, নতুন সফর, আগস্ট '৯৬ সংখ্যা।

ভারতের। নজরুলের এই স্বপ্নের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। যেমন-

"ভারতের দুই নয়ন তারা হিন্দু মুসলমান,
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান।"

★ ★ ★

"হিন্দু মুসলমান দু'টি ভাই ভারতের দুই আঁখিতারা
এক বাগানে দু'টি তারা দেবদারু আর কদমচারা।"

★ ★ ★

"মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই
এক বৃন্তে দুইটি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই।"

নজরুলের প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর প্রতিভাকে অন্য খাতে প্রবাহিত অথবা তাঁর প্রতিভাকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রমিলার সাথে বিয়ে করিয়ে শাশুড়ী গিরিবালাকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। নজরুলের পরিবারে কালি মূর্তি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নজরুল ছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

কবি নজরুলের লেখায় উভয় ধর্মের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও বাউল, পীর-সূফীবাদ স্থান পায়নি। তিনি অসংখ্য বাউল গান লিখেছেন, কিন্তু কখনোই রবীন্দ্রনাথের মতো লালন শাহের জগা-খিচুড়ি মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। লালনকে নিয়ে একটি শব্দও লেখেনি। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নজরুলের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার মৌল পার্থক্য। কবি নজরুলের ব্যক্তিগত সঠিক ধর্মীয় অবস্থানের স্পষ্টতা বিদ্যমান। তিনি তাঁর লেখায় সাম্যের, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মানবতার যে জয়গান গেয়েছেন তা বিস্ময়কর। তিনি লিখেছেন-

"গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে, কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ,
অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে
ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

কবি নজরুল এভাবে তাঁর কবিতায়, গানে, সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আকুতি প্রকাশ করেও তিনি অসাম্প্রদায়িক কবি হিসাবে বিবেচিত হতে পারেননি। 'সাম্প্রদায়িকতা' ও 'মুছলমানি' গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। জীবন-মৃত ও নির্বাক হয়েও এর খেসারত দিতে হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক কবি নজরুলের পুত্রবধূ অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বছর আটেক আগে বলেছিলেন ঃ

"পশ্চিমবঙ্গের কবির অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই বছর তা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং এবারই প্রথম 'নজরুল প্রণাম' করা হচ্ছে। রবীন্দ্র সদন থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।"

আর শেরে বাংলার ভাগিনা নূরুল হুদা বলেছেন ঃ

"পাকিস্তান হওয়ার পর তারা সব এ দেশে চলে আসলে কবিকে অসামান্য আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয়।"[২]

অথচ অনেকে বলে থাকেন- নজরুল দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না; এক জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহলে তো কবি নজরুলের জামাই-আদরে ভারতে থাকার কথা ছিলো। যেমন হয়েছিলো মওলানা আবুল কালাম আজাদ কিংবা হুমায়ুন কবিরের ক্ষেত্রে। কিন্তু কবি নজরুলের বেলায় তা হয়নি। কারণ তিনি তাঁদের মতো ভেজাইল্লা মুসলমান ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা ঈমানদার মুসলমান। এই মুসলমান হওয়ার অপরাধেই ভারতে তাঁর কদর হয়নি। যেমন হচ্ছে না এখন বাংলাদেশেও।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন (কাব্যিক ভাষায়) ঃ

বিচারের দিন সুধাবে বিধাতা-
"আদমের সন্তান,
ক্ষুধায়-কাতর অন্ন চেয়েছি
অন্ন কর নি দান।"
কহিবে মানব, 'রাজ্জাক' ওগো,
তুমি নিখিলের স্বামী,
তোমারে কেমনে অন্ন দিতাম
পারিনু বুঝিতে আমি।'
কহিবেন খোদা, "বান্দা আমার
অন্ন চাহিল দান,
তারে দিলে সে-যে আমিই পেতাম
(আজি) পেতে তার প্রতিদান!

আর প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

"সে ব্যক্তি কখনই মুছলমান নয়, যে তার প্রতিবেশীকে (তা সে প্রতিবেশী মুছলমান অমুছলমান যে-ই হোক) অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খায়। রছুলুল্লাহ (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সেই সবচেয়ে ভালো যে মানুষের প্রতি সবেচেয়ে ভালো।"

তাই দেখা যায়, মানবতার কবি নজরুলের কাব্যে পবিত্র কোরান ও হাসিদের

২। দৈনিক মিল্লাত, ২৮ মে, ১৯৯০।

বাণীগুলোই যথার্থভাবে প্রতিফলিত বা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেমন ঃ

"মস্‌জিদে কাল শির্‌নি আছিল, অঢেল গোস্ত-রুটি
বাচিয়া গিয়েছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!
এমন সময় এল মুসাফির গায় আজারির চিন,
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা-ফাকা, আছি আজ নিয়ে সাত দিন!"
তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল মোল্লা- ভ্যালা হল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"
ভুখারি কহিল, "না বাবা!" মোল্লা হাঁকিল, "তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ!" গোস্তা-রুটি নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা!
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে
"আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা' বলে বন্ধ করোনি প্রভু!
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!"

(মানুষ সাম্যবাদী)

পবিত্র কোরআন ও সুন্নতের আলোকে কবি নজরুলের এইসব তত্ত্ব কথা অর্ধশিক্ষিত বা স্যাকুলারিজম শিক্ষিতদের মগজে ঢোকেনি। তাই এদের কারো কাছে নজরুল হয়েছে 'কাফের' আর কারো কাছে হয়েছে সাম্প্রদায়িক। তাই নজরুল আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ আমি কবি, রাস্তা দিয়ে যাব, খান বাহাদুর- রায় বাহাদুররা আমাকে দু'পাশে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করবে। বললেন ঃ আমি সম্ভ্রান্ত হতে চাই না, বিভ্রান্ত করতে চাই।" [মুসলমানেরা কবির ভাষা না বুঝলেও হিন্দু বাবুরা ঠিকই বুঝেছিল নজরুল কোন চিজ]।

সুতরাং কবি আল মাহমুদ এক আলোচনা সভায় আক্ষেপ করে যথার্থই বলেছিলেন ঃ

"অসাম্প্রদায়িক কবি হওয়ায় নজরুলের কোন লাভ হয়নি। তিনি পশ্চিমবঙ্গে যেমন অবহেলিত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর সাহিত্য তেমনি অবশ্য পাঠ্য নয়। অথচ চরম সাম্প্রদায়িক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেও যেমন আদ্রিত হয়েছেন, তেমনি কুকুর বলে গালি দিতেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে তারাও তাঁকে ফেলে দেননি। মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক সাহিত্য অবশ্য পাঠ্য। নজরুল জীবনের অনেক ট্রাজেডির মধ্যে একটা ট্রাজেডি।"

নারী বিদ্বেষী ঈশ্বর(!) রবীন্দ্রনাথ

'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না নারী মুক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন না নারীর, ছিলেন নারীর প্রতিপক্ষের এক বড় সেনানী। তিনি চেয়েছিলেন নারীরা ঘরে থাকবে, স্বামীর সেবা করবে, সন্তান পালন করবে, তবে কিছু নারী থাকবে, যারা কবিতা পড়বে, আর হবে তাঁর মতো বড় কবির একান্ত অনুরাগিনী।"

- ডঃ হুমায়ূন আজাদ

১৯৯১ সালে তিন দিনব্যাপী জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনে এ দেশের বর্ষীয়ান মহিলা কবি সুফিয়া কামাল তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মকে মঙ্গলবার্তা হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

"রবীন্দ্র সঙ্গীত আমার কাছে উপাসনার মত।"

তিনি আরো বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে কোন ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ করা যাবে না, তিনি মহীরূহ আমরা তাঁর আশ্রয়ে আছি, আমাদের সব কবির প্রেরণা তিনি।

সুফিয়া কামাল আরো বলেছেন, বর্তমানের গ্লানিকর অবস্থা থেকে রবীন্দ্রনাথের সুরই আমাদের মুক্তি দিতে পারে।[১]

এই সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা রবীন্দ্র সঙ্গীতকে এবাদত এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ের প্রার্থনা না করে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে থাকার আকুতি জানিয়েছেন তাঁর ভাষণে এবং ২০ এপ্রিল দশটি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলের বন্দনা করেছিলেন।

দেশত্যাগী বিতর্কিত মহিলা লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সে নিজেকে নাস্তিক বলে দাবী করেন। অথচ তারও না-কি একজন পুরুষ ঈশ্বর আছেন। সুতরাং তসলিমাকে আস্তিক বলেই ধরে নেয়া যায়। এই মহিলার ঈশ্বর কে? এর ঈশ্বর হলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সম্পর্কে তসলিমা লিখেছেন-

"রবীন্দ্রনাথকে আমি ঈশ্বর বলে মানি। আমার চোখের সামনে ঈশ্বরের যে ছবিটি হঠাৎ হঠাৎ ভেসে ওঠে, সে তার রক্ত মাংস শিল্পস্বপ্নসহ কেবলই রবীন্দ্রনাথ। এই আমার ধর্ম,

১। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯১।

আমি এই ঈশ্বরের কাছে পরাজিত। আর কোনও ঈশ্বর দোষ, আর কোনও লৌকিক বা পারলৌকিক মোহ আমার নেই। জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সামনে কোনও দেয়াল রাখিনি আর কোনও গন্তব্য নেই আমার যাবার।"[২]

আরেক অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার গত বছর একটি জাতীয় দৈনিকে এক স্মৃতিকথায় আল্লাহর পরে রবীন্দ্রনাথকে স্থান দিয়েছেন।

রবীন্দ্র উপাস্য এই তিনজন নারীই তথাকথিত নারীমুক্তি এবং নারী জাগরণে খুব উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু তাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই একজন নারী বিদ্বেষী পুরুষ। এই নারী বিদ্বেষী রবীন্দ্রনাথকে চেনা, নারী বিদ্বেষী স্বরূপ জানা যাবে বিভিন্ন নজরুল ও রবীন্দ্র গবেষকের মন্তব্য এবং নারী বিষয়ে উভয় কবির লেখা পড়লে। এখানে সবার মন্তব্য ও বক্তব্য দেয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ-এর মন্তব্য দিয়ে মাসিক সফর, এপ্রিল '৯৩ সংখ্যায় "যে নারীর 'ঈশ্বর' একজন নারী বিদ্বেষী পুরুষ" শিরোনামে শেখ নুরুল ইসলামের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেখান থেকে ডঃ হুমায়ূন আজাদের মন্তব্য এবং শেখ নুরুল ইসলামের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। ডঃ হুমায়ুন আজাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' পাঠ করে লিখেছেন ঃ

'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না নারী মুক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন না নারীর, ছিলেন নারীর প্রতিপক্ষের এক বড় সেনানী। তিনি চেয়েছিলেন নারীরা ঘরে থাকবে, স্বামীর সেবা করবে, সন্তান পালন করবে, তবে কিছু নারী থাকবে, যারা কবিতা পড়বে, আর হবে তাঁর মতো বড় কবির একান্ত অনুরাগিনী।"

ডঃ আজাদ আরো লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ নারীকে মনে করতেন অসম্পূর্ণ মানুষ। পুরুষ মহাজগৎ পেরিয়ে চলে যাক, কিন্তু নারী থাকুক ঘরের কোণে কল্যাণী হয়ে।"

মহারাষ্ট্রীয় নারীবাদী রমাবাঈ একটা বক্তৃতা দেন পুনায় ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ওই বক্তৃতা শুনে পুরুষেরা ক্ষেপে যান। ওই বক্তৃতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মতামত দেন তাতে তার পুরুষাধিপত্যবাদিতা প্রকাশ পায় প্রবলভাবে। তিনি রুশো-রাসকিন, ভিক্টোরীয় ও সমগ্র পুরুষতন্ত্রের মতো বিশ্বাস করতেন যে, নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়, নারী প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট।

তিনি বলেছেন ঃ "মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তাহলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়।"

অতঃপর হুমায়ূন আজাদ মন্তব্য করেছেন ঃ

"একজন চমৎকার ভিক্টোরীয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নারীদের মধ্যে দেখেছেন শুধু রূপ আর

২। নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য, তসলিমা নাসরিন, পৃঃ ৯৯।

আবেগ, দেখেছেন নারীদের শক্তিহীনতা, প্রতিভাহীনতা, আর এসবই তাঁর মতে প্রাকৃতিক। ... তাঁর চোখে নারী-পুরুষের অসাম্যই ন্যায়সঙ্গত, আর সাম্য অন্যায়; প্রকৃতি বা বিধাতা এমন অন্যায় করতে পারেন না।

তিনি আরো লিখেছেন, 'আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, তেমনি রূপে শ্রেষ্ঠ। .... স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প। .... স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান-এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই। মেয়েরা কখনোই পুরুষদের সঙ্গে বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না। ..... পুরুষাধিপত্যবাদী রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, 'মেয়েরা হাজার পড়াশুনা করুক, কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পাবে না।

রবীন্দ্রনাথ নারীদের ঘরে আটকে রাখার জন্য দোহাই দিয়েছেন প্রকৃতির। তিনি লিখেছেন- 'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবেনা। যদি প্রকৃতির সে রকম অভিপ্রায় না হতো তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজের কথা নয়।' অর্থাৎ আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজই যে নানা সামাজিক নিয়ম-শৃংখলে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে মেয়েদের এমন দুর্বল করে রেখেছে রবীন্দ্র সে কথা স্বীকার করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির আন্দোলনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাকে বলা হয়েছে 'কোলাহল'। নারীমুক্তির বিরুদ্ধে এই বলে তিনি কলম ধরেছেন- 'আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে সেটা আমার কাছে অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাকে একটা ধর্ম মনে করতো;...... প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।' এর সোজা অর্থ হচ্ছে মেয়েদের অধীনতা মেনে নেয়াই মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ অন্যায়।

পুরুষাধীনতাই নারীর জন্য ধর্ম। পুরুষতন্ত্রের অবিচল অনুসারী রবীন্দ্রনাথ স্বামীকে দেখেছেন নারীর দেবতারূপে; যাকে ভক্তি করা নারীর জন্য ধর্ম। তিনি লিখেছেন- 'পতি ভক্তি' বাস্তবিকই স্ত্রী লোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল এক রকম নিস্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। ....

'পতিভক্তি'র মতো একটি মধ্যযুগীয় ধারণা ও শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। স্বামীর অধীনতাকে তিনি বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক দু'রকম যুক্তি দিয়েই; স্বামীর অধীনে থাকা নারীর জন্য একদিকে আধ্যাত্মিক ধর্ম, আরেক দিকে ইহজাগতিক কর্তব্য; দু'ধরনের শিকলেই নারীকে বেঁধেছেন তিনি। নারী সম্পর্কে যখন তাঁর এরূপ চিন্তা-ভাবনা তখন তাঁর বয়স মাত্র উনত্রিশ।

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে, স্ত্রী লোক ততই অসুখী হচ্ছে'। কবির ভাবখানা এমন যেন সভ্যতা অগ্রসর না হওয়ায় আমাদের নারীরা বেশ সুখে আছেন।

নারীকে গৃহবাসিনী করে রাখার সব দোষ প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে তিনি পুরুষকে এ ব্যাপারে দায়মুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়ে গৃহবাসিনী করিয়াছে- পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে- অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও পাইবেন না (অন্যন্যা ১৯)।'

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, প্রকৃতিই বিকলাঙ্গ করে তৈরী করেছে নারীকে, তাই তাকে থাকতে হবে ঘরে, মানতে হবে পুরুষাধিপত্য।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে গৃহে দেখতে চেয়েছেন এবং সব সময় মনে করেছেন প্রকৃতিই নারীর মধ্যে নিজের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করার জন্য নিয়েছে এ ব্যবস্থা। পুরুষরাই যে নারীকে ঢুকিয়েছে ঘরে। এ কথা তিনি স্বীকার করতে চাননি। তিনি বলেছেন, মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধনমানা প্রবণতা আছে, সে জন্য এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে ('নারী' কালান্তর)।

এতো গেলো ডঃ হুমায়ূন আজাদের বিরাট 'নারী' গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি। এ গ্রন্থের বাইরে এখানে রবীন্দ্রনাথের আরো দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়, যা থেকে নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের হীন ধারণার জাজ্বল্যমান প্রমাণ মিলবে। যেমন তিনি এক জায়গায় লিখেছেন- 'রমণীর মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর।' অর্থাৎ কবি রবীন্দ্রনাথের মতে, নারী এমনি এক ভয়ানক প্রাণী যে, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। মুখের মিষ্ট কথা তার মুখোশ, অন্তরে শাণিত ধারালো ক্ষুর, যা দিয়ে সে পুরুষের চরম সর্বনাশ করতে পারে।

'সোনার তরী'র 'মানসী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে বলেছেন-

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তারে সৌন্দর্য সঞ্চারী।'

এই কবিতার শেষে নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন বিধাতা নারীকে সৃষ্টি করেই কর্তব্য শেষ করেছেন, তাকে সুন্দরের প্রতিমূর্তি করে গড়েছে পুরুষ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নারীর মানুষ হিসেবে পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেনি, রয়ে গেছে অর্ধেক মানবী। নারী সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করে নারীকে কি অপমান করেননি রবীন্দ্রনাথ? পুরুষের কাছে নারীর কতটুকু চাওয়া-পাওয়া বা

প্রত্যাশা রয়েছে, সেই অন্তর্বাণী একজন নারীর জবানীতে কবিতার ভাষায় প্রকাশ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেমন ঃ

"দেবী নহি, নহি আমি
সামান্য রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাতায়
সেও আমি নই;
অবহেলা করি পুষিয়া
রাখিবে পিছে,
সেও আমি নই।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটের পথ, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও,
যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব হইতে সহায়
যদি সুখে-দুঃখে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

এখানে কবি নারীকে পূর্ণ মানবীয় মর্যাদা, স্বাধীনতা দেয়ার কথা বলা হয়নি। সুখে-দুঃখে দুর্দিনে একজন অন্তরঙ্গ সাথী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। নারীর চাওয়া-পাওয়ার সীমারেখা এঁকে দিয়েছেন।

আর তথাকথিত প্রগতিবাদী, নারীমুক্তি ও নারী জাগরণে উচ্চকিত সুফিয়া কামালরা রবীন্দ্রনাথকে 'ঈশ্বরে'র আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী দূরে থাক অন্যান্য ধর্মের স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মমর্যাদাশীল নারী সমাজ এরূপ একজন নারী বিদ্বেষী কবিকে 'ঈশ্বর' হিসাবে কখনো মর্যাদা দিতে এবং তাঁর গানের সুরকে এবাদততুল্য গণ্য করতে পারে না। এরূপ নারী বিদ্বেষী কবিকে মহীরূহ আখ্যায়িত করে তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাওয়ার কোন প্রশ্নই আসেনা, কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় মুসলিম নামধারী মহিলারা তা করছে। যা ইসলামী বিধান মতে শিরকী-মহাঅপরাধ।

নজরুলের দৃষ্টিতে নারী

"নজরুল প্রেমের কবি, ধূলো-মাটির মানুষের প্রেমই তার সম্পদ, তার সমস্ত কবিতা রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যথায় ও কামনায় ভরপুর। যে ব্যথা তিনি পান নাই, সেই অপরূপ ব্যথার গান বিনাইয়া বিনাইয়া তিনি গান নাই। নিত্যকার মানুষ যে ব্যথা পায় কাঁদিয়া আকুল হয় তারই ব্যথায় সিন্ধু মথিত করিয়া কবির কাব্য জন্মিয়াছে।"

-বিশ্বনাথ দে'র

কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মে নারীর প্রভার সবচেয়ে বেশি। নজরুল তাঁর হৃদয়ের গভীর ভালবাসার রং তুলি দিয়ে নারীকে গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, কাব্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। নারীর প্রেমেই যে নজরুলের প্রেমের কবিতা ও গানের মূল উৎস- এই উক্তির জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু লেখক বিশ্বনাথ দে'র উক্তিতে। তিনি লিখেছেন ঃ

> "নজরুল প্রেমের কবি, ধূলো-মাটির মানুষের প্রেমই তার সম্পদ, তার সমস্ত কবিতা রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যথায় ও কামনায় ভরপুর। যে ব্যথা তিনি পান নাই, সেই অপরূপ ব্যথার গান বিনাইয়া বিনাইয়া তিনি গান নাই। নিত্যকার মানুষ যে ব্যথা পায় কাঁদিয়া আকুল হয় তারই ব্যথায় সিন্ধু মথিত করিয়া কবির কাব্য জন্মিয়াছে।'

যেটুকু ভালবাসা কবি নজরুল তাঁর মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাকে পুঁজি করে তিনি 'মা' কবিতা রচনা করেন। তিনি লিখেছেন-

"যে খানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশানোই।
মায়ের মতন এত আদর সোহাগ সেতো
আর কোন খানে কেহ পাইবে না ভাই।"

নজরুলের লেখায় নারী জাতি মায়ের প্রতি যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় তা অনুপস্থিত। তবে তিনি যে মায়ের বন্দনা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁর সাহিত্য কর্মে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা গর্ভধারিনী মায়ের নয়; দেবী কালির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী মুক্তির আন্দোলনকে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে 'কোলাহল' বলে ব্যাঙ্গোক্তি করেছিলেন। আর কবি নজরুল "জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা" গানটিতে নারী জাগরণের জয়গান গেয়েছেন এবং তাদের মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানসী কবিতায় নারীকে "অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা", বলে অভিহিত করেছেন, আর কবি নজরুল 'নারী' কবিতায় লিখেছেন-

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীকে গৃহে দেখতে চেয়েছেন এবং তিনি সব সময় মনে করেছেন প্রকৃতিই নারীর মধ্যে নিজের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করার জন্য নিয়েছে এ ব্যবস্থা। পুরুষই যে নারীকে ঢুকিয়েছে ঘরে-এ কথা তিনি স্বীকার করতে চাননি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রকৃতিই নারীকে বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করেছেন, তাই তাকে থাকতে হবে ঘরে, মানতে হবে পুরুষাধিপত্য। কিন্তু কবি নজরুল ইসলাম নারীর দূরবস্থার বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের রক্ত চক্ষু ভ্রূকটিকে উপেক্ষা করে লিখেছেন-

"চোখে চোখে আজ চাহিতে পারনা;
হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা ছুঁড়ে ফেল নারী,
ভেঙ্গে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু
ওড়াও সে আবরণ
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন
যেথা যত আভরণ।"

এমন স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় বিশ্বের আর কোন কবি পুরুষ রচিত কারাগার থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য কলম ধরেছে কি-না আমার জানা নেই।

আর কবি নজরুল সভ্যতার নির্মাণকারিণী হিসাবে নারীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন-

"জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী,
শস্য লক্ষ্মী নারী
সুষমা লক্ষ্মী নারীই দিয়েছে
রূপরসে সঞ্চারী।"

কবি নজরুল আরো লিখেছেন ঃ

“নারীর বিরহে, নারীর মিলনে,
নর পেল কবি প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা,
শব্দ হইল গান।”

জাতীয় কবির এ কথা যথার্থ। এরপরও কবি নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

“নারী এ পৃথিবীতে আলো বর্তিকা নিত্য অনন্ত দিকে তার সৌন্দর্য ঝরে পড়ে সে নারী ভুবনে ভবন রচনা করে রস দ্বীপ জ্বালিয়ে দেয়... তার রূপে না দেখা পরম সুন্দরের ছায়া ফুটে ওঠে। সে পূর্ণ সুন্দরের পথের দিশারী তার প্রেম চির আনন্দ ধর্মের জ্যোতি দেখায়।”

কবি নজরুলের ন্যায় মহাকবি ইকবালের কবিতায়ও নারী প্রসঙ্গে তাঁর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন মার্জিত ও রুচিবোধ সম্পন্ন স্টাইলে। তাঁর লেখার মাধ্যমে ইসলাম ও নারীর প্রতি আন্তরিকতা ও মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। যেমন তিনি লিখেছেন ঃ

মাতৃত্ব তো আল্লাহর রহমত
যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নবুওয়াতের সাথে
যার জন্য আল্লাহ বলেছিলেন,
সৃষ্টি হোক জীবন,
তিনি ঘোষণা করেছেন, মায়ের পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত্
ধরুন কোন অজ্ঞ গেঁয়ো কৃষক রমণীর কথা।
কদাকার, স্থূলদেহী, অশিক্ষিত, অভব্য,
সরল শাদামাটা তার জীবন।
স্বপ্নশূন্য,
মাতৃত্বের যাতনা তার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করেছে।
বিষণ্ন মলিনমুখ, চোখের নীচে তার পড়েছে কালি......
যদি তার কোল থেকে উম্মাহ্ লাভ করে
কোন এক উৎসাহী ঈমানদার মুসলিম বান্দা,
তাহলে বলতেই হবে-
সে মায়ের বেদনা আমাদের সত্তাকে সুরক্ষিত করেছে।
তার সূর্যাস্তের ঔজ্জ্বল্য ঝলসে ওঠে
আমাদের সূর্যোদয়ের সোনালী কিরণ।
এখন আসুন ঐ রমণীর কথায়,
ছিপ ছিপে গড়ন, কোল কালি, চোখেমুখে বিদ্রোহের ছাপ,

চিত্ত চেতনায় সে পাশ্চাত্য প্রভাবের অধীন।
আসলে সে রমণী নয়।
যে বন্ধন আমাদের সমাজকে নিরাপদ রেখেছে,
তাকে এই ব্যক্তি ধ্বংস করে দিয়েছে
তার লাগামহীন যাতায়াত উস্কানিমূলক
গোপন সৌন্দর্য তার উদোম হয়ে গেছে,
বিনয় ও নম্রতাহীন চোখদুটো স্পর্ধায় জ্বলছে।
তার যে শিক্ষাদীক্ষা, তাতে সে মায়ের দায়িত্ব
বহনে অক্ষম, সত্যিই দুর্ভাগা এই নারী।
আমাদের বাগানে ফুলটি না ফুটলেই ভাল ছিল ঃ
ভাল হতো সমাজদেহে এমন অলংকার না থাকলে

....
সতী সাধ্বী ফাতিমাই আদর্শ নমুনা।
সকল প্রাণী তার আদেশ মানত।
তবুও তিনি তাঁর সব ইচ্ছাই
সোপর্দ করেছিলেন মহৎ স্বামীর খায়েশের কাছে
লজ্জা ও সহিষ্ণুতা ছিল তার উজ্জ্বল ভূষণ।
আর তার ঠোঁটে উচ্চারিত হতো আল্লাহর বাণী,
এভাবেই ঘরের কোণে ফাতিমা যাঁতা পিষতেন।

....
ধুরন্ধর ধান্দাবাজ বর্তমান দিনকালের মানুষ,
এযুগে ডাকাত ছিনিয়ে ধ্বংস করে ফাতিমার ঐশ্বর্য।
যার মগজে আল্লাহর চিন্তা নেই, সে অন্ধ।
নির্লজ্জরাই শুধু যুগের শিকারে পরিণত হতে পারে।
এ-যুগের বেলাগাম দৃষ্টি নিজেকে মুক্ত ভেবে বিভ্রান্ত হয়।

হে নারী! তুমি সংরক্ষক
আমাদের জাতির যা পুঁজি সম্ভ্রমকে বাঁচাও।
আমাদের শিশুরা তোমার বুকের দুধ খেতে
প্রথম তোমার কাছেই শেখে, আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নাই,
আমাদের মুরুব্বীরা যে পরিচিত পথে চলে গেছেন,
তার অনুসরণেই সন্তুষ্ট থেকো।

লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে ব্যতিব্যস্ত হয়োনা।
যুগের অভিশাপ থেকে সতর্ক হও
আর তোমার প্রসারিত বক্ষে জড়িয়ে ধর সন্তানদেরকে
বাচ্চারা তো সবুজ চত্বরে বিচরণরত মুরগীর শাবক।
উড়তে চাইলেও তাদের পাখা নাই।
তাদের উষ্ণ নীড়ে থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে।
তোমার আত্মার আকুতি শোন,
সময় থাকতে সচেতন হও
তোমার মডেল ফাতিমাকে দেখে।
তবেই তো তোমার ঘরে আসবে নতুন হোসেন।
আমাদের বাগানে তখন সোনালী যুগ আসবে। (অনুবাদ- মীযানুল করীম)

পৃথিবীতে যত ধর্মের কথা আমরা জানি এবং বর্তমানে প্রচলিত আছে, এর মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারী জাতিকে দিয়েছে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার। যা অন্য কোন ধর্মে লক্ষ্য করা যায়না। ঠিক তেমনি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর বিশাল সাহিত্য কর্মে নারী জাতিকে যেভাবে সম্মানিত, মহিমান্বিত করেছেন, সমান চোখে দেখেছেন, নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান আদায় করার জন্য বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছেন, অন্যান্য কবির লেখায় তা বিরল। নারী জাগরণে নজরুলের ভূমিকা বা অবদানের কথা এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলা যায়, নারী সম্পর্কে কবি নজরুল যা লিখেছেন তাতে ইসলামের মর্মবাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'নারী' কবিতায় নজরুল যা বলেছেন,"সেটাই নারীর শাশ্বত সত্য।"

আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সাহিত্য কর্মে 'নারী' জাতি সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে হিন্দু ধর্মীয় মর্মবাণীই সার্থকভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর মতে ঃ

"নারীর অন্তর নির্মল হতে পারে না। কারণ মন্ত্র দ্বারা তার সংস্কার সাধন সম্ভব নয় এবং বেদাদি শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নেই।"

মনু আরো বলেন, "গর্ভধারণের জন্যই নারীর সৃষ্টি।' মনু সংহিতায় আছে, "কাম-ক্রোধ, কুৎসিত আচার, হিংসা, কৌটিল্য-এ সমস্ত নারী জাতিতে উদ্ভব হয়ে থাকে।"

হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে এর অধিক কিছু দিতে সক্ষম হয়নি। এ ধর্মে নারী হচ্ছে সেবাদাসী।" ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর লেখায় নারী সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ করেছেন তা হলো 'নারীর মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর।"

আরবী ভাষার বিখ্যাত মরমী কবি ইবনে আল আরাবী বলেছেন ঃ তার মতে, স্রষ্টার কোন মনোরম ছবি আমরা যখন কল্পনার ক্ষেত্রে অবলোকন করতে চাই, তখন কেবল

তা ফুটে উঠতে চায় নারীর ছায়া মূর্তি নিয়ে। মুসলমান সমাজে কবিরা, বিশেষ করে কবি নজরুল ও মরমী কবিরা যেভাবে মেয়েদের সৃজনী শক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। মুসলিম সমাজে কবিরা অন্তত মেয়েদের ছোট করে দেখতে চাননি। কেবল মুসলিম সমাজে নয়, সব সমাজেই মেয়েদের অনেক অসম ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শারীরিক শক্তির ন্যূনতার অনেক কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পুরুষ দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। কিন্তু সেটাই সব সত্য নয়। পুরুষ পেতে চেয়েছে নারীর ভালবাসা। গড়ে তুলতে চেয়েছে সুখের সংসার। পেতে চেয়েছে ঘরকন্নার সাধারণ আনন্দ। এই ইতিহাস ভুলে যাবার নয়। পুরুষ ও নারী একে অপরকে বাদ দিয়ে চলেনি কোনদিন। এর সুন্দর উপমা রয়েছে মুসলিম সমাজের মরমী কবি রুমির একটি কবিতায়। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ

> "যদিও তুমি তোমার স্ত্রীকে শাসন করতে পার বাহ্যিকভাবে
> তথাপি তুমি শাসিত হও তার দ্বারা তোমার নিজের অন্তর থেকে।
> কারণ তুমি তাকে কামনা কর
> অন্তরের অন্তস্থল হতে।
> এইটাই স্বভাবধর্ম সৎ মানুষের।
> মানুষ নয় অন্য প্রাণীদের মত
> কারণ অন্য প্রাণী ভালোবাসতে জানে না
> কিন্তু মানুষ তা জানে।
> ভালোবাসাতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, অন্য
> প্রাণীর থেকে।"

নবী বলেছেন ঃ

> "জ্ঞানীদের উপর কাজ করে চলে নারীর প্রভাব
> কিন্তু মূর্খদের প্রভাব পড়ে নারীর উপর।
> নবীরা পরাভূত হয় তাদের হিংস্রতার কাছে।
> কারণ মূর্খদের মধ্যে থাকে কেবল জান্তব প্রবৃত্তি।
> ভালবাসা ও অনুরাগ হলো মানবিক গুণ
> কাম ও ক্রোধ হল পশুদের ধর্ম।
> মূর্খদের মধ্যে যা প্রকাশ পায় ভয়ঙ্কর রূপে।
> নারীদের মধ্যে ফুটে উঠে স্রষ্টার দীপ্তি
> বলা যায়, মেয়েরাই সৃজক শক্তি
> সৃষ্টির পরিচয় তারা নয়।"

কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মেও এ কথাগুলো সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ নারী জাগরণের কথা বলেছেন। কিন্তু বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এবং কবি নজরুলের মতো নারী জাগরণের কথা সে যুগে কেউ

বলেননি। কবি নজরুল তাঁর কালজয়ী রচনায় নারী জাগরণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"অসতী মাতার পুত্র যদি সে
জারজ পুত্র হয়
অসৎ পিতার সন্তানও তবে
জারজ সুনিশ্চয়ই।"

নারী জাগরণ ও নারী অধিকার সম্পর্কে কবি নজরুল যেভাবে প্রতিবাদী বক্তব্য রেখেছেন; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর কাব্যে নারীর রূপচর্চা ও সৌন্দর্য্যের চিত্র এঁকেছেন নানা আঙ্গিকে। যেমন ঃ

কুরুবকের পরতো চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলা কমল রইতো হাতে কি জানি কোন কাজে।
অলক সাজতো কুন্দফুলে,
শিরীষ পরতো কর্ণমূলে,
মেসলাতে দুলিয়ে দিত নব নীপের মালা,
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে,
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু মাখতো মুখে বালা।
...... কঙ্কুমেরই পত্রলেখায় বক্ষ রইতো ঢাকা,
আচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।

....

মুখে তার লোধ্ররেণু লীলা পদ্ম হাতে
কর্ণমূলে কুন্দকালি, কুরুবক মাথে।
তনুদেহে রক্তাম্বর নারীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নুপুরখানি বাজে আধা আধা॥

এ প্রসঙ্গে আমি আর মন্তব্য করতে চাইনা। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ লেখক ও কলামিস্ট জনাব হারুনুর রশীদ-এর নারী প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে ইতি টানছি।

ফুল ও নারী। এই দুই বস্তুর প্রতি অপার আগ্রহ ও বল্গাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি, এমন কবি, শিল্পী বা সঙ্গীতকার পৃথিবীতে কখনোই জন্মাননি। শেক্সপীয়র বলেছিলেন, যে ফুল ভালোবাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু যে ফুল ভালোবাসে, সে যে মানুষ খুন করতে পারে না, এ কথাইবা কে বললো? বাস্তবে তো দেখি, সমাজে যারা পাঁপ বদমাশ, খুনী, ক্রিমিন্যাল, তাদের বাড়ীতেও ফুলের আবাদ থাকে, তাদের বাসর শয্যাও সাজানো হয় ফুলে ফুলে। আসলে ফুল বোধ হয় ভালোমন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষই ভালোবাসে। তেমনি নারীও।

রবীন্দ্র সাহিত্যে অশ্লীলতা

রবীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দু সমাজে কেন, পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না। অশ্লীলতা ঘৃণ্য বটে, কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আস্তাকুঁড়ে হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। .... ইহার, সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবদ্ধ, ইহার উপমা ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।'

-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রবচন রয়েছে 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল'- এই তিনটি শব্দ সাহিত্য ও শিল্প-কলার মূল দর্শন। যেহেতু শিল্পকলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক তাই এ বিষয়টি আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

রক্তে-মাংসে গড়া প্রতিটি মানুষ দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে অথবা ফুলের মতো পবিত্র নয়, একমাত্র মহামানব ছাড়া। সুতরাং লেখক-সাহিত্যিকেরাও এ সমাজ জীবনের বাইরে নন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক অসুন্দর, অপবিত্রতার কাহিনী কমবেশী রয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত জীবনের চৌহদ্দিতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সাহিত্যে টেনে এনে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া একজন রুচিসম্পন্ন লেখকের কর্ম নয়। এ কর্ম কুরুচিসম্পন্ন বিবেকহীন লেখকরাই করে থাকে। এরা ফনা তোলা বিষাক্ত সর্পের ন্যায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে বসে থাকে সমাজের উঁচুস্তরে। এসব লেখক নামের কলংক বিষধর সর্পেরা লেখনীর মাধ্যমে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ ঢুকিয়ে লাভ করেন প্রচুর বিকৃত তৃপ্তি। কিন্তু রুচিশীল, সৃষ্টিশীল লেখকেরা কর্মের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন পবিত্রতাবোধ। শিক্ষা দেন নৈতিকতাবোধ। সমাজকে সুন্দর ও সুখী করতে সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে গড়ে তোলেন সামাজিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ। তারা জীবনবোধকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন বা পরিবেশন করেন অত্যন্ত নিখুঁত সুন্দর ও পরিমিতভাবে, যেন সমাজের মানুষ তাদের লেখা পড়ে ভাব তরঙ্গে দোল খেতে খেতে পৌঁছে যায় মানবীয় কল্যাণের শীর্ষে।

সাহিত্যে সমাজের চালচিত্র, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে-

এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং যৌনতা বাস্তব জীবনের বাইরে নয়। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে যা প্রকাশ্যে সবার কাছে বলা যায়না; তা সাহিত্যে শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে প্রবেশ করাও শোভা পায়না। যদি করা হয়, তাকেই সামাজিকভাবে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করা হয়। সাহিত্যের এসব অশ্লীলতা একটি সুস্থ সমাজকে অসুস্থ করে। পাপ-পঙ্কিলতার দিকে জাতিকে ঠেলে দেয়। সাহিত্য মানুষকে আদর্শের বাণী শিখায়; অশ্লীলতা শিক্ষা দেয় না; সাহিত্য সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়; অসুস্থ সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয় না। সাহিত্য সামাজিক সুশৃঙ্খলতা শিক্ষা দেয়; উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দেয় না। সাহিত্যে নারী থাকবে জায়া, ভগ্নী ও জননী হিসাবে, এটাই শ্লীল সাহিত্যের দাবী।

প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক যেমন কবি নজরুল, শেখ সাদী, কবি হাফিজ, ওমর খৈয়ামসহ অনেকেই সাহিত্যের প্রয়োজনে কিছুটা অশ্লীলতা জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা কখনোই নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। তাঁদের লেখায় নারীকে নিয়ে পবিত্র প্রেমের, শ্রদ্ধার, ভালোবাসার, স্নেহের নিদর্শন রয়েছে। নর-নারীর স্পর্শকাতর অঙ্গ ও যৌনতাকে উপমা, শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশে ব্যবহার করেছেন। যেমন কবি নজরুল কবিতা, গানে, গল্পে উপন্যাসে নারীকে মহীয়ান করে তুলেছেন। তিনি তার বিশাল সাহিত্যে অশ্লীলতা দূরে থাক কোথাও 'স্তন' শব্দটিও ব্যবহার করেননি। (দ্রষ্টব্য 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা; কবি আতাউর রহমান')। মতান্তরে 'স্তন' শব্দটি উপমা অর্থে তিন থেকে পাঁচ জায়গায় ব্যবহার করেছেন।

কবি হাফিজ নারীদেরকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন এভাবে-

'প্রিয়ার মোহন চাঁদ কপোলে
একটি কালো তিলের তরে।'

এখানে স্রষ্টার প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে বিশ্রী কাম ভাবের প্রকাশ ঘটেনি।

কবি হাফিজের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। কবিতাটি স্মরণে নেই। কিন্তু ভাবার্থ স্মরণে আছে। তাঁর সেই কবিতায় নারীর যোনীকে পাহাড়ের ঝর্ণা এবং যৌন কেশকে পাহাড়ের ঘাসের সাথে তুলনা করেছেন। এ কবিতায় অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটাননি; বরং পাহাড়ের ঝর্ণা এবং নারীর যোনীর সাথে স্রষ্টার সৃষ্টির তুলনা করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র এঁকেছেন।

ফুলের সৌন্দর্যে যেমন সাহিত্য, তেমনি নারীর সৌন্দর্যেও সৃষ্টি হয়েছে অঢেল সাহিত্য। নারী ও ফুল যে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ তা বিশ্বের অনেক কবির কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে। পারস্য দেশীয় কবি ওমর খৈয়াম বলেছেন-

"ওগো নারী, শ্রেষ্ঠ তুমি অবনীর,
গোলাপে গঠিত যেন ভিতর বাহির।
মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে তাই মনে হয়,
নারী তো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্মিক নারী।' অথচ এহেন মূল্যবান সম্পদটির অবমূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য যেভাবে কলংকিত হচ্ছে, তাতে নারীর সৌন্দর্য-গৌরব বিলীন হবার পথে। এদিকে পুরুষও ঐ কলংকিত সৌন্দর্যের মাধুর্য হারিয়ে স্বাদে বিস্বাদ কুড়াচ্ছে। একটি নারী ও পুরুষের প্রেম সাংসারিক শান্তি তথা মানবতার প্রশান্তির জন্য কতটুকু প্রয়োজন, সে সম্পর্কে শেখ সাদী সুন্দরভাবে লিখেছেন-

'সম্রাটের সমসুখী হবে সে বিভারী
থাকে যদি গৃহে তার মনমত নারী।
শত দুঃখ থাক মনে, দুখ কিরে ভাই?
নিরালয় দুঃখহারী সাথী যদি পাই।
গৃহে যার ধনজন, বিবি অনুগত,
খোদার করুণা তাঁর উপরে সতত।'

শেখ সাদী'র এহেন চিন্তাই যে নারীর আসল রূপ তা অনেকে চিন্তা করেন না। তাদের মতে নারী কামাতুর এবং সেটিই নারীর আসল রূপ। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত জীবনের নোংরা মানসিকতা, অন্তরের লালিত পুঁতি গন্ধময় ভাবনা টেনে এনেছেন তাঁর বিশাল সাহিত্য কর্মে। অনেক সুন্দর-সুন্দর, ভালো-ভালো কথার পাশাপাশি কামাতুর-লোভাতুর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপবিত্র প্রেমের নোংরা মানসিকতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে লেখা 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতায় দেখা যায়, যৌবন সুলভ ভোগানুরাগের উপস্থিতি। এতো বড় মাপের একজন কবি হয়েও তা লিখতে বিবেকে বাধেনি। পাঠকেরাও তা পড়তে অপরাধবোধ করেনি।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কবিতায় নারীর 'স্তন' সম্পর্কে লিখেছেন-

'স্তন হাতে টেনে নিলে
কাঁদে শিশু ভরে
মুহূর্তেই সান্ত্বনা পায়
গিয়ে স্তানান্তরে।'

এখানে 'স্তন'-কে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহৎ ভাবের প্রকাশ ঘটালেও ব্যক্তিগত জীবনে লুকিয়ে নারীর স্তন দেখেছেন। তিনি তা দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন 'সোনার তরী'র 'নিদ্রিতা' কবিতায়। তিনি লিখেছেন-

'কমল ফুল বিমল মেজখানি
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা;
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষ,

বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে, ভারে;
একটি বাহু বক্ষ পরে পড়ি
একটি বাহু লোটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুট রয়েছে যেন ঢাকা অনাঘ্রাত
পূজার ফুল দু'টি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ রচনা বলে খ্যাত 'চিত্রাঙ্গদা'। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবন বল্লভ!" দুই বাহু দিলাম বাড়ায়ে।
চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হ'য়ে গেল অসহ্য পুলকে।'

কবি চিত্রাঙ্গদা'র মুখ দিয়ে প্রথম মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেম সংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গে ব্যাপিয়া
বীনার ঝংকার-সম, সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিল
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি।
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি।

চিত্রাঙ্গদা'র মুখ দিয়ে মিলনের আহ্বান জানিয়ে কবি লিখেছেনঃ-

'শিলা খন্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস, নাথ, বিরল বিরামে।

জবাবে অর্জুন বলছেন ঃ

আজ নহে

প্রিয়ে।

অন্যস্থানে সেখানে চিত্রাঙ্গদা বলছেন-

'বাহুবন্ধে

এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা। প্রণয়ের

সুধাময় চির-পরাজয়ে।'

তার উত্তরে অর্জুন বলছেন-

'ঐ শোনো

প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে

আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।'

চিত্রাঙ্গদা বলছেন : কেন নাথ।

জবাবে অর্জুন : শুনিয়াছি দস্যুদল

আসিছে নাশিতে জনপথ। ভীত জনে

করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা : কোনো ভয় নাই প্রভু।

তীর্থ যাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা

স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী।

দিকে দিকে বিপদের যত পথ ছিল

বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

সংসারের বাইরে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমলীলার মধ্যে শ্রান্তি ও অবসাদ ক্রমে এসে পড়েছে। অর্জ্জুন কেবল রূপ উপভোগে আর পরিতৃপ্ত হতে পারছেন না। তাঁর মন গুমরে কাঁদছে সংসারে ফিরে যাবার জন্য। অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করছেন ঃ

'কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে-ভবনে

কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?'

চিত্রাঙ্গদা বলছে-

'প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?'

যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই পরিচয়।

শেখ রাত্রিতে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলছে ঃ

প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত

সুগঠিত নবনী কোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান? আর কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু।
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

চিত্রাঙ্গদা নাট্যের পরিসমাপ্তিতে কবি চিত্রাঙ্গদার মুখে বলিয়েছেন-

আমার পাইবে তবে পরিচয়। 'গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি তারে এক-দিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম!
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা
রাজেন্দ্রনন্দিনী।'

উত্তরে অর্জুন বললেন-

'প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।'

রবীন্দ্র যুগে ভদ্র সমাজে নাচের প্রচলন ছিল না, নাচ একমাত্র নিষিদ্ধ পল্লীতে সীমাবদ্ধ ছিল। বাঈজীর নৃত্য-কলার মাধ্যমে খদ্দের আকৃষ্ট করতো। দেহ ব্যবসায় দেহ বল্লরীর মাদকতা মূল কথা। এই ব্যবসায় কামোদ্দীপক নাচে যে যত বেশী চৌকস তার ততবেশী দাম। সুন্দরী না হলেও মনোহর নাচের দ্বারা পতিতারা বাজার মাত করতো। নৃত্য কামোত্তেজনা বৃদ্ধির একটি অমোঘ অস্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ভদ্র সমাজে নাচের আমদানি করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তার "ন হন্যতে" গ্রন্থে এ দাবী করেছেন ঃ

"১৯২৬ কিংবা ১৯২৮ সালে শিলং গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে মনিপুরী লোকনৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথই প্রথম রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের নৃত্য প্রবর্তন করলেন। দর্শকেরা টিকিট করে সে নাচ দেখতে গেল। বাঙালী ঘরের মেয়ে সহস্র লোকের চোখের সামনে অঙ্গসঞ্চালন করবে-এ কথা চিন্তা করে অনেকেরই রাত্রির নিদ্রা চলে গিয়েছিল। এ একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা। হয়তো রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়েও কঠিনত। রবীন্দ্রনাথকে তাই সাবধানে চলতে হয়েছিল। প্রথম যে নাটকে এই নৃত্য জলসা হলো সে 'নটীর পূজা'-কথা ও কাহিনীর 'শ্রীমতী' কবিতাটিকেই ঐ নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'নটীর পূজা' অর্থাৎ নৃত্যটাও নৃত্যশিল্পীর জন্যে পূজোই- এই বিশেষ ব্যঞ্জনার দ্বারা নটীর

কলঙ্কমোচন করা হয়েছিল খুব সূক্ষ্মভাবে। যে গানটির সাথে নৃত্য করলে 'শ্রীমতি নামে যে দাসী' সে হচ্ছে 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম'... নতর্কী ভগবান বুদ্ধকে বলছে, 'তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে' কিংবা 'আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কি আরাধনা'... সেই আরাধনার ভাবমূর্তি দেখে নিন্দুকেরা কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আমি 'নটীর পূজা' দেখিনি। কারণ নাচ দেখবার তখন আমার বয়স হয়নি।"[১]

শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী যথার্থই বলেছেন ঃ

"এ এক রকম বিদ্রোহ ঘোষণা। হয়তো রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়েও কঠিনতর। রবীন্দ্রনাথকে তাই সাবধানে চলতে হয়েছিল।"

তবু সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সে সময় সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, নাটকে তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অবিভক্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ডিএল রায় তার নাটকে নর্তকীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু মঞ্চে 'বাঙালী' ঘরের মেয়ে সহস্র লোকের চোখের সামনে অঙ্গসঞ্চালন করবে'- এটা মেনে নিতে পারেননি।[২]

'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন ঃ

'রবীন্দ্র বাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি লউন। এটি রবীন্দ্র বাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কিনা? তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম। মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি এই- 'অর্জুনা মনিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমাণনা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়ে মুগ্ধ হন এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করেন।'

এই গল্পটি রবীন্দ্র বাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল........রবীন্দ্র বাবু কোর্ট পিনের অবতারণা করিলেন। হউক বা অস্বাভাবিক, নতুন রকম তো হইল। 'ডুববে না হয় ডুবাবে- একটা নতুন হবে খুব।' কোর্টশিপ না হলে প্রেম হয়। রবীন্দ্র বাবুর কাব্যের গল্পাংশ এই-

বনমধ্যে অর্জুনকে দেখিয়ে উপযাচিক হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জুন সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাহাদের (বোধহয়) বিবাহ হয়। অদ্ভুত কোর্টশিপ। এ কোর্টশিপে একজন সামান্য ইংরেজ নারী সম্মত হইতো না। কিন্তু তাহা একজন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন। চমৎকার!

রবীন্দ্র বাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্র সন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা এক মনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্তত করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর

১। শ্রীমতি মৈত্রয়ী দেবী ন হন্যতে' আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত এ কালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঃ প্রাইমা পাবলিকেশনস ঃ ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ঃ ১৯৭৪ ঃ পৃঃ ৯৩।

২। তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ১৫/৩/৯৭, ওবায়দুল হক সরকার।

তিনি যে সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জুন- যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করেন। তিনি রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার সর্বনাশ করিলেন।

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারি মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমায় যে এহেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। একজন যে সে হিন্দু কুলবধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত কিন্তু ধর্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে। আর কি বলিব- বর্ষকাল, দ্বিধা নাই, সংকোচ নাই, ধর্ম নাই কেবল নিত্য ভোগ আর ভোগ; আর নির্লজ্জভাবে তাহার বর্ণনা আর কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি। দুঃখ তাহা নহে যে, 'কল্য রাত্রিকালে কি করিলাম।' দুঃখ এই মাত্র 'হায়, আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম, বর্ষকালের ভিতর কি তাহার পরেও ব্যভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না। তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য দুর্নীতিমূলক হউক, ইহা মনুষ্য স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সংকোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারী জাতির সম্পত্তি, একজন কুলাঙ্গারকে এরূপ নির্লজ্জা কুলটা করিতে হইলে একটা আয়োজন চাই। রবি বাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোন আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্র বাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারত চন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর কবি বাবুকে Chaste কবি বলেন। কিন্তু ভারত চন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ indecent কিন্তু immoral নয়। রবীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দু সমাজে কেন, পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না। অশ্লীলতা ঘৃণ্য বটে, কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আস্তাকুঁড়ে হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্র বাবু এই কাজকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি বঙ্গদেশে আর কোন কবি অদ্যাবধি করেন নাই। সে জন্য এ সুনীতি আরও ভয়ানক।

আমি 'চিত্রাঙ্গদার' সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার, সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবদ্ধ, ইহার উপমা ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।'[৩]

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একজন হিন্দু হয়ে চরম নৈতিকতা বিবর্জিত 'চিত্রাঙ্গদা' পুস্তকটি পুড়িয়ে ফেলার মত প্রকাশ করেছেন, আর শতকরা নব্বই ভাগ অধ্যুষিত এই মুসলিম দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চিত্রাঙ্গদা। এ সম্পর্কে সচেতন মহলের অভিমত হলো 'বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ যৌনাচারে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে।'

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ কাব্যে নীতি ঃ সাহিত্য ঃ ২০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

প্রখ্যাত অভিনেতা ও লেখক ওবায়দুল হক সরকারের দেয়া তথ্য সূত্রে জানা যায়- ১৯২৮ সালে 'অবতার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিফিলিস হয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল আক্ষেপ করেছেন ঃ 'বর্ষকালের ভিতর কি তাহার জ্বলেও ব্যাভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না।'[৪]

ভারতীয় লেখক চিদানন্দ দাশ গুপ্ত এক প্রবন্ধে লিখেছেন- 'শিব পুরাণে শিব স্বয়ং বলেছেন, যেখানেই পুরুষের উচ্ছ্রিত লিঙ্গ আছে, সেখানেই আমি আছি।' আবার ঐ পুরাণেই আছে- লিঙ্গই সর্বসুখের আধার। একাধারে পার্থিব সুখ ও মোক্ষলাভের উপায়। লিঙ্গ দর্শন, লিঙ্গ স্পর্শ ও লিঙ্গ ধ্যানের মধ্য দিয়েই জীব সকল জন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্তি পায়।

শ্রী দাশ গুপ্ত আরও লিখেছেন ঃ

'শিবের মন্দিরে-মন্দিরে যোনী মধ্যে প্রবিষ্ট লিঙ্গের পূজা হাজার হাজার বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। মোহেনজোদাড়োতেও উচ্ছ্রিত লিঙ্গ নিয়ে পশুপতি জীবজগতের মধ্যস্থলে সমাসীন।' অতএব লিঙ্গ পূজা, লিঙ্গ ভক্তি, লিঙ্গ যজ্ঞ অন্য ধর্মের মানুষের মনে চরম অস্বস্তি জাগালেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম জ্ঞানে পূজ্য।'[৫]

এ সম্পর্কে লেখক, অভিনেতা আরিফুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে লিঙ্গ রমণ, সঙ্গম, রতিক্রিয়া প্রভৃতি গোপন বৃত্তিগুলোকে নিয়ে কোন গোপনীয়তা রাখো-ঢাকো নেই। তাই তো দেখা যায়, কোন সরকারী অফিসে দিব্যি নেমপ্লেট ঝুলিয়ে অফিস করছে কোন কুমারলিঙ্গম, বৃহৎ লিঙ্গম বা মহালিঙ্গম নামের বড় সাহেব। অথবা অধ্যাপনা করছেন বা ছাত্রী পড়াচ্ছেন কোন রমণী-রমণ, রাধারমণ বা রমণ লাল বাবু। এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, রমণের দ্বারাই 'লাল' বা সন্তান উৎপাদন হয়। কিংবা রমণীর সৃষ্টিই হয়েছে রমণ বা যৌন কর্মের জন্য। তাই বলে এসব কথা মানুষের নাম রেখে, ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে বেড়াতে হবে, এমন অদ্ভুত সংস্কৃতি ভূমণ্ডলে আর কোথাও আছে কি-না আমার জানা নেই। লিঙ্গ চর্চা, রমণকার্য উগ্রকামাচার প্রভৃতি সংস্কৃতিই তাদের ধর্মে, মন্দির গাত্রে, পোশাকে, নাটকে, মহাকাব্যে, বোম্বাইয়া ফিল্মে, সর্বত্র পরিব্যপ্ত।

এই কুমার লিঙ্গম, মহালিঙ্গম সংস্কৃতির ধারক-বাহক এ দেশীয় তাত্ত্বিকদের চিন্তা-চেতনায় মন ও মগজে লিঙ্গ রমণ, সঙ্গম, রতিক্রয়া প্রভৃতি গোপন বৃত্তিগুলোকে নিয়ে তাদের সাহিত্যে কোন গোপনীয়তা নেই। সুতরাং কবি গুরুর ভক্ত, অনুসারী ও পূজারীদের কাছে 'মসজিদের আজান বেশ্যার ধ্বনি' এবং নারীর শরীরকে 'জ্যোস্না ধোয়া মসজিদের মতো' মনে হওয়া স্বাভাবিক। কথায় আছে- 'ফুল থেকে মৌমাছি মধু গ্রহণ করে, আর মাকড়সা গ্রহণ করে বিষ'। রবীন্দ্রনাথের এই ভক্তরাও ঠিক তাই।

৪। দৈনিক সংগ্রাম, উপসম্পাদকীয় ১৫/৩/৯৭।
৫। বিদ্যোশ্বর সংহিতা ১/৯/৪৩-৪৪, ১/৯/২৩।

হাবিলদার বেশে কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুলের জীবনে প্রেম

কল্যাণীয়াসু ঃ জীবনে তোমাকে পেয়েও হারালাম। তাই মরণে পাব-সে বিশ্বাস ও সান্তনা নিয়ে বেঁচে থাকব। প্রেমের ভুবনে তুমি বিজয়িনী, আমি পরাজিত। আমি আজ অসহায়। বিশ্বাস করো, আমি প্রতারণা করিনি। আমাদের মাঝে যারা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে- পরলোকেও তারা মুক্তি পাবে না। তোমার নব অভিযাত্রা সুখের হোক।

-নজরুল

কবি নজরুল তিনজন প্রতিভাময়ী মহিলার সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এদের একজন হলেন বনগ্রামের রানু সোম ওরফে প্রতিভা বসু, যিনি বর্তমানে সুলেখিকা ও স্বর্গীয় বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী, দ্বিতীয়জন হলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মৈত্রি ও তাঁর কন্যা উমা মৈত্র ওরফে নোটনের সঙ্গে। রানু ও নোটনের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা তা প্রধানত সংগীতের জন্যই। রানু সোমকে নজরুল স্বরচিত ও সুরারোপিত গান শেখাতেন। সদ্যযৌবনা এই মহিলার কণ্ঠও ছিল অত্যন্ত সুরেলা। যেদিন সন্ধ্যায় ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নজরুল রানুদের বাড়িতে গেলেন, সেদিনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার চিত্রটি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন প্রতিভা বসু ঃ

"তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, এই তো তুমি তুমিই রানু। ঠিক ত? তুমিই মন্টুর ছাত্রী। মন্টু দিলীপকুমার রায়ের ডাক নাম।

আমার বুকটা ঠক করে কেঁপে উঠল। মনে মনে বললাম, তবে কি ইনিই তিনি? আমি রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, আপনি-আপনি কি-

আমি নজরুল ইসলাম, বড় বড় গলায় হাসলেন। নজরুল ইসলামের বয়স তখন তিরিশ বত্রিশ অথবা আরো কিছু বেশি কি-না আমি জানি না। যৌবন তাঁর চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মত বহমান ও বেগমান। সেই বয়সে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন শুধু তাঁদেরই বোঝান যাবে কি দুকূলপ্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তাঁর চরিত্র। আমার মত একটা নগণ্য নসদ্য কিশোরীর জীবনে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে সেদিন যে প্রচন্ড সুখ এবং সম্মান এনে দিয়েছিল তার কোন তুলনা নেই।"[১].....

রানু ও নোটনের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কবি বন্ধু মোতাহার হোসেনের

১। নজরুল ইসলাম ঃ প্রতিভা বসু, দেশ ২৪ মে ১৯৮০।

লেখাও তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ঃ

"এবারে বনগাঁর অধিবাসিনী প্রতিভার সোমা এবং রমনা হাউসের অধিবাসিনী উমা মৈত্র ওরফে নোটন (ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা) এই দুই জনের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় হয়.... রানুর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও সুরেলা ছিল। নজরুল একে গান শুনিয়ে আনন্দ পেতেন। .... রানুকে গান শেখাবার পেছনে কবির আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, দিলীপ রায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। দিলীপ রায় ইতিপূর্বে টিকাটুলির অধিবাসিনী বেনুকা সেনকে গান শিখিয়েছিলেন। ..... নজরুল চেয়েছিলেন রানুকে দিয়ে দিলীপের সাগরেদ বেনুকার চেয়েও উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রেকর্ড সংগীত গাওয়াবেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।"[২]

রানু সোমদের বনগ্রামের বাড়িতে প্রথম দিনের আলাপেই রানুর পিতা-মাতাকে আপন করে নিলেন নজরুল এবং সকলের অভ্যর্থনা আন্তরিকতায় নিজেও একজন হয়ে গেলেন পরিবারের। সেদিন সন্ধ্যা রাতেই জমে উঠল আসর, দু'তলার একটি প্রশস্ত ঘরে। হারমোনিয়াম বেরুল বাক্স থেকে। বাটভরা পান এল, এল কাপের পর কাপ চা। কখনো নজরুল গান, কখনো রানুকে দিয়ে গাওয়ান। রানু যখন গানে টান দেন এবং সঠিক সুরটি গলায় উঠে যায় আপনভোলা কবি প্রফুল্ল হয়ে বলে উঠেন ঃ 'অভোলন', 'অভোলন'। দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ যে কি তা একমাত্র কবিই সঠিক বলতে পারতেন। হয়ত বা এর অর্থ এমন হতে পারে, 'ভোলা যায় না, ভোলাই যায় না- এ সুরের দোলা সারা জীবন মনকে নাড়া দেবে, দোলা দেবে।'

পরের দিন সকালে এলেন রাতে লেখা সদ্য সমাপ্ত একটি গান নিয়ে। গানটির ভাবার্থের সঙ্গে সদ্য পরিচিত হওয়া সোম পরিবারের কোন সম্পর্কসূত্র আছে কি? সংগীতটি একবার পড়ে নেওয়া যাক ঃ

"আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী এ কোন্ সেমানার গাঁয়
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়।।
আমার দুঃখের কান্ডারী করি,
আমি ভাসিয়েছিলাম তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপনপরী নয় ইশারায়।।...
ও গো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায়।।"

সকালে এসেই গানটি রানু সোমকে তুলে দিতে শুরু করলেন, তখনো ছন্দের গায়ে

২। আমার বন্ধু নজরুল ঃ কাজী মোতাহার হোসেন, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১৩৮১।

সম্পূর্ণ সুর বসেনি, শেখাতে শেখাতেই সুরারোপ ঠিক হয়ে গেল। তিন দিন পর কবি আর একটি নতুন লেখা গান সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ঃ "এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনল বল কে'- এটাও পরিশ্রমী রানু সোম সঠিকভাবে তুলে নিলেন। এভাবে কবি যে ক'দিন ঢাকায় ছিলেন গানে গানে যেন মাতিয়ে তুলেছিলেন। ৭ আষাঢ় ১৩৩৫ সাল 'কবিদা' লিখেছিলেন 'কল্যাণীয়া সোমের' খাতায় তাঁদের বনগ্রামের বাসায় বসে এই কবিতাটি ঃ

শ্রীমতী রানু সোম কল্যাণীয়াষু মাটির উর্ধে গান গেয়ে ফেরে
স্বারণের যত পাখী
তোমার কণ্ঠ রাখি।
.... তুমি আনিয়াছ শুধু সুরে সুরে
ভাষাহীন আবেদন,
যে সুর মায়ায় বিকশিয়া ওঠে
শশী তারা অগনন।....

'কবিদা'

ইতোমধ্যে আর একটি কান্ড ঘটে গেল। তখন হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি আজকালকার দিনের মত খুনোখুনির পর্যায়ে না পৌছালেও ছোঁওয়া-ছুঁয়ি জাতি বিচার প্রবর্তিত আকারে বিকটভাবে বর্তমান ছিল। হিন্দুর বাড়িতে একজন মুসলমান যুবক গান শেখায় তাও আবার এক যুবতীকে গভীর রাত পর্যন্ত- হিন্দু ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা হয়ে উঠল অসহ্য। একদিন দশটা-এগারটার দিকে অন্ধকার রাতে গান শিখিয়ে রানুদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে এক দল হিন্দু যুবক লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কবির উপর। দেখা গেল সৈনিক কবি তাঁর সেনাজীবনের ট্রেনিংগুলো ভুলে যাননি। অতগুলো উম্মত যোয়ানের সঙ্গে একালড়া যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে আত্মরক্ষা করা যায়। কৌশলে একটি বেতের লাঠি হঠাৎ কেড়ে নিয়ে দু-চার ঘা কষিয়ে দিয়ে এবং নিজেও খেয়ে এক দৌড়ে চলে এলেন বর্ধমান হাউসে- মোতাহার হোসেনের বাসায়।

এ সম্পর্কে নজরুল বলেন ঃ

"সোম মশাইয়ের বাড়ি থেকে আমি বেল বেরিয়ে এসেছি এমন সময় ৭/৮ জনের একটি যুবকের দল ছুরি ও লাঠি নিয়ে হঠাৎ আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো। প্রথমে আমি হকচকিয়ে গেলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই একজনের হাত থেকে এই বেতের ছড়িটা নিয়ে কেমন করে আঘাত ফিরিয়ে দিতে হয় তা একটু তাদের বুঝিয়ে দিলাম। আমার কাছাকাছি যে দু'তিনজন ছিল ঐ হায়দরী মারের দু'চারটা খেয়ে সেখানেই ঘুরে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে এবং কাছের নবাবপুর স্ট্রিটের পাহারাদার পুলিশের আগমন ভয়ে তারা সব দ্রুত পালিয়ে গেল।"

'নজরুল যখন বনগ্রামের মোড় পেরিয়ে একটা আরো নির্জন রাস্তায় পৌছেন, বোধ হয়, ঠাঁটারি বাজারের মোড়, সেই মোড়টা থেকেই জন সাত-আট ছেলে লাঠি নিয়ে পেছন থেকে

প্রচন্ড জোরে মাথায় আঘাত করতে করতে বলল, দিলীপ রায়ের টাক মাথাটা ফাটাতে পারিনি, এবার তোর বাবরি চুলের মাথাটা আর আস্ত রাখবো না।'

কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব লিখেছেন ঃ

"স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা সজনীকান্তের প্যারোডিটি সম্ভবত পড়েছেন। এতে তাদের মনে সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তারা একটা কেলেংকারির কথা আঁচ করে তার একটা বিহিত করার চেষ্টা করছিল। রানু হিন্দুর মেয়ে, আর নজরুল মুসলমানের ছেলে। সুতরাং তাদের হিন্দু রক্ত এই সম্পর্কটিকে একেবারে সহ্য করতে পারছিল না। এ যেন তাদের পৌরুষের ওপর আঘাত।"[৩]

'আমার বন্ধু নজরুল' প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন এ প্রসঙ্গের এক উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"...আর নও যওয়ান হিন্দু ছোকরারা একজন মুসলমান (বা মুসলা) যুবক প্রতিভা সোমকে দিন নেই, রাত নেই যখন তখন, গান শেখাতে আসবে তা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে নি।.... তাই একদিন রাত দশটা এগারটার মত সময়ে রানুদের ঘর থেকে গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় পাঁচ সাতজন যুবক নজরুলকে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুলও যওয়ান মর্দ মানুষ, বেতের মুঠোওয়ালা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদের দু'এক ঘা করে লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসেন বর্ধমান হাউসে। দেখলাম জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। হাতে পিঠে রক্ত আর পিটুনীর দাগ। অবশ্য এ নিয়ে আর কোন দিক থেকে উচ্চবাচ্চ হয়নি।".....

কাজী মোতাহার হোসেন এই বেতের লাঠিটি বহুদিন সযত্নে রক্ষা করেছিলেন, এমন কি নিজে ব্যবহারও করেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা থেকে জানা যায় ঃ ....এবারের রানু সোমকে যেসব গান শিখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আছে- 'যাও যাও তুমি ফিরে এই মুছিনু আঁখি', 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়', 'আমি কি মুঝেলো গৃহে', 'রব, নাইয়া কর পার', 'আঁধার রাতে কে গো একেলা', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়' প্রভৃতি। এরপর নজরুল ঢাকার পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এর আট-দশ মাস পরে রানু সোম আসেন কলকাতায় এবং ওঠেন তাঁর পিসে মশায়ের বাড়ি হুগলিতে। পিসেমশাই সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। রেকর্ডে গান তোলাই ছিল রানুর উদ্দেশ্য, অবশ্য উৎসাহদাতা নজরুল। উভয়ের মাঝে যোগাযোগ ছিল, নজরুলও রানুর পিসেমশায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠতেন, থাকতেন এবং এখানে রানুকে প্রয়োজনীয় তালিম দিতেন। এই অপরিচিত উৎপাতে গৃহকর্তারা অসন্তুষ্ট হবেন কি, কবির প্রাণঢালা ব্যবহারে তাঁরাও আন্তরিক হয়ে উঠলেন, রানুর পিসিমা তো নজরুলকে রীতিমত স্নেহ করতে শুরু করেন। একটি বোর্ডের এপিঠ-ওপিঠে দু'টি করে চারটি গান দেওয়া ছাড়াও কবির প্রচেষ্টাতেই রানু হয়ে উঠলেন বেতার শিল্পী। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের ঘোষণা ঃ

৩। তথ্য সূত্র ঃ সাপ্তাহিক রোববার, ২৪ মে '৯৮।

"নজরুলের গানকে ছড়িয়ে দেবার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিলেন দিলীপ কুমার রায়, কিন্তু তিনি তখন সন্ন্যাসী হয়ে শ্রী অরবিন্দের আশ্রম পন্ডিচেরা নিবাসী। কেমন করে যেন অবধারিতভাবেই সেই ভারটা আমার উপর ন্যস্ত হয়ে গেল। আর রেডিওর মারফৎ অতিদ্রুত অনেক বেশি শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে অনেকে বেশি সমাদৃত হবার অবকাশ পেল। পরের দিন বিভিন্ন কাগজে প্রশংসা বেরুল অনেক। নজরুল ইসলাম আর নলিনী দা দু'জনেই সমান খুশি, সমান উত্তেজিত। এর পরে নানা মহলে বসতে লাগল আসর। হিজ মাস্টার্স ভয়েস ইন্দুবালা-আঙুরবালাকে দিয়েও রেকর্ড করালেন ওঁর গান এবং ওঁকেই ট্রেইনার নিযুক্ত করলেন। সমস্ত গান দিয়ে নজরুল একখান গানের বই প্রকাশ করলেন পরের বছর, বইয়ের নাম দিলেন চোখের চাতক। আমাকে উৎসর্গ করলেন সে বই।"[৪]

ঢাকায় অসহিষ্ণু হিন্দু যুবকেরা যেমন রানু-নজরুলের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের চিন্তা করে লাঠি ধরেছিলেন, কলকাতায় কোন কোন হিন্দু লেখক-সম্পাদক ততোধিক অধম চিন্তা মাথায় নিয়ে বিকৃতির চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন। 'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে' এই গজলটির তাঁরা প্যারডি লিখেন এভাবে ঃ 'সে বিদেশী বনগাঁবাসী (রানুর বাড়ি ছিল বনগাঁয়ে) বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।' এক সংখ্যায় 'তরুণের লজ্জা' প্রবন্ধে তাঁরা স্পষ্ট লিখলেন ঃ

"তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযানগীতি সম্পর্কে মৌন হয়ে প্রবীণ পারস্যের যৌনগজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হল।"

অথচ এ গজল গান ও সুর সম্পর্কে স্বর্গীয় সংগীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায় বলেন ঃ

"এরূপ গজলের সৌরভের আমদানীর জন্য সত্য সংগীতানুরাগী মাত্রই কবি কাজী নজরুল ইসলাম মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞবোধ করিবেন।"[৫]....

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন উপলক্ষে কবি নজরুল ৭ম বারের মতো কবি নজরুল ঢাকায় এসেছিলেন। এই সম্মেলনে ফজিলাতুন্নেসা 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' শিরোনামে নিবন্ধ পাঠ করেন। এখান থেকেই নজরুলের সাথে ফজিলাতুন্নেসার ব্যক্তিগত পরিচয়।

ঢাকার দ্বিমাসিক নজরুল একাডেমী পত্রিকা ঃ ৪র্থ বর্ষ, বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮১-তে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের 'Nazrul Islam : The Singer and Writer of Songs'-এর নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদকৃত বঙ্গানুবাদ 'আমার বন্ধু নজরুল ঃ তাঁর গান' শিরোনামে নিবন্ধে প্রকাশ যে, ফজিলাতুন্নেসা কবির কাছে হাত দেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, ফজিলাতুন্নেসা কবির কাছে হাত দেখানোর ইচ্ছা কাজী মোতাহার হোসেনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। আর সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। কাজী মোতাহার হোসেনই হাসিনা মঞ্জিলের কাছে ৯২ নং দেওয়ান বাজার রোডে

৪। নজরুল ইসলাম প্রতিভা বসু, দেশ ২৪ মে ১৯৮০।
৫। ভারতবর্ষ ঃ ৩৩৫ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা।

অঙ্কের এম, এ, এবং বাক্‌পটু ফজিলাতুন্নেসার বাসায় কবিকে নিয়ে যান।.... প্রথম দিন কবি সেখানে এক ঘন্টা ছিলেন। এর মধ্যে ফজিলাতুন্নেসার হাতের হৃদয়ে রেখা, মস্তিষ্ক রেখা, জীবন রেখা, সংলগ্ন ক্ষুদ্র রেখাসমূহ এবং সেই সঙ্গে ক্রস, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ সমন্বিত অন্যান্য মাউন্ট, শুক্র, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল ও চন্দ্রের অবস্থানগুলো নিরীক্ষণ ক'রলেন; কিন্তু তখন এগুলোর সম্বন্ধে সূত্রের ফলাফল নির্ণয় করতে না পারায় একজন জ্যোতিষীর মতোই সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তারকার অবস্থান নোট করে নিলেন। জানালেন ঃ রাত্রিতে তিনি বিশদভাবে এসব পরীক্ষা করবেন।

বর্ধমান হাউসে ফেরার পর রাতের খাওয়া সেরে উভয়ে শুতে গেলেন রাত এগারোটা নাগাদ। কাজী মোতাহার হোসেন ঘুমিয়ে পড়লেও কবি সম্ভবত ফজিলাতুন্নেসার হস্তরেখা বিষয়ক তথ্যগুলো অধ্যয়ন করেন এবং পরের দিন সকালে নাস্তার সময় কবির বিবরণ ঃ

"রাতে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন জ্যোতির্ময়ী নারী তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু জেগে উঠে সেই দেবীর পরিবর্তে একটি অস্পষ্ট হলুদ আলোর রশ্মি দেখলাম। আলোটা আমাকে যেন ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে আমার সামনে সামনে এগিয়ে চলছিল। আমি বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে কিছুটা অভিভূত হ'য়ে সেই আলোক রেখার অনুসরণ ক'রছিলাম। মিস্ ফজিলাতুন্নেসার গৃহের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আলোটা আমার সামনে চলছিল। তাঁর বাড়ীর কাছে পৌঁছতেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। রাস্তার ধারের জানালার কাছে সম্ভবত পথিকের পায়ের শব্দ শুনে গৃহকর্ত্রী এগিয়ে এসে ঘরের প্রবেশ দরজা খুলে দিলেন এবং মিস্ ফজিলাতুন্নেসার শয়ন কক্ষের দিকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ফজিলাতুন্নেসা তাঁর কামরার দরজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। কুমারী নেসা তাঁর শয্যার উপর গিয়ে বসলেন আর আমি তাঁর সামনে একটি চেয়ারে বসে তাঁর কাছে প্রেম যাঞ্চা করলাম; তিনি দৃঢ়ভাবে আমার প্রণয় নিবেদন অগ্রাহ্য করলেন।
ঐ ঘটনার পর নিরতিশয় ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি; তাই ভোরবেলা রমনা লেকের ধারে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলাম।"

কাজী মোতাহার হোসেনের ভাষায় ঃ

"এই হচ্ছে সামগ্রিক ঘটনা- একে মানসচক্ষে নিয়ে আসা কিংবা এর রহস্যোদ্‌ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন।....
ঐ দিন দুপুরে লক্ষ্য করলাম ঃ ফজিলাতুনের গলার লম্বা মটর মালার হারটা ছিঁড়ে দু'খানা হয়ে গেছে। পরে সেটা সোনারুর দোকান থেকে সারিয়ে আনতে হয়েছিল। অত্যন্ত কাছ থেকে জোরাজবি ছাড়া এমনটা কেমন করে ঘটতে পারে তা আমার পক্ষে বুঝে ওঠা মুস্কিল।"

ফজিলাতুন্নেসা কবিকে খুব নিকটে আসার আহবান না জানালে তাঁর ঘরে তাঁর চোখের সামনে বসে মধ্যরাতে কবি তাঁকে 'রাণী' সম্বোধন করতেন না। সময়ের পরিধি যা-ই হোক, লেনদেন উভয়ের মধ্যেই নিঃশেষেই হয়েছিল। তবে সে ক্ষুধা, সে বিনিময় স্পষ্টতই মানসিক ছিল। পরিস্থিতির সাক্ষ্যে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের

দৃষ্টিভঙ্গির অনুমোদন মেলে না। বোঝা যায় ঃ ব্যক্তিগত জীবনে অন্ততঃ ফজিলত ও কবি, উভয়েই নিঃসঙ্গ ছিলেন। আর কবির কাছে নিঃসঙ্গতা তখন যন্ত্রণার নামান্তর।

যে কোনো কারণেই হোক, কবির পরিণয়-জীবন তাঁর ভালবাসার সাধ পুরোপুরি মেটাতে পারেনি। ফজিলাতুন্নেসার মধ্যে তিনি একাধারে অনেক কিছুই পেয়েছিলেন। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নজরুলের তখনই যে প্রতিষ্ঠা, তাতে পরিণতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তখনকার দিনে এম.এ পাস, বাক্‌পটু এই বিদুষীর পক্ষে দ্বিতীয়া স্ত্রীর আসন বড়ই বেমানান হতো। তাই তিনি যখন বুঝলেন, কবির আন্তরিকতা সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁদের সম্পর্ককে সম্পৃক্ত করতে চায় এবং অঙ্কের এম.এ ফজিলাতুন্নেসা যখন হিসাব করে দেখলেন, তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে যে নিন্দার ঢেউ উঠবে, তার মাশুল পরিশোধের মানসিক প্রস্তুতি তাঁর নেই, তখন তিনি ব্যবধান রচনা করতে চাইলেন। তাঁর খাতাই সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হয়েছিল। 'রাণী'র কাছে 'চোখের জলের লেখা' 'রেখে', প্রভাতে তা শুকাবে, এ ভরসা দিয়ে লিখেছেন ঃ "চলে যাই আমি একা।" তারিখ ও সময়সম্বলিত কবির স্বহস্তে লেখা পূর্বোক্ত চার লাইন কবিতার পর ঐ একই পৃষ্ঠায় পরের তারিখ ও সময়সম্বলিত আরো চার লাইন কবিতা নজরুল ইসলাম নিজ হাতে লিখেছেন পরের দিন শুক্রবার চতুর্থী ১১ ফাল্গুন ১৩৩৪ ঃ ২ রমজান ১৩৪৬ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ তারিখ ভোরে ঃ

"দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,
ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলায় দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ?"

২৪-২-২৮ -নজরুল
প্রভাত।"

লক্ষণীয় যে, কবি ফজিলাতুন্নেসাকে 'ব্যথাহতা' এবং নিজেকে 'দৈত্য' বলে উল্লেখ ক'রেছেন এবং 'রাতের দুঃস্বপন' ভুলে যেতে বলেছেন। এই ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ তারিখ সকালেই কবি ঢাকা ত্যাগ করেন। আন্তরিকতার তীব্র আবেগ প্রশমিত করার প্রয়োজনে এ ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এক অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসায় অন্তত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী কবি যে ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে দুটো নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে, সে প্রমাণ তো খাতাটিতেই আছে!

ফজিলাতুন্নেসার খাতায় উপরোক্ত দু'টি কবিতা যে পৃষ্ঠায় কবি লিখেছেন, এর ঠিক পরের পৃষ্ঠায় এই বিদুষী মহিলাও কবির ভালোবাসার স্বীকৃতি জানিয়েছেন নিজের হাতের লেখায় এইভাবে ঃ

"তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গন্ডুষ ভরিয়া করেছ পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরূপম
হে ঐশ্বর্য্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত
করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়!
হে বন্ধু, বিদায়!"

আলী আকবর খান

পরের পৃষ্ঠায় ফজিলাতুন্নেসা আবার নিজের হাতে লিখেছেন ঃ

"তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার মন
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন।"

তাঁর সর্বস্ব চেতনায় ফজিলাতুন্নেসা যে কবিকে ভালোবেসেছিলেন, সে সত্য তাঁর অকৃপণ উক্তিতেই সুস্পষ্ট। কবিকে তিনি কিছু হাতে রেখে দেননি। তিলে তিলে তিনি নিজেকে দান করেছেন।

গণিতের অধ্যাপিকা ফজিলাতুন্নেসা সাতচল্লিশ-পূর্বকালে বেথুন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। সাতচল্লিশোত্তরকালে দীর্ঘদিন ঢাকার ইডেন কলেজে অধ্যক্ষা ছিলেন। ইন্তেকাল করেন কবির ইন্তেকালের পরের বছর ১৯৭৭-এ। শোনা যায়, ঢাকার পি, জি হাসপাতালে কবি যখন অসুস্থ ছিলেন তিনি তখনও তাঁকে দেখতে যেতেন। কিন্তু এতদিন বেঁচে থাকলেও তাঁর জীবদ্দশায় নজরুল জীবনীকাররা তাঁর মনের হদিস, সাক্ষাৎকার নেওয়ার কোনো চেষ্টা করেননি। এ কথা ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ তারিখে রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বিদুষী ফজিলাতুন্নেসা ও নজরুল' শিরোনামে তাঁর রম্য রচনায় চিত্রা দেবও লিখেছেন। কিন্তু ফজিলাতুন্নেসাকে তিনি যেভাবে অঙ্কবিদ্যা পাথর প্রতিমা হিসাবে এঁকেছেন সেটা ঠিক নয়। আকবরউদ্দীন এবং মাহ্‌ফুজুর রহমান খানের স্মৃতিকথা পড়লে তাঁর ধারণা অবশ্যই বদলাবে। পরে আলোচনা প্রসঙ্গে ফজিলাতুন্নেসার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করায় তিনি জানান ঃ এত সব পড়ার সুযোগ তিনি পাননি।[৬]

৬। তথ্যসূত্র ঃ শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল।

১৯২৮ সালের জুনে নজরুল অসামান্য সুন্দরী বহুগুণে গুণবতী এক যুবতীর সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। ইনি হলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা উমা মৈত্র ওরফে নোটন। থাকতেন রমনা হাউসে, একাধারে চিত্রশিল্পী, টেনিস খেলোয়াড়, দাবাড়ু, সেতারী এবং মেধাবী ছাত্রী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সেতারী হায়দার আলীর শিষ্যা, সুতরাং কণ্ঠে যথেষ্ট মাধুর্য না থাকলেও তা ঝরে পড়তো আঙ্গুল দিয়ে, সেতার যেন সুরেলা বোলে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। দিলীপ কুমার রায় ও নজরুলের অনেক গানে তিনি সেতার সঙ্গত করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী কাজী মোতাহার হোসেন এ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

> "…. দিলীপ রায়ের বা নজরুলের গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সঙ্গীত করতেন। এর বাপ-মা দুজনেই কিছুটা বিলিতি ধরণের ব্রাহ্ম ছিলেন। সাহিত্য, শিল্প 'সংগীত' চিত্র প্রভৃতির অনুরাগী এঁদের বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাছাড়া টেনিস ও দাবা খেলাতেও নোটনের অনুরাগ ছিল। নজরুল এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।
>
> ….. নজরুলের "চক্রবাক" গ্রন্থখানা নোটনের নামে নয়, নোটনের বাবা বিরাটপ্রায় কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণার বিন্দেষু'র নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল।'[৭]…

কবি নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের নিদর্শন রয়েছে। জীবনের প্রথম প্রেম তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন নার্গিসকে। নার্গিসের প্রেমাঘাতই নজরুলের লেখনীর মূল চালিকা শক্তি।

কুমিল্লার নজরুল আবিষ্কার করেছিলেন নার্গিসকে। নার্গিসের সাথে নজরুলের পরিচয়ের সূত্র হলো আলী আকবর খান। জানা যায় দেওঘর থেকে কলকাতায় ফেরার পথে নজরুল মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে আফজাল উল-হক সাহেবের সঙ্গে থাকতেন। এই সময় ভিশ্‌তি বাদশাহ, বাবর, প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা আলী আকবর খান নামে এক ব্যক্তি নজরুলকে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ করেন। আলী আকবরের বাড়ি ছিলো কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মহকুমার অধীন দৌলতপুর গ্রামে। আলী আকবর খান সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের আসার আগে থেকেই বাস করছিলেন। তিনি প্রথমে বিভিন্ন জেলার ছোট ছোট ভৌগোলিক বিবরণ লিখে প্রকাশ করতেন। পরে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে তিনি অন্য বই লেখা আরম্ভ করেন। নজরুল এই সব বইয়ের জন্যে 'লিচু চোর' সহ বেশ কিছু ছোটদের কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। আলী আকবর সাহেব ছিলেন একজন কট্টর ধর্মপরায়ণ। কিন্তু কবি নজরুলের একান্ত সহচর কমরেড মুজাফফর ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ধর্মী লোক। কমিউনিসট রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি নজরুলকে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তিনি চাইতেন না আলী আকবর খানের সাথে কবির

৭। আমার বন্ধু নজরুল ঃ কাজী মোতাহার হোসেন, পৃঃ ৯৯-১০০।

ঘনিষ্ঠতা হোক। কিন্তু মুজাফফ্‌র আহমদের বারণ সত্ত্বেও একদিন নজরুল আলী আকবর খানের সাথে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

দৌলতপুর যাবার পথে আলী আকবর সাহেব নজরুলকে নিয়ে কয়েকদিন কুমিল্লার কান্দির পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাসায় যান। ইন্দ্রকুমারের পুত্র বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে এই বাড়িতে আলী আকবর সাহেবের আসা যাওয়া ছিলো। এই পরিবারে বীরেন্দ্র কুমারের মা, বাবা ও স্ত্রী ছাড়া তার দু'টি বোন ও একটি ছেলে ছিলো। বীরেন্দ্র কুমারের মায়ের নাম বিরজা সুন্দরী দেবী। এরা ছাড়াও ছিলেন বীরেন্দ্র কুমারের বিধবা জ্যেঠিমা গিরিবালা দেবী। তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলাকে (ডাক নাম দুলি) নিয়ে। এদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হলেও সাহিত্য ও সঙ্গীতের একটি সুস্থ ও প্রাণময় আবহাওয়া এই পরিবারটিতে বিরাজ করতো। নজরুল সহজেই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন এবং বিরজা সুন্দরী দেবীকে মা বলে ডাকতে শুরু করেন। অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে নজরুল কয়েকদিন কুমিল্লায় অতিবাহিত করেছিলেন।

এরপর নজরুল যায় আলী আকবর খানের বাড়িতে। এখানেও নজরুল যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন লাভ করেন। আলী আকবর খানের এক বিধবা দিদি সংসারের সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন। তিনি নজরুলকে মায়ের মতো স্নেহে আদর যত্ন করতেন। আলী আকবর খানের আর একটি বিধবা বোন সেই পাড়াতেই থাকতেন। তার একটি পুত্র ও বিবাহযোগ্য একটি কন্যা ছিলো। নজরুল থাকাকালীন সময়ে তিনি এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। সেই বিবাহযোগ্য মেয়েটির সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পরে উভয়ের মধ্যে প্রণয় লাভ করে। অবশেষে উভয়ের বিয়ে স্থির হয় এবং কলকাতার বন্ধুরা এই বিয়ের খবর জানতে পারেন। নজরুল হাতছাড়া হয়ে যাবার আশংকায় কমরেড মুজাফ্‌ফরসহ কলকাতায় কবির অনেক বন্ধুরই এ বিয়েতে সম্মতি ছিলো না। তাদের ধারণা ছিলো- আলী আকবর খান তার ভাগনিকে বিয়ে দিয়ে প্রকাশনার ব্যবসায়িক স্বার্থে কবিকে ব্যবহার করবেন। এই সম্পর্কে নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম লিখেছেন ঃ

> আলী আকবর খান প্রথমে তার ভাই ওয়াছের আলী খানের মেয়ে হেনার সঙ্গে নজরুল ইসলামের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু চাল নেই, চুলো নেই, সাংসারিক জীবনে এমন উন্মুল মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তারা সম্মত হননি। এরপর আলী আকবর খান তাদের পাশের বাড়িতে বিধবা বোনের মেয়ে নার্গিস আক্তার খানম ওরফে সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরল ইসলামের বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। সৈয়দা তার এই মামার বাড়িতেই থাকতেন। তার বিধবা মাকেও এই উপলক্ষে এই বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ইতোপূর্বে ভাইদের কাছে তিনি অনাদৃতা ছিলেন। মুজাফফর আহমদের কাছে নজরুল ইসলাম ঘটনার যে বিবরণ পেশ করেছিলেন, তাতে ব্যাপারটা আলী আকবর খানের পরিকল্পনা মাফিক অন্তত: কিছুটা সাজানো বলে মনে হয়। যেমন, নজরুল ইসলামের কণ্ঠে কবিতা, গান, তার প্রাণবন্ত কথাবার্তা এসব কিছুই সৈয়দা খাতুনকে

আকর্ষণ করলো না। এই কিশোরী মুগ্ধ হলেন এক রাতে নজরুল ইসলামের বাঁশী শুনে। আলাপের সূত্রপাত তার এই জিজ্ঞাসায়!
গত রাতে আপনি কি বাঁশী বাজিয়েছিলেন? আমি শুনেছি।
বাঁশীর যাদুকর আফতাব উদ্দীন খানের দেশে নজরুল ইসলামের আর সব কিছু উপেক্ষা করে তার বাঁশীতে মুগ্ধ মানা কারো কারো কাছে একটা কৃত্রিম বা সাজানো এ্যাপ্রোচ বলে মনে হয়েছে। (শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ১৭২-৭৩)।

কবি নজরুলের সাথে নার্গিসের সাথে বিয়ে ঠিক হয় ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮: ৭ জুন ১৯২১, ২৯ রমযান ১৩৯৯ হিজরী মঙ্গলবার। এ সম্পর্কে একটি তথ্যে জানা যায় বিয়ের আগে আলী আকবর খানের আচরণে এবং বাগদত্তা মেয়েটির কোন কোন ব্যবহারে না-কি কবি নজরুল অপমানিত বোধ করেন। ইতোমধ্যে বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে বিরাজা সুন্দরী দেবী তার পুত্র বীরেন্দ্র সেন গুপ্তকে নিয়ে দৌলতপুর বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হন। বিরজা সুন্দরী দেবীকে নাকি নজরুল তাঁর অপমানের কথা খুলে বললে তিনি তাঁকে এ বিয়ে করতে নিষেধ করেন। কিন্তু অতিথি অভ্যাগত এসে যাওয়ায় নজরুল বিয়ের মজলিসে বসতে বাধ্য হন এবং আক্‌দ (বিবাহ বন্ধন) হয়ে যায়। এরপরই নজরুল বিরজা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে নৌকা করে দৌলতপুর ত্যাগ করেন এবং কুমিল্লায় কান্দির পাড়ে পৌছান। এ বিষয়ে এই তথ্য বহুল নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় গত ২৫ মে, '৯৮ কবির ৯৯তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় 'দৌলতপুরে নজরুল' শিরোনামে ডঃ আলী আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন ঃ

...... তরুণ কবি নজরুল নাট্যকার, সাহিত্য-রসিক এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত পুস্তক ব্যবসায়ী আলী আকবর খান বি-এ'র আমন্ত্রণক্রমে কুমিল্লায় আসেন ১৯২১-এর এপ্রিল, বাংলা চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে। চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা শহরে নামেন রাতের বেলা। আলী আকবর খান ট্রেন থেকে নেমে উঠলেন শহরের কান্দিরপাড় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায়-যিনি ছিলেন কুমিল্লা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ইন্সপেক্টর (তাঁর ছেলে বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তই ছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুল সহপাঠী বন্ধু এবং তখন থেকেই তাদের বাসায় যাতায়াত)। বীরেন্দ্রর মা বিরজা সুন্দরী দেবীকে (যিনি পরে নজরুলকে আলীপুর জেলে লেবুর শরবৎ খাইয়ে ৪০ দিনের অনশন ভাঙ্গিয়েছেন) মা বলতেন এবং নজরুলও বন্ধুর মাকে মা বলে ডাকতে শুরু করেন। এই বাড়ীতেই তখন থাকতেন বীরেন সেনের জেঠিমা বিধবা গিরিবালা দেবী। একমাত্র কন্যা দুলি-দোলন-আশালতা সেনগুপ্তকে নিয়ে, যিনি পরে প্রমীলা নজরুল হলেন। দুলীর বাবা বসন্ত কুমার সেনগুপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যের নায়েব ছিলেন এবং প্রমীলার (দুলির) জন্মের পর সেখানেই দেহত্যাগ করেন। অসহায়া এই বিধবার একমাত্র শিশু কন্যা নিয়ে ইন্দ্রকুমারের উত্তর ভিটার ঘরে বা ঘর তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। বীরেনের নিজ বোন কমলা, অঞ্জলী ও জেঠাত বোন দুলী- যারা প্রায় সমবয়সী-সকলেরই ছিল গানের গলা। আর টগবগে তরুণ নজরুল তো পরের দিনই গান গেয়ে আবৃত্তি শুনিয়ে দ্রুত তালে হারমোনিয়াম ও বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন। পরের দিনই নজরুলসহ নৌকাযোগে দৌলতপুর যাবার কথা। সামনেই বিষু,

চৈত্র সংক্রান্তি এবং নববর্ষ ১লা বৈশাখ থাকায় বিরজা সুন্দরী দেবী তাদের যেতে দিলেন না। এদিকে নববর্ষের উৎসবমুখর কুমিল্লার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে, বাঁশি বাজিয়ে দ্রুত তালে হারমোনিয়ামে ঐন্দ্রজালিক সুর তুলে শুধু শহরবাসী নয় সেনগুপ্ত পরিবারের সকলের হৃদয়ও না-কি নজরুল জয় করে ফেললেন। বিশেষ করে বড় বড় দু'টি মায়াভারা ডাগর চোখ, গান গাইতে বাবড়ি চুলের সঞ্চালন সকলেরই মন কেড়ে নিল। মতান্তরে বুলবুল ইসলামের মতে, ২৩ চৈত্র বিকালে কবি দৌলতপুর আগমন করেন-আলী আকবর খানের পূর্ব ব্যবস্থামত কবিকে বরণের জন্য তোরণ নির্মাণ এবং বিপুলভাবে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। গাওয়া হয় গ্রাম্য কবিদের দিয়ে সংবর্ধনা সঙ্গীত, করা হয় পুষ্পবর্ষণ- যা একজন উঠতি তরুণ কবির জন্য ছিল অত্যন্ত প্রাণভাষিণী- কারণ তখনও তিনি 'বিদ্রোহী' বা 'ধূমকেতু' নজরুল হয়ে উঠেননি। মুন্সী আবদুল জব্বার বি.এ, যিনি পরে নজরুল নার্গিসের বিবাহ পড়িয়েছিলেন, তার এক পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন ঃ

কাজী নজরুল ইসলাম এই মেয়ে যুবী- যুবরাজ (নারগিস) দেখে পাগল...। এদিকে গানে গানে নজরুল যুবী- যুবরাজসহ গ্রামের সবাইকে পাগল করে তুলছেন। গাব গাছ এবং কামরাঙ্গা গাছের নীচে অবিরাম (বাড়ীর বাঁ দিকে) গান গেয়ে মাঠে যুদ্ধের তালে তালে প্যারেড, খেলাধুলা- এক মুক্ত জীবনানন্দ কবি- যেন কেহ তার নয় পর।

অবশেষে নজরুল এবং কন্যাপক্ষের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত নজরুল-নারগিসের বিবাহ স্থির হল।...... এ বিয়েতে নজরুলের একান্ত আগ্রহেই কুমিল্লা সেনগুপ্ত পরিবার থেকে বিরজাসুন্দরী, গিরিবালা দেবী আশালতাসহ মোট ১১ জন আসেন এবং তাদের জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা হয়। বিবাহ হয় জমিদারসুলভ শান শওকতের সঙ্গে গান-বাজনা, খাওয়া খাদ্য, কনে ও বরের পোশাক এবং এতে সর্বমোট ১৫ হাজার টাকা খরচ হয় বলে জানা যায়। কাবিন ঠিক হয় ২৫ হাজার টাকা। শোনা যায়, এই বিবাহের কাবিননামায় লিখা ছিল এই বিবাহের পর নজরুলকে ঘরজামাই থাকতে হবে।... এ বিষয়ে নজরুলের সঙ্গে আলী আকবর খানের (মামা শ্বশুর ও সুহৃদ) ইংরেজীতে না কি তর্ক বির্তকও হয়। এ বিষয়ে না বুঝে, না শুনে সেনগুপ্ত পরিবারও ভীত হয়ে নজরুলকে নানা কু-মন্ত্রণা দিতে থাকেন এবং এ কথাও গিরিবালা দেবী না কি বলেছেন- এ বিবাহ না হওয়াই ভালো (দ্রষ্টব্য অভিনন্দন, অরফিয়াস, কুমিল্লায় নজরুল, ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি ইত্যাদি গ্রন্থ)।

১৯৪০ সালে নজরুল শেষবারের মত ঢাকা বেতারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বর্তমান চলন্তিকা বইঘর (বাংলা বাজার) যা তখন নার্গিসের দোকান ও বাসা ছিল দেখা করেন। এতদিন পর কবির এই দেখা করার ইচ্ছা কেন? কমরেড মুজাফফর আহমদ 'নজরুল-জীবনে' লিখেছিলেন ঃ "নজরুল-নার্গিসকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু নার্গিস করেছিল প্রেমের অভিনয়।" অভিনয় করে স্বেচ্ছায় স্বীয় এজিমে কবুল করে কেউ স্বামীকে গ্রহণ করেন কি? নজরুলের সঙ্গে যদি অভিনয়ই করবেন, তবে বিত্তশালিনী ঢাকার দুটি বাড়ি ও গাড়ি এবং একটি প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীর মালিক দ্বিতীয় বিবাহের জন্য ১৬ বছর অপেক্ষা করবেন কেন? বারবার কবিকে পত্র প্রদান করবেন কেন? বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বড় বড় হস্তাক্ষরে পত্রইবা দিবে কেন? একজন সহজ সরল গানের শিল্পী সাহিত্যমনা গ্রাম্য সরলা বালার পক্ষে'অভিনয়' করা কি সম্ভব ছিল? সেখানে দীর্ঘ দু'মাস মন দেয়া নেয়া, কত গানের আসরে উভয়ের গান গাওয়া গান শোনা, গভীর রাত জেগে

নজরুলের বাঁশি শোনা যা নজরুলের সতর্ক পাঠক তার বহু গান কবিতায় দেখে থাকবেন। কবিরা কবিতায় অন্তত মিথ্যা করা বলেন না। আলী আকবর খান, যিনি নিজেও ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন সাহিত্যমনা মেয়েটির সঙ্গে এ বিবাহ হলে মেয়েটি সুখী হবে এবং তাদের ভারতী লাইব্রেরীও উপকৃত হবে। বারবার কলিকাতা গিয়ে সব ভুলে রূপের রাণী এতিম মেয়েটিকে যেন কবি গৃহিণী করেন (নজরুল জীবনী পৃং ১৬৯-১৭০) বিনীত অনুরোধ রাখেন। কিন্তু তাতে কমরেড মোফাফল আহমদের মন গলেনি। কেন? কোন কোন সমালোচক বলেছেন- কমরেড চাননি নজরুল তার হাতের নাগাল থেকে দূরে চলে যান সেই অজপাড়াগাঁয়ে অথবা ঢাকায়।...... আলী আকবর খানের সঙ্গে তার ছিল আদর্শগত মতভেদ। আলী আকবর রীতিমত নামাজ পড়তেন, ইসলামের পাবন্ধ ছিলেন এবং কমরেডকে খুব একটা পছন্দও করতে না। তর্ক বিতর্ক লেগেই থাকতো। অসুস্থ নজরুলকে কমরেডই কিন্তু কুমিল্লা থেকে নিয়ে এলেন ৬ জুলাই ১৯২১। অথচ কারো কাছে কিছুই জিজ্ঞাসা না করে বললেন নজরুল বিয়ের আসর থেকেই উঠে এসেছেন (নজরুল জীবনী, পৃঃ ১৬৯-১৭০)। সম্পূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন গ্রন্থাদি ঘেটে এবং বুলবুল ইসলামের সত্যসন্ধি বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং স্থানীয় বিবাহে উপস্থিত বৃদ্ধ এবং গণ্যমান্য লোকদের সাক্ষাৎকার থেকে (অভিনন্দন অরফিয়াস, ১৯৯৬) স্পষ্ট প্রমাণিত হবে কমরেড চাননি নজরুল আবার দৌলতপুর ফিরে যাক। অন্যদিকে মাতৃসমা বিরজা সুন্দরী দেবী, যিনি দৌলতপুর বিয়ের বাসরে উপস্থিত ছিলেন তিনি এ বিবাহ সাফল্যমন্ডিত করতে কোন অবদান রাখেননি। নজরুল বলেছিলেন বাকী উৎসব আগামী মাসে শ্রাবণেই হবে এবং তিনি নার্গিসকে কলিকাতা নিয়ে যাবেন। কলিকাতা গিয়ে 'বিদ্রোহী' এবং 'আগমনী'র মত কবিতা ও গান লিখে- জেলে গিয়ে ৪০ দিন উপবাস ছিলেন।....... নজরুলের (১৯২১-১৯২৪) আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা এবং প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি দেখে কমরেড মুজাফফর আহমদের কমুনিজমের নীতিতে বিশ্বাসী গিরিবালা দেবী যিনি পরাশ্রয়ী সেই গিরিবালা দেবীই মেয়েকে নজরুলমুখী করলেন এবং ২৫ এপ্রিল, ১৯২৪ সালে মা ও মেয়ে এবং 'চানাচুর' গ্রন্থের লেখিকা মিসেস এম রহমানের (যাকে কবি মা বলতেন) সতর্ক তত্ত্বাবধানে ৫নং হাজী লেন, কলিকাতায় মাত্র ৪/৫ জন লোকের উপস্থিতিতে নার্গিসের সঙ্গে তালাকনামা স্বাক্ষরের পূর্বে (১৯৩৭)-এ বিবাহ হল যা ইসলামী মতে নাযায়েজ এবং এ বিয়ের বিষয়টি মাতৃস্বরূপা মিসেস এম রহমান মোটেই জানতেন এমন প্রমাণ হাতের কাছে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবাহের পূর্বে বিরজা সুন্দরী পরিবার অমুসলিম-মুসলিম এ বিষয়ের বিরুদ্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপেন, ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিবাদ মিছিল করে। ফলে নজরুল প্রমীলার কলিকাতা ছেড়ে প্রথমে মিসেস এম রহমানের আশ্রয়ে হুগলী এবং পরে কৃষ্ণনগর চলে যেতে হয়। যদিও আয়ের উৎস তেমন কিছুই ছিল না।

১৯৩৭ সালে নজরুল নার্গিসের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, নজরুল নার্গিসের অভিভাবকদের সামনে লিখিত তালাকনামায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর অভিভাবকবৃন্দের চাপে এবং ভারতীয় লাইব্রেরী (ঢাকার) মালিক নার্গিসের ও লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানের স্বার্থেই কবি আজিজুল হাকিমের সঙ্গে (যিনি ছিলেন নজরুলের বিশেষ প্রিয়ভাজন) নার্গিসের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। নার্গিসের দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে (বুলবুল ইসলামের জবানীতে প্রকাশ) নজরুল 'পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরাণ প্রিয়' গানখানিসহ শুভেচ্ছাপত্র প্রেরণ করেন।

এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন ঢাকার বিশিষ্ট প্রকাশক 'চলন্তিকা, বইঘরের (বাংলা বাজার) মালিক মোশাররফ উদ্দিন ভুইয়া। তিনি লিখেছেন ঃ

আমি দীর্ঘ আলাপ করতাম- যখনই তার সান্নিধ্যে যেতাম- তখনই মনে হত আমি এক যন্ত্রণাদগ্ধ মহিয়সী নারী এবং ইতিহাসের এক কিংবদন্তীর নায়িকার মুখোমুখি। সমকালের কোন মুসলিম মহিলার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। রূপের রাণী নার্গিস অতিথি আপ্যায়না, রুচিশীলা, পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, স্বল্পভাষিণী ছিলেন। তার হাসি ছিল মধুর-মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি ''৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন। কলিকাতায় অসস্থ নজরুলের জন্য স্বামী কবিভক্ত আজিজুল হাকিমের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা পাঠান ১৯৪৫-৪৬-এ। এই ঘরেই ১৯৪০-এ বেতারে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা এসে কবি আজিজুল হাকিমের মাধ্যমে নার্গিসের ক্রাইসলার গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়। নজরুলের প্রিয় খাবারের যথেষ্ট আয়োজন সত্ত্বেও কবি নার্গিসের হাতে একটি মাত্র পান খেয়ে অশ্রুরুদ্ধ চোখে সেদিন বিদায় নেন। নজরুল গবেষক বুলবুল ইসলাম (মরহুম) যিনি ছিলেন একই গ্রামের এবং নার্গিস পরিবারের আত্মীয়। তিনি লিখেছেন, নজরুল ১৯৭২-এ যখন ঢাকায় নারগিস বুলবুলসহ এলেন- একটি কালো বোরখা পরে কবি ভবন, ২৮ নং রোড ধানমণ্ডিতে কবিকে দেখতে যান, তাঁর মৃত্যুর পরও একটিকালো বোরখা পরে বুলবুলকে সাথে নিয়ে কবির কবর জেয়ারত করে আসেন। নজরুল তাঁর বিভিন্ন কবিতা-গানে বিভিন্ন সময় লিখেছিলেন ঃ মোদের দু'জনই জীবনভরে কাঁদতে হবে গো... (ছায়ানট)/ এই সে চরণ বক্ষে চেপে, চুমেছে আর দু'চোখ ছেপে জল ঝরেছে..... (দোলনচাপা), ... দেখ মোরে পাছে ঘুম ভাঙিয়াই ঘুম না টুটিতে তাই চলে যাই... (চক্রবাক)-এসবই বাস্তব চিত্র- যা নজরুল বন্ধু-বান্ধবদের বলেছেন, নার্গিস অকপটে বলেছেন-ঘটনা তো ঠিক এরূপই ছিল এবং কবিরা কবিতায় মিথ্যা বলে না।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২৫/৬/৯৮)

নার্গিসের প্রতি নজরুলের যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিলো তা প্রকাশ পেয়েছে কবির বিভিন্ন গান, কবিতা ও চিঠিতে। নজরুলের সাথে নার্গিসের বিবাহিত ও নিকট সান্নিধ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এর প্রভাব পড়েছিলো তাঁর সাহিত্যে ব্যাপক ও গভীর। কবি জীবদ্দশায় তার প্রিয়তমা নার্গিসকে কোন দিন ভুলতে পারেননি। নার্গিসও নজরুলকে তার জীবনে ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

নজরুলের সাথে প্রমীলার বিবাহের (২৫ এপ্রিল, ১৯২৪) পূর্বে নার্গিস কমপক্ষে চার বার কলকাতা গিয়ে দেখা করেন। চারটি মতান্তরে তিনটি পত্র দেন। নজরুলকে না পেয়ে নার্গিসের জীবনে যে বিরাট শূন্যতা দেখা দিয়েছিলো তা নার্গিসের লেখা চিঠিতে অনুভব করা যায়। এখানে কমরেড মুজাফফর বলেছেন, নার্গিস নাকি প্রেমের অভিনয় করেছিলেন। যা হোক নার্গিসের লেখা তিনটি পত্রের কোন জবাব কবি না দিলেও (মতান্তরে দ্বিতীয় বা তৃতীয়) চিঠির জবাব দিয়েছিলেন গানের ভাষায়। যেমন ঃ

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রেখ তারে
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে॥

নার্গিসের তৃতীয় বা চতুর্থ চিঠির জবাবে নজরুল লিখেছিলেন ঃ

কল্যাণীয়েসু,

তোমার পত্র পেয়েছি নববর্ষার নবঘন সিক্ত প্রভাতে। মেখমেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারি ধারার প্লাবন নেমেছিল। তা-তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘ পুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে রেবা নদীর তীরে মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে এনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত-স্রোতে।

আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্যে আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি সেই আগুণের পরশমনি না দিলে আমি অগ্নিবীনা বাজাতে পারতাম না। আমি ধুমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।

-নজরুল

কবি নজরুল নার্গিসকে কিরূপ ভালোবেসেছেন উল্লিখিত পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম জীবনের পরম প্রিয়তমা নার্গিসকে কবিতা ও গানে কবি নজরুল স্মরণ করেছেন এভাবে-

"আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেনী, তন্বী-নয়নের বহ্নি
আমি ষোড়ষীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা ব্যথা সুনিবিড়
নিত চুম্বন চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারী।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল-করে দেখাত নুখন
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কামন চুড়ির কনকন।"

নারগিসের দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে ১৯৩৮, ১ ডিসেম্বর নজরুলের শুভেচ্ছা বাণী, শেষ চিঠিও বটে।

কল্যাণীয়াসু,

জীবনে তোমাকে পেয়েও হারালাম। তাই মরণে পাব-সে বিশ্বাস ও সান্তনা নিয়ে বেঁচে থাকব। প্রেমের ভুবনে তুমি বিজয়িনী, আমি পরাজিত। আমি আজ অসহায়। বিশ্বাস করো, আমি প্রতারণা করিনি। আমাদের মাঝে যারা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে- পরলোকেও তারা মুক্তি পাবে না। তোমার নব অভিযাত্রা সুখের হোক।

-ইতি নিত্য শুভার্থী -নজরুল

এই চিঠিটিই প্রমাণ করে নজরুল-নার্গিসের নিখাঁদ পবিত্র প্রেমের গভীরতা। আর তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ যে ছিলো একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত তা বলাই বাহুল্য।

ফজিলাতুন্নেসাকে কবি নজরুল অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। এই

প্রেম সম্পর্কে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের উক্তি ছিল ঃ "মিস ফজিলাতুন্নেসার প্রতি আবাল্য ঘর-ছাড়া কবি নজরুল ইসলামের মানসিক প্রেম দাঁড়াবার ঠাঁই না পেয়ে আধ্যাত্মিকতায় আশ্রয় নিয়েছিল।"

নজরুলের জীবনে ঘটে যাওয়া এ দু'প্রেমই সফলতা বা পূর্ণতা পায়নি। সারাটা জীবন অতৃপ্ত হৃদয় নিংড়ানো মর্ম বেদনার অভিব্যক্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন গানে ও কবিতায়। এর ফলে নার্গিস, ফজিলাতুন্নেসা ও স্ত্রী প্রমিলা নজরুল সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভার বিস্তার করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য, কবি নজরুলের পবিত্র প্রেম ও ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কৌশলে অনেকে কুৎসা গেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক গাল-গল্প প্রচলিত আছে। কবির চরিত্র হনন এবং কবিকে তাঁর আপামর ভক্তবৃন্দের কাছে ছোট করে দেখানোই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকে অভিযোগ করে থাকেন, কবি যোগ বা কালী সাধনা করতেন। কবি অভিনেত্রী ও শিল্প রমণীদের কাছে যেতেন। তিনি প্রত্যহ অনেক রাতে বাড়ী ফিরতেন। সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কবি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। মদ খেতে খেতে বুকের বাম পাশটা অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডটা একেবারেই বিনষ্ট করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি নজরুলের বিরুদ্ধে যে-সব অপপ্রচার করা হয়েছে তা যে অসার ও ভিত্তিহীন ছিল তা প্রমাণ করেছেন জনাব শেখ দরবার আলম তাঁর 'অজানা নজরুল' গ্রন্থে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

(১) সমসাময়িক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন- কবি মদ কেন, ধূমপানও করতেন না।

(২) নজরুলের মতো মুখোশবিহীন ঋজু প্রতিভাকে যদি যোগ সাধনায় পায় তবে আর রমণী সাধনায় পাবে না; আর রমণী সাধনায় পেলে যোগ সাধনায় আসবে না। ধর্ম আর অধর্ম, এক সঙ্গে চালিয়ে যাবেন- এমন ভণ্ডামীতে আর যাকেই পাক নজরুলকে কোনোদিন পায়নি। আর এই দুই জায়গায় কোনো একটি জায়গাতেই যদি তিনি যাবেন তবে দৈনিক 'নবযুগ'-এর অফিসে প্রধান সম্পাদকের ভূমিকায় সমাজটাকে বদলানোর অভিপ্রায়ে অনেক রাত অবধি দু'হাতে লিখেছেন কিভাবে? রেডিও, গ্রামোফোন রেকর্ড, চৌরঙ্গী, প্রভৃতি ছায়াছবির জন্য গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, গান শিখিয়েছেন কিভাবে? এতো সবের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও লাম্পট্য চরিতার্থ করার সময়টা পেয়েছেন কোথায়?

(৩) নজরুল গবেষক ডক্টর মিলন দত্ত তাঁর 'নজরুল-জীবন চরিত' নজরুলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের ২৪/৯/৭৬ তারিখে ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা যায়, নজরুল কোনদিনই যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হননি।

পরিণত বয়সে সৈয়দা নার্গিস আসার খানম

দৌলতপুরে এই আমগাছ তলায় কবি গান-কবিতা লিখতেন

১৯২৮ সালে ঢাকায় বনগ্রামের বাসভবনে প্রতিভা বসু (রানু সোম)কে গান শিখাচ্ছেন কবি নজরুল

ফজিলাতুন নেসা এম.এ

রবীন্দ্রনাথের পরকীয়া প্রেম ও প্রাসঙ্গিক কথকতা

গণক ঃ বলি নাই যেয়ো না রাজকোটে
দোঁ-আঁশলা ঠাকুর সাহেবের কাছে।
গণিকা ঃ চুপ করো, হায় নাথ
উঁচুগিরি কুচ-যুগ 'যৌবন' কি আর আছে।

- *শওকত ওসমান*
(মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪৬)

কবি নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র নির্দোষ প্রেমের নিদর্শন থাকলেও বিশ্ব কবির ব্যক্তিগত জীবনে রয়েছে বহু পরকীয়া প্রেমের কুৎসিত নিদর্শন। যার পরিণতিতে আত্মবলি হতে হয়েছে একজন অন্তঃসত্ত্বা অবলা নারীর।

নারী-পুরুষের যে মৌলিক সম্পর্ক যৌন মিলন সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

'যৌন মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা 'প্রজনার্থং' নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ।'[১]

কিন্তু কবির বক্তিগত জীবনে যেসব প্রেমের কথা শোনা যাচ্ছে বা তাঁর মুখ দিয়ে পরোক্ষভাবে যেসব কথা বলেছেন, তাতে কিন্তু পবিত্র প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরকীয়া প্রেমের নোংরা কুৎসিত দিকটাই ভেসে উঠে।

প্রেমিক দেবর হিসাবে যিনি বাঙ্গালী সমাজে পথ প্রদর্শক হয়ে আছেন, তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রজ জ্যোতিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রণয় নিয়ে একটি বিরাট উপাখ্যান রচিত হতে পারতো। দু'জনের প্রণয় ছিল অত্যন্ত গাঢ়।

এই কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

'এমন সময় একদিন বাজল সাঁনাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শ্যামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি, পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই; সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে; আমি যে হেলাফেলার ছেলে মানুষ। .....

১। রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ২৩, পৃঃ ৪০৫।

বউ ঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বউ ঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো; খাওয়াতে ভালোবাসতেন; এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরী থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয় বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটি জুতো জোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা কোন দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।' তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন', তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।[২]

কাদম্বরীর সাথে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের বিয়েতে ঘোর আপত্তি ছিল আই.সি.এস মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রীর, যুগের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর। তাঁদের হাতে বিলেত-ঘুরে-আসা এক পাত্রীও ছিল। স্ত্রীকে লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, "আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না।" মহর্ষির কাছেও আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু কাজ হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে যুক্তি দেখিয়েছিলেন ঃ "জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়েছে এইই ভাগ্য। একে ত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমাদিগকে ভয় করে।" বিবাহ নির্বাধে সম্পন্ন হয়েছিল। বিয়ে একটি সামাজিক কৃত্য। মেয়ের বয়স ন' বছর হওয়ায় আশ্চর্য হই না, সে-যুগে এটাই চল ছিল। বাইরের কন্যা বধূরূপে আনার ক্ষেত্রেই নয়, বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারেও ব্যতিক্রমী, রুচিমান্, আধুনিক ও নানা বিষয়ে সাহসী এই পরিবারকে কখনো সাহসের পরিচয় দিতে দেখি না। বুঝতে পারি, বাল্যবিবাহ ঠাকুরবাড়িরও রীতি ছিল। অশিক্ষিতা বালিকাবধূ নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তাই লজ্জিত হওয়ার কারণ ছিল না, তবে অস্বস্তি তো থাকতেই পারে। যদি অসমবয়সী বিবাহকে নিষ্ঠুরতা হিসেবে গণ্য করি, তো জমিদারগৃহের নিষ্ঠুরতাও প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশে ছিল বৈ কি। জমিদারনন্দন দেবেন্দ্রনাথের জন্য কন্যা খুঁজে আনা হয়েছিল প্রায় চুরি করে এবং সেই যে সারদাসুন্দরী দেবী জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকলেন, সম্ভবত আর বেরোননি এবং কন্যা না-দেখে তাঁর মা কেঁদে-কেঁদে (যদিও মেয়ে যে তাঁর রাজার ঘরণী তা তিনি জানতেন) অন্ধ হয়ে মারা যান। যাই হোক, কাদম্বরী দেবীকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের অক্ষরহীনা থাকার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু এও সত্যি যে তিনি স্কুল-কলেজ পাস করেননি, স্বশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে যে, অন্য ধরনের মানুষ হয়ে গেলেন, শুধু ব্যক্তিত্বময়ীই নয়, জেদী, অভিমানী, স্কিৎজোফ্রেনিক- তার বীজও কি শ্বশুরালয়ের আবহাওয়া থেকে পাওয়া? তাঁর যে-দুটি ছবি

২। রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬ ঃ পৃঃ ৬১৪।

আমাদের চেনা তার একটি হল সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদাননন্দিনীর সঙ্গে স্বামীসহ তোলা আলোকচিত্র। অন্যটি তাঁর স্বামীর আঁকা স্কেচ। নিজের আঁকা এ ছবিই কি জ্যোতিরিন্দ্র বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনে রাঁচির বাড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন? দু'টি ছবিতেই মুখের তীক্ষ্ণ কাঠামোতে কোমলতা সত্ত্বেও ঋজুতা ধরা পড়ে। দেবেন্দ্রসন্তানেরা যত কান্তিমানই হোন, তাঁদের স্ত্রীরা যে সকলেই শাশুড়ি সারদাসুন্দরীর ন্যায় রূপবতী ছিলেন, এমন নয়; জ্ঞানদাননন্দিনীই বলেছেন যে, বেশির ভাগ বৌদেরই গাত্রবর্ণ শ্যামলা ছিল। কাদম্বরীরও তাই। বৌমাদের রূপ নিয়ে আক্ষেপ ছিল শাশুড়ি ঠাকুরানীর। তা নিয়ে কি কখনো তির্যক কথা শুনতে হয়েছে কাদম্বরীকে? আমরা জানি না। তবে অনুমান করি, অসম্ভব নয়। কিংবা যখন শুনেছিলেন (শোনাটাই তো স্বাভাবিক, তা তিনি বিশ্বাস করুন বা না-করুন) বিয়েতে মত ছিল না মেজ ভাশুরের আর তাঁর স্ত্রীর, তখন থেকেই কি মনের অতলে, হয়তো-বা নিজের অজ্ঞাতে, প্রতিরোধ ও আত্মসম্মানের অহঙ্কার দানা বাঁধতে শুরু করেছিল? রবীন্দ্রনাথে চিত্রাঙ্গদার যে ব্যক্তিত্ব নির্মিত, সেখানে কোথাও কি দাঁড়িয়ে থাকেন নতুন বৌঠান?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর দাম্পত্য জীবনের আনন্দচিত্র অঙ্কিত আছে বহু ব্যক্তির স্মৃতিকথায়। সে-জীবন শুধু দু'জনকে নিয়ে সম্পূর্ণ নয়; দেবর রবীন্দ্রনাথ, স্বামীর কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন- সকলের সম্মিলনে সে এক নিত্যদিনের উৎসব যেন, আর তার চালিকাশক্তি প্রাণময়ী কাদম্বরী। এই রূপান্তরটিই বালিকাবধূর অর্জন। পিছনে হয়তো প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল ঈর্ষা, আই.সি.এস-পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর জন্য। স্বামী তাঁর এই বৌঠানের জন্য পাগল। রবীন্দ্রনাথকেও পাগল করার পিছনে প্রতিশোধের এক সমান্তরাল কাহিনী তৈরি হয়ে যায় কি? অন্ত্য-বিশ শতকের মুক্তযৌনতার এই যুগে এমন উন্মাদনার চারিত্র্য উপলব্ধি করা আমাদের জন্য অতীব দুরূহ হয়তো-বা। কিন্তু যুগ ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় আনলে এই মহিলার অন্তর্গত ক্রন্দন, নৈঃসঙ্গ্য ও শূন্যতা সংবেদনশীল মনে ধরা পড়তে বাধ্য।

বৌঠানের আত্মহনন কবি-জীবনের প্রথম বিশ্বগ্রাসী শোক। সে কি শুধুই ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের চলে-যাওয়া বলে? শুধুই এটুকু হলে তার ভার কি সুদীর্ঘ সাতান্ন বছর পর্যন্ত বয়ে বেড়ানো যায়? বয়ে বেড়ানো সম্ভব হয়েছিল, কারণ কায়াহীন অন্য বাস্তবতায় বাল্যসঙ্গী এই দেবরটিকে বরাবরের মতো তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।[৩]

পরবর্তীতে পারিবারিক চাপে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৬ সালে মৃনালিনী দেবীকে বিয়ে করলে জ্যোতিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী চব্বিশ বছর বয়সে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে। তখন সে অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। এই কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে গভীর শোক

৩। 'ভারতীয় ভিটে' সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পা, স্মৃতিকথা, ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে সংকলন। কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৩, পৃঃ ৮১, 'আমাদের কথা' উঃ স্থ, পৃঃ ৩১। দ্রঃ হায়াত মামুদ, দিন যাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫২, ৫৩)

পেয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছবি দেখে অনেক দিন পর দুঃখ মথিত স্মৃতি মন্থন করে তাঁর অমর কবিতা 'ছবি' রচনা করেছিলেন। বউ ঠাকরুনের স্মৃতি আজীবন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে লালন করেছেন, মৃত্যুর পূর্বে কবি দেখতে চেয়েছিলেন নতুন বউ ঠাকরুনের ছবি।

কাদম্বরীর শূন্যতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ঃ

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
আহা তোমার সঙ্গে
আমি কোথায় প্রেমে হবো সাবার।'

রানী চন্দ তাঁর রোজ নামচা 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ৭ আগস্ট ১৯৩৪ সালে অর্থাৎ কবির বয়স যখন তিয়াত্তর বছর লিখেছেন ঃ

বাংলাদেশে বউদি সম্পর্কটি বড়ো মধুর। এমনটি আর কোনো দেশে নেই। মনে পড়ে আমার নতুন বউঠানের কথা- খুব ভালোবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমায় খুব ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসায় নতুন বউঠান বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন। আমার সকল আবদারের ঐ একটি স্থান ছিল- নতুন বউঠান। কত আবদার করেছি কত যত্ন ভালোবাসা পেয়েছি।[৪]

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর প্রতি কবির ভালোবাসা ও মমত্ববোধ কতটুকু ছিলো, এই সম্পর্কে কবির একটি ব্যক্তিগত পত্রাংশ প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশি কোন চেষ্টা করো না- আন্তরিক ভালোবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগাযোগ থাকত খুব ভালো হ'ত- কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ও নয় ..... জীবনে দু'জনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে। আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই- সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালোবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর- আমাকে অনাবশ্যক দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহু মূল্য হবে।'[৫]

উপরোক্ত বক্তব্য ও মন্তব্য পাঠ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কবি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা ও অনুরাগ কাদম্বরী দেবীর প্রতি ছিলো প্রবল যা মৃণালিনী দেবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সাথে বৌদি কাদম্বরীর প্রেম যে অত্যন্ত জমজমাট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অমিতাভ চৌধুরী 'পরলোকে রবীন্দ্র চর্চা' গ্রন্থ থেকে। রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানটেচে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্ল্যানটেচ করে আনলেন কাদম্বরীকে। কাদম্বরী বলল, 'কে তুমি?

৪। শ্রীমতি রানী চন্দ্র ঃ আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৫-২৬।
৫। প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড ঃ পৃঃ ৫০৯।

আমাকে চিনতে পারছো না ঠাকুর পো? আমি তোমার সেই বৌঠান, যার কাছে গচ্ছিত ছিল আমার ২২ বছরের যৌবন।'[৬]

যারা রবীন্দ্র চর্চাকে এবাদত মনে করেন, তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের বৌদির সাথে প্রেমলীলা অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে কি-না জানিনা। তবে অনেকে রবীন্দ্রনাথের পরকীয়া প্রেমের স্বপক্ষে অদ্ভুত যুক্তি খণ্ডন করে বলে থাকেন 'রবীন্দ্রনাথ রক্ত-মাংসের মানুষ। জৈবিক সব তাড়না থেকে মুক্ত তিনি এক মহাপুরুষ, দেবতুল্য নিষ্কলুষ তার চরিত্র। দু'জন মনীষীর ব্যক্তিগত জীবনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- 'টলস্টয়ের মত সাহিত্যিক যৌবনে নারী সংসর্গের ব্যাপারে ছিলেন উৎসাহী পুরুষ। টলস্টয় নাকি অকপটে স্বীকার করেছেন, তিনি যৌবনে নারী সংসর্গের ব্যাপারে ছিলেন অক্লান্ত।

বাট্রান্ড রাসেল তার আত্মজীবনীতে বাড়ীর চাকরানীকে ধর্ষণ করার ব্যর্থ প্রয়াসের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন, অজানা এ ঘটনাকে তিনি সাদা কাগজের কালো অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পৃথিবীতে এ জন্য কেউ টলস্টয়, বাট্রান্ড রাসেলকে চরিত্রহীন বলে কেউ অসম্মান করেননি। আজও জগতে তাদেরকে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে সম্মান করে। তাহলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেলায় অন্যথা হবে কেন?

অদ্ভুত যুক্তিই বটে। তাদেরকে কে বোঝাবে পাশ্চাত্য সমাজে যা স্বাভাবিক; আমাদের সমাজে তা অস্বাভাবিক। মুসলমান সমাজে তো তা গ্রহণযোগ্য নয়ই; এমনকি হিন্দু সমাজেও তা সামাজিকভাবে নিন্দনীয়। এই নিন্দনীয় কাজটির পক্ষে যারা সাফাই গাইছেন তারা যে অসুন্দর ও অশ্লীলতারই পূজারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে পিলে চমকানো বক্তব্য দিয়েছেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ডঃ আহমদ শরীফ। তিনি পশ্চিম বাংলার 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকায় একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এই ইন্টারভিউটি পরবর্তীতে আমাদের দেশের 'দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা'য় দু'কিস্তিতে যথাক্রমে ২৪ এপ্রিল ও ১লা মে '৯৭ পুনঃ প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ ইন্টারভিউয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কটাক্ষ করে বলেছেন ঃ

> 'আমাদের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তার সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনও ত্রুটি নেই, এটা কোনও কথা হল। অথচ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ মদ খেতেন একথা কেউ কেউ বলেছেন? তিনি যেখানে গেছেন মেয়েদের প্রেমে পড়েছেন, টিস করেছেন। জগদীস ভট্টাচার্য ইনিয়ে বিনিয়ে বহু নারী সম্পর্কে বলবার চেষ্টা করেছেন, এমন যেন গুরুদেবের নিন্দে না হয়। রবীন্দ্রনাথের আরো একটি লোভ ছিল পৌরহিত্যের লোভ।'[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে বর্ণিত গুরুতর অভিযোগগুলো কোন মৌলবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীর নয়। একজন বামপন্থী লেখকের। সুতরাং বর্ণিত অভিযোগগুলো যে

৬। অমিতাভ চৌধুরী, পরলোকে রবীন্দ্র চর্চা।
৭। আহমেদ শরীফ, বাংলাবাজার, ১ মে, '৯৭।

অতিরঞ্জিত বা বিদ্বেষপ্রসূত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই ব্যক্তিগত জীবন যার এরূপ কলুষতায় ভরপুর, যে কবি বৌদির সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়াও অসংখ্য নারীর সাথে পরকীয়া ও ব্যভিচারীর হোতা, সে যতো বড় প্রতিভাবান কবিই হোক না কেন তার ব্যক্তিগত চরিত্র থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নেই। তাঁর আদর্শ আমাদের জন্য কখনো অনুসরণ বা অনুকরণযোগ্য হতে পারে না। তাঁর সৃষ্টি থেকে ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারি; কিন্তু জীবনকে আলোকিত করতে পারি না।

আমরা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁর সাহিত্যকর্ম গবেষণা এবং অসাধারণ প্রতিভাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে পারি। কিন্তু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে কখনো শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং তাঁর আদর্শ মহাপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতে পারি না। অথচ আমাদের দেশের কতিপয় অন্ধ রবীন্দ্র ভক্ত ও অনুসারীরা তা করছে। এসব অনুসারীর মধ্যে অনেকের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে অনেক মুখরোচক ও রসালো কাহিনী শোনা যায়। আবার অনেকের সাহিত্যকর্মে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অশ্লীলতায় ভরপুর এবং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রও তথৈবচ। আমি এখানে এসব শোনা কথা উল্লেখ করতে চাই না। তবে একজন রবীন্দ্র প্রেমিক অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধার করা বর্ণনা না লিখে পারছি না। এর আগে অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের কাছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ কেন মহামানবদের আদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে আল্লাহর পরে স্থান দিয়েছেন- এর সঠিক জবাব অভিনেত্রীর লেখায়ই রয়েছে।

গত বছর একটি জাতীয় দৈনিকে 'আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শীর্ষক একটি লেখায় শ্রী রামেন্দু মজুমদারের পত্নী ও বুদ্ধিজীবী কবির চৌধুরীর ভগ্নি শ্রীমতি ফেরদৌসী মজুমদারের কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

> 'আমি তখন সেভেন/ এইটে পড়ি, আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম 'আব্বু, আল্লাহর পরে কে?' আমার প্রশ্নে আব্বু অবাক বিস্ময়ে বেশ কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, চট করে উত্তর দেয়াটা তার পক্ষে সহজ হয়নি। পাল্টা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোর কাছে কি মনে হয়?' বলেছিলাম 'কেনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' তিনি তার লেখার শুরুতেই বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বটে।' হিন্দু পুত্রবধূ শ্রীমতি মজুমদার আরো জানিয়েছেন তার মা তার বাবাকে সে আমলে ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন। তার ভাষায় '...... বাবার ভয়ে সদা শঙ্কিত মা তর্জনী উঁচিয়ে বলতেন, 'আচ্ছা তোমরা ঠাকুরকেও ডরাও না?' তখন এ 'ঠাকুর' কেবল মার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। এর মর্ম একটুকুও আমার মরমে পশেনি। কিন্তু এখন বুঝি মার কাছে বাবার স্থান কোথায় ছিল?'

এমনকি রচনার শেষে তিনি আর আল্লাহর পরে নয়, সবার ওপরেই রবীন্দ্রনাথকে বসিয়েছেন। তার ভাষায় ঃ 'রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথই।' ওকে যে উচ্চাসনে আমি

বসিয়েছি, সেই ছোটবেলা থেকে আর কারও সেখানে প্রবেশ করার অধিকার নেই।' তাই ফেরদৌসী মজুমদার আরবী বিভাগে কৃতি ছাত্রী হয়েও পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থাকে চরম উপেক্ষা করে বিয়ে করেছিলেন রামেন্দু মজুমদারকে। নিজ ধর্মীয় আচারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সপরিবারে পূজা পার্বনে কলিকাতায় যান। সনাতন অন্যান্য আচার করেন। রবীন্দ্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বেছে নিয়েছেন ব্যাভিচার জীবন।

রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পের শেষের দৃশ্যটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফেরদৌসী বলেন ঃ

> 'একরাত্রি'র বিবাহিত সুরবালা এবং সেকেন্ড মাস্টারের রোমান্টিকতা আমাকে আজও রোমাঞ্চিত করে। ...... যখন গভীর রাতে সুরবালা এবং মাস্টার বানের জল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেদের অজান্তেই পুকুরের উঁচু পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল- অসাধারণ! কী ভাষা! দৃশ্যটা যেনো চোখে ভাসে, শরীর শিহরিত হয়।' অন্য এক জায়গায় 'মনুষ্য সমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না। তাহার পর বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।' গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথের এ মনোভাব তুলে ধরে পুলকে আত্মহারা হয়ে ফেরদৌসী মন্তব্য করেন ঃ 'কি চমৎকার কথা! মনুষ্য চরিত্রে কি মোক্ষম বিশ্লেষণ! আমার তো মনে হয় সংসারে শতকরা আশি ভাগ লোক এ অস্থিরতায় ছটফট করে মরে এবং মরছে।'

এ রকম নিষিদ্ধ কামোত্তেজনায় বা 'বেঠিক বাসনায়' ছটফট করে মরা ফেরদৌসী মজুমদারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখাটির গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় জনাব মাশহুর হাসান। তিনি "মুখ মে শাহ ফরিদ বগল মে ইট' শিরোনামে লিখেছেন ঃ (আংশিক)-

> 'এই ব্যাভিচরী রবীন্দ্রনাথকে পূজো দিয়ে অনেক মহিলাই তার সাথে ইন্দ্রিয় প্রেমে জড়িয়েছিলেন স্বামী সংসার ফেলে। মৈত্রেয়ী দেবীর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'ন-হন্যতে' -এর সুস্পষ্ট আভাস আছে। বাংলাদেশের বর্ষীয়ান আওয়ামী কবি (অবঃ) ও তথাকথিত নারী নেত্রী সুফিয়া কামাল রবীন্দ্র সঙ্গীতকে প্রার্থনার সাথে তুলনা করেছিলেন। শ্রীমতি ফেরদৌসীও হয়তো রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে তার সাথে তার অতৃপ্ত ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থ করতেন। সে রকম পরকীয়া ও ব্যভিচারী ইচ্ছে অবশ্য তার এ (আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) লেখাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। ..... শ্রী রামেন্দুর সাথে লটর-পটর সংসার ফেলে রবীন্দ্র মনস্কামনার যথার্থ উত্তরসূরী এই মহিলা অনেকের সাথেই ইয়ে করে বেড়িয়েছেন। একজন সতীর্থ নাট্য আন্দোলন কর্মী নাট্যকার ও টিভি কর্মকর্তার সাথে তার দীর্ঘদিনের একটি মনো দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মহল মাত্রই অবহিত। একবার তাদের বিয়ের কথাও শোনা গিয়েছিল। বিপত্নীক ঐ নাট্যকার নব্বইয়ের দিকে একবার বন্ধনে আবদ্ধ হতে উতলা হলেও শেষ পর্যন্ত ফেরদৌসীর কারণে নাকি আর তা হয়ে ওঠেনি। জানা গেছে লিভ টুগেদারে বিশ্বাসী এই ভদ্র মহিলা বন্ধনকে ঝামেলা বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বলে, বিয়ের আগেও ফেরদৌসী তার বড়ো দু'ভাইয়ের এক চিরকুমার শিক্ষকের সাথে

নাকি বেশ কিছু দিন লিভ টুগেদার করেছিলেন।

এ রকম মহিলার পক্ষে এসবই স্বাভাবিক (যদিও বয়সের কারণে বিগত যৌবনা এ মহিলা এসব পুলকিত ভাবনা এখন অস্থির করে তুলে মাত্র) আর তিনি নগর সংস্কৃতি লালিত যে আশি ভাগ মহিলার কথা বলছেন তারা তো হামেশা তাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন; বর্তমান উদার খোলামেলা সংস্কৃতির জোয়ারে তারা আরো বেশি করে ভেসে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রগতিশীল ধ্বজাধারী নাট্য আন্দোলন কর্মী শ্রীমতি মজুমদার নিপীড়িত মানুষের পক্ষে বারবার দাঁড়ালেও তার এ লেখায় কিন্তু তিনি জমিদারী আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার পরিবারের ছিলেন বলেই তার লেখায় যেমন একটা আভিজাত্যের মেজাজ আছে যেটা আমার মনকে কাড়ে।'

কমিটমেন্টের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে জমিদারদের প্রতি তার এ আসক্তির কারণ কি! তবে কি অষ্টাদশ শতকে গোড়ায় বৃটিশ বেনিয়া ও নীলকরদের সহযোগি উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু জমিদাররা নৃশংস অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে মুসলমানের স্বতন্ত্র পরিচয় মুছে ফেলারও যে অপ্রতিরোধ্য ষড়যন্ত্র করেছিলো আজকে আরো ভয়ঙ্কর কায়দায় ধর্মের নামে দামামা বাজিয়ে আসা সরকারের মদদে যখন ইসলামের নাম-নিশানা গুঁড়িয়ে দিয়ে সেক্যুলারিজমের নামে এ দেশের ১২ কোটি মানুষের জীবন-অভ্যাস-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কহীন বাবু কালচার প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন তখন সে-সব জমিদারদের প্রেতাত্মাকেই তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন বলে ধরে নেবো?

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের শর্মিলা বিমলা চরিত্রের মধ্যদিয়ে নারী মুক্তির প্রশস্তি করতে গিয়ে উচ্ছ্বাস সংবরণ করতে না পেরে তিনি তার নিতান্ত অগভীর এ লেখায় বলেছেন ঃ

'...... এই ভেবে রবী ঠাকুরের কাছে আমার মাথা নত হয়ে আসে যে, সেই সাতযুগ আগে এমন আলো পাওয়া আধুনিক সাহসী মহিলা চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। এ বোধ হয় তার পক্ষেই সম্ভব।'

নারীর সাহসকে এরা কেবল শারীরিকভাবে দেখতে অভ্যস্ত। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীবাদী লেখিকা এবং কিছু নারী নেত্রী ও অভিনেত্রী সম্ভবত ফ্রয়েডের শিষ্য ও বিকৃত কামতাড়নায় বিভোর বলেই বোধ করি নারীর যৌন স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন দিক তাদের চোখে পড়ে না। তাই ১৯৯৪- এ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সে বছর তাদের প্রতিপাদ্য স্থির করেছিলো- 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার।[৮]

ফেরদৌসি মজুমদারের মতো রবীন্দ্রপ্রেমী অনেক কবি-সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আমাদের দেশে আছে। তাঁদের থেকে একজন কবি ও একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবন নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করছি। এখানে তাঁদের টেনে আনার অর্থ হলো, যারা রবীন্দ্রনাথের অস্তিতে নিজকে বিলীন করে দিতে চান এবং রবীন্দ্রনাথকে দেবতাতূল্য মনে করেন তারা কোন বাথানের জীব তা তুলে ধরা।

কথায় বলে যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। আমাদের দেশে গুরুজীর অনেক ভাব-শিষ্য রয়েছে। তাদের সাহিত্য কর্মও গুরুজীর মতো অশ্লীলতা ও নোংরা কামোদ্দীপক উপাদানে ভরপুর। এদের মধ্যে এক কবির কাছে পাকিস্তান আমলে গুরুজী রবীন্দ্রনাথ

৮। দৈনিক ইনকিলাব, '৯৭)

ছিল অসহ্য। তার লেখা ছিল পড়ার অযোগ্য। বর্তমানে এ কবির কাছে দেবতার স্থান দখল করেছেন গুরুজী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই ভক্তিতে গদ্ গদ্ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ দেশের কবি লিখেছেন-

'কার উপস্থিতির আভায় ঘর
উদ্ভাসিত হলো এবং আমি চোখ কচলে দেখি
আমার টেবিলে হাত রেখে একটু ঝুঁকে
দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবমূর্তি। আলখাল্লা পরা
অসামান্য ব্যক্তিটি যে রবীন্দ্রনাথ, চিনতে
দেরী হলো না।.....

সুতরাং এই অসামান্য দেবতার সুপ্রভাব/কুপ্রভাব ভাব শিষ্যের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যে প্রকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সুপ্রভাব কতটুকু পড়েছে জানিনা কিন্তু কুপ্রভাব যে ভালোভাবেই আছর করেছে তাঁর সাহিত্য কর্মই তা বলে দেয়।

কবি যুবতী কাজের মেয়ের শারিরীক গঠন বর্ণনা করেছেন এভাবে-

'সে যে ডাগর পেঁপে গাছ
হয়ে আছে এক জোড় পাকা,
গোল-গাল, বেশ বড়ো-সড়ো
কাঞ্চন বয়নী গাড় লালিমায়।'

মেয়েদের নগ্ন শরীর নিয়ে এই খ্যাতনামা কামুক কবি তাঁর কবিতায় লিখেছেন-

'নিভৃত শরীর দেখলাম নগ্নতায়
উদ্ভাসিক এবং তোমার উষ্ণ, স্মিত যৌনীরূপ
সতেজ ঘাসের স্পর্শ মাটির আঘ্রাণ পেতে চায়
স্তন চূড়া, নাভিমূল, শিহরিত আরণ্যক সুরে।'

বারবনিতার নগ্ন দেহ নিয়ে কবি লিখেছেন-

'হালায় আজকে নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা কান্দুপট্টির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ারা
রাইতের তামাম গতরে।'

নারী প্রসঙ্গ আসলেই অযাচিতভাবে এসব কবিদের যৌন ক্ষুধা জেগে উঠে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। যেমন-

'অন্তরঙ্গতায় তুমি রেখেছিলে মুখ? মনে পড়ে
গোধূলিতে কৌমার্য হরণ সেই কৈশোরের ঘরে?

★ ★ ★

বুকে নাভিমূলে, থুতনিতে'
অথচ গ্রীবায় লেগে থাকে থরো থরো। চুম্বনের ম্যাজেন্টা স্বাক্ষর।'

* * *

হয়তো স্নানের ঘরে নিজেকে দেখেছো অনাবৃতা,
জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি ভেজা নর্তকীর মতো
গাছটিকে তীব্র দেখছিলাম তখন।
সাবান ঘষছো তুমি বগলের সবুজাভ ভূমি
সরার মতন স্তন, নাভীমূল, উরু
এবং ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড, কি মঞ্জুল

* * *

কোনো কোনো মধ্যরাতে জেগে দেখি, আমার যুগল
উরুর একান্ত মোহনায় মুখ গুজে রয়েছে সে, ছলচ্ছল
নড়ে উঠলেই আমি, চেপে ধরে স্তন জিভ তার
যেন মাছ, মারে খাই কী-যে ঘেন্না লাগতো আমার
প্রথম প্রথম। আর উপভোগ করি, বলা যায়, যথাররতি।

* * *

হয়তো বা ব্রা খুলে দাঁড়াবে স্নানাগারে
গা জুড়ে কোমল নেবে জলের আদর

* * *

কারো অভিযান প্রিয় হাত তোমার স্তনের দিকে
অগ্রসর হ'লে তুমি কেমন বিহ্বল হয়ে যাও,
এবং তোমার ওষ্ঠে চুমো খেলে
তোমার চোখের পাতা অতি দ্রুত নেমে আসে কিনা।

শুধু তা-ই নয়। এসব কবিরা পিতার লাশের সাথে শোকাতুর মায়ের যৌন ক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন তাদের কবিতায়। পিতার মৃত্যুতে পাষণ্ড কবি মানবতার শত্রু অশ্লীল যৌন ক্ষুধা প্রকাশ করেছেন কিন্তু শোক তাকে স্পর্শ করেনি। বন্ধুর লাশের পাশে বসেই বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি যৌন কাতর পাষণ্ড কবি বিকৃত যৌন লালসা সংবরণ করতে পারেনি। যেমন-

'ইতিমধ্যেই তোমার রোরুদ্যমান স্ত্রীর
ব্লাউজ উপড়ে পড়া কম্পমান স্তন আড়চোখে
নিলাম বিষম দেখে, অবাধ্য রক্তে ডাকে বার বার
লাল-চক্ষু তৃষিত কোকিল।'

আল্লাহ শেষ বিচারের দিন বান্দাদের কৃতকর্মের জবাব নিবেন। কুকর্মের মিথ্যা সাক্ষী দেবে বলে আল্লাহ বান্দার মুখ বন্ধ করে দেবেন এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে কুকর্মের ফিরিস্তি নেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো আমাদের দেশে কিছু লোক দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর পর তাদের মুখ তাদের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দেয়া দূরে থাক জীবিতকালেই তাদের মুখ কুকর্মের ফিরিস্তি দিচ্ছে। তাও প্রকাশ্যে এবং বাড়ীতে সাংবাদিক ডেকে এনে। যেমন গত ঈদে একটি ম্যাগাজিনের ঈদ সংখ্যায় এ দেশের একজন নামকরা কবি তাঁর কুকর্মের বয়ান করেছেন। ঐ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের জবাবে এই কবি যা বলেছেন তা হলো ঃ তাঁর জীবনে বহু নারী এসেছে। নাম প্রকাশ করে তাদের বিপদে ফেলতে চাই না। তারাও তো কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে বলেন ঃ

> "... মনেরও তো একটা ক্ষুধা থাকে। যে আমার সঙ্গে অষ্টপ্রহর আছে। সে যদি সেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে না পারে.... তবে অন্য নারী এসে ভাসিয়ে নিতেই পারে। 'শারীরিকভাবে এই বয়সে তিনি পুরোপুরি সক্ষম নন এরপরও নারীরা কেন আসে"।
>
> এর জবাবে কবি বলেন- "তারা সেটা জেনেই আসে। বয়সের তো একটা সীমাবদ্ধতা আছেই। মনের দিক থেকে আমি যতোই উদ্দাম থাকি না কেন শরীরের দিক থেকে তো নই। কাজেই সাধ থাকলেও.... মানুষের এমন একটা বয়স আসে, যখন তার উচ্ছলতা কমে যায়.....। "এক সঙ্গে দু'জন নারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হয়েছে?" এর জবাবে কবি বলেছেন, "এক সঙ্গে দু'জন নারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হতে পারে না। তবে একবার কিছুদিনের জন্য এক অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার গাঢ় সম্পর্ক হয়েছিলো। তিনি জানতেনও আমার জীবনে অনেক নারী এসেছে।"

এই কবির মতো আরেকজন কবি-নেতা বাসায় সাংবাদিক ডেকে এনে নিজের কুকর্মের কথা ফলাও করে প্রচার করেছিলেন। তিনি আরেকজনের স্ত্রীর সাথে পরকীয়া প্রেমে মত্ত ছিলেন তা সগর্বে ঘোষণা করেছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি মসজিদে মসজিদে গিয়ে মদীনার ইসলাম কায়েমের কথা বলেছেন। আবার তিনিই তিন কোটি টাকা ব্যয়ে শিলাইদহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি সে অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্দনা করে বলেছেন ঃ

"হে কবি
সূর্যের সহজ আলোর মতো
তোমার কবিতার বিস্তার।
তোমার কবিতা ছড়িয়ে আছে
আমাদের সকল অনুভবে।
তুমি নির্মাণ করেছো আমাদের চিন্তার
সকল ভাষা

আমাদের গানের সকল শব্দ।
তুমি আছো
আমাদের সকল আবেগে উচ্ছ্বাসে বর্ণনায়-
আমাদের ধ্যানের সকল
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ভরে আছে
তোমার অনুভবের সকল সৌন্দর্যে-
আমাদের সকল প্রভাত সন্ধ্যা রাত্রি, আলো অন্ধকার
চিরকালের জন্যে ভরে আছে
তোমার ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাসে-
তুমি আছো
আমাদের হৃদয়ের প্রান্ত দেশে
স্নিগ্ধ কুঞ্জের ক্ষুদ্র গৃহকোণে
আমাদের সকল অস্তিত্ব জুড়ে।"

ভন্ডামী আর কাকে বলে! একদিকে তিনি মদীনার ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে স্থান দিয়ে তাঁর অস্তিত্বে নিজকে বিলীন করে দিতে চেয়েছেন। অথচ কবি নজরুলকে নিয়ে তিনি কোনো কবিতা লিখেননি।

তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের চিরায়ত জনসমাজের আচার-সংস্কৃতি মূল্যবোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন এই সাবেক রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে রবীন্দ্র প্রেমগীত ঃ

"প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাবনা
পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও....।"[১]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এমন ভক্ত কলির কৃষ্ণ আরো রয়েছে। উদাহরণ টেনে লাভ নেই। উল্লেখিত উদাহরণই যথেষ্ট। এসব কবিতা পড়লে যে কেউই বলবে উপযুক্ত দেবতার উপযুক্ত ভক্তই বটে!

সুতরাং এসব রবীন্দ্রপ্রেমিক তথাকথিত নারী নারীবাদীদের কাছে ফুল ও ভুল সবই সমান। তাদের কাছে সৃজনশীল, রুচিশীল বক্তব্য-মন্তব্য, চিন্তা ও কর্ম আশা করা অবান্তর। কূয়োর কোলা ব্যাঙ কূয়োটাকেই মনে করে সাগর। যে গুরু ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্য কর্মে নারীর কামনা-বাসনায় ছিলো বিভোর; সে গুরুর ভাব শিষ্যরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে- এটাই স্বাভাবিক। তাই গুরুর আদর্শে উজ্জীবিত ও উদ্বেলিত ভাব-শিষ্যরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে তা অনুসরণ করছেন এবং অন্যদেরকেও

১। মিডিয়া সিন্ডিকেট, ১০/৪/৯৭।

অনুপ্রাণিত করছেন। এদের কাছে নারী স্বাধীনতা মানেই যৌন স্বাধীনতা। নারী মুক্তি মানেই যখন তখন পর পুরুষের সাথে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যার তার সাথে শয্যা সঙ্গিনী হওয়া!

তাঁর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়া, তাঁর আলোতে আলোকিত হওয়া, তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা, তাঁর গানকে এবাদত তুল্য মনে করা এবং আল্লাহর পরে রবীন্দ্রনাথকে স্থান দেয়া বিচিত্র কিছু নয়। কথায় বলে ঃ জেয়ছায় তেয়ছা মিলে, শুঁটকী আর বাইগুনে মিলে।

এবারকার ('৯৮) রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী স্মরণ সভায় সরকারের একজন নীতি নির্ধারক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে যুব সমাজকে রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে পাঠ নিয়ে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মানবিক মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন।

এর আলামত ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দেশের ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে আমাদের সন্তানদের চিরকাল চাষার বেটা চাষা করে রাখার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে আজ রবীন্দ্রনাথের সে ইচ্ছে বাস্তবায়নের প্রতিযোগিতা চলছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন ছিলো এ দেশকে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সে আয়োজনও চলছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা ধর্মে মুসলমান হলেও জাতিতে না-কি হিন্দু। দেশের মুসলমানকে হিন্দুত্বে বিলীন হওয়ার জন্য সে আলামতও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। রাখী বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, উলু ধ্বনি, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বেশ কয়েক বছর আগেই শুরু হয়ে গেছে।

নববর্ষের সাজ দেখে তাকে বাংলা সংস্কৃতি বা নববর্ষের সাজ না বলে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির সাজ বলাই যথাযথ। পত্রিকায় যেভাবে যুবক-যুবতীদের ধুতি পরে, কপালে সিঁদুর, তিলক কেটে, গলায় রুদ্রাক্ষরের মালা জড়িতে রাধাকৃষ্ণ, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে এবং হিন্দু দেবী কালি মূর্তি, হিন্দু দেবতা কার্তিকের বাহন ময়ূর মূর্তি, লক্ষ্মী দেবীর পেঁচা মূর্তি, গণেশের ন্যায় হাতির মাথার মূর্তি, মনস্া দেবীর সাপের মূর্তি ও কুকুর গাধাসহ বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে ঢোল, করতাল, মন্দিরা বাজিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাতে জনমনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, নববর্ষ তবে কি হিন্দু ধর্মের কোন পূজা-পার্বণের অংশবিশেষ?

এখন মাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া বাকি যে, "আমরা হিন্দুতে বিলীন হয়ে গেলাম।"

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহযোগী এস. ও. মাথাই লিখেছেন ঃ–

"ভগবান কৃষ্ণের জীবনে ১৬০০৮টি নারী দিয়েছিলো। এ কারণে তিনি বা তার প্রিয় রাধার খ্যাতির কোন ক্ষতি হয়নি; বরং বিভিন্ন চিত্রকলা ও কবিতায় তারা উচ্ছসিত প্রশংসিত

হয়েছেন। এটাই মৌলিক ভারতীয় ঐতিহ্য। মোট কথা ভারতীয়রা কখনও মধ্য ভিক্টোরিয়ান শিষ্টাচারপনায় ভোগেনি।"[১০]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম তাঁর 'বঙ্গ সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ

"চর্যা পদের পর শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনেও বাঙলার সাধারণ সমাজ জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। এগারো বছরের বালিকার দেহভোগের জন্য গ্রাম্য কিশোরের নীতিহীনতা দেব মাহাত্মরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসীরা অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্গে জড়িত ছিল, তারা উপার্জন করতো যেমন রাধা ও বড়াই গোপিনীদের নিয়ে দই দুধ বিক্রি করতে যেতো। পান-ফুল দিয়ে রাধাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কৃষ্ণ।"[১১]

সখীরা যখন উলঙ্গ হয়ে স্নান করতো এবং তাদের কাপড় তীরে রাখতেন ঠিক তখনই শ্রীকৃষ্ণ কাপড়গুলো নিয়ে গাছের আগায় বসতেন। কারণ তিনি না-কি নারীদের উলঙ্গ দেহ দেখতে ভালবাসতেন।

রীবন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গানে বলেছেন ঃ

বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও
বাঁধ ভেঙ্গে দাও, হা-আ-আ

অথবা

"ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল
লাগলো যে দোল
স্থল জলে বনতলে
লাগলো যে দোল"

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের এই গানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছি। দ্বার খুলে দিয়েছি। তাইতো ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আসছে রবীন্দ্রনাথের দেশ থেকে নট-নটিনীরা। মহাপুরুষী শ্রীকৃষ্ণ চুপি চুপি স্নানরত সখীদের বস্ত্র হরণ করে গাছের আগায় বসে তাদের নগ্ন দেহ দেখতো। এ যুগের কৃষ্ণকলি রবীন্দ্র ভক্তরা দেখছে পাবলিশিটি করে, প্রকাশ্যে পাঁচ তারা হোটেলে বসে।

চারিদিকের অবস্থ দৃষ্টে একথা সুস্পস্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ দেশের কিছু লোক দ্রুপদীর বস্ত্রহরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী ভালো ভাবেই ধারণ করেছে। তাইতো আজ সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখা যায় এই যুগের দ্রুপদীদের বস্ত্র হরণের ঘটনা। দেখা যায় নয় বছরের বালক থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধও ধর্ষণের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের হাত থেকে ৩ বছরের শিশু থেকে পঞ্চাশ বছরের মহিলাও রেহাই পাচ্ছে না।

১০। এস. ও. মাথাই, রমিনিস্যান্স অব দি নেহেরু এইজ, পৃঃ ২১১।
১১। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, বঙ্গ সংস্কৃতি দ্র:।

নব বিবাহিতা স্ত্রী মৃণালিনীর সাথে রবীন্দ্রনাথ

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী

ভ্রাতৃষ্পুত্রী ইন্দিরা ও রবীন্দ্রনাথ

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার

"নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই-বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কোন পাওনাদার আসলে তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলতেন যে, প্রকাশকের নিকট থেকে অমুক বইটির সম্মানী পেলেই ঋণ শোধ করে দেবো। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বইয়ের বাজার তৎকালে ছিলো খুবই মন্দা। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর গ্রন্থ পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নিজের বইয়ের বাজার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যও ছিলো হতাশাব্যঞ্জক। তিনি অত্যন্ত দুঃখ করে ও ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন ঃ

> "নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই-বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।" (রবীন্দ্রনাথ, ৮ আগস্ট, ১৯০০)।

তৎকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের বাজার কিরূপ ছিল তা এ বক্তব্যে সুস্পষ্ট। এছাড়া এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দ বাজার পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা (১৩৮৮) শ্রী অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য। "গত শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার" শিরোনামে এক দীর্ঘ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ (আংশিক)

> রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধ কাটে ঊনিশ শতকে, শেষ অর্ধাংশ কাটে বর্তমান শতকে। তাঁর আশি বছরের জীবনে প্রকাশিত দুই শত বই-পত্রের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বই ছাপা হয়েছিল বিগত শতকে- কবিজীবনের প্রথম চার দশকে।
>
> ঊনবিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথের বই-পত্রের বাজার কেমন ছিল, অর্থাৎ সেকালে তার বইয়ের দরদাম কত ছিল, ক্রয়-বিক্রয় কিরকম হত, বইয়ের এডিশন হত কি-না, মুদ্রণ সংখ্যা কোন বইয়ের কিরকম ছিল, বইগুলি কোনটি কত ফর্মার ছিল, বইয়ের কাগজ এবং ছাপা-বাঁধাই কেমন ছিল, তাঁর বই-পত্রের বিজ্ঞাপন কেমন বেরত, লেখক-প্রকাশকের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, গ্রন্থকর্তারূপে অর্থপ্রাপ্তি কিছু ঘটত কি না-ইত্যাদি নানা কৌতূহল ও
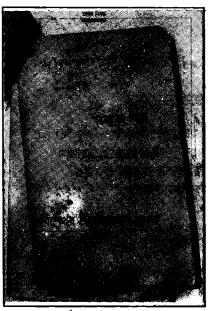
সবুজপত্রের দুর্লব প্রথম প্রচ্ছদ

জিজ্ঞাসার কিছু উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করা গেছে এই নিবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবি-কাহিনী প্রকাশিত হয় ১৮৭৮-এর নবেম্বর মাসে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ এবং এপ্রিল-মে মাস নাগাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমেদাবাদে গিয়েছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন ফর্মার ছোট বই (২+৫৩+শেষ ১ পৃষ্ঠা ফাঁকা =৫৬ পৃষ্ঠা) কবি কাহিনী ছাপতে বেশিদিন লাগার কথা নয়! দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কলকাতা ত্যাগের মাস ছয়-সাত পরে কবি-কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কবি জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন, "আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকাকালেই, অর্থাৎ তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতেই কবি কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল-কবি প্রদত্ত এই বিবরণীতে যে কোনো অতিরঞ্জন নেই তা তথ্যাদির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। কবি-কাহিনীর আখ্যাপত্রে লেখা ছিল-কবি-কাহিনী। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ও/শ্রী প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক/ প্রকাশিত। এই আখ্যাপত্রের লিখনবিন্যাসটি বিশেষ লক্ষ্য করার মত। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো বইতে কখনো দেখা যাবে না। লেখকের নামের সঙ্গে এমন গা ঘেঁসাঘেঁসি করে প্রকাশকের নাম ছাপা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই আখ্যাপত্র একথাই নির্দেশ করে যে, গ্রন্থ-প্রণেতা রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব এ-বইতে যতখানি, গ্রন্থ প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষের গুরুত্ব তার চেয়ে যেন কিছু কম নয়। কবি-কাহিনী ভারতীয় পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। পর-পর চার মাসে ১২৮৪ পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায়। অর্থাৎ ১৮৭৭ ডিম্বের থেকে ১৮৭৮ মার্চ মাস পর্যন্ত। এর এক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ চলে যান ভারতী পত্রিকার ওই চারিটি সংখ্যা হাতে নিয়ে। আমেদাবাদ থেকে বিলেত চলে যাবার সময় কবি ওই সংখ্যাগুলি তরুণী আন্না তরখড়ের হাতে তাঁর উপহারস্বরূপ দিয়ে যান। বোম্বাই থেকে বিলেতের পথে জাহাজ ছাড়ে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ তারিখে। এর ঠিক দেড় মাস পর কবি-কাহিনী বই হয়ে বাজারে বেরয়। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ও তাঁর অগোচরেই যে প্রকাশিত হয়েছিল-তা তথ্যাদির দিকে তাকিয়ে স্বীকার করতেই হয়।

ডিমাই আকারের এ বই পাঁচশ' কপি ছাপা হয়েছিল। দাম ধার্য করা হয়েছিল ছয় আনা। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসে থাকাকালেই কবি-কাহিনী বান্ধব পত্রে সমালোচিত হয়েছিল।

সমালোচক এ কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করলেও স্বয়ং গ্রন্থকারের কথা থেকে জানা যায় যে, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেলফ-এ অক্ষয় হয়ে বিরাজ করেছিল। এবং কবি উৎসাহী বন্ধু প্রকাশকের চিত্তকে এ কারণে ভাবাতুর করে তুলেছিল। কবি-কাহিনীর দ্বিতীয় সংরক্ষণ আর কখনো প্রকাশিত হয়নি।

সন্ধ্যা সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন্ধ্যা সঙ্গীত বইয়ের প্রচ্ছদ

প্রথম বই প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নানা মিল চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই যেমন বিক্রি না হয়ে সুদীর্ঘকাল কেবল দোকানের শেল্ফেই বিরাজ করেছিল. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বই, সেটিও কাব্যগ্রন্থ ললিতা-পুরাকালিক গল্প-তথা মানসও তেমনি প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতেই পচে-বিক্রয় হয় নাই।' এ উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই।
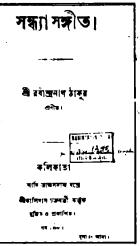
দু'টি বইয়ে শুধু যে বিক্রি না হওয়াটাই মিল, তাই নয়, দুটি বই-ই কবিতাপুস্তক এবং দু'টি বইয়েরই দাম একেবারে সমান-উভয় পুস্তকেরই মূল্য ছয় আনা। রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনী এক 'উৎসাহী বন্ধু'র উদ্যোগে মুদ্রিত, আর বঙ্কিমের প্রথম বই ললিতা, কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধু'র অনুরোধে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বই দু'টির মধ্যে অমিল ছিল পৃষ্ঠা সংখ্যায়। ললিতার পৃষ্ঠা ৪১, কবি-কাহিনীর পৃষ্ঠা সংখ্যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আবার পৃষ্ঠা সংখ্যার হিসাবের দিক থেকে এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বঙ্কিমের ৪১ পাতার বই ১৮৫৬ সালে ছাপা হয়ে দাম ছিল ছয় আনা, আর রবীন্দ্রনাথের আরো এক ফর্মা বড় বই তার দীর্ঘ বাইশ বছর পর মুদ্রিত হয়েও দাম ধার্য হয়েছিল সেই ছয় আনা। তার মানে কি এই যে, ১৮৫৬-তে গ্রন্থ প্রকাশনের খরচ বেশি ছিল ১৮৭৮-এর অপেক্ষা? নাকি রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই লভ্যাংশের কল্পনা বাদ দিয়ে শুধু খরচ-মূল্যে বাজারে ছাড়া হয়েছিল? দাম এত কম রেখে বই ছাড়া হল. কিন্তু তবু সে-বই বিক্রি হল না প্রকাশকের দপ্তর থেকে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বইও অপরের উদ্যোগে উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮২-৮৩ বঙ্গাব্দে বন-ফুল জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশের তিন বছর পর ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (৯ মার্চ ১৮৮০) রবীন্দ্রনাথের দাদা সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বই অনুজের প্রতি প্রীতিবশে ছাপিয়ে দেন। জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ বন-ফুল প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে একটি গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াও ছিলেন।" এ বই ছাপা হয়েছিল

শৈশব সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা
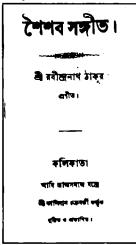
শৈশব সঙ্গীত বইয়ের প্রচ্ছদ

এক হাজার কপি।

মূল্য ছিল আট আনা। কবি-কাহিনীর মত বন-ফুলেরও দ্বিতীয় সংস্করণ আর কখনো ছাপা হয়নি।

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পঁচিশটি বই অবলম্বনে সেকালে তাঁর বইয়ের বাজার কেমন ছিল দেখতে চেষ্টা করব। এই পঁচিশটি বই হল ঃ কবি-কাহিনী, বন-ফুল, বাল্মীকি-প্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচন্ড, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, কাল-মৃগয়া, সন্ধ্যাসঙ্গীত, বউ-ঠাকুরানীর হাট, প্রভাত সংগীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশব সংগীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, রামমোহন রায়, আলোচনা, রবিচ্ছায়া, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, চিঠিপত্র, সমালোচনা, মায়ার খেলা এবং রাজা ও রাণী।

এই বইগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাবপত্র নিলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার মোটেই ভাল ছিল না সেকালে। এদিক থেকে বলতে পারি, ঊনিশ শতকের বইয়ের বাজারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন নিষ্প্রভ তারকা-মেঘে ঢাকা তারা; সেদিনের সাধারণ পাঠক সমাজে তার বিশেষ জনপ্রিয়তার কোনো নিদর্শন নেই। যদিও সন্ধ্যা সঙ্গীতের কবির গলায় বঙ্কিমচন্দ্র বিজয়মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্গের পাঠক সমাজের উপরে এই বঙ্কিমচন্দ্রের এমনই জনপ্রিয়তার আধিপত্য ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশেষ কোনো স্থান করে নেবার সুযোগ পান নি কিছুতেই। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবীণ ঔপন্যাসিক, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ তখন একজন নবীন গীতিকাব্যকার। বঙ্গের পাঠক সমাজ সেদিন বঙ্কিমের উপন্যাস-রসে এমনই নিমজ্জিত ছিল যে, উচ্চাঙ্গের কাব্য কবিতা পড়বার মত স্পৃহা বা আকর্ষণ তখন তার ছিল না। বাঙালীকে কাব্যা প্রিয়জাতি বলা হয়ে থাকে- একথা কিন্তু এক অর্থে সত্য, এক অর্থে মিথ্যা। আমি বলি, বাঙ্গালী যখন হাতে কলম ধরে তখন সে কাব্য প্রিয়জাতি; আর বাঙালী যখন দোকান ঘর থেকে বই কেনে তখন সে উপন্যাসপ্রিয়জাতি। উপন্যাস পাঠে একালের বাঙালী সেকালে ঐতিহ্য বহন করে চলছে আজও।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পঁচিশটি বইয়ের মধ্যে মাত্র চারটি বই দ্বিতীয় সংস্করণের এবং মাত্র দু'টি বই তৃতীয় সংস্করণের মুখ দেখার সুযোগ পেয়েছিলো গত শতকে। সে বইগুলো হল ঃ (১) বাল্মীকি-প্রতিভা, (২) সন্ধ্যাসঙ্গীত, (৩) বউ-ঠাকুরানীর হাট, (৪) প্রভাত সংগীত, (৫) কড়ি ও কোমল, (৬) এবং রাজা ও রাণী।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল যে-বছর বই হয়ে বেরয়, সেই বছর থেকেই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত। সুতরাং বই-বাজারের প্রতিযোগিতায়

কবি-কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা

কবি-কাহিনী বইয়ের প্রচ্ছদ

রবীন্দ্রনাথ যে সেদিন কিছুটা পিছিয়ে পড়বেন, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। বঙ্কিমের জীবৎকালের মধ্যে, অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হবার পর মাত্র ষোল বছরের মধ্যে তার চারটি সংস্করণ বেরয়, রাজসিংহ ও আনন্দমঠ প্রকাশের বারো বছরের মধ্যে যথাক্রমে চার এবং পাঁচ সংস্করণ ছাপা হয়, দেবী চৌধুরানী দশ বছরে ছয় সংস্করণ হয়, আর সীতারাম সাত বছরের মধ্যে তিনটি সংস্করণ হয়। এই জনপ্রিয়তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেদিন পাল্লা দেবার সামর্থ্য ছিল না কোনোভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পঁচিশটি বই প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে। আমরা এখন একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে এক ঝলকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশনার একটা সম্পূর্ণ ছবি দেখে নিতে চাই। দেখতে চাই, তাঁর এই পঁচিশটি বইয়ের কোন্ বইটি কত ফর্মার ছিল, বইগুলির প্রত্যেকটির কত করে দাম ছিল, কোন্‌টি কোন্ বছর প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোন্‌টির ক'টি সংস্করণ হয়েছিল। এই পঁচিশটি বইয়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য ছিল দুই আনা আর সর্বোচ্চ মূল্য ছিল দেড় টাকা। প্রদত্ত ছক্ থেকে আমরা আরও দেখতে চেষ্টা করব- রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দাম কি ফর্মার পরিমাণের উপর নির্ভর করত, না-কি তাছাড়াও অন্য নানা চিন্তা-ভাবনা কাজ করত তাঁর পুস্তকের মূল্য নির্ধারণর ব্যাপারে। এমনও দেখা গেছে- তার একটি ২০২ পৃষ্ঠার বইয়ের (ভগ্নহৃদয়) দাম এক টাকা, আবার তার ১১২ পৃষ্ঠার একটি বইয়ের (ছবি ও গান) দামও সেই এক টাকা। আবার ১৫৪ পৃষ্ঠার একটি বইয়ের (বিবিধ প্রসঙ্গ) দাম আট আনা। অর্থাৎ তিনটি বইয়ের প্রথমটি পৃষ্ঠাসংখ্যার তুলনায় বেশি সস্তা কিংবা উল্‌টে বলতে পারি, দ্বিতীয়টির পৃষ্ঠা-সংখ্যায় প্রথমটির তুলনায় দাম বেশি, আর তৃতীয়টির মূল্য সম্পর্কে এক কথায় বলা চলে-জলের দাম। এই শেষের বইটা প্রবন্ধের বই বলেই কি কম বিক্রির আশঙ্কা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটি বই গত শতকে যে মূল্য নির্দিষ্ট করে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশের মাত্র কয়েক মাস পরেই তার মূল্য হ্রাস করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। রবিচ্ছায়া নামক গানের বইটির (প্রকাশ ২রা জুন ১৮৮৫, বৈশাখ ১২৯২, মুদ্রণ এক হাজার, পৃষ্ঠা ১৯০) দাম ছিল বারো আনা। প্রকাশের সাত মাস পর সাপ্তাহিক সঞ্জীবনীপত্রের কয়েক সংখ্যায় নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন ছাপা হয়- "মূল্য কমিল রবিচ্ছায়া মূল্য কমিল।"

বাল্মীকি প্রতিভা বইয়ের প্রচ্ছদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই- এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিয়া বঙ্গ ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি একত্রে মুদ্রিত হইয়া 'রবিচ্ছায়া' নামে এত দিন বিক্রিত হইতেছিল। ইহা প্রেমসঙ্গীত, শোকসঙ্গীত ও ধর্মসঙ্গীতে পরিপূর্ণ। বঙ্গবাসী যদি কখনও নির্মল পবিত্র আমোদ অনুভব করিবার বাসনা থাকে, যদি কখনও হৃদয়-মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও সংসারের অতীত করিতে অভিলাষ হয়, যদি কখনও বিষাদময় অন্ধকার জীবনে জ্যোৎস্নালোক আনয়ন করিতে মানস থাকে, তবে আপনার জন্য বড় সুবিধার সময় আসিয়াছে। এতকাল 'বারো আনা করিয়া' 'রবিচ্ছায়া' বিক্রয় হইতেছিল। অতঃপর আট আনা মূল্য নির্ধারিত হইল। ডাকমাশুল এক আনা। নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়। ৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট, মোহিনীমোহন মজুমদারের দোকান ও ক্রানিং লাইব্রেরী, ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্রনাথের দোকান, ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট, সোমপ্রকাশ ডিপোজিটারী, ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০১ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

'সঞ্জীবনী' ও 'ভারত শ্রমজীবীর' গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে ছয় আনা মূল্যে পাইবেন। এক আনা ডাকমাশুল লাগিবে।

শ্রী শশীভূষণ বিশ্বাস
২ নং বেনেটোলা লেন
পাটলডাঙ্গা, কলিকাতা,
ভারত শ্রমজীবী কার্যালয়॥

এই বিজ্ঞাপন থেকে এ-কথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সেকালে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার খুবই মন্দা ছিল। বিক্রিবাটা যে শুধু কম ছিল তা-ই নয়-শেষে হাফ্ প্রাইসে তার বই বিক্রি করতে হল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে- এ বড় কম দুঃসংবাদ নয়।

দুঃসংবাদ আরও আছে। ১২ জুলাই ১৮৮৪ তারিখে এক পুস্তক-বিক্রেতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি উদ্ধার করছি-

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী। ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
আমার ফর্দে লিখিত পুস্তকগুলি আমি আপনার নিকট দুই হাজার তিন শত নয় ২৩০৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। তন্মধ্যে অদ্য এগার শত ১১০০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকি টাকা

আপনি দুই মাসের মধ্যে দুই বারে পরিশোধ করিবেন। ইহা ব্যতীত দোকানদারদিগের নিকটে যে সকল পুস্তক আছে তাহা ক্রমে পাঠাইয়া দিব, তাহা নগদ মূল্যে লইবেন। এ সকল পুস্তক যতদিন না আপনার বিক্রয় শেষ হইবে ততদিন আর এগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব না। এ সকল পুস্তক অল্প অবশিষ্ট থাকিতে আমাকে জানাইতে হইবে পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

১২ জুলাই
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৮৪
৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
জোড়াসাঁকো/ কলিকাতা।

কড়ি ও কোমল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদিত।

প্রকাশিত।
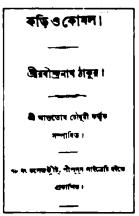
কড়ি ও কোমল বইয়ের প্রচ্ছদ

১৯৮৪ সালের ১ জুলাই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এই পত্র-রচনার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মোট ষোলটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের চিঠির শেষ ছত্রটি লক্ষণীয়- 'পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।' অতঃপর ১৩০৪ সালের একটি পুস্তক তালিকায় দেখি রবীন্দ্রনাথের উনিশটি বইয়ের নাম ও দাম উল্লেখ করে নিচে লেখা হয়েছে 'একত্রে সকলগুলি লইলে অর্ধমূল্যে দিই।' এই পুস্তক তালিকার নামপত্র এইরূপ-

রাজা ও রাণী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

রাজা ও রাণী বইয়ের প্রচ্ছদ

সুলভ মূল্যের শ্রী শ্রীচৈতন্য পুস্তকালয়ের/ বিক্রেয় পুস্তকাবলী॥ শ্রী উপেন্দ্রকুমার ঘোষ॥ ৯ নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৩০৪ সাল।

১৯০০ আগস্টে প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ

"একটা কাজের ভার দেব? আমার বাড়ি তৈরি বাবদ লোকেনের কাছে আমি ৫০০০ টাকা ঋণী ঐ সম্বন্ধে খুচরা ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যের Copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০ টাকায় কেনাতে পার? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি সিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব- গ্রন্থাবলী যা আছে সে এক-তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যর অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই) আমার

সাধনা বইয়ের প্রচ্ছদ
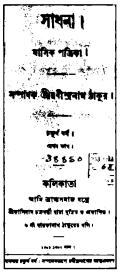
নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে লোক কিনবে সে ঠকবে না।"

এ চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বই শুধু অর্ধমূল্যেই নয়, সিকি মূল্যেও তিনি বিক্রি করতে প্রস্তুত ছিলেন ১৯০০ সালের আগস্ট মাসে।

এই সকল বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে এ কথাই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, গত শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার আদৌ ভাল ছিল না, তাঁর বইয়ের পাঠক ছিল না যথেষ্ট, খদ্দেরের অভাবে বেচাকেনা ছিল খুবই কম, আর তার ফলে বই থেকে তাঁর অর্থপ্রাপ্তি ঘটেনি বিশেষ কিছুই বলতে গেলে। বই বিক্রির পরিসংখ্যান থেকে বলতে পারি উনিশ শতকের সাধারণ পাঠকসমাজ প্রায় অর্ধশত গ্রন্থের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের একজন জনপ্রিয় লেখক বলে সমাদর করতে পারেননি। এই অনাদর উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের পক্ষে এক অগৌরবের সাক্ষী হয়ে রইল। [আনন্দ বাজারপত্রিকা, কোলকাতা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৮। দ্রঃ মাসিক সফর, জুলাই '৯৫ সংখ্যা]

সুতরাং নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের বাজার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে একথা সুস্পষ্ট যে, বই থেকে তাঁর মোটেই আয় ছিলো না। জমিদারীই ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। এই আয় থেকেই গড়ে তুলেছেন শ্রী নিকেতন, শান্তি নিকেতন ও বিশ্ব ভারতীয়। আর নোবেল প্রাইজ-এর অর্থ পেয়েছেন এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ার বহু পরে। সে অর্থও তিনি বিশ্ব ভারতীয়কে দান করেছেন। অথচ যে-সব প্রজার অর্থে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, সে-সব প্রজার সন্তানদের শিক্ষার জন্য পাঁচটি টাকাও দান করেননি। হায়রে আত্মার আত্মীয়!

ছবি ও গান বইয়ের প্রচ্ছদ

> **"আমি হয়ত নীচেই পড়ে থাকব;**
> **কিন্তু যাকে সৃষ্টি করব- সে স্বর্গেরও**
> **উর্ধ্বে আমারও উর্ধ্বে উঠে যাবে।**
> **তারপর আমার মুক্তি।**
> ***- কাজী নজরুল ইসলাম***
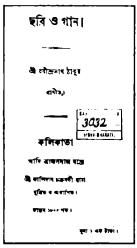
রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির গুরুতর অভিযোগ

"নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম ধরে দেন 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র নকল। একথা অবশ্য আগে বলবার চেষ্টা করছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন। তারপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একটি মেয়েও 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র সাথে দু'টি ইংরেজী উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এর বেশী বলতে সাহস পাননি। কালমোহন ধরে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র কবিতার নকল। .... এই রবীন্দ্রনাথই ডঃ ডেভিটের মধ্যস্থতায় এ্যান্ডারসনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'চার অধ্যায়' লেখেন। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, 'ঘরে বাইরে'ও তাকে টাকা দিয়ে লেখানো হয়। অনেক অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত বলেছেন যে, পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করে নয়, 'জনগণমন' আসলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে লেখা। ঈশ্বর তো বিশ্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেন শুধু বৃটিশ ভারতের উপনিবেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ রইলেন? এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তারা?

- ডঃ আহমদ শরীফ

সাহিতে চৌর্যবৃত্তির প্রবণতা একটি স্পর্শকাতর বিষয় হলেও এই অপবাদ থেকে ছোট খাট লেখক থেকে শুরু করে অনেক খ্যাতিমান লেখক-কবিও রেহাই পায়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই অপবাদ রয়েছে। অনেকে বলে থাকেন তিনি ছিলেন অনুকরণপ্রিয় কবি। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় জগৎ থেকেই তিনি অনেক কিছু নিয়েছেন, কিন্তু ঋণ স্বীকার করেননি কোথাও।

এ সম্পর্কে কাজী আব্দুল মান্নান 'রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ প্রায় হুবহু অনুকরণ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উনিশ শতকের বাংলা গদ্য রচনা থেকেও। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তিকায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন 'ভাগ্যবান লোকের' গ্রন্থাগারের কৌতুকপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

গীতাঞ্জলী রচনারত রবীন্দ্রনাথ

"মহাশয় এই কলিকাতার ভাগ্যবান লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষায় উত্তম উত্তম গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সী ইংরাজী আরবী কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমন সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেরও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্‌গর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোন কালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায়না।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও, মোরে' এবং মানসী কাব্যের 'বধূ' কবিতা দু'টোর ভাব ও আবেগ ইংরেজ কবি শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার অনুরূপ বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।[১]

বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ডঃ আহমদ শরীফ পশ্চিম বাংলার 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ আনেন। এই সাক্ষাৎকারটি পরবর্তীতে ঢাকার বাংলা বাজার পত্রিকায় দু'কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ঐ সাক্ষাৎকারে ডঃ আহমদ শরীফ বলেন ঃ

"নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম ধরে দেন 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র নকল। একথা অবশ্য আগে বলবার চেষ্টা করছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন। তারপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একটি মেয়েও 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র সাথে দু'টি ইংরেজী উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এর বেশী বলতে সাহস পাননি। কালমোহন ধরে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র কবিতার

১। কাজী আবদুল মান্নান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৮১-১৮২)

নকল। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ধারণা ছিল না। কারণ তার ফরমেটিভ পিরিয়ডে ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করে নাই। সেটা এসেছে রবীন্দ্রনাথে, যে রবীন্দ্রনাথ মিছে কথা কয়। জনগণ মন তিনি লেখেছেন আশুতোষ চৌধুরীর পরামর্শে, ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন তার ভাইজি জামাই, প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই। এই রবীন্দ্রনাথই ডঃ ডেভিটের মধ্যস্থতায় এ্যান্ডারসনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'চার অধ্যায়' লেখেন। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, 'ঘরে বাইরে'ও তাকে টাকা দিয়ে লেখানো হয়। অনেক অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত বলেছেন যে, পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করে নয়, 'জনগণমন' আসলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে লেখা। ঈশ্বর তো বিশ্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেন শুধু বৃটিশ ভারতের উপনিবেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ রইলেন? এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তারা?[২]

স্বয়ং নজরুলের বিরুদ্ধেও লেখার ভাব চুরির অভিযোগ উঠেছিল তাঁর সময়েই। আর অভিযোগ করেছিলেন কবির এক সময়কার প্রখ্যাত অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। এক সময় কবির সাথে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ভুল বুঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে তাঁদের সম্পর্ক দ্রুত অবনতি ঘটে এবং তা আর কোনদিন স্বাভাবিকতায় ফিরে আসেনি।

নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর পর একদিকে যেমন ধন্য ধন্য রব পড়ে যায়, তেমনি বিদ্বেষের বিষবাষ্পও কম উদগীরিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, সতেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যদিকে এ নিয়ে ফুঁসতে থাকা মোহিতলাল চতুর্দিকে প্রচার করতে থাকেন যে, তাঁরই রচিত 'আমি' শীর্ষক কথিকা থেকে নজরুল 'বিদ্রোহী'র প্রেরণা পেয়েছেন।

অভিযোগ তেমন গুরুতর না হলেও বিরোধী প্রচারকরা হয়তো এতে কিছু শক্তি পেয়েছিল। এছাড়া রচনায় তো কারো প্রভাব থাকতেই পারে। কিন্তু কালের চক্রে এবং নজরুলের অসাধারণ শক্তিমত্তায় তা ধুলোয় মিশে যায়। এর ফলে দাবিটি গৌণ হয়ে পড়ে। যদি এর দ্বারা প্রেরণা পেয়েও থাকেন কবি তাতেও হৈ-চৈ করার কিছুই থাকে না। কেননা এটা কোনমতেই চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ে ফেলা যায়না। মোহিতলালও এরকম দাবি করেননি। তিনি শুধু 'বিদ্রোহী' রচনায় তাঁর 'আমি' কথিকার প্রেরণা পাওয়ার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন ঃ

"মোহিতলাল যে দাবী তুলেছিলেন, 'আমি' কবিতা থেকে 'বিদ্রোহী' উদ্ভূত হয়েছে, তাতে মোহিতলালের প্রাপ্য অনেকে উড়িয়ে দিয়েছেন একেবারেই। কিন্তু কবি মানসের যে পর্যায়টি প্রেরণার উৎসভূমি, সেই প্রাণনাদেশে মোহিতলালের কথিকাটি নজরুলের 'বিদ্রোহী' ফলাতে সহায়তা করেছিলো। এতে আমি কোন সন্দেহ দেখিনা। নিশ্চয় মোহিতলালের অভিপ্রায় থেকে নজরুলের উৎকাঙ্খা আলাদা হয়ে গেছে, তবু প্রাথমিকভাবে 'বিদ্রোহী'র জন্যে

২। দৈনিক বাংলাবাজার ১-৫-৯৭।

অধ্যয়নরত রবীন্দ্রনাথ

নজরুলের মানস জমি তৈরী করেছে ঐ রচনাটি।"[৩]

মোহিতলাল মজুমদারের অভিযোগ যে বিদ্বেষপ্রসূত বলাই বাহুল্য। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে নকলপ্রবণতার অভিযোগ অনেক লেখক-কবি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু শ্রী মজুমদারের অভিযোগের কোন ভিত্তি বা সমকালীন লেখক-কবি দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এছাড়া কবি নজরুলের শত শত গান হারিয়ে গেছে এবং অন্যের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে-এ অভিযোগ কবির জীবদ্দশায় উঠেছে। তাঁর গান অন্যের নামে ছাপা হচ্ছে এবং গানের খাতা চুরি হয়েছে-এরকম কথা নজরুলকে বলা হলে ডেম কেয়ার ভাবে তিনি বলেছিলেন, "তাতে কি হয়েছে, ওরা তো সমুদ্র থেকে কয়েক ঘটি পানি নিচ্ছে মাত্র।"

সুতরাং কবির বিরুদ্ধে যে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন মনগড়া বানোয়াট কাহিনী।

৩। তথ্য সূত্র ঃ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, সাহিত্যে চৌর্যবৃদ্ধি, নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, জুলাই '৯৭ সংখ্যা)।
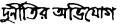
আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রে ঠাকুরের একটি রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেটাকে 'বিশুদ্ধ ও সাধু বাংলায়' লেখার নির্দেশ ছিল। এবং এটা ছিল ১৯১৪ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পরে।

- নীরদ চৌধুরী

দেশের বুদ্ধিজীবী মহল হয়ে থাকেন শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী। তাঁরা হন সুন্দরের পূজারী এবং ন্যায়-ইনসাফ, ঐক্য ও শান্তির প্রতীক। এঁদেরকে হিংসা-বিদ্বেষ, হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি স্পর্শ করতে পারে না। তাদের কোন পক্ষ থাকেনা; তাঁরা হন নিরপেক্ষ। এঁদের কোন দল থাকে না; এঁরা হন নির্দলীয়; জাতির সম্পদ। এঁরা হন জাতির বিবেক। এক কথায় এঁদের পরিচয় হলো এঁরা মানবপ্রেমিক। এই মানব প্রেমিকেরা হন উদারচিত্তের অধিকারী। তাঁরা আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী নন, আত্মপ্রকাশে বিশ্বাসী। তাঁরা বিত্ত-বৈভব, যশ-খ্যাতি সম্পর্কে থাকেন উদাসীন, নির্মোহ। তাঁরা সৃষ্টিশীল কর্মকান্ড নিয়েই থাকেন মত্ত ও তৃপ্ত। তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মধারাই তাঁদেরকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌছে দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে একজন অমুসলিম মনীষির বিচিত্র জীবনের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি।

জ্ঞান সাধক ডায়োজীনস। জন্ম ৪১৩ এবং মৃত্যু ৪২৩ খৃঃ পূঃ। কথিত আছে তিনি জ্ঞান সাধনায় এতোই মগ্ন থাকতেন যে, কৈশোর পেরোবার পর সারা জীবন কখনো বিছানায় শয়ন করেননি। কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হলে বা ঘুম পেলে বালিশ ছাড়া হাতের তালুতে মাথা রেখে আধ শোয়া অবস্থায় গা এগিয়ে আরাম করতেন বা ঘুমাতেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একবার তাঁর ঘর বাঁধার এবং আরামদায়ক বিছানায় শোবার ইচ্ছে জাগে। কিন্তু এই ইচ্ছে পূরণ করার মতো অর্থ জ্ঞান সাধক ডায়োজীনিসের নেই। তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে লিখলেন টাকার জন্য। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অপেক্ষা করেও বন্ধুর কাছ থেকে ঘর বানাবার এবং আরামদায়ক বিছানা কেনার টাকা পেলেন না। অর্থের অভাবে জীবনের একমাত্র সাধ তাঁর অপূর্ণই

কবি, কবিকন্যা মাধুরীলতা ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ

কবির ছেলেমেয়ে ঃ শমীন্দ্রনাথ (শমী), রেনুকা (রাণী), মাধুরী লতা (বেলা) ও মীরা (মীরু/ অতসী)

রয়ে গেল। একদিন ডায়োজীনিস দেখলেন, শহরের রাস্তার পাশে পড়ে আছে অনেকগুলো বড় বড় চুঙ্গি। তার মধ্যে দিব্যি ঢোকা যায়। তিনি ভাবলেন, এই চুঙ্গিগুলোর মধ্যেই তো বাস করা যায়। অতঃপর তিনি তা-ই করলেন। ওই পরিত্যক্ত চুঙ্গির ভিতরেই পাতলেন তাঁর আস্তানা। এই ডায়োজীনেস এরপর বাকী জীবন এই পরিত্যক্ত চুঙ্গির মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আর ঘর বাঁধা হয়নি। এই সময় ডায়োজীনেস-এর একমাত্র সম্পত্তি ছিলো পানি খাবার একটি মগ। এর কিছু দিন পরেই ঘটলো আরেক ঘটনা। একদিন তিনি তার চুঙ্গির আস্তানায় বসে আছেন। হঠাৎ দেখলেন পাশের পানির কল থেকে কতকগুলো ছেলে পানি পান করছে। তাদের সাথে কোন কিছু ছিলো না বলে ওরা আঁজলা ভরেই পানি পান করছে। তাই দেখে ডায়োজীনিসের দিব্য চক্ষু খুলে যায়। তিনি ভাবলেন, ওরা যদি কোন পাত্র ছাড়াই আঁজলা ভরে পানি পান করতে পারে, তবে তিনি কেন পারবেন না? তাহলে তাঁরই বা পানি পান করার জন্য সখ করে মাটির মগ রাখা দরকার কি? তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিলাসের বস্তু মাটির মগটাকে ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। এবার থেকে তিনি হলেন সর্বপ্রকার জাগতিক বস্তু থেকে মুক্ত। সত্যিকার অর্থে একজন নিঃস্ব। কিন্তু তাঁর এই নিঃস্বতা যে সত্যি সত্যি কতোখানি শ্রদ্ধার ও পবিত্রতার ছিলো তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। জগতের কোন বস্তুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভও ছিলোনা। তাঁর কাছে একটি হীরের টুকরো এবং একটি ইটের ভাঙ্গা টুকরোর মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিলো না।

তাঁর এই নির্লোভ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আর একটি চমৎকার গল্প আছে। মহাবীর আলেকজান্ডার ছিলেন বিশ্ববিজয়ী বীর। সারা পৃথিবীতে ছিলো তাঁর অসীম সম্মান, বিশাল শক্তি। প্রায় অর্ধ পৃথিবী ছিল তার পদানত। মহাবীর আলেকজান্ডারও নাম শুনেছিলেন এই মহান দার্শনিকের। তিনি যুদ্ধ জয় করতে করতে যখন সাইনব শহরে এসে উপস্থিত হলেন তখন আলেকজান্ডার ভাবলেন, এখানে যখন এসেই গিয়েছি তখন ডায়োজীনিসকে দেখে যাওয়া যাক।

ছিলো শীতের সকাল। ডায়োজীনিস চুঙ্গির পাশে সকালের রোদ পোহাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে গিয়ে সদলবলে হাজির হলেন আলেকজান্ডার। আলেকজান্ডার নিজেই সামনে এগিয়ে গিয়ে বিনীতভাবে ডায়োজীনিসকে অভিবাদন করে বললেন, আমি সম্রাট আলেকজান্ডার। আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি।

ডায়োজীনিস কিছু বললেন না। শুধু বিরক্তির সাথে তাকালেন সম্রাটের মুখের দিকে। সম্রাট আলেকজান্ডার ডায়োজীনিসকে ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ডায়োজীনিস কিছুক্ষণ পরে বললেন, পারেন।

পারি? আলেকজান্ডার মহাআগ্রহে বললেন, বলুন আমি আপনাকে কি আর করতে পারি? আমি আপনার যে কোনো সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।

আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে সকালের রোদটুকু আটকে রেখেছেন। সরে গিয়ে

কবির জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও মীরা দেবী

রোদটা ছেড়ে দিতে পারেন। তাহলে আমার উপকার হয়।

আলেকজান্ডার লজ্জায় তৎক্ষণাৎ সরে এলেন তাঁর সামনে থেকে। যারা সম্রাটের সাথে এসেছিলেন তারা তো অবাক। এই সামান্য ভিক্ষুকটা মহাবীর আলেকজান্ডারকে এমনভাবে অপমান করতে পারে, তা তারা ধারণাও করতে পারেনি। তারা ভেবেছিলেন হয়তো সম্রাট এক্ষুণি রেগে গিয়ে বুড়োটাকে কতল করার আদেশ দিবেন। কিন্তু আলেকজান্ডার কিছুই করলেন না। শুধু বিষন্ন মনে ফিরতে ফিরতে বলতে লাগলেন, আমি যদি মহাবীর আলেকজান্ডার না হয়ে ওই দার্শনিক ডায়োজীনিস হতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

ডায়োজীনিস-এর কাহিনীটি এখানে উদাহরণ হিসেবে এ জন্যে উদ্ধৃত করেছি, এখানে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। শুধু ডায়োজীনিসই নয়, আমরা যদি খ্যাতিমান মনীষীদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাই তাহলে দেখতে পাবো তাঁরা কেউই শাসকদের আনুকূল্য পাবার জন্য কখনো লালায়িত ছিলোনা। মানব কল্যাণে তারা নিজেদেরকে উৎস্বর্গ করে নিঃস্ব, রিক্ত ও অভুক্ত অবস্থায় এই ধরা থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কর্মের মাধমে যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে চির জাগরুক রয়েছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিংশ শতাব্দীর কবি নজরুল ও ফররুখ আহমদের জীবনেও রয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু দেখা যায় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর এদেশীয় কতিপয় অতি ভক্ত বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ নেই, যে উত্থাপিত হয়নি। প্রজা পীড়ন, প্রজা উচ্ছেদ, নারী বিষয়ক কেলেংকারী, ইংরেজ তোষণ, অর্থের প্রতি প্রচন্ড মোহ, স্বজনপ্রীতিসহ সব অভিযোগই তার বিরুদ্ধে রয়েছে। আর এই সব অভিযোগ কোন মুসলিম লেখক বুদ্ধিজীবী করেননি। তাঁর স্বজাতি স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবীরাই তাঁদের পত্র-পত্রিকায় অহরহ তা প্রকাশ করছে। যা তাঁর মতো একজন বিশ্ব কবির কাছে কেউ আশা করতে পারে না।

গত ৭/১১/৯৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় জনাব আব্দুর রহিম, "রবীন্দ্রনাথ ঃ তার স্বজনপ্রীতি" এক নিবন্ধে পশ্চিম বাংলার 'দেশ' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী শ্রী দীনেশ চন্দ্র সিংহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বজনপ্রীতির এক চিত্র তুলে ধরেন তার গবেষণামূলক এক নিবন্ধে। 'রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', এই শিরোনামে লিখিত ও দেশ পত্রিকার শারদীয় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে শ্রী দীনেশ সিংহ দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন, কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উচ্চাভিলাষী জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজের প্রভাব খাটিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের এক চাকরি জোগাড় করে দেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরিশালের এক অসচ্ছল পরিবারের সন্তান নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকা পাঠাবার শর্তে কন্যাদান করেন। দুঃখের ব্যাপার, কবিকন্যা মীরার সাথে নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। নগেন্দ্রনাথকে কবি গুরুর লেখা এক চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী দীনেশ সিংহ লিখছেন, 'এই চিঠিতে নগেন্দ্রনাথ ও মীরা দেবীর আইনসিদ্ধ সম্পর্কোচ্ছেদের ইঙ্গিত রয়েছে'। শ্রী দীনেশ সিংহের নিবন্ধের মূল বক্তব্য হলো কিভাবে কবি গুরু তাঁর কন্যা জামাতার মধ্যে বিরাজমান বিবাদ সত্ত্বেও জামাতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নগেন্দ্রনাথকে 'হায়দারাবাদ, মহীশুর বারোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) পরিচয় দিয়ে কাজের চেষ্টা করতে বলছিলেন।' কিন্তু কোথাও কোন সুবিধে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু কৃষি বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রীপ্রাপ্ত জামাতাকে নির্দিষ্ট বেতনের একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে পারলে, তাহলে হয়ত কন্যা-জামাতার জীবনের দুর্গ্রহের মোচন হলেও হতে পারে। এই আশার বশবর্তী হয়ে তিনি যখন দিন গুণছেন, বলতে গেলে অপ্রত্যাশিতভাবেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাথে কবির আবার যোগাযোগ ঘটল এবং সম্ভবত তারই ফলে নগেন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সুমগ হল'। নগেন্দ্রনাথের চাকরি পাওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রী দীনেশ চন্দ্র সিংহ নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, নগেন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পাস করে আমেরিকা যান ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য প্রয়োজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। ঐ সময় 'খয়রা ফান্ড' থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক আয় দ্বারা পাঁচটি অধ্যাপক পদ (চেয়ার) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাঁচটি পদ পাঁচটি বিষয়ে (১) ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস, (২) ফনেটিক্স, (৩) ফিজিক্স, (৪)
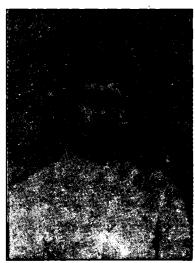
প্রিন্সিপাল [illegible]
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পাঠ্য পুস্তক হিসেবে বাছাইতে শূন্য নম্বর দিয়ে সৎসাহস দেখিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিলেন

ক্যামিস্ট্রি ও (৫) এগ্রিকালচার। চার স্বনামধন্য ব্যক্তি চারটি অধ্যাপকের পদে নিয়োগ পেলেন। তারা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ফাইন আর্টস), ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (ফনেটিক্স), ডঃ মেঘনাদ সাহা (ফিজিক্স), ডঃ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (ক্যামিস্ট্রি)। পঞ্চম অধ্যাপকের ব্যাপারে আশুতোষ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। এগ্রিকালচার বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্তির জন্য একটি বিজ্ঞাপন কায়দা করে প্রকাশ করা হল। এই বিজ্ঞাপনে ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তার কথা সযতনে এড়িয়ে গিয়ে অরিজিনাল রিসার্চ ওয়ার্কে পোস্ট গ্রাজুয়েট-এর ছাত্রদের গাইড করার যোগ্যতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। দীনেশ সিংহ বলেন, 'উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে যেসব দরখাস্ত জমা পড়ে সেগুলো সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হলে সিন্ডিকেট সব দিক বিবেচনান্তে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' এর ফলে নগেন্দ্রনাথ ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করতে সুযোগ পান। এখানে উল্লেখ্য, 'খয়রা ফান্ড' পরিচালনা বোর্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম সদস্য। পাঁচ বছর মেয়াদের দুই টার্ম-এ নগেন্দ্রনাথ চাকরি করার সুযোগ পান। দ্বিতীয় টার্ম শুরুর আগেই তিনি ভারত সরকারের রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচারের অন্যতম সদস্য হিসেবে লিয়েনে চলে যান। কিন্তু দ্বিতীয় টার্ম-এ তার চাকরি শেষ হওয়ার আগেই নগেন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়-এর চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয়। তার পুনঃ নিয়োগের আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে নগেন্দ্রনাথের শ্বশুর কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ খয়রা ম্যানেজমেন্ট বোর্ড থেকে নিজে অবসর নিয়ে সে জায়গায় স্বীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথকে মনোনীত করেন। আর স্যার আশুতোষ তখন পরলোকে। তাই নগেন্দ্রনাথের চাকরি জীবনের শেষ হল ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে। পরের বছর তিনি স্থায়ীভাবে বিলেত চলে যান।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরিশালের এক অসচ্ছল পরিবারের সন্তান নগেন্দ্রনাথকে শুধু আমেরিকা পাঠাবার শর্তেই কন্যাদান করেননি। এর সাথে মোটা অংকের যৌতুকও দিতে হয়েছিল। কবি সারা জীবন পণ প্রথার বিরুদ্ধে লড়েছেন। অথচ মেয়ে মাধুরীলতার

(কবি আদর করে ডাকতেন বেলা) বিয়েতে তৎকালীন সময়ে দশ হাজার টাকা পণ দিয়েছিলেন। পাত্র পক্ষ বিয়ের আগেই যৌতুকের টাকা দাবি করে যা ঠাকুর পরিবারের পক্ষে রীতি বিরুদ্ধ কাজ বলে অভিহিত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই পণের টাকা বিয়ের আগেই পরিশোধ করতে হয়েছে। এই বিষয়ে এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। কবির পারিবারিক জীবন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতি ভক্ত রবীন্দ্র প্রেমিকেরা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বলে থাকেন "ধনী গরীব কৃষকের মত ধনী-গরীব জমিদারও ছিল"। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনই একজন গরীব জমিদার। তাঁর জমিদারী থেকে যে আয় হতো তা মাসোহারা হিসেবে ভাগ হতো শতাধিক হিস্যাদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মাসোহারা ছিল পাঁচশ' টাকা মাত্র। জমিদারী তহবিল থেকে এর অতিরিক্ত এক পয়সাও গ্রহণ করা তাঁর অধিকার ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কাগজপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ টাকার অভাবে কলকাতা জীবন ছেড়ে বোলপুরে এসে স্থায়ী নিবাস নেন। কুলের সম্মান রক্ষার্থে জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি করা সম্ভব ছিলোনা। কিন্তু ঐ বাড়িতে থেকে রাজকীয় জীবন যাপন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কলকাতার বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মাসিক খরচ হতো তিনশ' টাকা। বাকি মাত্র দুইশ' টাকা দিয়ে চলতো তাঁর বোলপুর জীবন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথকে (কন্যা মীরার স্বামী) নিজ খরচে আমেরিকায় পড়াতে গিয়ে তাঁর অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। দেশ ভ্রমণের বাতিক ছিলো রবীন্দ্রনাথের। বিলেত, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে তাঁর অনেক টাকা খরচ হয়েছিলো। বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পেও তিনি অনেক টাকা খুইয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের টাকা তিনি নিজের জন্য খরচ করেননি। পুরস্কারের গোটা অংকই তিনি বিনিয়োগ করেছেন বিশ্ব ভারতীয়, শান্তি নিকেতন ও শ্রী নিকেতন প্রকল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ইতিহাসের অধ্যাপক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়। উল্লেখিত বক্তব্যগুলো যে অতিরঞ্জিত ও অসার তা প্রমাণিত হবে এই গ্রন্থের জমিদার রবীন্দ্রনাথ অধ্যায় পাঠ করলে। সেখানে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-সব সাফাই গেয়েছেন তা ভিত্তিহীন এবং অন্ধ অতি ভক্তিরই বহিঃপ্রকাশ।

মানুষ কখনোই দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। কাজেই অনেক মানুষ জীবনের ভুল-ত্রুটির জন্য প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অনুতপ্ত হন। কিন্তু চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির জন্য প্রকাশ্যে অনুতপ্ত হয়না। চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুতপ্ত হয়ে অপ্রকাশ্যে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। কাজেই কোন মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা বিভিন্ন উক্তি দ্বারা কখনো চারিত্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সবাই চায় নিজকে একজন আদর্শবান ব্যক্তিত্ব হিসাবে জাহির করতে। তাই মানুষের দীর্ঘ জীবনের কর্মধারাই বলে দেয় তাঁর সঠিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং নজরুল-রবীন্দ্রনাথের খন্ডকালীন কর্মপরিধি নিয়ে

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করলে সেটা হবে ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। এর কিছু দিন পরই তিনি শিলাইদহ জমিদারীর দায়িত্ব অর্পণ করেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে। কেননা, শিলাইদহের জমিদারি ভ্রাতৃস্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে পড়ে। সম্ভবতঃ সে সময়েই রবীন্দ্রনাথের মাসোহারা ছিল পাঁচশ টাকা। এ থেকে যদি তিনশ' টাকা কলিকাতার বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণে খরচ হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট ২০০ টাকা দিয়ে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ এবং বিশ্ব ভারতীয়, শান্তি নিকেতন ও শ্রী নিকেতন প্রতিষ্ঠা করা দূরের কথা সাধারণভাবে জীবন যাপনও অসম্ভব। তাহলে এতসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো কোন যাদু বলে। বই বিক্রির এবং 'নোবেল' পুরস্কার বা ভারতীয় সরকারের টাকায় যে হয়নি তা ইতিহাসেই প্রমাণিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯০ সালে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মতান্তরে ১৮৯২। প্রায় ২৩ বছর দাপটের সাথে জমিদারী পরিচালনা করেন। দফায় দফায় গরীব প্রজাদের উপর কর বসিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর সাধের বিশ্ব ভারতীয়, শান্তি নিকেতন ও শ্রী নিকেতন। এ ছাড়া ১২ থেকে ১৩ বার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। একেকবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে একাধিক দেশ সফর করেছেন। এগুলো সবই হয়েছে গরীব মুসলমান প্রজাদের ঘামে ভেজা শোষণ করা অর্থে। এই সীমাহীন শোষণ করা প্রজাদের অর্থেও যখন এই রাজকীয় জীবনের এবং ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের খরচ মিটানো সম্ভব হয়নি; তখন শ্রী নিকেতন বিদ্যালয়, বিদেশ ভ্রমণ এবং পারিবারিক প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে হাত পাততে হয়েছিল অন্যের কাছে। হতে হয়েছিল ঋণগ্রস্ত। ১৯০১ সালে মাধুরীলতা ও রেনুকার বিয়ে এবং দ্বিতীয় জামাতা অর্থাৎ রেনুকার স্বামী জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ত্রিপুরার মহারাজার কাছে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০২-৪ সালে শ্রী নিকেতন বিদ্যালয়ের অর্থাভাবে পুরীর জমি ও স্ত্রীর গয়না বিক্রি করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে দ্বিতীয় জামাতা সন্তোষ চন্দ্রকে আমেরিকা প্রেরণ করেছিলেন। এসব রাজকীয় খরচের কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক পাওনাদার ছিলো। অনেকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি সুদে টাকা ঋণ নিয়ে পূর্ব ঋণ শোধ করেছেন। আয় বৃদ্ধির আশায় রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জীকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কোন কোন বই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। আশুতোষ তা করেননি। সে জন্য দুই মহারথীর মধ্যে পত্র-পত্রিকায় পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে প্রফেসর মুফাখখারুল ইসলাম "অসাধারণ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ইব্রাহীম খাঁ" শিরোনামে এক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

সেকালে স্যার আশুতোষ মুখার্জি পরিবারে ইবরাহীম খাঁ সাহেব তাঁর কারমাইকেল হোস্টেলে থাকাকালে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই আশু বাবুর পুত্র ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন কলকাতায় টেক্সট বুক বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্য পুস্তক বাছাই করার জন্যে অন্যতম পরীক্ষক হিসেবে

প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁ সাহেবকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্য দু'জন পরীক্ষক অন্য সম্প্রদায়ের। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর নিজ সম্প্রদায়ের।

বই বাছাই করতে গিয়ে দেখা গেল, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জন্যেই সংকলিত এক একখানা বাংলা সাহিত্য বই দাখিল করেছেন।

সাহিত্যের সবদিকের দিক্‌পাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ্যবই নিজে সংকলন করে দাখিল করেছেন। এতে সকলেরই খুশী হওয়ার কথা। ইব্‌রাহীম খাঁ সাহেবও খুশী হয়েছেন।

অন্য সম্প্রদায়ের পরীক্ষকদ্বয় খুশীতে একেবারে বে-এখতিয়ার হয়ে রবীন্দ্রনাথের সংকলিত প্রতিটি বইয়ের জন্যই সর্বোচ্চ নম্বর দিলেন। পারেন তো মোট নম্বরের উপর কিছু বেশী দিতে পারলেই যে, তারা বেঁচে যান। কিন্তু তারা বইগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে পড়ে নম্বর দিয়েছেন কিনা সেটি নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁ রবীন্দ্রনাথের সংকলিত পাঠ্য বইগুলোর সবই পুংখানুপুংখ বিশেষ যত্নের সঙ্গে পড়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি বইয়ের জন্যে "শূন্য" নম্বর দিয়েছিলেন। এটা দেখে ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরীক্ষকদ্বয় বিদ্রূপের ভাবে মুখ টিপে হাসছিলেন। তাদের মনোভাব এইরূপ ছিল ঃ কলেজের প্রিন্সিপাল হলে কি হবে। হাজার হলেও যবন-শ্যাক। তার উপর পড়েছে ইংরেজী সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের নামই হয়তো কোনও দিন শুনেছে কি-না সন্দেহ। এইসব মাছলা তাঁর মাহাত্ম্য কোথা থেকে বুঝবে? আরে রবীন্দ্রনাথ যে-সব পাঠ্য বই সংকলন করে দিয়েছেন, এই তো যথেষ্ট! আর আবার বিচার কিসের?

নম্বর আলোচনা বৈঠকের দিনে সেন্ডিকেট শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিও নম্বরগুলো দেখলেন। তিনি কিন্তু ইবরাহিম খাঁকে চিনতেন। তিনি বিষয়টাকে অতো হালকাভাবে নিতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন এর অবশ্যই কোনও বিশেষ কারণ আছে।

বৈঠক শুরু করার আগেই শ্যামা প্রসাদ বাবু আস্তে আস্তে খুব বিনয়ের সঙ্গে প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁর কাছে গিয়ে বসলেন। তারপর ঈষৎ নিম্ন স্বরে বললেন ঃ

"আমি জানি, অবশ্যই কোনো কারণবশতই আপনি কবিগুরুর বইগুলোতে 'শূন্য' নম্বর দিয়েছেন। তবে, ভাই, আমিও কিন্তু বুঝতে পারিনি, কেন তা দিয়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনার কাছে কারণটা জিজ্ঞাসা করি।"

তখনই ইবরাহাম খাঁ বললেন ঃ

'রবিবাবুকে যে আমি মোটামুটি ভালোভাবে জানি তা ত আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন। তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পাঠ্য বাংলা সাহিত্য বই দাখিল করেছেন, তা˳ ˉ আমি সত্যই খুশী। মনে করেছি- সংকলন। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখি, তাঁর কোনও বইয়েই আর কোনও লেখক-লেখিকার কোনও একটি লেখাও নাই। যত কবিতা, তার সবই তাঁর। যত জীবনী, তার সবই তাঁর লেখা জীবনী। যত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, তার সবই তাঁর রচনা। যত গল্প, তাও তাঁর রচনা। মোট কথা, একটি লেখাও অন্য কারোর রচনা নয়। রবি বাবু যত পাঠ্য বই দাখিল করেছেন, ছেলেমেয়েরা তা যদি পাঠ্যরূপে পড়ে, তবে তাদের ধারণা হবে, এ দেশে রবি বাবু

ছাড়া আর তেমন কোনও লেখক জন্মে নাই- যার লেখা পাঠ্যের মধ্যে গণ্য হতে পারে। তাহলে কি আর ভবিষ্যতে কোনো লেখক এ দেশে জন্মাবার সম্ভাবনা আছে বলে কচি ছেলেমেয়েরা ভাবতে পারবে? পারবে না। ঐ জাতীয় হতাশার ঘায় ছেলেমেয়েদের পক্ষেও কোন দিন কিছু লিখতে যাওয়ার উৎসাহ আসতে পারবে না। একজনের কৃত বই পাঠ্য করে যদি সারাদেশের ছেলেমেয়ের সৃজন প্রতিভাকে অমন স্তম্ভিত ও মিসমার করে ফেলার আয়োজন হয় তাহলে তেমন বই পাঠ্য করার চাইতে না করাই কি ভালো নয়? তিনি যত বড় লেখকই হোন, তাঁর বই পাঠ্য করে আমি দেশে এমন নিশ্ছিদ্র নৈরাশ্য আবাদ করা পছন্দ করিনি। ছেলেমেয়েদের প্রতিভা যে স্থলে বিকাশের জন্যেই স্কুলে-বিদ্যালয়ে পাঠদান করার কথা, সে স্থলে তাদের প্রতিভাকে মেরে দেওয়ার আয়োজন তো আর কাম্য নয়।?

"রবি বাবুর বইয়ের জন্যে হয়তো দু'একটি নম্বর আমি দিতাম। কিন্তু অন্য দুই পরীক্ষক যে তাঁর বইয়ের জন্যে এতো বেশী নম্বর দিবেন তা আমি জানতাম তাই আমি শূন্যই দিয়েছি।"

এবারে প্রেসিডেন্ট শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু মুশকিল করেছেন কবিগুরু নিজে তাঁর বইগুলো দাখিল করে দিয়ে। আমরা তাঁর বইগুলি অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করে দিই। অমন একটেরে বই লোকে পাঠ্য করবে বলে মনে হয় না, শুধু পাঠ্য বইগুলির অন্তর্গতই থাকবে হয়তো। কি বলেন?

তখন প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ সাহেব বললেন, সে অবশ্য করা যায়।" (তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৪/৪/৯৭)

এভাবে বিশ্বকপি জাতীয় স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেছিলেন। যা হোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বই বিক্রি করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বই পাঠ্যের অন্তভুক্ত করে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে একজন পাওনাদার তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ মর্মে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করেছিল যে, রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় টাকাটা আদায় করে তা যেন ট্রাস্টের পুঁজি বানানো হয়। অভিযোগ রয়েছে টাকা ধার করে ফেরত না দেবার অভ্যাস ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চার অধ্যায়' বইটি লিখে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বেশ মোটা অংকের অর্থ বাগিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ইংরেজ শাসনের মহিমা প্রচারের জন্য লিখা হয়েছিল এই 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি। পরবর্তীতে ইংরেজ সরকার শত শত কপি বিভিন্ন বন্দী নিবাসে আটক রাজবন্দীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে-গঞ্জে নাটক আকারে অভিনয় করিয়েছিলেন। এইসব কর্মকে দুর্নীতি ছাড়া আর কি বলে অভিহিত করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন ভোগবাদী কবি। ভোগবাদীদের কাছে স্বীয় স্বার্থের কাছে অন্যের স্বার্থ তুচ্ছ। এঁরা মুখে বা সৃষ্টিশীলতায় অনেক চটকদার কথা বললেও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে তা প্রতিফলিত হয় না। কাজেই এই ভোগবাদী আদর্শ জাতির শিক্ষণীয় বা অনুসরণযোগ্য হতে পারে না। যে বা যাঁরা এই ভোগবাদী আদর্শের অনুসরণ করে তারা নিজেরাই ডুবে; জাতিকেও ডুবায়।

হিন্দুবাদীদের নজরুল বিদ্বেষ

"উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ
আমরা বলিব, সাম্য, শান্তি এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।"

- কবি নজরুল

আকাশের কালো মেঘ কিছু সময়ের জন্য কিছু এলাকায় সূর্যের কিরণ বা চাঁদের আলো আড়াল করে রাখতে সক্ষম হলেও সব সময়ের জন্য সব এলাকায় তা আড়াল করে রাখতে সক্ষম নয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই কালো মেঘ সরে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে অনন্তকাল যাবত সূর্য্য ও চন্দ্র আপন মহিমায় বিশ্বের কল্যাণে কিরণ ও আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি কোন মানুষের অসাধারণ প্রতিভাকেও আড়াল করা যায়না। সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বে অসাধারণ প্রতিভা হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু বিকাশমান প্রতিভাকে চক্রান্তের মাধ্যমে আড়াল করা যায় না। সাময়িকভাবে প্রতিভা বিকাশের পথ বাধাগ্রস্ত করা গেলেও পরবর্তীতে তা আপন মহিমায় উদ্ভাসিত ও বিকশিত হবেই। আরো যদি স্পষ্ট করে বলি, নদীর স্রোতকে যেমন বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায় না, ঠিক তেমনি চক্রান্ত করে কারো প্রতিভাকেও ঠেকিয়ে রাখা যায়না।

মুসলমান কবি হবার অপরাধে কবি নজরুলের অসাধরণ বিস্ময়কর প্রতিভাকে নানাভাবে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক সময় অনেক বর্ণবাদী হিন্দু বাবু উপহাস ও তাচ্ছিল্য কণ্ঠে উচ্চারণ করে বলেছিলো ঃ "মুচলমান কবি, সে আবার লিখবে কি হে"! কিন্তু সেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যখন নজরুলের অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভা সর্বমহলে আলোড়ন ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তখন নজরুলের প্রতিভাকে খর্ব করার জন্য প্রকাশিত হয় 'শনিবারের চিঠি' নামক পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন যোগনন্দ দাস। পরবর্তীকালে নব পর্যায়ে সম্পাদক হয়ে আসেন সজনী কান্ত দাস।

আবহমান কাল ধরে সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অতএব সমালোচনা দোষের কিছু নয়। গঠনমূলক সমালোচনা ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ করে দিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যকে পাঠকের কাছে আরো বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।
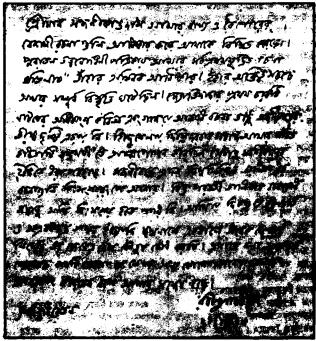
নজরুল বিদ্বেষী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিলো দারুণ সখ্যতা। প্রায়ই তাদের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান হতো। উপরের ছবিটি সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

লেখকের প্রতিভাকে জাগ্রত এবং চেতনাকে আরো শাণিত করে। এর ফলে সাহিত্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ হয়। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে জনভিত্তি সুদৃঢ় করতে সহায়ক হয়। কিন্তু কবি নজরুলের বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠি পত্রিকায় যে সমালোচনা করা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষপ্রসূত এবং নজরুলের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে খর্ব করার প্রয়াস।

শনিবারের চিঠির প্রতিটি সংখ্যায় নজরুলের কিছু লেখা প্রকাশিত হলেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হতো। ওরা বলতো এগুলো হচ্ছে ছক্কু খানসামা আর ফেকু ওস্তাগারের কথা। এই 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত অংশবিশেষ বিচ্ছিন্নভাবে অনেক নজরুল গবেষকের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম তাঁর লেখা অজানা নজরুল গ্রন্থে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এবং পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ও বক্তব্য রেখেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি এখানে সংক্ষেপে অংশবিশেষ তুলে ধরছি। শেখ দরবার আলম লিখেছেন ঃ

> "শনিবারের চিঠির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যা কিছু প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা মূলত তাঁর নজরুল বিরোধিতার জন্যই। তাঁর সাহিত্য জীবন বলে যদি কিছু থাকে তবে তারও প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় নজরুল বিরোধিতারই মহাসড়ক পথে। নজরুল ইসলামকে যারা ঈর্ষা করতেন, সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিতে যারা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন, সজনীকান্ত দাস তাদেরকেই তার পাঠক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।"

সজনীকান্ত দাস নিজে উল্লেখ করেছেন যে, তার নজরুল বিরোধিতার অন্যতম কারণ নাকি নজরুল ইসলামের সাহিত্যের অশ্লীলতা। কিন্তু নজরুল-সাহিত্যে আমরা জানি, ভালবাসার ঋজুতা ও উষ্ণতা আছে, কিন্তু অশ্লীলতা নেই। তাঁর মতো সহজ, সরল ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পক্ষে অশ্লীল সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্ট করা সম্ভবও ছিল না। যে অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন তাতে অশ্লীল সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করার প্রয়োজনও তাঁর ছিলনা। কিন্তু নজরুল সাহিত্যে একটা অশ্লীলতা কল্পনা করে সজনীকান্ত দাস-এর বিরুদ্ধে যা লিখেছেন বা রচনা করেছেন তার একটা প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যই কিন্তু অশ্লীলতা। অথচ ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও অবিবেচনাপ্রসূত নজরুল বিরোধিতায় সজনীকান্ত দাস যা ইচ্ছে তা-ই লিখেছেন, শুধু তা-ই নয়, মোহিতলাল মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে সর্বশ্রী ডক্টর স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমলচন্দ্র হোম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সংগঠন গড়ে তোলারও প্রয়াস চালিয়েছেন।

কিন্তু সময়ে, সাহিত্যের কোনো বায়বীর মানদন্ডে নয়, আদালতের রায়ে, 'শনিবারের চিঠি' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসই অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক আসামীর প্রতি ৫০ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে এক মাস সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

অভিযোগ ছিল 'শনিবারের চিঠি'-তে নকুড় ঠাকুর শীর্ষক এক ধারাবাহিক গল্প প্রকাশিত হচ্ছিল। গল্পটি ছিল যৌন ভাবোদ্দীপক, আশ্বিন (১৩৩৫) সংখ্যায় বহু অশ্লীল ভাষা ও অশ্লীল চরিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে শেখ দরবার আলম লিখেছেন ভাবতেও কৌতুকবোধ হয় যে, নজরুল বিদ্বেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে যে সাময়িক পত্রের জন্য, সেই 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাসের সাজাও হ'ল অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ঠিক শনিবারেই। নজরুলের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত দাসদের অভিযোগগুলোও খতিয়ে দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, সেগুলো তাদের কাছে পরিণামে বুমেরাং হ'য়ে ফিরে এসেছিল।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, অশ্লীলতার অভিযোগে অতিরিক্ত প্রদান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দন্ডিত হওয়ার বাইশ মাস আগে সজনীকান্ত দাস সংগঠিত উপায়ে 'শনিবারের চিঠি'র নবপর্যায়ে নজরুল বিরোধিতা শুরু করেন।

এই নজরুল বিদ্বেষ প্রচার পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রচ্ছদের বিষয় ছিল এক ব্যক্তি মোরগকে চিঠি দিচ্ছে। লেখা আছে, 'যাও পাখী বল তারে /স্বরাজ মেল'। এই প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছে শ্রী সজনীকান্ত দাসের 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' শিরোনামে নজরুল বিদ্বেষ সংবাদ। তাঁর 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য'-এ শ্রী সজনীকান্ত দাস লিখেছেন যে, "২৪ মাঘ ১৩৩৩ (৪ শাবান ১৩৪৫ঃ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭) তারিখ সোমবার মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তিনি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ তীরস্থ গৃহে সাক্ষাৎ

করেন। সজনীকান্ত দাসের বিবরণ ঃ “কল্লোল” “কালি কলম” শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ও কাজী নজরুল ইসলামের সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকায় ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিত পটুত্ব তাঁহাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না, কিন্তু নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত পন্ডিতগণ যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্ট করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া ওঠে।..

স্কুলের পাঠ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল কেহই সম্পূর্ণ করেননি। সজনীকান্ত বাবু তার লেখায়ও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে নয়, নজরুলকে পৃথক করে অশিক্ষিত বলা হয়েছে। অথচ স্কুলের পাঠে রবীন্দ্রনাথ সফলতার পরিচয় দেননি। আর স্কুলের পাঠে শর ৎচন্দ্র যে ভালো ফল করেছিলেন এমন খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম স্কুলে যে ফার্স্ট বয় ছিলেন, এ সংবাদ তো অপ্রতুল নয়। এছাড়া মাতৃভাষা বাংলাতেই শুধু নয়, আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃতি ও ইংরেজীতেও যে তাঁর দখল ছিল। উর্দু এবং হিন্দীতেও তিনি গান লিখেছেন। মূল ফার্সী কাব্য থেকে অনুবাদ করেছেন। ব্যাখ্যাসহ আরবী ছন্দে কবিতা লিখেছেন। সংস্কৃত ভাষা থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাঠামো উদ্ধার ক'রে । তাতে বাঙলা কথা বসিয়েছেন। মূল আরবী কোরআন শরীফ থেকে আমপারা অনুবাদ করেছেন। ইংরেজী কবিতা থেকে অনুবাদ করেছেন, ইংরেজীতেও কবিতা লিখেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো দূরের কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তো এতগুলো ভাষা জানতেন না। তদুপরি সম-সাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অপেক্ষা কাজী নজরুল ইসলামই যে বেশি অবহিত ছিলেন সে প্রমাণ রাখতে তাঁর বিভিন্ন লেখাতেই তা বিদ্যমান। সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নজরুলের কর্মজীবনের শুরু ও শেষ হয় সাংবাদিকতা দিয়েই।

নজরুলের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারাভিযান চালাতে গিয়ে কারো কারো অনবধানতা, অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও ধৃষ্টতা যে কোনো সীমা মানেনা, সে প্রমাণই সজনীকান্ত দাসরা দিয়েছেন।

অন্ধ বিদ্বেষ যে এঁদের রুচি বিকৃতি ঘটিয়েছিল, সে প্রমাণ এঁরা বিশেষত ‘শনিবারের চিঠি’-তে সর্বত্রই রেখেছেন। নব পর্যায় ‘শনিবারের চিঠি’ ভাদ্র ১৩৩৪-এ শ্রী সনাতন দেব শর্মা ছদ্মনামে ‘নব যুগান্তর (বন্দনা)” শিরোনাম, নজরুল বিদ্বেষ প্রচারণায় লিখেছেন ঃ

“কাম-ব্যথা- যৌনাভাব-আর
সুলভ স্ত্রীজনসঙ্গ ল'য়ে
মিশায়ে তাহাতে যথা-তথা-উথলিত অশ্রুরাশি।”

কবির এক মহার্ঘ্য সৃষ্টি 'সিন্ধু' কবিতা ব্যঙ্গ করে প্যারডিতে আরো অশ্লীল ও হীন উক্তি ঃ

"হে অপূর্ব,
নাহি জানি জন্ম লভ কোথা
সদ্যই খুঁজিয়া ফির মাতার অন্তরে
যৌন প্রবণতা।"

এ লেখা এক অভাবিত রুচি-বিকৃতির ফসল! ভাবলে লজ্জা হয়; অথচ এ সবই নাকি শিক্ষিত লোকদের লেখা। 'শনিবারের চিঠি'র এই একই সংখ্যায় ২১ পৃষ্ঠায় কবির বিখ্যাত 'অ-নামিকা' কবিতা ব্যঙ্গ ক'রে গাজী আব্বাস বিটকেল ছদ্মনাম দিয়ে ছাপানো হয়েছে "অঙ্গুষ্ঠ" ঃ

"তোমারে পেয়ার করি
কপ্‌নি- লুঙ্গি পরি"
লো আমার কিশোরী নাতনী
সুদূর ভবিষ্যৎ-লোকে মিশায়ে নির্জন কুঞ্জে
হে টোকা খাতিনি,
তোমারে পেয়ার করি।-
শৈশবের ওগো উলঙ্গিনী
অ-পাতা শয্যায় মম অ-শোয়া, সঙ্গিনী,
তোমারে পেয়ার করি॥"

এ ধরনের ঈর্ষা ও কুৎসাপ্রবণ প্যারডিকে নিছক রুচি বিকৃতি বললে খুবই কম বলা হয়। আদতে এটা উন্মাদনাপূর্ণ যৌন-বিকৃতিরই ফসল।

নব পর্যায়ে শনিবারের চিঠির এই প্রথম সংখ্যায় শ্রী মধুকর কুমার কাঞ্জিলাল ছদ্মনামে লেখা প্যারডি 'তোমাদের প্রতি' ঃ

"যৌন কণ্ঠে সবে গাহে গান
থাকব না মৌন মোরা, আমাদের দান
বিলাব সকল জনে....
এ সংসার সার-যৌন যাহা;

. . . .

মল দিয়া হয় সার, বাঁধা কপি তাহে বাড়ে বটে;
তাই বলে ছড়াবে কি মল বীর তুমি সর্বঘটে?

. . . .

মাতৃস্তন্যে মদ্যলাভ আশে তুমি ধাইতেছ সদা,

. . . .

বারঙ্গনা সতী হয়, চোর হয় শিব।"

নব পর্যায়ে 'শনিবারের চিঠি'র তৃতীয় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৩৪) ১১৩ পৃষ্ঠায় শ্রী সত্যসুন্দর দাসের 'সাহিত্যের আদর্শ' নজরুল বিদ্বেষ প্রণোদিত ঃ

> 'আবার নারীমাত্রেই তাঁহার সেই 'অনামিকা' প্রেয়সী- কেননা, তাহাদের কোনও ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না। তাহার সেই অভিন্ন রতিরসের বিভিন্ন পাত্র বহুত নয়?' অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন না-এ বিষয়ে তিনি এক রকম "Pan মৈথুন-ist!"।"

এ সংখ্যায় ১৪২ পৃষ্ঠায় শ্রী কেবলারাম গাজনদারের 'রাতারাতি' ঃ

"আধ ফুটন কলির উপরে আধ ঘুমন্ত অলি"

এ তৃতীয় সংখ্যায় শ্রী বটুকলাল ভট্ট-র 'চির তরুণ'-এ কবির দারিদ্র্য লাঞ্ছিত বাল্য জীবনের প্রতি রুচিহীন কটাক্ষ ঃ

"তরুণের গাহ জয়!
বয়সে বৃদ্ধ নিত্য তরুণ আমি হ'টেলের বয়।"

'শনিবারের চিঠি' ৪র্থ সংখ্যা ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-এর ২২৯ পৃষ্ঠায় 'চাবুক' শিরোনামে শ্রী কেবলরাম গাজনদার ছদ্মনামে কবির প্রতি হীন ও বীভর্ৎস্য হামলা ঃ

"উলঙ্গ হয়ে ছড়ায় বিষ্ঠা, পথিকে ছুঁড়িয়া মারে,
পস্তাবে শেষে মেনী বাঁদরেরে বেশী যদি দাও নাই।"

এ সংখ্যায় ২৩৬ পৃষ্ঠায় শ্রী মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল-এর 'পাঞ্চদশ' কলিকার এক গাছি মালা' ঃ

'বেদুইন ইংরেজ ইহুদী কি বাঙালী
সকলের 'জান' কেন ঢং দিয়ে রাঙালী?'

শনিবারের চিঠিতে কবি নজরুলের সাহিত্যকর্ম নিয়েই সজনীকান্তরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেনি। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও অত্যন্ত অশালীনভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ১৩৩১ সালের ২৮ ভাদ্র সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস "ভবকুমার প্রধান" ছদ্মনামে কবি নজরুলকে ব্যঙ্গ করে বলা হতো গাজী আব্বাস বিটকেল। গাজী আব্বাস বিটকেল সম্বোধন করে সজনীকান্ত লিখেছেন ঃ

"ওরে ভাই গাজি রে
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে-ঝাড়ে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা।....
দাবানল বীণা আর
জহরের বাঁশীতে

শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুল্‌লি,
পুষ্পক দোলা দিয়া
মজালি যে কত হিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি।"

কবি মোহিত লাল মজুমদার নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার সংযমহীন সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

মানবাত্মার পক্ষে গ্লানিকর এক শ্রেণীর ভাব ও ভাবুকতা বিদ্রোহের 'রক্ত-নিশান" উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে। এ বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নেই, মনুষ্যত্বের অগ্রভেদী অভ্যুত্থান কামনা নাই... নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়েছে। আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকের বালক-প্রতিভা কাব্য কাননে 'কামকন্টক ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি'র চাষ আরম্ভ করিয়াছে।"

ক্রোধে অন্ধ হয়ে তিনি নজরুলের সমস্ত কবিতারই নিন্দা করেছেন। তিনি "চামার খায় আম" বেনামীতে লিখেছেনঃ

"চাহি না আঙুর-শুধু চানাচুর
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান দুই, -
ঘসঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ, বেল, যুঁই!
লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ!"... ইত্যাদি।

কবি নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে, বিচিত্র সুর ও ছন্দে এবং বাণী সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায় অনেক গান ও গজল লিখেছেন। প্রতিটি গান ও গজল জননন্দিত হয়েছে। অথচ এই গান ও গজলগুলোও সজনী বাবুদের নগ্ন আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। কবি নজরুলের বিখ্যাত গান-

"বাগিচায় বুলবুলি তুই
ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল'

এর প্যারডি গাইলেন ঃ

"জানালায় টিকটিকি তুই টিকটিকিয়ে করিসনে আর দিক।
ও বাড়ির কলমিলতা কিসের ব্যথার ফাঁক করেছে চিক।
বহুদিন তাহার লাগি রাত্রি জাগি গাইনু কত গান।
আজিকে কারে জানি নয়না হাসি হাসল সে ফিক্ ফিক্।"

'জলসা'য় নজরুলের বিরুদ্ধে অনেক অশালীন উক্তি করা হয়। নজরুলের জননন্দিত গান-

"কে বিদেশী, বন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
সুর সোহাগে, তন্দ্রা লাগে
কুসুম বাগের গুলবদনে।"

এই গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিজাত শ্রেণী থেকে শুরু করে মাঠের রাখালের মুখে মুখে ফিরছিল। এই গানটির প্যারডি প্রকাশিত হয় এভাবে-

"কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী
বাজাও বনে,
বাঁশী সোহাগে ভিমরী লাগে,
বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা,
বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা,
বোকা চাঁদের লাগল ধোঁকা,
খোকা-কবির বাঁশীর স্বনে।'.....

কবি নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরাস গান 'কান্ডারী হুশিয়ার'-কে ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত লিখেছিলেন "ভান্ডারী হুঁশিয়ার"-এর দু'টি লাইন নিম্নরূপ ঃ

"চোর ও ছ্যাঁচোর, ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার-
তলপি তলপা তহবিল নিয়ে ভান্ডারী হুঁশিয়ার।"

১৩৩১ সালের ১৮ আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি'-তে কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র প্যারডি ছাপা হয় এভাবে-

আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রঙসে বরষা আসিলে
ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ।
আমি ব্যাংঙ
"আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই!
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিত ফণা,
আমি ছোবল মারিলে পরের আয়ু মিনিটে যে যায় গণা!

আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি
আমি 'বে অব বিস্কে' সাইক্লোন' আমি মরু সাহারার আঁখি!
আমি খোদার ষন্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি..."

'বিদ্রোহী' কবিতার এই প্যারডি 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশিত হলে তরুণের দল মনে করে এটি মোহিতলাল মজুমদারেরই রচনা। কাজী নজরুল ইসলামও তা-ই মনে করেছিলেন। এর ফলে কাজী নজরুল মোহিতলালকে লক্ষ্য করে 'সাবধানী ঘন্টা' শিরোনামে ১৩৩১-এর কার্তিক সংখ্যায় 'কল্লোলে' লিখেছিলেন ঃ

"রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা!
হে দ্রোনাচার্য! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি।'
অঞ্জলি ভরি' শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি।
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদগার গুরু শিষ্যের শিরে; তব বুক হোক খালি।"

মোহিতলাল এই কবিতাটি পড়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। প্রতি উত্তরে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় রচনা করেন 'দ্রোন-গুরু'। ১৩৩১ সনের ৮ কার্তিক 'শনিবারের চিঠি'-তে তা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় ঃ

"আমি ব্রাহ্মণ, দিব্য চক্ষে দুর্গতি হেরি তোর-
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে-
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিশম্পাতে;
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে!- ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভন্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার,- মহাবীর হওয়া মর্কট সভাতলে!
দু'দিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস-
চরম ক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস।"

মোহিতলাল ছিলেন কবি নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই কবিতা থেকে দু'জনের সম্পর্কে ফাটল ধরে। পরবর্তীতে এই মোহিতলাল নজরুলের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' কবিতাটি নিয়ে নকলের অভিযোগ এনেছিলেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

'শ্রী তরুণ চাঁদ উদাও' বেনামীতে নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাকে আক্রমণ করে 'বাংলার তরুণ' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করে। কবিতাটির কয়েকটি লাইন হলো ঃ

"ভাসনু কমল-লাগি ঠেলে অথই পগার জলে,
বিদ্রোহ আর কাম-ডোঙাতে দুইটি চরণ রাখি-
তীরের গাঁয়ে সমাজ-বিধি মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে
নেই আবরণ-একটুখানি আর্ট বলে থাক্ বাকি।....."

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কবি নজরুলকে কটাক্ষ ও উপহাসাত্মক মন্তব্য করতে ছাড়েননি। একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে হিমালয়ের দার্জিলিংয়ে কবি নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। কবি নজরুল বিশ্বকবিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আচ্ছা, আপনি যখন ইটালি গিয়াছিলেন, দান্নুৎসিত্তর সঙ্গে কোনো দিন দেখা হয়েছিল?'

কবি বালকের(?) মতো হেসে জবাব দেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি করে? তিনি যে তোমার চাইতেও পাগল।'.......

ব্রাহ্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মদদে কবি নজরুলের বিরুদ্ধে এই সব প্যারডিতে সভ্যতা-বৈভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যে, সব বিদ্বেষ, কটুক্তি, কটাক্ষ ও ঈর্ষাপূর্ণ তীর্যক বাক্যবাণে অত্যন্ত নগ্নভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তা চরম সাম্প্রদায়িকতারই বহিঃপ্রকাশ।

এ সম্পর্কে নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম তার "অজানা নজরুল" গ্রন্থে লিখেছেন-

"বোঝা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের ব্যাপক জনপ্রিয়তায় একশ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত, রুচিশীল ও সাহিত্য রসের বিচারপতি হিন্দুদের ঈর্ষা ও হামলা প্রবণতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বলা বাহুল্য যে, কাজী নজরুল ইসলামকে সমর্থন করার দায়ে নরেশচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধেও জোর খিস্তি চলছে।" (শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৩৭৬।)

কবি নজরুল যে শুধু হিন্দু লেখক-সাহিত্যিকদের সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন তা নয়। এর সাথে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকও হাস্যরসের মাধ্যমে অথবা তীর্যক, তীক্ষ্ণ ও তীব্র বাক্যবাণে নজরুলকে জর্জরিত করেছেন। অর্থাৎ কবি নজরুলের জন্য তখন ছিল উভয় সংকট।

এ প্রসঙ্গে "বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ" থেকে কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। সেকালের অন্যতম প্রখ্যাত বক্তা ও লেখক মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় 'লোকটা মুসলমান না শয়তান" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

"মুসলমানের ঔরসেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনার ন্যায় বর্জ্জন করিয়াছে, সুতরাং এ যুবক কোন ছার! নরাধম ইসলাম ধর্ম্মের জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম শয়তানের পূর্ণাবতার। এমন অনেক পাষন্ডই পৃথিবীতে জন্মিয়াছে এবং শেষটা নিকৃষ্ট জীবের মত মরিয়া স্বীয় পাপলীলার অবসান করিয়াছে।

খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুন্ডুপাত করা হইত নিশ্চয়।"

১৩২৯ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় নজরুলকে লক্ষ্য করে বলা হয় ঃ

"উহার স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে- 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' ও 'ভৃগু বন্দনা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মা ভৈ', 'ব্যোম কেদার', 'ব্যোম ভোলানাথ', 'বোল হরি হরি বোল' প্রভৃতি কাফেরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে, আমরা ভাবিয়াছিলাম যবন হরিদাসের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা করা পন্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু দুষ্ট ধুমকেতু ও উহার দুর্বিনীত সারথি এখন কেবল হিন্দু পুরাণের চর্ব্বিত চর্ব্বনে ক্ষান্ত না থাকিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরা শরিয়তের উপর পর্যন্ত শয়তানী আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।"

কবি গোলাম মোস্তফা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সমালোচনা করেন একটি কবিতায়। তাঁর কবিতাটির নাম ছিল 'নিয়ন্ত্রিত'। তিনি এই কবিতায় লিখেন ঃ

"ওগো 'বিদ্রোহী' বীর!
সংযত কর, সংহত কর 'উন্নত' তব শির।
'বিদ্রোহী'? শুনে হাসি পায়।
'বাঁধন-হারা'র কাঁদন কাঁদিয়া 'বিদ্রোহী হ'তে সাধ যায়?
সেকি সাজেরে পাগল, সাজে তোর?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মত কতটুকু তোর আছে জোর?
বাঁধন-হারা'র মাঝারে দাঁড়ায়ে
খালি দু'টি হাত উর্ধ্বে বাড়ায়ে
তুই যদি ভাল বলিস্ চেঁচিয়ে- "উন্নত মম শির,
আমি বিদ্রোহী বীর"
সে যে শুধুই প্রলাপ, শুধুই খেয়াল, নাই নাই তার কোন গুণ,
শুনি' স্তম্ভিত হ'বে "নমরূদ" আর "ফেরাউন!"
শুনি' শিহরি উঠিবে "শয়তান!"
হ'বে নাকো সেও সঙ্গের সাথী'
গাবো নাকো তোর জয়গান।"

কবি নজরুল ছিলেন উদার চিত্তের প্রাণখোলা, চঞ্চল ও আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাস প্রকৃতির লোক। এ সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা অনেকখানি খেয়ালের বসে একখানি কবিতায় লিখেছিলেন-

"কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লা'ফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত,
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়,
ধরায় পর তার কেউ নয়।"

কবি নজরুলের সম-সাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের মতে, "নজরুল ইসলামের সঙ্গে যারা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত, তারা জানেন, এই ছড়ার প্রত্যেকটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কবি নজরুল উভয় সম্প্রদায় থেকে তীব্র আক্রমণ ও সমালোচনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য্য ও সাহস হারাননি। অত্যন্ত ধীর-স্থির চিত্তে এর মোকাবেলা করেছিলেন। সমালোচনাকারীদের প্রতি আক্রমণাত্মক বা ক্ষিপ্ত না হয়ে তিনি 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ' নামে একটি প্রবন্ধের একস্থানে সমালোচনাকারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন ঃ

আজ তিন চার বছর ধরে এই শুভানুধ্যায়ীরা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপ্‌রে বাপ! মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত কসরতও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না। ফি শনিবারের চিঠি! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানী রসিকতা, আর মেছোহাটা থেকে টুকে আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ-কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ। বাংলায় রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধোপার মাঠ! ফি হপ্তায় মেল (ধোপামেল) বোঝাই!"[১]

এ সম্পর্কে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"হিংসা আর বিদ্বেষ ও এ দু'টি জিনিস নজরুলকে কোনো দিন স্পর্শ করেনি। তিনি সব বিরোধিরা এমনকি অশালীন সমালোচনাও হেসে উড়িয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত দাস ও অন্যান্য বিরূপ সমালোচকরা নজরুলের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং পরম বন্ধুত্বের পরিচয় দেন।"[২]

কট্টর সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে কবি নজরুল যে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি, সহনশীলতা, শিষ্টাচার ও উদারতা দেখিয়েছেন তা মহান ধর্ম ইসলামের শিক্ষারই প্রতিফলনযুক্ত। তাই কবি নজরুলের একটি কবিতায় মানবতার মহান ধর্ম ইসলামের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেমন ঃ

"উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ
আমরা বলিব, সাম্য, শান্তি এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।"

১। নজরুল রচনা সম্ভার, আবদুল কাদির সম্পাদিত, পৃঃ ২০৮।
২। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৬৫৯।

আকাশের মতো উদারচেতা, অসাম্প্রদায়িক ও আযাদীপ্রিয় কবি নজরুল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক যে তীব্রভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছেন, সে তুলনায় চরম সাম্প্রদায়িক, বৃটিশ তোষণকারী এবং সংকীর্ণ মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেভাবে কট্টর সমালোচনার সম্মুখীন হননি। কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়ে ভারতের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক জাতে শিখ অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করে খুশবন্ত সিংহ রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বছর দু'য়েক আগে "দি শিলং টাইমস'-এর ওয়ার্কশপে বক্তৃতা দেয়ার সময় নতুন লেখকদের উপদেশ দিতে গিয়ে খুশবন্ত সিংহ বলেছেন ঃ

"কেন যে বাঙ্গালীরা রবীন্দ্রনাথের পূজো করেন, জানিনা। তবে পুরস্কার ও পূজা পাবার জন্যে লেখাগুলো খুবই সাধারণ। তিনি লেখকদের এ বলে উপদেশ দেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে বরং বাইবেল পড়।"

খুশবন্ত সিংহ-এর এ মন্তব্যের পর কলকাতার বাঙ্গালী সমাজে নিন্দা ও সমালোচনার প্রবল ঝড় ওঠে। মাঝে কলকাতায় এসে বিমান বন্দরে এক দল লোক তাঁকে ঘেরাও করে। তারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে খুশবন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছেন ঃ

"কলকাতাবাসী বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তারা তসলিমাকে গোঁড়ামী করে একঘরে করেছে। কিন্তু তারা নিজেরাও তো কম গোঁড়া নয়।"[৩]

এই গোঁড়া সম্প্রদায়ের পূর্বসূরী হিন্দু বাবুদের সাথে কবি নজরুলের একান্ত ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সামাজিক ব্যাপারে কবি নজরুলকে বহুবার অপমানিত হতে হয়েছে। নজরুল তাঁর বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাথে একটি হিন্দু বোর্ডিং-এ দু'একদিন ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালীন সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবি নজরুল তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন ঃ

"সেখানে আমার অট্টহাসি আর উৎকট গানে এমনিতে বাসিন্দারা ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে।" তারপর যখন শৈলজা 'নূরু নূরু' বলে ডাকছে আমায়, তখন তারা আমার নাড়ী-নক্ষত্রের খোঁজ নিতে শুরু করল। দুপুর বেলা এক পংক্তিতে খেয়ে ওদের জাত মেরে দিলাম। তারপর যখন ওরা আবিষ্কার করল আমি মুসলমান, তখন ওদের মেজাজ যা হল তা তো বুঝতেই পার। দল বেঁধে ঘরে চড়াও হল। রুচিবোধের সীমা ছাড়িয়ে কোরাশ কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি মশায়, মুখুজ্যে বামুনের ছেলে হয়ে নেড়ের কাছে বোন দিতে পারেন, আমরা কিছু বলব না। কিন্তু জেনে-শুনে আপনি আমাদের জাতি ধর্ম নষ্ট করছেন। এ জন্য আপনাকে কি করা উচিত জানেন?

৩। সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, '৯৫

শৈলজা বল্লে, 'না।'

আপনি বেরিয়ে যাবেন কি-না, এই মুহূর্তে মেস থেকে- ঘুষি পাকিয়ে দাবী জানাল মেসের বাসিন্দারা।

রিকশায় চড়ে বিছানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এ সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের মন্তব্য হলো ঃ

"নজরুলের জীবনে এমন ব্যাপার আরও ঘটেছে। কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমান বলে নজরুলের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। .... অবশ্য হিন্দু সমাজের উদারমনা সাহিত্যকগণ নজরুলের কবিতা ও গানের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট উদারতার সাথে নজরুলের কবিতা ও গান রচনায় উৎসাহ দিতে থাকেন। তাঁরা একত্রে আহারাদি ও চলাফেরা করতেন। সংখ্যায় অল্প হলেও সে-সব বন্ধু শেষ জীবন পর্যন্ত নজরুল প্রতিভার অনুরক্ত ছিলেন।[৪]

প্রকৃত পক্ষে নজরুল যে মুসলিমদের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব নিয়ে হিন্দু দেবদেবীর উপমা দিয়ে কবিতা লিখেছেন তা নয়। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। তখনকার দিনে মুসলমান সমাজে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা বলে কিছু ছিল না বল্লেই চলে। উদারপন্থী হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহচর্য্য ও তাঁর সৃষ্ট পরিবেশই নজরুলের ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজে আধুনিক সাহিত্যের বিকাশের সাথে সাথে তাদের ঐতিহ্যের রাজ্যেও নজরুলের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে। নজরুলের ইসলামী গান ও কবিতা বাংলার মুসলমানদের প্রাণে এক নব স্পন্দনের সৃষ্টি করে। ক্রমে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অগণিত লোক নজরুলের কবিতা ও গানের ভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে, পরবর্তীকালে নজরুল জাতির পক্ষ থেকে বিরাট সম্বর্ধনা লাভ করেন।

হিন্দুবাদীদের এইসব অপপ্রচার ও বিদ্বেষ তাদের জন্য বুমেরাং হয়েছিলো। নজরুলের ব্যক্তিত্বে ও তাঁর সৃষ্টিকর্মে এতটুকুও কুপ্রভাব পড়েনি; বরং তাঁকে খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলো। অনেকে নজরুলের এই খ্যাতি 'শনিবারের চিঠি'র অবদানই মনে করেন।

৪। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ দ্রষ্টব্য।

নজরুল প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সভায় তরুণ-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য করে (পরোক্ষভাবে নজরুলকেই) বলেছিলেন ঃ

"তরুণ-সাহিত্যিকদের লেখায় "দুধ নেই শুধু ফেনা"!

কবি নজরুল-এর জবাবে সাপ্তাহিক 'সওগাতে'র চানাচুর বিভাগে "শুধু গাভী" শিরোনামে বলেছিলেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামিত কোনো এক পরিষদে তরুণ-সাহিত্যিকদের লেখার উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, "দুধ নেই শুধু ফেনা"। রবীন্দ্রনাথ দুধের এক্সপার্ট কি-না জানি না। অন্তত করপোরেশনের 'মিউন্যাসিপাল গেজেটে' ত তাঁর নাম বেরুতে দেখিনি।

কিন্তু দুধ ছাড়া শুধুতে ফেনা হয়? ভাষাকে নিয়ে ফেনানো যাঁদের পেশা তাঁরাই ভাল বল্‌তে পারবেন।

কিন্তু তরুণ সাহিত্যিকরাও ত ইচ্ছা করলেই ও-রকম ভাষার কের্‌দানী দেখাতে পারে। যুক্তি না দিয়ে উপমাই যদি সবটা হয়, তা হ'লে তারাও বল্‌তে পারে বুড়ো সাহিত্যিকদেরও গোয়াল-ঘরে দুধ নেই, শুধু গাভী!

শুধু ফেনাতে যদি ছানা না বেরোয়, শুধু গাভীতেও ছানা বেরোয় না![১]

পরবর্তীতে নজরুলের বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল লেখা নিয়ে চারিদিকে যখন জনগণের মাঝে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তখন বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি বলে দাবিদার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ধূমকেতু'র সারথী বিপ্লবী কবি নজরুল প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলো আশিষের ভাষায়। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায় নজরুলের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে অতি সত্যবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

"-অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,-
তার নিত্য জাগরণ! অগ্নিসম দেবতার দান
উর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ!'

এমনকি নজরুলের প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধাতার অপার অলৌকিক দান বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নজরুল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা 'বসন্ত' নামক গীতিনাট্য গ্রন্থখানি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। এ সম্পর্কে

১। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৭২৩।

নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম-এর "অজানা নজরুল' থেকে জানা যায় ঃ

"নজরুল ইসলাম যখন আলিপুর জেলে সাজাপ্রাপ্ত রাজবন্দী, সে সময় রবীন্দ্রনাথ বুলা মহালনবীশকে পাঠালেন মধুরায়ের গলির মেস থেকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে জোড়াসাঁকোয় ডেকে আনতে। ভক্তগণ পরিবৃত রবীন্দ্রনাথ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন ঃ

"জাতীয় জীবনের বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতেই তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছিনা, আমার হ'য়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।........"

পারিষদ অমল হোম প্রমুখের বিরুদ্ধাচরণ তিনি উপেক্ষা করে বলেছিলেন ঃ

"বিদগ্ধ বাগ বিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়।"

তিনি আরো উক্তি করেছেন ঃ

"নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে আমি কবি বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন ক'রতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না প'ড়েই এই মনোভাব পোষণ ক'রেছো। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।

'কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়। তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈ কি।'

যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য'[২]

'বসন্ত' ঋতু নাট্যের উৎসর্গপত্র কবি এইভাবে লিখেছেন ঃ

উৎসর্গ

'শ্রীমান কবি নজরুল ইস্‌লাম স্নেহভাজনেষু

১০ ই ফাল্গুন ১৩২৯'

উল্লেখ্য যে, আত্মীয়-পরিজনের বাইরে আর কোনো কবিকে রবীন্দ্রনাথ কোনো বই উৎসর্গ করেননি। (শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৩১৭, ৩১৮)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নামক গীতিনাট্য গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে কবি নজরুলকে যে মর্যাদা ও প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কবি নজরুলও বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ

'দেখিছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি।

২। [দ্রষ্টব্য ঃ 'কবি স্বীকৃতি' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা) ঃ ১ম বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা ঃ শীত ১৩৭৬]

হে সুন্দর, বহ্নি-দুগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা।

একদিন রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, নজরুলের কাব্য-প্রেরণা হতে তাও বাদ যায়নি। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় যেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,- অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বল্‌তে শুনেছি- কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বল্‌ত, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সহসাই হবে না তোর এমনিভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলো যে, সে তা পারে, তাই একদিন সকালবেলা-

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন এবং ঠাকুর বাড়ীর দীর্ঘদিনের নিয়ম ভঙ্গ করলেন। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানসিকভাবে অসন্তুষ্ট না হলেও বিদ্রূপ ও উপহাসচ্ছলে কবি নজরুলকে বলেছিলেন ঃ "নজরুল, তুমি নাকি তরোয়ার দিয়ে আজকাল দাড়ী কামাচ্ছ- ক্ষুরই ও কার্যের জন্য প্রশস্ত- এ কথা পুর্বাচার্যগণ বলে গেছেন।[৩] পরবর্তীতে কবি নজরুল কাব্যের ভাষায় সেই পরিহাস-বিদ্রূপের জবাব দিয়ে লিখেছেন ঃ

'বলেছিলে হেসে একদিন,
তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি!
যে জ্যোতি করিতে পারে জৌতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিতে অগ্নি করি হ'লে পুচ্ছ-কেতু!
হাসিয়া বলিলে পরে, এই যশঃ খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন!
এ মজা না পেলে মন ম্যাজ ম্যাজ্ করে
মধুর ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান? ' (অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি)

মরহুম আবুল ফজল রবীন্দ্র নজরুল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ

"কথিত আছে, কোন এক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। তিনি নজরুলকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কাজী তুমি আমার ডান পাশে এসে বসো।" এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে নজরুলের আসন কোথায় তাহার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সত্যই বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র যুগে রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে পারার মত একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্যকোন কবিই জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই কথা বলিলে কিছু মাত্র অতি ভাষণ করা হইবে না যে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইতেছেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের সক্রিয় কবি-জীবন বড় জোর মাত্র কুড়ি বছরের। রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘ, সুস্থ ও সক্রিয় জীবনের উত্তরাধিকার-সৌভাগ্যও যদি তাঁহার হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার সর্বতোমুখিনতার এক বিকশিত ও স্ব-সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করা সহজ হইত ও তখনই একমাত্র সম্ভব হইত উভয়ের কোন রকম তুলনামূলক আলোচনার।[৪]

৩। নজরুল যুগ, পৃঃ ৩৪।
৪। আবুল ফজল রচনাবলী, পৃঃ ৪৮৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি জীবনে বিরক্ত হয়ে 'এবার ফিরাও মোরে' শিরোনামে কবিতায় লিখেছিলেন-

"যেদিন জগতে চলে আসি,
কেন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলবার বাঁশী।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেল একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা।"

কিন্তু বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' হয়েও বরণ করে নিয়েছিলেন এই সংসারের সীমানাকে। তাই তিনি লিখেছেন সংসারের নিত্যসঙ্গী 'দারিদ্র' সম্বন্ধে কবিতা ও জিজ্ঞাসা ঃ

"কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব? ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্য্যাস।"
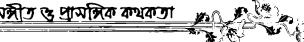
"বসন্তে কোকিল গাছের ডালে আপনার মনে গান গায়, সে কারো তোয়াক্কা করে না। কাক এসে তাড়া করলে সে উড়ে যায়। আমিও আমার মনের আনন্দে গান করবো। যদি আপনারা কাকের মত আমায় তাড়া করেন, তাহলে কোকিল হয়ে উড়ে চলে যাবো।"

- *নজরুল*

আমাদের দেশে অনেকের মাঝে কালজয়ী নজরুল সঙ্গীত বিষয়ে যেমনি রয়েছে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা; ঠিক তেমনি রবীন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ে রয়েছে অতি উন্নাসিকতা। তাদের এই হীনমন্যতা ও উন্নাসিতকতার কারণ হলো কবি নজরুলের অনেক গানে রয়েছে পেঁয়াজের অর্থাৎ মুসলমানী গন্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশীর ভাগ গানে রয়েছে পৌত্তলিকতার গন্ধ। তাই নজরুলের গান তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অনেকের কাছেই অপছন্দ। আর রবীন্দ্রনাথের গান এবাদততুল্য। এক সময় এসব প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা কথায় কথায় কম্যুনিস্টদের লাল বই থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। এখন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান থেকে উদ্ধৃতি দেন। এদের কাছে মনে হয় নজরুলের গান অশিক্ষিত রুচিহীনদের গান, আর রবীন্দ্রনাথের গান শিক্ষিত রুচিবানদের গান। বর্তমান বংশধরদের কাছে সেভাবে রবীন্দ্রনাথের গান তুলে ধরা হচ্ছে। প্রভাবিত করা হচ্ছে নানাভাবে। তাই দেখা যায় কাউকে প্রশ্ন করা হলে আপনি কোন গান পছন্দ করেন? বুঝুক বা না বুঝুক ঝট্‌পট্‌ উত্তর দেবে- "আমি রবীন্দ্রনাথের গান পছন্দ করি বা ভালোবাসি"। এখন রবীন্দ্রনাথের গানই যেন জাতে উঠার একমাত্র সিঁড়ি। ইসলামী সঙ্গীতের পাশাপাশি শ্যামা, কীর্তন এবং কালি দেবীকে নিয়ে অসংখ্য গান লিখেও কবি নজরুল এসব প্রগতিবাদীর কাছে অসাম্প্রদায়িক কবি হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারেননি। সভা-সমিতিতে মুখে মুখে এসব প্রগতিবাদীরা নজরুলের পক্ষে অনেক আপ্তবাক্য বর্ষণ করলেও কর্ম ও চিন্তায় বৈপরিত্যই লক্ষ্য করা যায়। এটা কবি নজরুলের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘ ৬৫ বছরে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির দর্শনে বা ভাবধারায় অসংখ্য গান রচনা করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম ধর্মীয় বিষয়ে দু'টি কলি লিখার সময় ও সুযোগ পাননি। এরপরও তিনি তথাকথিত প্রগতিবাদীদের কাছে অসাম্প্রদায়িক কবি। এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে সৌভাগ্যই

যুদ্ধ ফেরত নজরুল

বলা যায়।

আমি সঙ্গীতের কোন বিশেষজ্ঞ বা সমঝদার নই। তবে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ রয়েছে। ছোটকাল থেকেই নজরুলের গান যেমন শুনেছি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানও শুনেছি। এখনো রবীন্দ্রনাথের অনেক গান সময় ও সুযোগ পেলে বারবার শুনি। কিন্তু এ দেশের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিয়ে টিভি-রেডিও এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেভাবে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং আমাদের জাতিসত্তা বিরোধী বিভিন্ন উক্তি করে বর্তমান বংশধরদের প্রভাবিত করছে, এর পিছনে যে অশুভ শক্তির কালো হাত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আড়ালে এদের রয়েছে অসৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই লক্ষ্য করা যায় যেখানে-সেখানে, কারণে-অকারণে রবীন্দ্র সঙ্গীত জুড়ে দেয়ার প্রবণতা।

এ প্রবণতার রহস্য কি? এ রহস্য ভেদ করতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে কিছুটা দৃষ্টি ফিরাতে হয়।

মঙ্গল প্রদীপ-এর ধর্মীয় তাৎপর্য সম্পর্কে তিনজন লেখক ও চিন্তাবিদের উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন ঃ

> সর্বপ্রথম যে বাংলাদেশী কবির পরিচয় আমরা অষ্টম-নবম শতকে পাই তিনি হচ্ছেন সবহপা। তিনি তার 'দোহা কোষ গীতির' 'ষষ্ঠ দর্শন খন্ডনে' এই কাঁসর ঘন্টা, হোম, জাগযজ্ঞ, শঙ্খ ঘন্টা এগুলোর বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রেখেছেন। ..... এগুলোর মধ্যে কোথাও মঙ্গল প্রদীপ শঙ্খ বাধন কাসর ঘন্টার সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং এ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে এগুলো কোনক্রমেই সম্পর্কিত নয়। পাল রাজত্বের অবসানের পর দ্বাদশ শতকে বহিরাগত সেনরা এ দেশ তাদের অধিকারে এনেছিলো। .... এরা সাংস্কৃতিকে হিন্দুর

মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপের প্রবর্তন করে। ...... সুতরাং মূলত কাঁসর ঘন্টা এবং মঙ্গল প্রদীপ হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় অনুষ্ঠান। তাছাড়া এ অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে সাম্প্রদায়িক এবং পূজারতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপের প্রবর্তন করা হয়েছে এবং দেব-দেবী পূজার বিধি অনুসারে কাঁসর ঘন্টার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক মেরুদন্ডহীন পরজীবী এবং ধর্ম চেতনা শূন্য এবং ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কিছু মুর্খ লোক এ দেশের কোন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপের আয়োজন করে থাকে এবং কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে থাকে। আমি সুস্পষ্টভাবে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে জানাতে চাই যে, মঙ্গল প্রদীপ এবং কাঁসর ঘন্টা সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিক এবং সাম্প্রদায়িক। তাছাড়া এগুলো কোন ক্রমেই এ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে যুক্ত নয়।[১]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব তারেক ফজল "মঙ্গল প্রদীপের সংস্কৃতির খোঁজে" শিরোনামে লিখেছেন ঃ

'মঙ্গল' শব্দটির পরিচয়ের কথা পরে বলি। 'সংঘ' পরিভাষার বিবেচনায় একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় পরিভাষা। 'সংঘং শরনং গচ্ছমি' মন্ত্রটি অনেকেই শুনে থাকেন। এটি বৌদ্ধদের এক বিশেষ ধর্মীয় মন্ত্র বা শ্লোক। আরবী জিহাদ শব্দটি যখন পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় ইসলাম ধর্মীয় বিধানাবলী (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) প্রতিপালনের যে কোন প্রচেষ্টা জীবনবাজি রেখে আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা সশস্ত্র যুদ্ধ হলো জিহাদের বাহ্যত এক চূড়ান্ত রূপ। সুতরাং জিহাদের বিশেষ ব্যবহার এর কথিত সেক্যুলার চরিত্রকে ধরে রাখতে পারে না। জাকাত শব্দটি তাজকিয়া ধাতু থেকে উদ্ভূত। যে কোন পর্যায়ের পবিত্রতাকেই জাকাত বলা হয়। কিন্তু পরিভাষাগত ব্যবহারের বেলায় শব্দটি নিশ্চিতভাবেই ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিশেষ অঙ্গ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে জাকাতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। 'মঙ্গল' শব্দটির বিশেষ ব্যবহার তেমনি একটি ধর্মীয় পরিভাষায় পর্যবসিত। এই শব্দটি হিন্দু ধর্ম সাধনার সাথে যুক্ত। 'হিন্দী শব্দ সাগর' অভিধানে মঙ্গল শব্দকে হিন্দু সাধনার একটি শব্দ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে আরো কয়েকটি হিন্দু ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠার শব্দ। যেমন 'মঙ্গল আচরণ' মঙ্গল সূত্র' এবং 'মঙ্গল প্রদীপ'।

নেপাল সরকার কর্তৃক সরকারীভাবে প্রকাশিত 'নেপালী নতুন শব্দকোষ' অভিধানেও এই একই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। মঙ্গল প্রদীপ গোড়া থেকেই (ফ্রম দি ভেরী অরিজিন) নির্দিষ্টভাবে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গ এবং ধর্মীয় বিধান হিসাবে তা পালিত হয়ে চলেছে। দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে কর্ণাটক থেকে সেন রাজারা এলেন। এরা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং স্পষ্টতই বহিরাগত। সে সময়কার বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সেন রাজারা বহিরাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসগুলো হলো ঃ

(ক) সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান,

(খ) হিন্দু শাস্ত্রীয় ধর্ম ভাবনাকে প্রাধান্য দান,

(গ) স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতিতে ধ্বংস সাধন এবং

(ঘ) শাস্ত্রীয় অনুবন্ধে নৃত্যগীত প্রচলন।

১। সাপ্তাহিক বিক্রম, ১৯২৫ এপ্রিল '৯৩।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বিষ্ণুপুরে 'দল মাদল' কামানের গায়ে হেলান দেয়া অবস্থায় গৃহীত কাজী নজরুল ইসলামের আলোকচিত্র (১৩৩১)

এই নৃত্যগীত ছিলো প্রধানতঃ তিন ধরনের।

এক. দেবী বন্দনা, মঙ্গল প্রদীপ হাতে দেবী বন্দনা।

দুই. আরতি নৃত্য, ধুপের পাত্র হাতে নৃত্য। তিন. গীত গোবিন্দের গানের উপর ভিত্তি করে লাস্য নৃত্য'।

চর্যা গীতিকা থেকে জানা যায়, পালদের আমলে নৃত্য জনসাধারণের একটি অভিব্যক্তির বিষয় ছিলো। সে নৃত্যের সাথে ধর্মের কোন যোগ ছিলো না। সেনরাই এদেশে 'দেবদাসী নৃত্য' প্রবর্তন করে। মঙ্গল প্রদীপের একটি প্রতীকগত ব্যাখ্যা আছে। মাটির যে প্রদীপটি তৈরি করা হয়, তার পেছনের দিক অর্থবৃত্তের মতো এবং সামনের দিক সূঁচলো। এর মধ্যে একটি সলতে তেলে ডুবানো থাকে এবং সলতের অগ্রভাগ সূঁচলো দিক থেকে বেরিয়ে থাকে। এই মঙ্গল প্রদীপটি আকৃতির দিক থেকে রমণী যোনীর প্রতীক এবং সলতেটি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। অর্থাৎ এই প্রদীপের মাধ্যমে শিব এবং পার্বতীর মিলনের অবস্থার অভিব্যক্তি ঘটানো হয়েছে।

পন্ডিত লক্ষণারায়ন গর্গ তার 'কথক নৃত্য' গ্রন্থে (প্রকাশক সঙ্গীত কার্যালয়, হাতরস উত্তর প্রদেশ, ভারত, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯)। নানাবিধ নৃত্য ভঙ্গিমার বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে একটি বিশেষ ভঙ্গিমা হচ্ছে ডান হাতে মঙ্গল প্রদীপ রেখে বাম হাত সমান্তরালে প্রসারিত রাখা এবং দু'পায়ের সাহায্যে একটি স্থিতি নির্মাণ করা।[২]

এ কারণে নিরাকারে বিশ্বাসে বলে কথিত মঙ্গল প্রদীপ এতো প্রিয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 'পূজা' পর্বের অনেক গানে পূজার সঙ্গে প্রদীপের উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ

"আমার সকল দুঃখের প্রদীপ
জ্বেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন"

অথবা

"আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।"

প্রাতঃকালীন মঙ্গল আরতির রূপ বর্ণনা করে কবি লিখেছেন ঃ

"মঙ্গল বাজত খোল করতাল
মঙ্গল নাচত হরিদাস ভাল।
মঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ
মঙ্গল আরতি অতি অপরূপ।"

রাধা কৃষ্ণের মঙ্গল আরতির রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে-

"রতন প্রদীপ জ্বালি লালিতা পিয়ারী
আরতি করতাহি বদন নিহারী।"

প্রায় প্রতিটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু বাড়িতে তুলসী দেবীর সন্ধ্যা রতি করা হয় প্রদীপ জ্বেলে।

২। দৈনিক ইনকিলাব ১৭/৯/৯৩।

নজরুল গীতিকা'র স্রষ্টার একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

তুলসী দেবীর সন্ধ্যারতির রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে-

"ধূপ, দ্বীপ, নৈবেদ্য আরতি
ফুলেলা কিয়ে বরখা, রবখানি
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
ঠিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মঙ্গল প্রদীপের উৎস মঙ্গল আরতি থেকেই যা অগ্নিদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা কবি গুরুর গানে প্রকাশ পেয়েছে; এ জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতি ভাব শিষ্যদের কাছে এই গানগুলো হয়ে যায় ভক্তিমূলক, আধ্যাত্মিক গান। তাই মঙ্গল্‌ প্রদীপও তাদের কাছে খুবই প্রিয়। এই প্রিয়তার কারণেই কয়েক বছর যাবত মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনের হিড়িক পড়ে গেছে এদেশে।

কবি নজরুল হিন্দু দেব-দেবী, কালিকে নিয়ে বহু গান-কবিতা লিখেছেন। যেমন ঃ

"কে বলে মোর মাকে কালো
মা যে আমার জ্যোতির্মতী।
কে বলে মোর মাকে কালো
মায়ের হাসি দিনের আলো।"

অথবা

"আয় মা চঞ্চলা মুক্তিকেশী শ্যামাকালী
নেচে নেচে আয় বুকে আয়
দিয়ে তাথৈ তাথৈ।"

এই গানগুলোর জন্য নজরুলকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। তাদের কাছে তখন নজরুল হয়ে যান একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু কবি নজরুলের গানে যখন থাকে-

"আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান,
কোথা সে মুসলমান।
কোথা সে আরিফ, অবেধ যাহার
জীবন-মৃত্যু জ্ঞান॥"

অথবা

"তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম জাঁহা পুনঃ হোক আবাদ।"

অথবা

"রসুল নামের ফুল এনেছি রে
আয় গাঁথবি মালা কে?
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাতালাকে।"

আর্য কবি রবীন্দ্রনাথের গানে যখন থাকে ঃ

'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো,
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো।'

তখন এ গানগুলো হয় জাগরণী বা বিপ্লবী গান। আর কবি নজরুলের গানে যখন থাকে-

"ওঠ্ রে নওজোয়ান
শোন্‌রে পাতিয়া কান
নয়া জামানার মিনারে মিনারে
নব ঊষার আজান।"

অথবা

"বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙ্গা কেল্লায় উড়ে নিশান।"

অথবা

"দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠে জেগে
তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল।"

কবির সঙ্গীত-ওস্তাদ জমির উদ্দিন খানের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

এই গানগুলো তখন আর প্রগতিবাদীদের কাছে জাগরণী বা বিপ্লবের গান হয় না। এগুলো দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রেরণাদায়ক আবর্জনা।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে যখন থাকে-

"মম চিত্তে নিতে নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ"
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।"

তখন বোধহয় রবীন্দ্র বঙ্গদের চিত্তে আনন্দের ঢেউ খেলে। ময়ূরের মতো পেখম মেলে বৃদ্ধ বয়সেও তা-ধিং তা-ধিং করে নাচতে ইচ্ছে করে। ষাট বছর বয়সেও যেন হৃদয় মন্দিরে বসন্তের আবির্ভাব ঘটে।

আবার যখন কবি নজরুলের গানে থাকে-

"শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণি বায়।
জল তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্
ঢেউ তুলে সে যায়।"

তখন বোধ হয় অনেকের চিত্তে আনন্দের দোলা দেয়া দূরে থাক উঁকিও বোধ হয় দেয়না। কারণ এ গানে রয়েছে যে আরবী সুর। কবি রবীন্দ্রনাথের গানে যখন থাকে-

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী,
ওগো মা, তোমায় দেখে আঁখি না ফিরে....।"

অথবা

"একি অপরূপ রূপে মা তোমায়
হেরিনু পল্লী জননী ফুল ও ফসলে কাদা মাটি মাথায়"

তখন এ গানগুলো হয় একেবারে নির্ভেজাল উচ্চ মার্গের দেশের গান। আবার নজরুলের গানে যখন থাকে-

"আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।
এই দেশের মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটী।"

তখন এ গান বোধ হয় অনেকের কাছে দেশের গান বলে মনে হয়না। আর মনে হলেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো তেমনটা কদর পায় না।

রবীন্দ্রনাথের গানে যখন থাকে-

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।"

তখন তথাকথিত প্রগতিবাদীদের কাছে এ গানগুলো হয় ভাবের। আর কাজী নজরুলের গানে যখন থাকে-

"আবহায়াতের পানি দাও মরি পিপাসায়।
শরণ নিলাম নবীজীর মোবারক পায়
ভিখারীরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে
দয়ার সাগর তুমি যে মরু সাহারায়।"

তখন এ গানগুলো আর ভাবের হয় না। হয় মোল্লাকি গান।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে যখন বলা হয়-

"কোন বৃষ্টি ভেজা স্নিগ্ধ দুপুরে
ভেসে আসে বাদল দিনের কদমফুল।"

অথবা

"এক পাল তরুণ-তরুণীর কোলাহল
মুখরিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়।"

অথবা

"এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয় হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।"
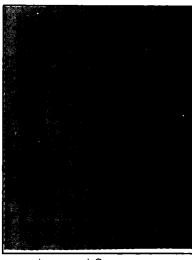
সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দিন

তখন এই গানগুলো হয় একেবারে খাঁটি প্রেমের গান। আর কবি নজরুলের গানে যখন থাকে ঃ

"চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার
সরসীর আরশিতে
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ
সে অঙ্গ পরসিতে।"

তখন এ গানগুলো আর তেমন একটা প্রেমের গান হয়না। অনেকের কাছে তখন মনে হয় এগুলো অশিক্ষিত, রুচিহীন, চাষা-ভুষাদের গান।

প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান গাওয়া হয়। গানটি হলো ঃ

"এসো এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষেরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।"

এই গানটিই যেন বৈশাখকে নিয়ে রচিত একমাত্র গান। আর কোন গান যেন রচিত হয়নি বৈশাখকে নিয়ে। অথচ কাজী নজরুল, ফররুখ আহমদ, কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি জসিম উদ্‌দীন, কবি আল মাহমুদ বৈশাখকে নিয়ে অনেক কালজয়ী গান রচনা করে গেছেন। এই গানগুলো ভাবে, ছন্দে, বাণীতে কোনো অংশে রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের তুলনায় কম নয়। অথচ প্রতি বছর ১লা বৈশাখে নজরুলের গান হেলাফেলা ও গুরুত্বহীনভাবে রেডিও-টিভি ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে পরিবেশিত হলেও বৈশাখকে নিয়ে রচিত বাংলাদেশের অন্যান্য কবিদের গান থাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। সকাল থেকে রাত অবধি নানা অনুষ্ঠানে ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকে-

"এসো এসো হে বৈশাখ।"

তাদের এইসব কর্মকান্ড এবং হাবভাব দেখে মনে হয় আমাদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। আমরা যেন একেবারে ফতুর জাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই যেন আমাদের একমাত্র ভরসা।

কবি নজরুল ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে একটি দেশাত্মবোধক গান লিখে প্রথম গানের জগতে প্রবেশ করেন। এরপর ১৩২৮ থেকে ১৩৩২ সালের মধ্যে নজরুল অনেকগুলো দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। ১৩৩৩ সাল থেকে নজরুল গজল গান

কবি নজরুলের সঙ্গীত শিষ্যা ও প্রখ্যাত নজরুল শিল্পী কমলা ঝরিয়া

লিখতে শুরু করেন। এরপর পুরোদমে অসুস্থ হবার আগ পর্যন্ত তিনি অসংখ্য গান লিখে যান। এই গানের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। মতান্তরে পাঁচ হাজারের অধিক। কারো মতে প্রায় দশ হাজার।

যা হোক, কবি নজরুল নিজে গান লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন। সুরের যাতে বিকৃতি না ঘটে, সে জন্যে নিজেই কণ্ঠ শিল্পীদের তালিম দিয়েছেন। শোনা যায়, এ জন্যে নজরুলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৫ বছরে ২২১৯টি গান লিখেছেন। তাঁর গান বাণীতে সমৃদ্ধ বটে কিন্তু গদবাঁধা বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু কবি নজরুলের গান বাণীতে যেমন সমৃদ্ধ; ঠিক তেমনি সুরে, ছন্দে, বৈচিত্র্যে ভরপুর। কবি নজরুল প্রেম, বিরহ এবং জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক, প্রতিটি বিষয়ে গভীর উপলব্ধি ও সুনিপুণ প্রকাশ ঘটিয়ে গেছেন তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি নজরুলের গান ও কবিতা সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ

"অরুগ্ন বলিষ্ঠ আর অনবদ্য ভাবমূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে, কৃত্রিমতার কোনো ছোঁয়াচ তাকে কোথাও মলিন করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেননি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে। তাই আবির্ভাব মাত্র অসামাস্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি।"[১]

ভারতের প্রখ্যাত গায়িকা শিল্পী আশা ভোঁসলের কোলকাতার আনন্দবাজার গ্রুপের পাক্ষিক 'সানন্দায়' ১১ জুলাই '৯১ সালে "রবীন্দ্র সঙ্গীতের বন্ধন শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায়" শিরোনামে একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সাক্ষাৎকারটি বাংলাদেশের একটি মাসিক পত্রিকায় জুলাই '৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো। গায়িকা আশা ভোঁসলে নজরুল-রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

বহু বছর আগে আমি কলকাতায় এসেছিলাম রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা রেকর্ড করতে। এইচ-এম-ভি'র জন্য। সেই সময় সবাই আমাকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার গলায় নজরুল গীতি গাওয়া উচিত। অবশ্যই। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে দেখি এতে ভীষণ সুরের কড়াকড়ি। নানারকম বন্ধন। একটা সুর বা নোট এদিক-ওদিক করার উপায় নেই। এটা গায়ক বা গায়িকার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। মাঝে মাঝে গাইতে গিয়ে মনে হয়েছে এখানে একটা তান দিলে কেমন হয়? কিন্তু না, রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপির বন্ধন এত দৃঢ় যে তা শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায়। সেই সময়

১। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ।

বংশীবাদক নজরুল

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ডবল ক্যাসেট রেকর্ড করি। সম্প্রতি কবিগুরুর জন্মদিনেও আমার গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান টিভিতে প্রচারিত হয়। সেই যখন রবীন্দ্র সঙ্গীত গাই, তখনই আমার মনে নজরুল গীতির রেকর্ড করার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু বম্বেতে নানা কাজের মধ্যে সেটা হয়ে উঠেনি। এতদিনে সেই ইচ্ছটাই পূরণ হলো।

....পপ ইন্ডিয়া নামে একটি নতুন কোম্পানির কর্ণধার যখন আমাকে নজরুলগীতি গাইবার প্রস্তাব দেন আমি খুশি হয়ে রাজি হই।

..... আমারই এক বান্ধবী আছেন কলকাতায় যাঁর মামা নজরুল গীতি গান। নাম ধীরেন বসু। আমার কাছে যখন পপ-ইন্ডিয়ার প্রস্তাব আসে আমি ধীরেন বাবুকেই পরিচালক হিসেবে বেছে নিই। শুনেছি, নজরুল গীতির জগতে ধীরেন বাবুর বেশ নাম-যশও আছে। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম নামই শুধু নয়, ধীরেনবাবু কাজেও তুখোড়। সবদিকে ওঁর নজর আছে। অথচ শিল্পীর মর্যাদা দিতে উনি জানেন। আমি এসেছিলাম আটটি গানের একটি ক্যাসেট করতে। ভেবেছিলাম, তিন-চারদিনে হয়ে যাবে। কিন্তু ধীরেন বাবু এক-একটা করে গান শোনাতে থাকলেন এবং আমিও মুগ্ধ হয়ে যেতে থাকলাম। সেই গানটিই গাইবার জন্য আবদার করলাম। এই ভাবে চারদিনের বদলে থেকে গেলাম দশদিন, রেকর্ড করলাম ১৬টি গান। আজ অবধি বোধ হয় আর কোনও গান রেকর্ড করতে আমি এতটা মনোযোগ দিইনি। নজরুল গীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। বম্বেতে আমাদের একইদিনে চার-পাঁচটা গান রেকর্ডিং হয়, সকালে, দুপুরে, বিকেলে। এর এক একটির এক এক রকম চরিত্র। আমি এবার নজরুল গীতির ক্ষেত্রে তা আর করিনি। তাই দশদিন একটানা ডুবে ছিলোম নজরুলের সুরের মূর্ছনায়। বম্বের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভেঙে ফেলে।...... নজরুল গীতিতে বন্ধন নেই। আছে সুরের মিষ্টতা। গাইতে গাইতে যদি কোথাও একটু আলাপ বা

সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুল

বিস্তার করার ইচ্ছে জাগে তাহলে সেটা করার স্বাধীনতাও নজরুল গীতিতে আছে। শিল্পীর নিজস্ব ইন্টারপ্রেটেশন বা ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে এই গানে। আর সেটাই নজরুল গীতির আকর্ষণের অন্যতম উপাদান।

.... প্রথমেই তো ওই বন্ধনের কথা আসে। সেটা তো বলেই নিয়েছি। ধরুন, 'কাঁদে কি কোয়েলিয়া' গানটা। এটা রাগাশ্রিত গান। গাইতে গিয়ে তান ফেলার ইচ্ছেটা তাই যুক্তিসঙ্গত। তাই নজরুলের সুর ধরে রেখে আমি মাঝে-মধ্যে তানের আশ্রয় নিয়েছি গানগুলিকে আরও শ্রুতিমধুর করার জন্য। মূলটা কিন্তু ছুঁইনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু রাগাশ্রিত গান আছে, যেখানে তানের সাহায্য নিলে আমার মনে হয় গানগুলো আরও সমৃদ্ধ হত। যেমন 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' কিংবা 'এসো শ্যামল সুন্দর', দ্বিতীয়টা তিন তালের উপর বাঁধা। এই গানটিতে আনায়াসেই তান ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। আমি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধনের বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারিনি। ফলে যে গাইতে জানে তার পক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলা শক্ত। তার অসুবিধা হয়, শিল্পী সত্তায় বাঁধে। কিন্তু যে গাইতে জানে না তার কোনও অসুবিধাই হয় না, বাঁধাগদে গেয়ে গেলেই চলে। কিন্তু আমরা যারা ক্লাসিকাল বেস-এর শিল্পী, যারা এত গান গেয়েছি তাদের পক্ষে...

আমি প্রথম বাংলা গান গাই সুধীন দাশগুপ্তর সুরে। তারপর পঞ্চমের, মানে আর ডি বর্মনের সুরে। ছবির গান, আধুনিক গান, সবকিছু। কোনও অসুবিধাই হয় না। খুব কঠিন কোনও শব্দ এলে তা দু-তিনবার শুনে বলে তাবে গাই। আর ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে একটা সূত্র রয়েছে। একই শব্দ একটু অদলবদল-করেই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বলা হয়। যেমন

নজরুলের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিষ্যা ইন্দুবালা

পাঞ্জাবিতে 'ভাইয়া'-কে 'পাইয়া' ব্যাস সেটা বেঝে গেলেই হল কে কোথায় কাকে কী বলে।
-রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে যখন আসি, তখন আমাকে বলা হয়েছিল চেপে চেপে অর্থাৎ দাঁত চেপে গাইতে। তবেই নাকি ঠিক গায়কি আসবে। আমি তখন এইচ-এম-ভির লোকদের বলেছিলাম ওই চেপে চেপে গাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মুখ খুলেই গান গাই এবং গাইব। "আ'. কে আমি 'আ'-ই বলব, অ ও আ-এর মাঝামাঝি কিছু বলতে পারব না। এইচ এম ভি'র লোকেরা তাতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তাও আমি চেষ্টা করেছিলাম কিছুটা দাঁত চেপে গাইতে। আমার গান শুনে তখন অনেকেই বলেছিলেন অবাঙ্গালী উচ্চারণ। যদিও আমি খুব মন দিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছিলাম। এবারে নজরুল গীতি করতে এসে আমি আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছি। নানা ধরনের গান গেয়েছি। রাগাশ্রিত, প্রেমের, বাচ্চাদের-লোকগীতি যেমন মেঘলা নিশি ভোরে... ।[২]

নজরুল সঙ্গীত কতো উঁচুমানের একজন হিন্দিভাষী শিল্পীর বিশ্লেষণমূলক আলোচনায়ই তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই নজরুল বিশেষজ্ঞদের মতে, কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলা গানের সর্বপ্রধান স্থপতি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করে গেছেন, তাঁর সৃষ্টি বিচিত্রগামী হলেও, সর্বত্রগামী হ'তে পারেনি। কবি নজরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছেন।

সুতরাং সকল ক্ষেত্রে ধূমকেতু'র মতো নজরুলের আবির্ভাব এবং দ্রুত অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন অনেকের কাছে ঈর্ষান্বিত ও অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২। সানন্দা, ১১ জুলাই '৯১ সংখ্যা

কাজেই নজরুল প্রতিভার বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত গোষ্ঠী বা দলের চক্রান্তের ধারাবাহিকতা শুরু থেকেই চলে আসছে। আমাদের দেশের পরজীবী দালালেরা মুখে নজরুল-প্রীতি দেখালেও অন্তরে কখনো নজরুলকে ঠাঁই দেয়নি। এদের নজরুল প্রিয়তা হলো গাছের গোড়া কেটে উপরে পানি ঢালার মতো। আমাদের দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা আন্তরিকতার সাথে কবি নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিলেও এইসব পরান্নভোগী বুদ্ধিজীবীরা কখনো জাতীয় কবির মর্যাদাটুকু আজও দেয়নি। অলিখিতভাবে সে মর্যাদা দেয়া হয়েছে যেন অন্য কাউকে। তাই এ দেশে নজরুলের গান, কবিতা ও সাহিত্যকর্ম টিভিতে অবহেলিত। এসবই সূক্ষ্ম চক্রান্তের ধারা। সাধারণ জনগণের মন ও মগজে স্কেচ করার কথা নয়। কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই নজরুলের গান নিয়ে যে-সব অভিযোগ আমি এখানে উত্থাপন করেছি, এর যৌক্তিকতা পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে বলে আমি মনে করি।

পাকিস্তান আমলে ষাট দশকে যখন এদেশে টিভি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয় তখন এ দেশীয় কতিপয় বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিকসেবী ও রাজনৈতিক নেতা এর বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতা করেন। তখন বলা হয়েছিল সামরিক শাসক আইয়ুব খান তাঁর ব্যক্তি ভাবমূর্তি গড়ে তোলা এবং সামরিক সরকারকে অসামরিক সরকারে রূপ দেয়ার প্রয়াসে এই টিভি কেন্দ্র

নজরুলের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিষ্যা কানন বালা

কলিকাতার রেডিওতে এককালে নজরুল সঙ্গীত দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। শ্রোতাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রেডিও কর্তৃপক্ষ ইন্দুবালা ও কানন বালাকে রেডিওতে ঘন ঘন প্রোগ্রাম দিতেন। তা দেখে হিন্দু বাবুরা পত্র-পত্রিকায় তীর্যকভাবে মন্তব্য করেছিলো ঃ অমুক বালা, তমুক বালারা রেডিওতে ঘন ঘন প্রোগ্রাম পায়; অথচ ভদ্রঘরের মেয়েরা কোন প্রোগ্রাম পায় না।
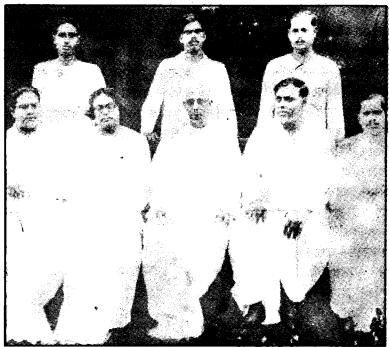
কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানীতে বসে (বাম থেকে) ঃ ধীরেন দাশ, নজরুল, ভগবতী ব্যানার্জী, তুলসী লাহিড়ী ও রাসবিহারী শীল

চালু করেছেন। ঢাকায় টিভি কেন্দ্র স্থাপন সম্পূর্ণভাবে আইয়ুব খানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এসব বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে আইয়ুব খান প্রথমে এক বিখ্যাত ইউরোপীয় কোম্পানীকে এ দেশে টেলিভিশন কেন্দ্র নির্মাণের অনুরোধ জানান। কিন্তু ঐ ইউরোপীয় কোম্পানী সম্ভাব্যতা পরীক্ষার পর নেতিবাচক জবার দেয়ায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এ দেশে টেলিভিশন সম্প্রচারকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে জাপানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ঢাকার ডিআইটিতে টিভি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যখন ঢাকায় টিভি কেন্দ্র চালু হয়ে যায় তখন বিরোধিতাকারী রবীন্দ্রভক্তরা এটাকে কব্জা করার জন্যে দলে দলে টিভি'র চাকরিতে ঢুকে যায়। শোনা যায়, অনুষ্ঠান পরিচালক পদে প্রথমে নিয়োগ পান একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী। পরবর্তীতে তিনি অনেক রবীন্দ্র ভক্তকে আকর্ষণীয় পদ এবং লোভনীয় বেতনে বিভিন্ন বিভাগে সরকারী চাকরিরত রবীন্দ্রভক্তদের ছাড়িয়ে এনে ঢাকার টিভি কেন্দ্রে জড়ো করে। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি যখন যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ হয়ে যায় তখন পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচার শুরু করা হয় দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত

"এস গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি" গানটির মাধ্যমে।

প্রায় নব্বই দিন পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের পর ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় তখন পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী জনসভা ছিল। এই জনসভায় অনেক বিরোধী দলীয় নেতা টিভি কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সে সভায় একজন শ্রোতা হিসাবে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে সেদিন ঢাকা টিভি কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। সেই উদ্বোধনের দিনও নজরুল সঙ্গীত থাকে উপেক্ষিত। দ্বিতীয় দিনেও রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্প্রচার করা হয়। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর 'রজত জয়ন্তী' উপলক্ষে বিশেষ সংকলনে জামিল চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেন ঃ

"দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান সাফল্য ছিল নৃত্যসঙ্গীতসম্বলিত পঁচিশ মিনিটের একটি স্টুডিও প্রযোজনা। ছায়ানট উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানটি এই কেন্দ্র থেকে অদ্যাবধি প্রচারিত সকল সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে অনায়াসে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। মূলত রবীন্দ্র সঙ্গীত ও তার রূপায়ণমূলক নৃত্যযোগে গ্রথিত এই অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, জাহিদুর রহিম, ফাহমিদা খাতুন, সেলিনা কাইউম ও মন্দিরা নন্দী। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন মনিরুল আলম।

কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানীতে। দাঁড়িয়ে (বাম থেকে) ঃ ধীরেন দাশ, নজরুল, আঙুরবালা, তুলসী লাহিড়ী, রসবিহারী শীল, (বসে) ভগবতী ব্যানার্জী

পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় বাসভবনে কবি। গান শোনাচ্ছেন কণ্ঠশিল্পী হুসনা বানু খানম, তবলা সঙ্গত করছেন নজরুল সঙ্গীত গবেষক আসাদুল হক। পিছনে কবিপুত্র সব্যসাচী। পাশে অভিনেতা ফতেহ্ লোহানী ও সুরশিল্পী আবদুল আহাদ।

অনুরূপ মানের অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য তিনি ছায়ানটের উপর চাপ অব্যাহত রাখেন। ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধ্যাকালীন কয়েকটি রাগের উপর ছায়ানট একটি অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।[৩]

উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে আমাদের দেশের রবীন্দ্র ভক্তরা রবীন্দ্রনাথের গানকে এ দেশে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করতে টিভি'র কতই না প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অথচ নজরুল সঙ্গীতকে নিয়ে সে প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ দেখা যায়নি। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মাঝে নজরুল বিষয়ে যথেষ্ট এলার্জি ছিল। এক সময় আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু গত ৩৪ বছরের রাজনৈতিক প্রচার-অপ্রচার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিলকে তাল করে প্রচার করা হয়েছে। এখনো করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনেই যদি তৎকালে টিভি স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে রবীন্দ্র ভক্তের সেখানে নিয়োগের সুযোগ হয় কিভাবে? আইয়ুব খানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যদি টিভি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এখনকার মতো নগ্নভাবে সেদিন টিভিকে দলীয়করণ করা হয়নি কেন? সাংস্কৃতিক

৩। জামিল চৌধুরী, পুরানো সেই দিনের কথা, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, পৃঃ ৮, ৯।

রাশবিহারী শীলের শবদেহের পাশে ইন্দুবালা, আঙুরবালা, ধীরেন দাশ, নজরুল ও অন্যান্য
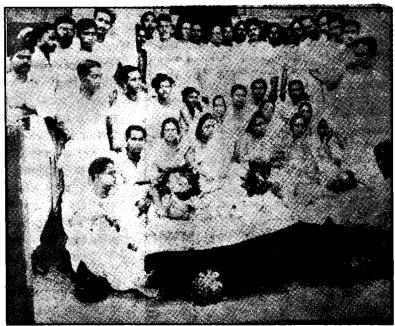
আগ্রাসনই যদি চিঠি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সম্প্রচার শুরু হয় কিভাবে?

উল্লেখ্য, টিভি কেন্দ্র চালুর ৩৪ বছর গত হয়েছে। আমাদের পরে টিভি কেন্দ্র চালু করে ভারত আজ এক ডজনেরও অধিক টিভি চ্যানেল চালু করেছে। অথচ জিয়ার আমলে বিটিভিকে সাদা থেকে রঙ্গিনে রূপান্তর করা ছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেও ক্ষমতাসীন দলগুলো দ্বিতীয় আরেকটি চ্যানেল আজো চালু করতে পারেননি। গত ছাব্বিশ বছর ধরে তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত, দলীয় নেতা ও রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা, ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যাচার এবং টিভিকে নগ্নভাবে দলীয়করণে এতোই ব্যস্ত ছিল যে, আরেকটি চ্যানেল চালু করার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সময়ও বোধ হয় পায়নি।

অথচ এটাকে নিয়ে মিথ্যাচারের শেষ নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁদের মিথ্যাচারের একটা পরিমাপ করা যাবে। কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এদের অসংখ্য মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক জবাব হতে পারে। জামিল চৌধুরী রামপুরায় টিভি স্থান ক্রয় ও নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"..... উদ্যোগ নেওয়া হল ঢাকায় একটি নতুন স্থায়ী ভবন নির্মাণ এবং ঢাকার বাইরে চারটি উপকেন্দ্র স্থাপনের। স্থায়ী টেলিভিশন ভবন নির্মাণের জন্য আবার জায়গা খোঁজা আরম্ভ

তিন বন্ধু ঃ অধ্যাপক হেমন্ত সরকার, হাবিবুল্লাহ বাহার ও নজরুল

হল। এবারকার বিনির্দেশ বা specification একটু অন্য ধরনের। শহরের মধ্যে ৪ থেকে ৬ একর খোলা জায়গা চাই। কিন্তু জায়গাটি তেজগাঁও বিমান বন্দরের কাছে অথবা বিমানের উড্ডয়ন বা অবতরণ funnel-এ পড়বে না। শিল্পীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জায়গাটি আবাসিক এলাকার কাছাকাছি হতে হবে, বন্যায় প্লাবিত হবার সম্ভাবনা থাকবে না, আবার ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য বেশ কিছুটা খালি জায়গাও থাকলে ভাল হয়। ডি আই টি'র নগর পরিকল্পক কে. আর. চৌধুরী বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীর একটি মানচিত্র খুলে গুলশানের দক্ষিণ দিকে খালের ধারে দ্বীপের মত একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন সব দিক্ বিবেচনা করলে এই জায়গাটি সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। জায়গাটির নাম রামপুরা। জায়গাটির মালিক মনসুর আহমেদ। কেবল একটি অসুবিধা- ওখানে যাবার কোন রাস্তা নেই।

কে. আর. চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম জায়গা দেখতে- যাওয়া তো নয়, রীতিমত অভিযান। মৌচাক বাজারে গাড়ি রেখে নরম কাদামাটির উপর দিয়ে হেঁটে দু'ঘন্টায় রামপুরা পৌঁছুলাম। ওই জায়গাটিই স্থায়ী টেলিভিশন ভবন নির্মাণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হল।

রামপুরায় স্থায়ী টেলিভিশন ভবন নির্মাণের জন্য কনসোশিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করে সুইডেনের অধ্যাপক পিটার সেলসিংকে ভবন পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হল। সেলসিং-এর নেতৃত্বে তাঁরই কৃতী ছাত্র মাহবুব-উল হক (বর্তমানে বাংলাদেশ কনসালট্যান্টস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ভবন পরিকল্পনার বিস্তারিত নক্শা প্রণয়ন ও খুঁটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত করেন। এ প্রসঙ্গে কনসোশিয়েটস-এর পরিচালক ও নবীন প্রকৌশলী কে. জি. রাব্বানীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১লা বৈশাখ ১৩৭৫ (১৪ এপ্রিল ১৯৬৮) তারিখে রামপুরায় টেলিভিশন ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল।

রামপুরায় নির্মিত ভবনের রুচিসম্মত অন্তরসজ্জার জন্য আমার পরামর্শে শিল্পাচার্য জয়নুল

আবেদীন-এর নেতৃত্বে একটি অন্তরশোভা কমিটি গঠন করা হল। টেলিভিশন ভবনের প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন খোলা চত্বরে ৩০ ফুট উঁচু একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য স্থাপনের সুপারিশ করা হল। বাঙালি শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতীকরূপে ভাস্কর্যটি হবে নটরাজের অনুকরণে নির্মিত একটি নৃত্যপরা নারীর। প্রস্তাবটিতে রাওয়ালপিন্ডি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও পাওয়া গেল। সমস্যা দেখা দিল এই বিরাট আয়তনের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটি ঢালাই করা নিয়ে।"

অথচ এই জায়গা কেনা ও ভবন নির্মাণের ইতিহাসও আজ হাইজ্যাক হয়ে গেছে। টিভি ভবনে ভাস্কর্য স্থাপনের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মিথ্যাচার থেকে আইয়ুব খান রক্ষা পাননি।

১৯৬৪ সালের ২৭ আগস্ট তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান থেকে একটি চিলড্রেন্স অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। সেদিন উপস্থাপক অনুষ্ঠান ঘোষণা করে বলেছিলেন- "এখন যে গানটি পরিবেশিত হবে তা Greatest poet of Bengali litearature কাজী নজরুল ইসলাম-এর। পরদিন একটি জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকের শেষের পাতা 'পাগলে কি-না বলে' শিরোনামে লিখেন- "যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, জীবনানন্দ রয়েছে সে ভাষায় Greatest কবি কি-না নজরুল।"

নজরুলের প্রতি এ ধরনের মানসিকতা আজও দূর হয়নি। গত ছাব্বিশ বছর ধরে বিটিভি যা করছে তাকে প্রচার না বলে অপপ্রচারের শামিলই বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বিটিভিতে প্রায়ই বিভিন্ন দেশী-বিদেশী মনীষীদের বাণী দেখানো হয়ে থাকে। অথচ কবি নজরুলের কোন স্মরণীয় বাণী প্রচার করতে দেখা যায় না। কালে-ভদ্রে ২/১টি দেখালেও তা অত্যন্ত হেলাফেলা আর গুরুত্বহীনভাবে প্রচার করে থাকে।

জনাব শফি চাকলাদারের "প্রসঙ্গ নজরুল প্রচারের নামে অপপ্রচার" শিরোনামে একটি বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ মাসিক সফর ঈদুল ফিতর '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির আংশিক এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

.... এ দেশের লিলি চৌধুরী টিভিতে বললেন যে, বিগত আমলে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথকে মারামারি করে পড়তে হতো। এ কথাটি কি ঠিক বলা হল? ১৯৬৫ সনের যুদ্ধের সময় তদানীন্তন সরকার ভারতীয় সমস্ত কিছুই নিষিদ্ধ করেছিল। ছায়াছবি এবং বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেই সাথে নিষিদ্ধ হল (রেডিওতে একটি বিরাট অংশ জুড়ে প্রচারিত হত) ভারতীয় শিল্পীদের রেকর্ডকৃত গানের অনুষ্ঠান। এতে করে দেশীয় শিল্পীদের কণ্ঠ আরো বেশি করে প্রচারের সুযোগ হল। এই নিষেধাজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাকে নিয়ে তো বাড়াবাড়ি কম হয়নি। এখনো চলছে। পাকিস্তান ছিল ইসলামী রাষ্ট্র কিন্তু সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের পাঠ্য তালিকা কি ভুলে যাওয়া হল?

গীতিকার নজরুলের দুর্লভ ছবি

কেবল মনে থাকল ঐ ক্ষণস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাটুকু? কিন্তু কেন? চিত্রাঙ্গদা'র মত কাব্য তখন এবং এখনো তো পড়ানো হচ্ছে। যে সময়ের পাঠ্য তালিকায় বন্দোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায়-ঠাকুর-এদেরই প্রাধান্য ছিল। অথচ মুসলমান বহু লেখক ছিল যাঁদের লেখার মর্যাদা দেয়া হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ কিন্তু হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। অথচ পাঠ্য তালিকায় প্রাধান্য ছিল সংখ্যালঘুদের, নয় কি?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা নজরুলের সৃষ্টিকে এভাবে মূল্যায়ন করছেন এবং করেছেন তাঁরা নজরুলের দু'একটি লেখা ছাড়া সমস্ত নজরুলকে মোটেও পড়েননি। পড়বার ইচ্ছাও নেই কিন্তু বিবৃতি ঠিকই দিচ্ছেন। বাংলাদেশ টিভির যোগাযোগ এ ধরনের লোকদের সাথেই। আমার তো রীতিমত সন্দেহ হয় টিভি কর্তৃপক্ষের নজরুল প্রেমের গভীরতা নিয়ে। নজরুল এ দেশের জাতীয় কবি অথচ নজরুলকে এড়িয়ে যাওয়াই যেন টিভি কর্তৃপক্ষের জাতীয় কর্তব্য। আমি কল্পনার বশবর্তী হয়ে নয় বরং টিভি যা করছে তা তুলে ধরছি।

হৈমন্তী শুকলা এলেন গান করতে। হৈমন্তী শুকলা প্রধানত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী তবে আধুনিক গানও করে থাকেন। অথচ এই শিল্পীকে দিয়ে প্রথম পরিবেশন করানো হল একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত। শিল্পীর পরিচয়ে আমরা জানি হৈমন্তী রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন না। যেমন হেমন্ত, শ্যামল-এ দু'জন শিল্পী মূলত আধুনিক গানের এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের। অথচ এঁদের দিয়ে তো নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করানো হল না অনুরোধ করে। এঁদের প্রথম পরিবেশন তো নজরুল সঙ্গীতের হওয়া প্রয়োজন ছিল। মান্না দে, প্রতিমা যেমন নজরুল সঙ্গীত করেছেন তেমনি রবীন্দ্র সঙ্গীতও, কিন্তু মূলত এঁরা আধুনিক গানেরই শিল্পী। অথচ এখানেও বাংলাদেশ টিভি অনুরোধ করেনি নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। অনুপ জালোটা এলেন। এই শিল্পী কোলকাতার নন। ভাষাও বাংলা নয়। কিন্তু নজরুল সঙ্গীত বেশ ক'টা করেছেন। এঁদেরও কোন প্রশ্ন রাখা হল না। ঘরোয়া পরিবেশে ২/১টি রবীন্দ্র সঙ্গীত করলে কিংবা রেকর্ডও যদি ২/১টা থাকে সে সুযোগে যদি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের অনুরোধ জানানো হয় তবে নজরুল সঙ্গীত যারা এমনি ২/১টা করেছেন তাঁদেরও তো নজরুল সঙ্গীত গাইতে বলা যেতে পারত, অথচ নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। এই তো সেদিন একক ব্যক্তিত্ব

হিসাবে গোলাম মোস্তফাকে টিভি পর্দায় আনা হল। তিনি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও একটি নজরুল সঙ্গীতের নাম করলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত তাৎক্ষণিকভাবে প্রচার করা হল। নজরুল সঙ্গীত যা শেষে দেয়া হল তাও অর্ধেক- বাকিটা কেটে দেয়া হল। অথচ অনুষ্ঠানটি খবরের পর পর্যন্ত চলেছিল। শুধু নজরুলের গানটা না কেটে সম্পূর্ণ পরিবেশন করা যেতো নয় কি?
কিছু দিন আগে জলসা অনুষ্ঠানে শাকিলা জাফরকে দিয়ে একটি নজরুল সঙ্গীত পরিবেশিত হল- 'খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার'। অপূর্ব পরিবেশন। শিল্পী যে নজরুল সঙ্গীত করেন- এটা অনেকেই জানেন না। শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে শিল্পী শাকিলা জানালেন, এই তো সুযোগ পেলাম গাইলাম। আমাকে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ দিলে নিশ্চয়ই টিভিতে গাইব। রেডিওতে তো আমি নজরুল সঙ্গীতের প্রোগ্রাম সব সময়ই করে থাকি।
এ রকম একজন নজরুল সঙ্গীতের শিল্পীকে টিভি কর্তৃপক্ষ কেন প্রোগ্রাম দিচ্ছেন না, সেটাই আশ্চর্য।
রুনা লায়লাও নজরুল সঙ্গীতের ক্যাসেট বের করেছেন। এখান থেকে নয়, কোলকাতা থেকে। অথচ রুনা এ পর্যন্ত বেশ ক'বারই টিভিতে এসেছেন, কিন্তু তাঁকে দিয়ে একটিও নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করানো হয়নি। এ সবের জবাব টিভি কর্তৃপক্ষের আছে কি-না তা তাঁরাই বলবেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, কোন মুসলমান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীকেই কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। কোন হামদ-নাত অনুষ্ঠানে তো নয়ই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন, গান করছেন। তা হলে এ দেশের মুসলমান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের বেলায় এমন হচ্ছে কেন? টিভি এবং রেডিও কর্তৃপক্ষই বা একই শিল্পীদেরকে হামদ-নাত পরিবেশন করতে ডাকছেন না কেন? রমজান মাসের সাহরী এবং ইফতারসহ বছরের অন্যান্য মিলাদ মাহফিলের কোনটিতেই এই মুসলমান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের দেখা যায় না। অথচ এদের দ্বীজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, আধুনিক গান, পুরোনো দিনের গানেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। শুধু কি আপত্তি ইসলামী গান-এ অংশগ্রহণে? হামদ-নাত- এ অংশগ্রহণ না করলেই সম্ভবত প্রগতিশীল হওয়া যায়?
১৯৬২ সালে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ফিরোজা বেগমের একান্ত উদ্যোগে নজরুল সঙ্গীতের পুনর্জাগরণ হয়। ১৯৬০ পর্যন্ত বলতে গেলে নজরুলের সৃষ্টির অবমূল্যায়নই হয়েছে বেশী। যার রেশ এখানে রয়েছে। টিভি'র জলসা অনুষ্ঠানে শিল্পী শাকিলা জাফরের অপূর্ব নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন উপস্থিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে মোস্তফা মনোয়ার-এর ভেতরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে- তাঁর চেহারাতেও তা প্রকাশ পায় এবং তিনি দিশেহারা হয়ে বলেই ফেলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত আরো পাঁচশ বছর বেঁচে থাকবে। অথচ নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বললেন না। সঙ্গীত পিপাসুরা জানে, কোন সঙ্গীতটি জনম জনম ধরে বেঁচে থাকবে এবং প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিস্তৃতির অঙ্গন খুবই স্বল্প।
জনাব মোস্তফা মনোয়ার টিভিতে শিশুদের জন্য 'মনের কথা' নামে একটি অনুষ্ঠান করেন। তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে একটি করে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করেই যাচ্ছেন। এই মানসিকতার

৪। তথ্য সূত্র ঃ মাসিক সফর, ঈদুল ফিতর সংখ্যা, '৯৬।

লোকেরাই রেডিও-টিভি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সূক্ষ্ম কাজ করে চলেছেন।[৪]

বছর চারেক আগে কবি নজরুলের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিটিভি থেকে 'ব্যথার দান' নাটকটি প্রচারিত হয়েছিলো। তাও প্রচারিত হয়েছিলো নজরুল জন্মবার্ষিকীর পরের দিন। কিন্তু নজরুলের বিশাল সঙ্গীত ভান্ডার থেকে কোন সঙ্গীত সংযোজন করার মতো খুঁজে পাননি অতি-রবীন্দ্রভক্তরা। তাদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিলো রবীন্দ্র সঙ্গীত ভান্ডারে। অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সেদিন নজরুলের নাটকে জুড়ে দেয়া হয়েছিলো.রবীন্দ্র সঙ্গীত-

"আমার সকল দুঃখের প্রদীপ
জ্বেলে করবো নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।"

দেখে সচেতন জনগণ বিস্মিত হয়েছিলো। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের দাদা বাবুরাও এই রবীন্দ্র প্রেমিকতা দেখে ভিমড়ি খেয়ে পড়েছিলো।

আমাদের গর্ব ও অহংকার করার মতো যা কিছু আছে তা একে একে ধ্বংস করা হয়েছে; এখনো হচ্ছে। কিন্তু সরাসরি নজরুল ও নজরুলের সাহিত্যকে ধ্বংস করে এ জাতিকে ফতুর করার সাহস ও স্পর্ধা তাদের নেই। পরোক্ষভাবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে নজরুলকে কবি ফররুখ আহমদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছে। তাই নজরুল মরে গিয়েও হীন পলিটিক্স-এর কবল থেকে রেহাই পাননি। চক্রান্তের আবর্ত থেকে অব্যাহতি পাননি। কিন্তু যতোই চক্রান্ত করা হোক না কেন বাণী ও সুরের কারণে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে নজরুল সঙ্গীত চিরকাল বেঁচে থাকবে এবং কালজয়ী নজরুল সঙ্গীতই হবে আমাদের আগামী দিনের প্রেরণা, আমাদের প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কতটা বাড়াবাড়ি করা হয়, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদের নিম্নোক্ত মন্তব্যে অনুমান করা যায় ঃ

'রবীন্দ্রনাথ এখন বেশ বড়ো রকমের এক দেবতা হয়ে উঠেছেন বাঙালীর, আমি তাঁর প্রতিভার অনুরাগী, কিন্তু আমি মনে করি না যে তিনি বিচারের ওপরে।'[৫]

৫। হুমায়ুন আজাদ, আমার অবিশ্বাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৩২।

বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবি রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ ৬৭ বছরে যা লিখেছেন একজন ব্যক্তির সারা জীবন পাঠ করেও শেষ করা যাবেনা। তা সত্ত্বেও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি ও পরিমাপ করা যায়। জীবনে কতো গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন এর একটা হিসেব রয়েছে। কিন্তু কবি নজরুল মাত্র বিশ/একুশ বছরে সাহিত্য চর্চা করে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে যা দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তাঁকে নিয়ে যথার্থভাবে গবেষণা হয়নি বলে তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। যদিও কাগজপত্রে তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে কিন্তু এর সঠিক পরিমাণ নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। যা রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখা যায়নি।

নজরুলের গান কেউ বলছেন ৩,৫০০; কেউ বলছেন, ৪,৫০০; কেউ বলছেন ৫০০০ হাজার। আবার কেউ বলছেন, দশ হাজারেরও অধিক। আর নাটকের ক্ষেত্রে আমরা জানি, কবি নজরুল ৩টি নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু গত বছরের ('৯৭) ৩১ অক্টোবর 'কাজী নজরুল ইসলামের নাটক' বিষয়ে আলোচনা সভায় প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী ও লেখক জনাব আরফিল হক এক পিলে চমকানো তথ্য দিয়েছেন। তিনি বক্তব্যে বলেছেন ঃ

> ১৯২২ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে কবি নজরুল কলিকাতা রঙ্গালয়ে যোগ দেন। এই সময় ১৯৩১ সালে তিনি রচনা করেন রূপকধর্মী পূর্ণাঙ্গ নাটক 'আলেয়া'। কলিকাতা নাট্য নিকেতন মঞ্চে নাটকটি নিয়মিত অভিনীত হয়। তিনি বলেন, ১৯৩৯ সালে কবি রচিত 'মধুমালা' নাটকটি আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে (বর্তমান প্রেস সিনেমার) একাধিকক্রমে চল্লিশ রজনী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অভিনীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

জনাব আরিফুল হক তাঁর প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম রচিত ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০টির মত নাটকের তালিকা দিয়ে বলেছেন ঃ

> "নজরুল ইসলামের নাটকের সংখ্যা যে কত তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কারণ তার সবগুলো নাটক সংরক্ষিত হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনি ১০০টিরও বেশি নাটক রচনা করেছিলেন।"[১]

প্রবন্ধকার জনাব হক তাঁর প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের বেশ ক'টি নাটক নিয়ে

১। দৈনিক ইনকিলাব, '৯৭।

বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"কাজী নজরুল মূলত বিদ্রোহ কবি হলেও তাঁর নাটকে বিদ্রোহ নেই। সেখানে তিনি অপরূপ সত্তার দীপাবরণ সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক ধ্যানমৌনী এক স্রষ্টা যেন চারদিকে রহস্যজাল বিছিয়ে বসে আছেন। নজরুল ইসলামের বেশীরভাগ নাটকই কাব্য এবং প্রতীকধর্মী। রূপক সাংকেতিক নাট্য রচনায় তিনি ছিলেন হাউপটম্যান ও আন্দ্রিভের সমকক্ষ। আধুনিক বাংলা নাট্যধারার তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সংলাপ রচনায় পৃথিবীর যে কোন বড় মাপের নাট্যকারের সমতুল্য"।

একই আলোচনা সভায় প্রখ্যাত লেখক অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার বলেছেন ঃ
কলিকাতার কিছু বাবু বুদ্ধিজীবী চাননি নজরুল নাটক লিখুক। তারা নজরুলকে নাটকের জন্য গান লেখার কাজেই ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাঁর নাটক নিজেদের থিয়েটারে প্রযোজনা ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ দেখাননি। একই ধারাই শ্রী আশুতোষ ভট্টচার্য এবং অজিত ঘোষ প্রমুখ গবেষকগণ নজরুলকে নাট্যকার হিসেবে মূল্যায়ন করেননি। এর প্রধান কারণ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মুসলমান নজরুলের প্রতি চিরন্তন অশ্রদ্ধা বা অনাত্মীয় ভাব পোষণ।

জনাব হক আরো বলেছেন ঃ
"নাট্যকার নজরুলের পরিচয় দিতে হলে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, বাংলা নাট্য সাহিত্যে রূপক সাংকেতিক নাটক লিখে যে ক'জন যশস্বী হয়েছে, নজরুল নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে প্রথম কাতারের নাট্যকার। এ ছাড়া রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন সার্থক গীতিনাট্য রচয়িতা। শ্রুতি নাটক বা রেকর্ড নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সার্থক পথ প্রদর্শক এবং উত্তর তিরিশ মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই ছিলেন দিশারী পুরুষ। বাংলার নাট্য ইতিহাসে যার এত বড় অবদান, তাঁর খবর, বিদগ্ধ ইতিহাসবিদগণ রাখেন না- এটা বড় পরিতাপের বিষয়"। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'যে দেশের নাট্যচর্চার অগ্রগতি নিয়ে জাতি গর্ব করে সেই দেশের নাট্যকর্মীরা এবং শিল্প, সমালোচক, প্রযোজক, পরিচালকরা শতাধিক নাটকের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামের একটি মৌলিক নাটকও মঞ্চে-টেলিভিশনে, বেতারে কিংবা চলচ্চিত্রে উপস্থাপনা করতে পারেন না- এই ব্যর্থতার ট্রাজিডি কার? কবির না আমাদের?

সভাপতির ভাষণে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন ঃ
আমি বাংলার অধ্যাপক, আমার হাতে কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত পেয়েছেন, কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, এই প্রবন্ধ পাঠের আগে আমিই জানতাম না যে, নজরুল ১০০টিরও বেশি নাটক লিখেছেন। একথা সত্যি যে, নজরুল ইসলামকে জানার শুরুই এখনও হয়নি। এই মহাসাগরের শেষ তো অনেক দূর।

যাই হোক, নজরুল একাডেমীর এই ব্যতিক্রম উদ্যোগকে আমরাও অভিনন্দন জানিয়ে বলছে চাই, উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে মননে কর্মে চিত্তলোক বাঙালি মুসলমানদের যখন দিশেহারা অবস্থা, তখনই দিশারী নক্ষত্রের মত নজরুলের আবির্ভাব। নজরুল বাঙালি মুসলমানদের প্রত্যাশাকে প্রগতিশীল চেতনার সাথে যুক্ত করেছিলেন। জাতীয় জীবনের চেতনাকে নবিনত্বে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিলেন, বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি চিন্তাকে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আত্মোন্নতির সঠিক পথে

পরিচালিত করেছিলেন, প্রায় সংকীর্ণ মুসলিম সংস্কৃতিকে চিত্তোৎকর্ষের বিশদ আবহে উত্তীর্ণ করেছিলেন। নজরুলের কাছে বাঙালি মুসলমানদের ঋণ অনেক। সুতরাং নজরুলকে যত জানা যাবে ততই আমাদের লাভ, ততই আমাদের মঙ্গল।[২]

কবি নজরুল শুধু নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, চলচ্চিত্রে অঙ্গনেও তিনি পদচারণার সফল স্বাক্ষর রেখেছেন। ত্রিশের দশকে সমগ্র ভারতবর্ষের দর্শকনন্দিত প্রখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীমতি কাননবালা কবি নজরুলকে ছায়াছবির একজন সফল সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস পান। তাঁর ভাষায় ঃ

কাহিনীকার কাজী নজরুল ইসলামের 'সাপুড়ে' ছবিতে রতন, মনোরঞ্জন ও সত্য।

"বিষ্ময়করভাবেই ঘণ্টার পর ঘন্টা নাওয়া-খাওয়া ভুলে শুধুমাত্র গান রচনা নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। আর সে কি আশ্চর্যভাবে মেতে থাকা। কখনও যদি কোন সুর মনে এলো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে কথা বসানো, আবার কখনও বা কথার তাগিদে সুর। রাগরাগিনীর সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান আমার ছিল না কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় ছিলো না, কি ব্যাকুল আবেগে তিনি কথার ভাবের সঙ্গে মেলাবার জন্য হারমোনিয়ম তোলপাড় করে সুর খুঁজে বেড়াতেন। এ যেন ঠিক রাগের মর্ম থেকে কথার উপযুক্ত দোসর অন্বেষণ। ছায়াছবিতে প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের কারণে সঙ্গীতের সঠিক ভাবাবেগ ফুটিয়ে তুলতে কবি নজরুল শ্রীমতী কাননবালাকে ছায়াছবির গান শেখাতে শেখাতে বলেন, মনে মনে ছবি এঁকে নাও- নীল আকাশ দিগন্ত ছড়িয়ে আছে তার কোন সীমা নেই- দু'দিক ছড়ানোতো ছড়ানোই। পাহাড় যেন নিশ্চিন্ত মনে তারই গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে....।[৩]

কবি নজরুলের চলচ্চিত্রে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে গবেষক লেখক অনুপম হায়াৎ তাঁর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতি একজন চিত্র পরিচালক, কাহিনীকার, সুরকার, গীতিকার এবং অভিনেতা হিসেবে। নজরুল প্রথম চিত্রজগতে আবির্ভূত হন 'ধ্রুব' ছবির মাধমে। গিরিশ চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বেনে নির্মিত পাইওনিয়ার ফিল্মসে'র এ ছবিটির পরিচালক ছিলেন দু'জন। একজন কাজী নজরুল ইসলাম আরেকজন সতেন্দ্রনাথ দে। এ

২। দৈনিক ইনকিলাব, ৮/১২/৯৭।
৩। সবারে আমি নমি, কানন বালা।

কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'ধ্রুব' ছবিতে প্রবোধ ও নজরুল

থেকে প্রমাণিত হয় কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম বাঙালি মুসলিম চিত্র পরিচালক। কারণ, এর আগে আর কোন মুসলমানের নাম শোনা যায়নি চিত্র পরিচালক হিসেবে। 'ধ্রুব' ছবিতে নজরুল 'নারদ' চরিত্রে অভিনয় করে সেকালের দর্শক সমাজকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশ এ চরিত্রে তিনি ক্লিন সেভ অবস্থায় বাবরী চুল নিয়ে, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে পাতলা চাদর গলায় ঝুলিয়ে অভিনয় করেন। এ নিয়ে তাঁকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলেন। পৌরানিক কাহিনীর নেশায় মশগুল সে-কালের মানুষ নজরুলের এই নব নারদী ভূমিকাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। নজরুল অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর নিজ বক্তব্য রেখেছিলেন। 'ধ্রুব' ছবির সুরকারও ছিলেন তিনি। তাঁর দেয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানের কথা ও সুরে আঙুরবালা গান গেয়েছিলেন। "ধ্রুব' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারিতে।

'পাতালপুরী' (১৯৩৫) ছবিতে কবি নজরুল ইসলাম কাহিনীকার শৈলজানন্দের অনুরোধে বিশেষ ধরনের সুরে গান রচনা করেন। সাঁওতালী আর ঝুমুর তাল মিশিয়ে তাতে বিভিন্নতার সমন্বয়ে নজরুলকে বিশেষ সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন এটা 'নজরুল ঝুমুর' নামে পরিচিত। এ ছবির আরেক গীতিকার ছিলেন শৈলজানন্দ। এরপর 'গ্রহের ফের' (১৯৩৭) ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেন কাজী নজরুল।

১৯৩৮ সালে মুক্তি প্রাপ্ত 'গোরা' ছবিতে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে চলচ্চিত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট ব্যবহার করেন। ১৯৩৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বিদ্যাপতি' ছবির কাহিনীকারও ছিলেন তিনি। তাঁর নাটক অবলম্বনে এ ছবি নির্মিত হয়। এ ছবির সুরকারও ছিলেন তিনি। এরপর 'সাপুড়ে' (১৯৩৯) ছবির গান কাজী নজরুলকে প্রচন্ড খ্যাতি এনে দেয়। 'সাপুড়ে' ছবির কাহিনীও ছিল তারই। এই ছবির গান সেকালের অনেক লোককেই মাতিয়ে তুলেছিলেন। কানন দেবীর কণ্ঠে গাওয়া- 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ' বা 'বউ কসনে কথা কসনে' গান আজও অনেকে স্মৃতি চারণ করে।

নজরুল ইসলাম 'দিকশূল' (১৯৪৩) 'নন্দিনী' (১৯৪০) ছবির জন্যে গান লিখেন এবং 'চৌরঙ্গী' (১৯৪২) ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। পরে কাজী নজরুল ইসলামের উৎসাহে শেরে-বাংলা, আব্বাস উদ্দীন, ওস্তাদ খসরু নান্না মিয়া, সারোয়ার হোসেন প্রমুখকে নিয়ে তৈরি হয় বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স। এই প্রতিষ্ঠান থেকে কাজী নজরুলের 'মৃত্যু ক্ষুধা' উপন্যাস অবলম্বনে 'মদিনা' নামে একটি ছবির জন্যে নজরুল গানও লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নজরুলের অসুস্থতার কারণে আর সে ছবি হয়নি। নজরুলের লেখা বিভিন্ন উপন্যাস গল্প, গান নিয়ে ঢাকা-কোলকাতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক ছবিই তৈরি হয়েছে।[৪]

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত পরিচালনায় 'চৌরঙ্গী' ছবির প্রচার পুস্তিকায় শেষ প্রচ্ছদ

কবি নজরুল বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে দীর্ঘ এগারোটি বছর জড়িত ছিলেন। এ সময় তিনি এই শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। কিন্তু সঠিক গবেষণার অভাবে বিশদ বর্ণনা আজো উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

কবি নজরুল ১৯৩১ সালে ছায়াছবির সাথে জড়িত হয়ে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই শিল্পের কাজ করেন। গবেষকদের মতে এই বারো বছরকালের মধ্যে কবি নজরুল ১৩টি ছায়াচিত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। এক নজরে ছায়াচিত্রগুলো ঃ

১. ধ্রুব - ছায়াছবি ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারিতে কলিকাতা ক্রাউন টকি হাউস-এ মুক্তিলাভ করে।
২. পাতালপুরী- ছায়াছবি ১৯৩৫ সালের ২৩ মার্চ কলিকাতা রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।
৩. গ্রহের ফের- ছায়াচিত্র ১৯৩৭ সালের ৪ ডিসেম্বর কলিকাতা রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।

৪। তথ্য সূত্র ঃ অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, পৃঃ ২২, ২৩, ২৪।

কবি-সৈনিক নজরুলের আরো একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

৪. বিদ্যাপতি (বাংলা)- ছায়াচিত্র ১৯৩৮ সালের ২ এপ্রিল কলিকাতা চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।
৫. বিদ্যাপতি (হিন্দী)- ছায়াচিত্র ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বে ও করাচীতে মুক্তিলাভ করে।
৬. গোরা- ছায়াচিত্র ১৯৩৮ সালের ৩০ জুলাই কলিকাতা চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।
৭. সাপুড়ে- ছায়াচিত্র ১৯৩৯ সালের ২৭ মে কলিকাতা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।
৮. সাপেড়া (হিন্দী) (তথ্যঃ সবারে আমি নমি, পৃ. ৬০। পরে আলোচিত।)
৯. নন্দিনী- ছায়াচিত্র ১৯৪১ সালের ৮ নভেম্বর কলিকাতা রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।
১০. চৌরঙ্গী (হিন্দী)- ছায়াচিত্র ১৯৪২ সালের ৪ জুলাই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করে।
১১. চৌরঙ্গী (বাংলা- ছায়াচিত্র ১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলিকাতা রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।
১২. দিকশূল- ছায়াচিত্র ১৯৪৩ সালের ১৪ আগস্ট কলিকাতায় একযোগে মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহগুলোতে মুক্তিলাভ করে।
১৩. অভিনয় নয়- ছায়াচিত্র ১৯৪৫ সালের ২ মার্চ কলিকাতা রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে।

বিভিন্ন প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, কবি নজরুল আরো কিছু ছায়াছবির সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন ঃ

১. ধ্রুব ঃ পায়োনীয়ার ফিল্ম দ্বারা পরিবেশিত। কাহিনী রচনা করেন নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষ। কবি নজরুল এ ছায়াচিত্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ছায়াচিত্রের গীত রচনা, সুর সংযোজন, সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন, ছায়াচিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় এবং নারদের কণ্ঠে চারটি গানে অংশগ্রহণ করেন। কবি

একক কণ্ঠে তিনটি গান এবং দ্বৈত কণ্ঠে মাস্টার প্রবোধের সাথে একটি গান করেন। শিল্পী আঙ্গুরবালা একক কণ্ঠে চারটি এবং মাস্টার প্রবোধের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে একটি গান করেন। মাস্টার প্রবোধ একক কণ্ঠে ছয়টি গান করে। শিল্পী পারুল বালা একক কণ্ঠে দু'টি গান করেন। এই মোট সতেরোটি গান কবি নজরুল দ্বারা রচিত এবং সুরোরোপিত। এই ছায়াচিত্রে মোট গানের সংখ্যা আঠারোটি। বাকী গানটি রচনা করেন নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষ। সুরারোপ কবি নজরুলের। কবি নজরুল পায়োনীয়ার ফিল্ম কোম্পানিতে ১৯৩১ সালে যোগদান করেন। ফিল্ম কোম্পানির গীত রচনা, সুর সংযোজন ইত্যাদি করার পাশাপাশি তিনি দশটি গ্রামোফোন কোম্পানিতে গীত রচনা, সুর সংযোজন ও প্রশিক্ষণের দায়-দায়িত্ব ও পালন করতেন।[৫]

কবি নজরুলের চলচ্চিত্র ও গান যেমন তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌছে দেন, ঠিক তেমনি এক শ্রেণীর কট্টর মুসলমান কর্তৃক চরম নিন্দিত হতে থাকেন। তাদের মতে, ইসলামে সঙ্গীত হারাম না হলেও বাংলার মুসলমানেরা গান-বাজনাকে হারাম মনে করতেন। এই সম্পর্কে সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ

ইসলামে সঙ্গীত হারাম না হলেও বাংলার মুসলমান গান-বাজনা হারাম মনে করতো। নজরুলের ইসলামী গান তাদের সেই ভুল ধারণা দূর করে দেয়।

সুরসম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদ লিখেছেন ঃ

"হিলি স্টেশনের কাছে জয়পুরহাটের স্কুলের ছেলেরা একবার আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর বসল তাদের গানের আসর, কিন্তু একটি ছেলে বললো, দেখুন এখানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলে একটা মস্তবড় গন্ডগোল হবে কারণ এখানে লামজহাবীর সংখ্যাই বেশি। এরা গান-বাজনা খুবই আপত্তিকর মনে করে। প্রথমটায় সত্যি বড় দমে গেলাম। তাছাড়া শিল্পীরা কোনদিনও হুড়হাঙ্গামা সইতে পারে না। শান্ত পরিবেশ না হলে চারধারে স্তব্ধতা বিরাজ না করলে অসুরের শব্দে সুর পালিয়ে যায়। আমি স্টেজে ঢুকলাম, সভার সবারি উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি নাকি যন্ত্রসহকারে এখানে গান গাইবেন, কিছুতেই তা হবে না। আমি বললাম কে বলেছে গান গাইব? আমি গান গাইব না, কয়েকটা কথা বলবো মাত্র। আচ্ছা, তেরশ বছর আগে আরব দেশে যেদিন আমাদের প্রিয় নবী এই দুনিয়ায় নাজেল হলেন তখন সারা প্রকৃতির অবস্থা কি হয়েছিল, তিনি এসে আমাদের জন্য কি বাণী প্রচার করলেন, শুনুন, এই বলে সুরে সুরে গাইলাম-

"তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে।"

'শুনতে চান এই জিনিস'? সব্বাই একসাথে চেঁচিয়ে উঠল, জি, জি, বলুন। আমি ইশারা করলাম- সবাই বসুন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সভায় সবাই বসলো এবং চারদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। এরপর গাইলাম, 'সৈয়দে মক্কী মদনী'। তারপরই বিদায় নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা তাহলে আজ আসি'। সভায় উঠল হট্টগোল, 'না না আমরা শুনতে চাই, আরো বলুন, আরো গান'। আমি বললাম 'যদি শুনতেই চান' পাশে ইশারা করে বললাম, 'এই

৫। আসাদুল হক, দৈনিক মিল্লাত ২৫/১১/৯৩।

হারমোনিয়ামটা দাও'। হারমোনিয়াম বাজিয়েই ধরলাম 'বাজিছে দামামা বাঁধবে আমামা'। এরপর আরও করলাম বক্তৃতা। 'আচ্ছা, মাংস রান্না করতে গিয়ে কি কি মশলা লাগে? কেউ বলবেন পেঁয়াজ, কেউ বলবেন রসুন, আমি বলি কি- আসল জিনিসই তো বাদ দিচ্ছেন। সব মশলাই দিলেন কিন্তু লবণ তো দিলেন না'? ইশারা করলাম 'স্টেজের ভিতরে নিয়ে এসো' এলো তবলা নিয়ে তবলচি। গান ধরলাম, 'আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়'। এরপর গাইলাম

'জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান'।

এরপর গান থামিয়ে বললাম, মুসলমান সমাজের গলদ কোথায়, অশিক্ষা কুশিক্ষায় এমনিতেই সব ক্লীব হয়ে আছে- তার উপর জগদ্দল পাথরের মত এই সমাজের বুকে বসে আছে কাঠমোল্লার দল। এই পাথর সরিয়ে বেরিয়ে এস তরুণ পথিক, হাঁক দাও নতুন সুরে নয়া জামানার নব-নকীবী, ঘুচিয়ে দাও, সরিয়ে দাও এই জঞ্জাল, জ্বালো জ্ঞানের মশাল!![৬]

সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দীন আহমদ আর একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঃ

"এ কে ফজলুল হকের সাথে একদিন হল পরিচয়। এক সভায় তিনি আমার গান শুনে কাছে ডাকলেন। তখন তিনি বেনেপুকুর লেনে এক বাসায় থাকতেন। গোলটেবিল বৈঠকে যাবার আগের দিন তিনি আমাকে দাওয়াত করলেন মিলাদে। মিলাদ হয়ে গেলে তিনি একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এলেন ঘরে। আট-দশজন মাথায় পাগড়ী বাঁধা মওলানা দাঁড়িয়ে উঠল। ফজলুল হক সাহেব বলে উঠলেন, আপনাদের যাদের আপত্তি থাকে যেতে পারেন, এবার হারমোনিয়াম দিয়ে আব্বাসের মিলাদ পড়া শুনব। কথার ভেতরে নতুনত্ব আছে বৈকি! বাংলাদেশের মোল্লা সমাজের মুখের ওপর এত বড় কথা কেউ কখনো শুনেছেন কি? মোল্লারা একথা শুনে সত্যিই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমাকে গাইতে বললেন, তিনি। আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরলাম 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে'। ফজলুল হক সাহেবের দু'চোখ বেয়ে বইছে অশ্রুর নহর। মোল্লারা দরজার গোড়ায় থ' খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে সবাই আসন গ্রহণ করল। আমি আর একটা গান ধরালাম-

'জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান'।

মোল্লাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হক সাহেব বোঝালেন এ গান কি হারাম? আগেই চলে যাচ্ছিলেন তো, এখন কেমন লাগছে?

হক সাহেব ফিরে এলেন গোলটেবিল বৈঠক থেকে। ময়মনসিংহে বিরাট কৃষক-প্রজা কনফারেন্স। এ কে ফজলুল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, কে জি এম ফারুকী, নলিনী সরকার- বড় বড় নেতার সমাবেশ। বিরাট প্যান্ডেল, প্রায় ষাট হাজার লোকের সমাবেশ। এত বড় সভায় গাইবার সুযোগ জীবনে সিরাজগঞ্জের পরে এই-ই। বুকে এক অদম্য সাহস এল। গান ধরলাম-

"বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙ্গা কেল্লায় ওড়ে নিশান॥"[৭]

মুসলমান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো। নিশানও উড়িয়েছিলো। শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুদেরও মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলো নজরুলের কবিতা। পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্যিকদের প্রবাদ পুরুষ শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন ঃ

৬। আব্বাসউদ্দীন আহমদ ঃ আমার শিল্পী জীবনের কথা ঃ প্রতিপক্ষ প্রকাশনা ঃ শ্যামলী, ঢাকা, পৃঃ ৬৪-৬৫।
৭। আব্বাস উদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পী জীবনের কথা, পৃঃ ৬৭।

"মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানুষ হিন্দু থাকতে 'দাস্যমুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড়কর' ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে 'উন্নত মম শিরদ' বলে গান গেয়ে উঠেছে। যে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে 'নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির'। হিন্দু সমাজে যে ক'জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তারাই কেবল ও কথা বলতে পারেন। জনসাধারণকে ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে দিতে সমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রমাণ করতে করতে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।"[৮]

কবি নজরুল শুধু বিদ্রোহী এবং কবিই ছিলেন না। তিনি একাধারে গল্পকার, নাট্যকার, উপন্যাসিক, অনুবাদক, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক এবং সাংবাদিকও বটে। তিনি সাংবাদিকতায় যে রূপ দক্ষতার দৃষ্টান্ত এবং সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাও ছিলো সে যুগে বিস্ময়কর।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় এ কে ফজলুল হক ৬নং টার্নার স্ট্রীট থেকে 'নবযুগ' নামে একখানা সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশ করেন। মুজফ্ফর আহম্মদ ও নজরুল ইসলাম 'নবযুগে'র যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ফজলুল হকের আশংকা ছিলো যে, সম্পাদকদ্বয় মুসলমানের ছেলে বলে হয়তো ভালো বাংলা লিখতে পারবে না। তাই তিনি প্রথম অবস্থায় কিছুদিন তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়কে কিছু টাকা দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়ে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর কোন নিজস্ব মতামত থাকার মত অবিচল ব্যক্তিত্ব ছিলো না। টাকার বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে যা খুশি লিখিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হতো। তাই সম্পাদকদ্বয় পাঁচকড়ি বাবুকে দিয়ে সম্পাদকীয় লেখানোর ব্যাপারে কিছুতেই রাজী হননি। 'নবযুগ' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাগজটি অভাবিত রকমের জনপ্রিয় হয়ে উঠে। যা আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি।

'নবযুগ'-এ প্রকাশিত লেখায় উৎকর্ষ সম্পর্কে হক সাহেব তাঁর অনেক হিন্দু বন্ধুদের কাছ থেকেও অভিনন্দন পান। কলকাতা হাইকোর্টের একজন জজ পর্যন্ত হক সাহেবের কাছে তাঁর কাগজের প্রশংসা করেন। এই পত্রিকাটি পাঠক মহলে এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো যে, চাহিদা অনুযায়ী পত্রিকা সরবরাহ করা সম্ভব ছিলো না। কারণ হক সাহেবের মুদ্রণ মেশিনটি খুব ভালো ছিলো না।

সংবাদপত্রে অদ্ভূত হেডিং-এর অভিনবত্বে পাঠক মহলে নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা তৎকালে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। এখানে কিছু হেডিং-এর নমুনা উদ্ধৃত করছি।

১৩২৯ সালের ২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২) তারিখের 'ধূমকেতু' পত্রে দেশের খবর অংশের কয়েকটি শিরোনাম বা হেডিং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের হেডিং ছিলো, 'মর্তের মতিলাল স্বর্গে'। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্তর্ভূক্ত কয়েক ব্যক্তির গবর্নমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগের চর

৮। অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ প্রবন্ধ সমগ্র ঃ প্রথম খন্ড ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩, কার্তিক ১৩৯১, পৃঃ ১৫৯। দ্রঃ ওবায়দুল হক সরকার, দৈনিক সংগ্রাম, ৫/৫/৯৬।

'লাঙল' পরিচালক নজরুলের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

বলে ধরা পড়ার সংবাদের শিরোনাম, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ঘর শত্রু বিভীষণ', মূলসী সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ নূতন করে আরম্ভ হওয়ার খবরের হেডিং, 'দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ', তেলিনীপাড়া ও মূলতানে মহর্‌রম নিয়ে একটু মারামারি হওয়ার সংবাদের শিরোনাম, 'মহররম নিয়ে দহরম মহরম', গরুকা বাগ সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করার সংবাদের শিরোনাম, 'নখদন্তহীন তদন্ত'। হেনজাদা জেলাতে ১৬১ বছরের রমণীর অটুট যৌবন থাকার সংবাদের শিরোনাম, 'আটকুড়ি বয়সের যুবতী'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ সম্পর্কে সংবাদের শিরোনাম, 'বাউল কবির টহল'। সার্‌ জন কার-এর গভর্নর হওয়ার সংবাদের হেডিং, 'গোবর-নর প্রসবিনী বঙ্গমাতা'।

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের চাকরি থেকে সার আলী ইমাম ইস্তফা দিয়েছেন- এই সংবাদের সমাপ্তিতে কবিতা -

> "যখন পিরীতি ছিল
> তখন বেসেছে ভাল
> আগে শুয়েছি তেঁতুল পত্রে
> কূলায় না আর মানপাতে।"

মুসলিম জাহান স্তম্ভে মোস্তফা কামাল পাশার গ্রীক যুদ্ধের জয়লাভ করার সংবাদের শিরোনাম ছিলো খুবই আকর্ষণীয়। যেমন ঃ

> "সাবাস কামাল মোস্তফা!
> তোরেই দেখছি মোচতোফা।
> খুব কষে ভাই গোস্ত খা!
> বাঁধ্‌ জালিমের হস্ত পা।"

খবরের হেডলাইন এবং টীকাভাষ্য রচনা করতে গিয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথের

'মমচিত্তের নিতি নৃত্য' অবলম্বনে একটি প্যারোডিই রচনা করে ফেলেন। পুরো প্যারোডিটি ছিল এ রকম ঃ

দাড়িতে আগুন লেগে অক্কা
টরে টক্কা টরে টক্কা
এবার টিকিতে লাগবে কখন?
কী আনন্দ কী আনন্দ কী আনন্দ
পুড়ে দাড়ি পুড়ে টিকি ছুটে গন্ধ
কী আনন্দ কী আনন্দ কী আনন্দ।

আরেকটি ছবি ছিল অনেকটা এ রকম- এক ইরানী তরুণী আর একটি ঘড়া। ঘড়াটি তরুণীর কাঁখে ছিল না, ছিল কাঁধে। নজরুল লিখলেন ঃ

"চপল ঘড়া ছলকে বলে টুটল কোমর সই
শিরীণ সখি এখন আমি কপোল পাশে রই।"

লাঙ্গল পত্রিকায় একটি কার্টূন ছিল। এক ভুঁড়িমোটা ধনী ব্যক্তি। সে তার হাতে ধরে আছে এক শীর্ণ শ্রমিককে। এ কার্টুনের জন্য নজরুল লিখেছিলেন ঃ

"পেট পোরা তার রাক্ষুসী ক্ষুধা
ধনীক সে নির্মম
দীনের রক্ত নিঙড়িয়ে করে উদর ভূদর সম।"

ছবির পরিচয় লিখতে গিয়ে নজরুল যে একটি অবিস্মরণীয় কবিতা রচনা করেছিলেন এ কথা আমরা এতক্ষণ বলিনি। অবিস্মরণীয় কবিতাটি হলো 'খেয়াপারের তরণী'। মুসলিম ভারত পত্রিকার জন্য ঢাকার নবাব পরিবারের কোন এক মহিলা একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। ছবিটি ভারি সুন্দর। ভাবটি এই ঃ উত্তাপ-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলধি। তাতে একটি নৌকা তর তর করে এগিয়ে চলেছে। এই নৌকায় আছে চারটি উসমান ও আলী। (এরা চারজন ইসলামের প্রাথমিক যুগের চারজন মহামান্য খলিফা- আর হজরতের 'আসহাব' নামে পরিচিত)। আর হালের মাথায় লেখা আছে, হজরত মুহাম্মদের নাম। পালের মধ্যে লেখা আছে- শাফায়াৎ। সম্পাদকমন্ডলী ছবিটি প্রকাশ করার জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু ছবিটির নিচে কি নাম দেয়া যায়, এ নিয়ে একটা বেশ সমস্যায় পড়েন। এর জল্পনা-কল্পনার সময় কবি নজরুল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছবিটি নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলেন, আর খানিকক্ষণ পর ছবিটিকে উপলক্ষ করে একটি কবিতা লিখে নিয়ে এলেন। এ কবিতাটির নাম 'খেয়াপারের তরণী'। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ।-(খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন)। এ কবিতার অংশ বিশেষ হলো ঃ

"আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হায়দার
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে ডর

কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী-মুখে সারিগান-লা-শরিক আল্লাহ। ”

এ লাইনগুলো পড়েই সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন ঃ “যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ।” বিশেষ করে বাংলা কবিতায় লা-শরিক আল্লাহ্-“এ আরবী বাক্যের যোজনা” তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

সাদা ইংরেজদের সঙ্গে কালো ভারতীয়দের অস্বাভাবিক মেলামেশা এবং ডিনারের খবরকে কেন্দ্র করে নজরুল লিখেছিলেন এ প্যারোডিটি ঃ

“কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো এমন ডিনার খাওয়া।”

নজরুল সম্পাদনা, পরিচালনা, লেখালেখি এবং সাংবাদিক হিসাবে চাকরি সূত্রে জড়িত ছিলেন তার সমকালের অনেক পত্রিকার সঙ্গে। পত্রিকাগুলো হচ্ছে ধূমকেতু, লাঙ্গল, গণবাণী, নবযুগ, সওগাত, মুসলিম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান, সাহিত্য পত্রিকা, সেবক, মোহাম্মদী ইত্যাদি। নজরুল সম্পাদিত এবং পরিচালিত পত্রিকাসমূহ সমকালে প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বের আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছিল। নজরুলের নিউজ সেন্স-এর প্রশংসা করেছেন কমরেড মুজাফফর আহমদসহ আরও অনেকে। তিনি লিখেছেন ঃ

“নিশ্চিয়ই নজরুলের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করে।... নজরুল ইসলাম কোনদিন কোন দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকেনি। তবুও সে বড় বড়

“দাদা মেখে দেয় দাড়িতে খেজাব
মিঞা টিকি মূলে তৈল
চারি চোখে হয়ে আড় চোখাচোখি
কি মধুর মিলন হইলো।”

ছবি ঃ কাজী আবুল কাশেম। ক্যাপশন ঃ কাজী নজরুল

সংবাদগুলো পড়ে সেগুলোকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলের বড় বড় সংবাদ সংক্ষেপ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। তার পরে নজরুলের দেয়া হেডিংয়ের জন্যে 'নবযুগ' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল"।[৯]

কবি নজরুল হাস্যরসের কবিতা-গানেও ছিলেন সমান পারদর্শী। শৈশব কালেই কবি নজরুলের লেখায় হাস্য রসের কবিতা-গানের সন্ধান পাওয়া যায়।

'খোদার বুদ্ধি' কবিতার নজরুল লিখেছেন ঃ

সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান,
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত পালোয়ান!!

'চিঠি' কবিতাটিতে ভাই লিখেছেন ছোট বোনকে পত্র, গদ্যে নহে ছন্দ মিলিয়ে পদ্যে। জোর করে বলা যায়, যে কোন বোন এই রকম মজার চিঠি পেলে খুশীতে বাড়ি করে তুলবে তোলপাড়!

"দিইনি চিঠি আগে,
তাইতো কি বোন রাগে?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝ্‌তেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখতেছি এই পদ্য।"

চিঠির শেষে বলা হয়েছে ঃ

মা মাসীমা'য় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম,
স্নেহাশিস্ এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা ল'স্ তা!
সাঙ্গ পদ্য সবিটা,
ইতি। তোদের কবি-দা"

'নামতা পাঠ' কবিতাটিতে রয়েছে ঃ

'আমি যদি বাবা হতুম, বাবা হতো খোকা
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।'

জেহাদী চেতনা থেকে নিষ্ক্রিয় এবং হীন বল দেখে তৎকালীন বাঙালী মুসলমানদের কটাক্ষ করে বিদ্রুপাত্মক হাসির কবিতা লিখেছিলেন ঃ

আরে বাপ-দাদা ক'বে গিয়েছে লড়াই
আমরা খামকা লড়ি

৯। মুজফ্‌ফর আহমদ, কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা, শারদীয়, আশ্বিন ১৯৮০, পৃঃ ৩১৪।

দেহে ইসলামী জোশ আনাগোনা করে
'ছহি জঙ্গনামা' যাব পড়ি॥
কোরাস! মাশা-আল্লা। ইনশা-আল্লা।

নজরুলের হাসির গানে ইংরেজদের প্রতিও বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য প্রকাশ পেতো। জেলের ভেতরে প্রথম গেয়েই না-কি কবি এই বিদ্রুপাত্মক হাসির গানটি রচনা করেন। যেমন ঃ

কোরাস ঃ দে গরুর গা ধুইয়ে ॥
উল্টো গেল বিধির বিধি
আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে,
মন্দ করেন চড়ুই-ভাতি।

আর একটা গান নজরুল সওগাত মজলিসে প্রায়ই গাইতেন। এটা দেশবাসীর ভীরুতাকে লক্ষ্য করে লেখা ঃ

থাকিতে চরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

নজরুল নিজে ছিলেন এক নম্বর চা-পায়ী। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা না হলে তাঁর চলতো না। চা-এর গান লিখতে গিয়ে তিনি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন ঃ

চায়ের পেয়াসী পিপাসিত চিত
আমরা চাতক দল,
দেবতারা ক'ন সোমরস যারে
সে এই গরম জল।
লাখ কাপ চা খাইয়া চালাক হয়,
সে প্রমাণ চাও কয় লাখ?
মাতালের দাদা আমরা চাতাল
বাচাল বলিস বল!
চা চেয়ে চেয়ে কাকা নাম ভুলি
পশ্চিমে চাচা কয়,
এমন চায়ে যে মারিতে চাহে সে
চামার সুনিশ্চয়!

'শ্যালক' নিয়ে নজরুল এক মধুর কমিক গান রচনা করেন। এতেও বিস্তর হাসির

খোরাক রয়েছে।

শালারে কোথায় পাই?
আটশালাতে মোর শালা নাই
বসেছে পাঠশালা।
গো-শালাতে গরু বাঁধা
আমার শালা নাই॥
খুঁজতে গেলুম শহরে
দেখি শালার ছড়াছড়ি।
পান শালাতে করে যায়
মাতাল গড়াগড়ি॥
ধর্ম শালা অতিথি শালা
শালার অন্ত নাই॥
হাতী শালা ঘোড়া শালা
রাজার ডাইনে বাঁয়ে
হঠাৎ দেখি যাচ্ছে বাবু
দো-শালা গায়ে
দোশালা তো চাইনে বাবা
এক শালাকে চাই॥
ঢেঁকি শালায় ঢেঁকি শুয়ে
পাকশালাতে ছাই!
হায় শালায় কোথায় পাই!

নজরুল সেদিনকার হিন্দু মুসলমান প্যাক্টকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এটাকে ক্ষণভংগুর বলে বিদ্রুপ করেন ঃ

কোরাসঃ বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব-প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হতে বাঁশ নাই॥
আঁটসাঁট ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা হ'ল টিকি আর দাড়ীতে,
"বজ্র আটুনি ফসকা গেরো"? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!
একজন যেতে চাহিবে সম্মুখে, অন্যে টানে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে।
বুকে বুকে মিল হ'ল না কো, মিল হ'ল পিঠে পিঠে? তাই সই।
মিঞা ক'ন, "কোথা দাদা মোর?" আর বাবু ক'ন "মিঞা ভাই কই"?
বাবু দেন মেখে দাঁড়িতে 'খের্জাব', মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়া-চোখাচোখী, কি মধুর মিলন হইল!

বাবু ক'ন, "খাই তোমারে তুষিতে ঐ নিষিদ্ধ কুক্ড়ো!"
মিঞা ক'ন, মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুক্রো!
মোদের মুর্গী হ'ল রামপাখী দাদা, তাও হ'ল শুদ্ধি?
বাদশাহী গেছে, মুর্গীও গেল, আর কার লোভে যুদ্ধি॥
বাবু ক'ন, "পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে!
মিঞা ক'ন, "রাখি ফেজে চৈতনী ঝাণ্ডা সেই সে খুশীতে!"
বাবু ক'ন "এত ছাড়িলেই যদি, ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা!"
মিঞা ক'ন, "দাদা, মুর্গী ত নাই, কি দিয়া খাইব পরটা!"
বাবু ক'ন, "গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
তোরে সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মা'র মন্দিরে নিয়া যাই!
মিঞা ক'ন, "যদি আল্লাহ মিঞার ঘরে নাহি লও হরিনাম
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে, যা হয় হবে সে পরিণাম!"

কবির বিদ্রুপ সত্যে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট ভেঙে গেল। কবি তাঁর ব্যঙ্গরস জমিনে ছিলেন এই বলে ঃ

"সারা-রারা-রারা" সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা!
শুম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছক মিঞা নিল ছোররা!
লাগিল হেঁচকা, হেঁইয়ো হাঁইয়ো, টিকি দাঁড়ি ওড়ে শূন্যে
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব-প্যাক্টেরি পুণ্যে।
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা, করুণ চন্দ্রবিন্দু!

আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য চর্চার দিকে দৃষ্টি ফিরাই তাহলে দেখতে পাব তিনি প্রায়ই বার বার কাটাকাটি, ঘষামাজা করে তাঁর লেখাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ শোনা যায় না। তিনি যা লিখতেন একেবারেই লিখতেন। এছাড়া উপস্থিত ফরমায়েশ মতো হঠাৎ করে কবিতা, গান লিখে ফেলতেন। কবি নজরুলের অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে সওগাত সম্পাদত মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি "বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "তিনি উপন্যাস বা কবিতা একবারেই লিখে যেতেন, দু'বার কপি করতেন না।" এ ছাড়া জনাব নাসিরুদ্দীন স্মৃতিচারণে আরো লিখেছেন ঃ

"নজরুল যখন 'বার্ষিক সওগাত' ও 'খালেদ' কবিতা লেখেন, তখন তিনি কৃষ্ণনগরে দারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তদুপরি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিলেন। এরূপ আর্থিক ও শারিরীক কষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি কিরূপে এত সুন্দর কবিতা এত তাড়াতাড়িতে লিখলেন তা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। 'বার্ষিক সওগাতের' জন্য উদ্বোধনী

কবিতা ছাড়াও কোনো মুসলিম বীর বা মহৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা কবিতা দেবার জন্য নজরুলকে পূর্বেই আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম। নজরুলের একান্ত ভক্ত খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে কৃষ্ণনগরে পাঠালাম নজরুলের কাছ থেকে কবিতা আনবার জন্য। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, সব দিক দিয়ে নজরুলের অবস্থা শোচনীয়। বার্ষিকীর জন্য কবিতা আনা সম্পর্কে খান মঈনুদ্দীন তাঁর নজরুল জীবনীতে লিখেছেন ঃ

"আবার একদিন গিয়ে হাজির হলাম কৃষ্ণনগরে। কবির কামরায় প্রবেশ করলাম। এ-কি চেহারা হয়েছে তাঁর? কিছুদিন থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে কবির চেহারা হয়ে গেছে ফ্যাকাসে। একখানা বেতের চেয়ারে অবশ-অলস দেহ এলিয়ে চুপ বসে আছেন কবি। এ অবস্থায় লেখার কথা কি করে তাঁরে বলি? অথচ ঐ দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে কোলকাতায় না ফিরলে নানা অসুবিধা। লেখার জন্যও আর দেরি করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ কবির বাড়ীতে পা দিয়েই তাঁর আর্থিক অবস্থা আঁচ করেছি। এমন অবস্থায় ওখানে এক বেলার বেশী আমার থাকাও চলে না।

কৃষ্ণনগরে আগমনের কারণ তাঁকে জানালাম। খানিক্ষণ তিনি কি ভাবলেন। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। এক লাইন দু'লাইন করে লেখা তাঁর এগিয়ে চললো। দশ বারো লাইনের পর কলম আর এগোয় না। দেখছি কবি কাঁপছেন। থর থর কাঁপুনি। ভীষণভাবে জ্বর এলো তাঁর।

কবিকে চেপে ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ তিনি লেপের ভেতর থেকে মুখ বার করলেন। বল্লেনঃ ঐ কাগজ আর কলমটা নিয়ে আয়।

বিস্মিত হয়ে বললাম ঃ কি হবে কাগজ-কলম দিয়ে? কবি বল্লেন ঃ লেখাটা এখন ভাল উৎরাবে।

অগত্যা কাগজ-কলম এনে দিলাম। কলম তিনি ধরতে পারছেন না, হাত কাঁপছে তাঁর। এভাবে জন্ম নিলো কবির বিখ্যাত কবিতা 'খালেদ'। কবিতা শেষ করে কবি যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর লেপের তলায় চুপ করে রইলেন।

কি পরিস্থিতির ভেতর কি সুন্দর কবিতার জন্ম হলো! 'বার্ষিক সওগাতে' যখন লেখাটা ছাপা হলো, সারা বাংলাদেশে তখন অপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কবির বিখ্যাত দু'টি কবিতা 'বার্ষিক সওগাতে' ছাপা হলো। তার উপর সোনায় সোহাগা ছবিতে ছবিতে 'বার্ষিক সওগাতে' ভরে দেওয়া হয়েছিল। 'বার্ষিক সওগাত' যেদিন বার হলো, সেদিন দেশের প্রত্যেকটি নর-নারী আনন্দিত হয়েছিল।" এখানে নজরুলের 'খালেদ' কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"খালেদ! খালেদ! ফজর হলো যে, আজান দিতেছে কৌম্,
ঐ শোন শোন- 'আস্সালাতু খায়র্‌ম মিনান্নৌম।"...

এই অস্বাভাবিক মুহূর্তে এরূপ বিস্ময়কর কবিতা রচনা একমাত্র অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব। মুসলমানদের তৎকালীন অধঃপতনের বাস্তব চিত্র

কবিতাটিতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি নজরুল। মুসলমানদের অধঃপতনে কবির বুকে যে ব্যথা লুকায়িত ছিল কবিতার ছত্রে ছত্রে তা প্রকাশ পেয়েছে।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন- "নজরুল ইসলাম যে কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ করে কবিতা, গান বা গল্প লিখে ফেলতেন। 'বার্ষিক সওগাতের' জন্য আমি ভাল একটি ছবি সংগ্রহ করেছি। ছবিটি ইরানী তরুণীর। সে একটি ঘড়া কাঁধের উপর রেখে চলেছে। নজরুল ছবিখানা আমার হাত থেকে নিয়ে বল্লেন ঃ অপূর্ণ ছবি! কোথায় পেলেন? ছবির নীচে কি ছাপা হবে লিখে দিচ্ছি। একটুও বিলম্ব না করে তাড়াতাড়িতে কলম চালালেন ঃ

চপল ঘড়া ছল্‌'কে বলে,
টুট্‌ল কোমর সই,
শিরীন সখি, এখন আমি
কপোল- পাশে রই।"

আর একদিনের ঘটনা। সওগাত অফিস থেকে সিঁড়ি দিয়ে নজরুল নীচে নামছিলেন। ওমর খৈয়ামের একটি ছবি হাতে করে গিয়ে আমি তাঁকে ধরলাম। বললামঃ 'অফিসে একটু চলুন, এই ছবিটার নীচে ছাপাবার জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাবেন'।

ছবিটির ভাব ছিল এই- খৈয়ামের প্রিয়তমা নদীর তীরে একটা লতানো গাছের পাশে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। খৈয়াম তার গা ঘেঁসে বসে আছেন।

নজরুল বল্লেন ঃ আর অফিসে বসবো না। এখানে দাঁড়িয়েই ক'টি লাইন লিখে দিচ্ছি। তিনি সাঁড়ির হাতলের উপর কাগজ রেখে দ্রুত লিখে ফেললেন ঃ

"চোখ-জুড়ানো গুল্ম-লতার চিকন পাতা পদ্মসম
ফেল্‌ছে ছায়া নদীর ঠোঁটে এলিয়ে তনু যথায় তুমি,-
আস্তে ক'রে হেলান দিয়ো লতার গায়ে প্রিয়তমা
উঠ্‌ছে লতা মাটির তলের কোন্ তরুণীর অধর চুমি!

কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি লম্বা দাড়ি রাখতেন। কোনো কারণে তিনি একবার দাঁড়ি চেঁছে ফেলেছেন। কাজী সাহেবের দাড়ি চাঁছার ব্যাপার নিয়ে নজরুল হঠাৎ করে এক হাসির কবিতা লিখে ফেললেন, নাম দিলেন 'দাড়ি বিলাপ'। কবিতাটি 'সাপ্তাহিক সওগাতে' বের হয়েছিল। এ কবিতার কয়েকটি ছত্র ঃ

হে আমার দাড়ি!
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি'
আমারে কাঙাল করি' শূন্য করি' বুক!
শূন্য এ চোয়াল আজি এ চিবুক!
তোমার বিরহে বন্ধু তোমার প্রেয়সী

ঝুরিছে শ্যামলী গুম্ফ, ওষ্ঠফুলে বসি।'....

কপোল কপাল বুঝি করে হাহাকার-

'রে কপটী, রে সেফ্‌টি (Safety)

গিলেট রেজার!" ইত্যাদি

সুর শিল্পী আব্বাস উদ্দীন তাঁর লিখিত 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'য় হঠাৎ করে নজরুলের লেখার একটি চিত্র দিয়েছেন ঃ

"এক ঠোংগা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তিনি (নজরুল) দরজা বন্ধ করে আধ ঘন্টার মধ্যেই লিখে ফেললেন- 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। তখনি সুর সংযোগ করে আমায় শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক একই সময়ে আসতে বল্লেন। পরের দিন লিখলেন- 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'। গান দু'খানা লেখার ঠিক চার দিন পরেই রেকর্ড করা হ'ল। এ হ'ল আমার প্রথম ইসলামী রেকর্ড।"

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন আরেকটি আরেকটি ঘটনার অবতারণা করে লিখেছেন ঃ নজরুল একটি বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ একজন অদ্ভূত এক প্রশ্ন তুলেন ঃ আচ্ছা, আপনারা আপনাদের প্রিয়াকে তুষ্ট করবার জন্য কে কি চান?

একজন বল্লেন ঃ আমি 'এয়ার'-এর টিকেট কেটে তখনই প্রিয়াকে নিয়ে স্বপ্নের দেশ ভূ-স্বর্গ সুইজারল্যান্ড!

আর একজন কপালে করাঘাত করে বল্লেন ঃ হায়, আমার যদি এক লাখ টাকা থাকতো তা'হলে এখনই প্রিয়াকে নিয়ে উঠতাম এম.বি সরকারের স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে।

কবি নিস্তব্ধ হয়ে ওদের কথা শুনলেন। তারপর এক টুকনো কাগজ নিয়ে তাড়াতাড়ি লিখে ফেললেন ঃ

"মোর প্রিয়া হবে এস রাণী

দেব খোঁপায় তারার ফুল

কর্ণে দোলাবো তৃতীয়া তিথির

চৈতী চাঁদের দুল।

কণ্ঠে তোমার পরাবো বালিকা

হংস সারির দোলাবো মালিকা

বিজলী জরির ফিতায় বাঁধিব

মেঘরঙা এল চুল।

জ্যোস্নার সাথে চন্দন দিয়ে

মাখাব তোমার গায়

রাম ধনু হ'তে রঙ আনি

আলতা রাঙাবো পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিবগো প্রিয়া
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার
কবিতার বুলবুল।"

কবি তাঁর প্রিয়াকে সাজালেন। তিনি তাঁর কল্পনার দূতকে ছুটিয়ে ছিলেন সীমা থেকে অসীমে। তৃতীয়ার চাঁদকে তিনি আকাশ থেকে ছিনিয়ে এনে প্রিয়ার কানের দুল করবেন, রামধনু থেকে লাল রং এনে আল্‌তা মাখাবেন প্রিয়ার পায়! আশ্চর্যের বিষয়, গানটি তিনি সেখানে বসেই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন এবং পড়ে সকলকে শোনালেন প্রিয়াকে তুষ্ট করার জন্য কি অদ্ভুত তাঁর কল্পনা! গান থেকে কবি বললেন- "কেমন বিনে পয়সায় প্রিয়াকে সাজালাম।"

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর 'যুগ স্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে স্মৃতিচারণে লিখেছেন-

"কোলকাতার মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের বাসা। দোতলার পশ্চিম দিকের কামরায় বসে দাবা খেলা চলছে। পাড়ার কতিপয় ভদ্রলোক এসে বসেছেন। ভীষণ আড্ডা চলছে। এমন সময় আমাদের বন্ধু বিখ্যাত বংশীবাদক জনাব তকরীম উদ্দীন আহমদ সাহেব এলেন। আমার কানে কানে বল্লেন ঃ "ভাই একটা গান আমার দরকার। এখনি লিখে দিতে হবে। এর শেষ শব্দ হবে 'বল, বল।' সুর আমার প্রায় ঠিক করাই আছে এখন গান হলেই হয়।"

বললাম ঃ 'তাহলে কবিকে বলি?'

তিনি বল্লেন ঃ 'তাঁর কাছে বহু উৎপাত করেছি, আর তাঁকে বলতে সাহস হয় না। আপনি যদি শেষে 'বল বল' দিয়ে একটা গান লিখে দেন, বড় ভালো হয়।'

এর আগে আমার গানের রেকর্ড হয়েছে, তাই তিনি এ কথা আমাকে বলতে উৎসাহ বোধ করলেন।

বললাম ঃ 'আমার লেখা কি আর কবির মতো হবে। আপনার পক্ষ থেকে কবিকে আমি অনুরোধ করবো, এতে অসুবিধার কি আছে?'

তিনি হাত চেপে ধরলেন, বল্লেন ঃ

কবি নজরুল ইসলামের হিন্দি ও উর্দু হাতের লেখা

'না, আপনি-ই চেষ্টা করেন।'

কবিকে দেখাবার জন্য আমি আমার গানের খাতা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতেই আমি একটা গান ফরমায়েশ মতো লিখতে শুরু করলাম।

খানিকক্ষণ পরে দেখি কবি আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। বল্লেন ঃ 'কি করছিস্ রে?'

বললাম ঃ 'এই দেখেন না, তকরীম উদ্দীন সাহেবের নির্দেশ- এখনি একটা গান লিখে দিতে হবে। যার শেষ শব্দ হবে- বল, বল। আপনার কথা বলেছিলাম। কিন্তু উনি লজ্জায় আপনাকে বলতে পারছেন না।'

কবি বল্লেন ঃ 'দেখি কি লিখেছিস্ তুই।'

অতি সংকোচে তাঁর হাতে খাতাখানা তুলে দিলাম। ঈশারায় তিনি আমার হাত থেকে কলমটা চেয়ে নিলেন। তারপর তাঁর মুখে ফুটে উঠলো ধ্যানী দরবেশের রূপ। চারপাশে ভীষণ জোরে আড্ডা চলছে, চীৎকার চলছে। তার ভিতরেই কবি ঐ খাতায় লিখে ফেললেন একটি সুন্দর গান ঃ

কোন্ কুসুমে তোমায় আমি
পূজিব নাথ বল বল
তোমার পূজার কুসুম ডালা
সাজায় নিতি বন তল॥

কবি নজরুলের অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'মনে পড়ে' শিরোনামে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন ঃ

"...... সৃষ্টি কর্মটি যে নির্জনতা দাবি করে বলে আমরা চিরকাল শুনে এসেছি, তার তোয়াক্কা রাখেন না নজরুল। ঘর-ভর্তি লোকের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করে না মুহূর্তের জন্য- বরং অন্যদের চোখে-চোখে তাকিয়ে হাসির উত্তরে হাসি ফুটিয়ে, তিনি যেন নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করেন। সামনে হার্মোনিয়াম, পাশে পানের কৌটো, হার্মোনিয়ামের ঢাকনার উপরে খোলা থাকে তাঁর খাতা আর ফাউন্টেনপেন- তিনি বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠলেন একটি লাইন, তাঁর বড়ো বড়ো সুগোল অক্ষরে লিখে রাখলেন খাতায়, আবার কিছুক্ষণ বাজনা শুধু- দ্বিতীয় লাইন- তৃতীয়- চতুর্থ; দর্শকদের নীরব অথবা সরব প্রশংসায় চর্চিত হয়ে ফিরে-ফিরে গাইলেন সেই সদ্য রচিত
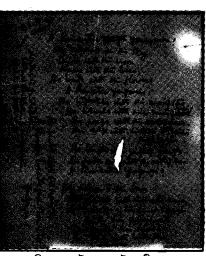
কবি নজরুল ইসলামের ইংরেজী হাতের লেখা
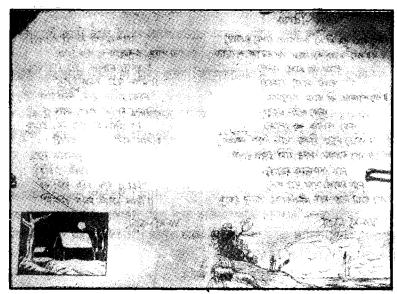
পাণ্ডুলিপিতে নজরুলের আঁকা ছবি

স্তবকটি; এমনি ক'রে হয়তো আধ ঘন্টার মধ্যে, "নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান-পিয়া" গানটি রচনা করতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম- দৃশ্যটি আমার দেবভোগ্য বলে মনে হয়েছিলো।"[১০]

নজরুলের সাহিত্য চর্চা বা সাধনা সর্বসাকুল্যে বিশ বছর। মতান্তরে বাইশ/তেইশ বছর। এই ক'বছরে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিস্ময়কর। এই তেইশ বছরে তাঁর কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি, কিশোর কাব্য ২টি, উপন্যাস ৩টি, নাটক ৩টি, কিশোর নাটক ২টি, প্রবন্ধের বই ৫টি, চলচ্চিত্র কাহিনী ২টি, রেকর্ড নাট্য ২টি এবং গান ৩২০১টি। মতান্তরে পাঁচ হাজারেরও অধিক।

নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম 'অজানা নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন- 'তাঁর সমসাময়িকরাই উল্লেখ করেছেন যে, সুস্থাবস্থায়ই গ্রামোফোন অফিসে রাখা তাঁর মোটা মোটা খাতা থেকে গান টুকে অনেকেই নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কেউ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলতেন ঃ 'সাগর থেকে আর ক'ঘটি জল নেবে![১১]

নজরুলের দুই হাজারের অধিক গান ছন্দ সুরের বৈচিত্রে সৃমদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সব গান একই সুরে বাঁধা বৈচিত্রহীন। নজরুল ইসলাম যেমন ইসলামী গান ও গজল রচনা করেছেন ঠিক তেমনি শ্যামা সঙ্গীতও রচনা করেছেন। তিনি এতো প্রচুর সংখ্যক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বোধহন জীবদ্দশায় তা শুনেওনি।

১০। তথ্য সূত্র ঃ নজরুল একাডেমী পত্রিকা, নব পর্যায়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৯৫, পৃঃ ৮১)
১১। শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৪৮৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পয়ষট্টি বছর নির্বিঘ্নে সাহিত্য চর্চা করেছেন। এই দীর্ঘ সাধনায় তিনি বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। কবি নজরুলও যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত অবিরাম নির্বিঘ্নে সাহিত্য চর্চার সুযোগ পেতেন তাহলে বাংলা সাহিত্যে নিরূপণ করা সম্ভব হতো কার স্থান কোথায়। তা সত্ত্বেও মাত্র তেইশ বছরে বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল যে বিশাল অবদান রেখে গেছেন এর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সাহিত্যকর্মের পরিমাপ করা গেলেও কবি নজরুলের সঠিক প্রতিভার পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নজরুলকে যে সম্বর্ধনা দেয়া হয় সে অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন ঃ

"আজ বাঙলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙলাদেশ সম্মোহিত হইয়া আছে। তাই অন্যের প্রতিভা লোকচক্ষে তেমন করিয়া ধরা পড়িতেছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দুইজন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পাইয়াছি। তাহারা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি, প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই; তাই রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি।"

নিরপেক্ষ নজরুল বিশেষজ্ঞদের মতে, 'মহাকবি ইকবাল, মির্জা গালিব, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, মিল্টন, শেলীর একত্র সমাবেশ ঘটেছিল নজরুলের মধ্যে। তিনি মহাকবি ইকবাল হয়ে মুক্তির গান গেয়েছেন, মির্জা গলিব হয়ে গেয়েছেন কল্যাণের গজল। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের নান্দনিকতা, মিল্টনের ছন্দ শৈলী, শেলীর দেশাত্মবোধ একত্রিত হয়েছিল নজরুলের মধ্যে।

আল্লাহতায়ালা মানুষকে যে সব নেয়ামত দিয়েছেন প্রতিভাও একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এই নেয়ামত আল্লাহ কম বেশী সকল সুস্থ মানুষকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু কবি নজরুলকে তিনি কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী করেছেন এর অসংখ্য ঘটনা রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা, গান, গল্প-উপন্যাস রচনা ছাড়াও মাঝে মাঝে ছবিও আঁকতেন। এছাড়া ডাক্তারী বিদ্যাও কিছুটা করায়ত্ত ছিলো। আর অন্যদিকে কবি নজরুল বহুমুখী প্রতিভায় তিনি ছিলেন ভাস্বর। লেখালেখি ছাড়াও তিনি ছিলেন বিপ্লবী রাজনীতিক, খেলোয়াড় এবং বিজ্ঞান-চর্চায়ও পদচারণা ছিলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান বিষয়ে কিছুটা জ্ঞানার্জন করেছিলেন অধ্যয়ন করে। কিন্তু নজরুলের সে সুযোগ হয়নি। অধ্যয়ন না করেই বিজ্ঞান বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ দিলেই তাঁর চিন্তার গভীরতা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

একান্ত ভাবনায় ছাব্বিশ বছরের যুবক কবি নজরুল

পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব সম্পর্কে কবি নজরুল বলেছেন ঃ

ঘোড়ার ভুরু হয় না। (তাই বলে কই তাকে ত বিশ্রী দেখায় না!)

রোমন্থনকারী জন্তু মাত্রেরই ক্ষুর বিভক্ত। (কিন্তু সাহিত্য-রোমন্থনকারী প্রাণীগুলির আদতে ক্ষুরই হয় না! এটা বুঝি ব্যতিক্রম!)

তিমি মৎস্যের দাঁত হয় না। তবে হাড়ের মত এক রকম পাৎলা স্থিতিস্থাপক (যা' রবারের মত টানলেই বাড়ে আবার আপনি সংকুচিত হয়) জিনিস তার ফোকলা মুখের উপর-চোয়ালে সমান্তরাল হয়ে লেগে থাকে। তাই দিয়ে এ মহাপ্রভুর দাঁতের কাজ চলে!

কচ্ছপ বা কাছিমদের আবার দাঁত বিলকুল নদারদ্। (ছেলে বেলায় কিন্তু শুনেছি যে, কাছিমে আর ব্যাং-এ একবার কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না!)

শশক বা খরগোশের চোখ কখনও বন্ধ হয় না, কেননা বেচারীদের চোখের পাতাই নেই! মেম সাহেবদের মুখের বোরকার চেয়েও পাৎলা একরকম চামড়ার পর্দা ঘুমোবার সময় তাদের চোখের উপর ঘনিয়ে আসে। (মানুষের যদি ও রকম হ'ত, তা হ'লে ত লোকে তাকে 'চশম-খোর', শা'-র চোখের পর্দা নেই প্রভৃতি বলত! তা ছাড়া চোখের পাতা না থাকলে প্রথমেই ত আমাদের চোখে ঘা হয়ে ফ্যাচকা-চোখো হয়ে যেতম)।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে হরিণের না কি নাকের ছ্যাদা ছাড়া আরও কতকগুলি ঐ রকম ছ্যাদা আছে। আশ্চর্য বটে!

প্যাচার চোখে কোন গতি বা ভঙ্গি নেই, অর্থাৎ কিনা তাদের ঐ ভাঁটার মত চোখ দুটির তারা নড়েও না চড়েও না। সদ-সর্বদাই ডাইনী মাগীর মত কট্‌মট্‌ করে তাকায়।

ভেড়ার আবার উপর-চোয়ালে দাঁত হয় না। (তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যাঁর ওপর চোয়ালের দাঁত ভেঙ্গে যায় তিনিও ঐ ভ্যাঁ-গোত্রের)।

উট ত একেই একটা বিদঘুটে জানোয়ার, যাকে দূর থেকে আসতে দেখে অনেক সময় একটা সচল দোতলা বাড়ী বলেই মনে হয়। কিন্তু এর চেয়েও ঐ 'কুঁচ-বগলা'র হস্তম সংস্করণ জীবটির একটা বিশেষ গুণ আছে। সে গুণ আবার পেছনকার পদদ্বয়ে। উষ্ট্র-ঠাকুর তাঁর পেছনের শ্রীচরণ দু'টি দিয়ে তার বড় বপুর যে কোন স্থান ছুঁতে পারেন!

একটি হাতীর গর্দানে (স্বন্ধে) মাত্র চল্লিশ হাজার (বাপ্‌স্‌!) মাংসপেশী থাকে! সাধে কি আর এ-জন্তুর হাতী নাম রাখা হয়েছে।

ক্যাঁকড়া এগিয়েও যেমন বেগে হাঁটতে পারে, পিছিয়েও তেমনি হাঁটতে পারে। বাহাদুরী আছে এ মস্তকহীন প্রাণীটির!

আপনারা কোন সর্বদর্শী জানোয়ার দেখেছেন কি? সে হচ্ছে জিরাফ। এই জন্তুপ্রবর চতুর্মুখ না হয়েও আগেও যেমন দেখতে পান, পিছনেও তেমনি দেখতে পান। ভাগ্য আর কাকে বলে!

আর একটি মজার বিষয় হয় তো আপনারা কেউ লক্ষ্যই করেননি। বৃষ্টি হবার আগে বিড়াল জানতে পারে যে বৃষ্টি আসবে, আর সে তখন হাঁচে। অতএব বিড়াল বৃষ্টির দূত বললে কেউ আপত্তি করবেন না বোধ হয়।

উত্তর আমেরিকার ময়দানে একরকম লাল খেঁকশিয়ালী আছে। শুনছি, দুনিয়ার কোন প্রাণীই নাকি তাদের সঙ্গে দৌড় তে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশী খেঁকিও বোধ হয় কম যাবে না। দিব নাকি এই লাল খেঁকির সঙ্গে আমাদের দেশী খেঁকির একদিন 'ঘোড়-দৌড়' লাগিয়ে?

কবি নজরুলের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে নজরুল গবেষক 'তিতাস চৌধুরী'র লেখা থেকে জানা যায় ঃ

নিবন্ধটির শুরু হালকাচালে, রঙ্গ-ব্যাঙ্গের মধ্যে দিয়ে এবং সমাপ্তিও তাই। বলাবাহুল্য, প্রাণীবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় নিয়েই মূলত এই নিবন্ধটি রচিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান' মানে বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিটি সুশৃংখল শাখার নামই বিজ্ঞান। এই সাধারণ অর্থেই বিদ্রোহী কবির বিজ্ঞান চর্চাকে এখানে বিচার করতে হবে। বস্তুত একটু ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বিদ্রোহী কবির এই বিজ্ঞান চর্চার মধ্যেও তাঁর স্বভাবজাত এক ধরনের 'বিদ্রোহ-রস' এর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। এখানেই এই নিবন্ধটির বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য। তবে এই নিবন্ধে কবি কেন তিমি মাছ, কাঁকড়া ও পেঁচাকে পশুদের গোত্র ভাবলেন- এই যা একটু খট্‌কা লাগে?

প্রানবন্ত নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন প্রাণীবিজ্ঞানে কৌতুহলী ও উৎসাহী ছিলেন, তেমনি হস্তরেখা বিজ্ঞানেও তাঁর কৌতুহল ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। বিশেষ করে স্ত্রী প্রমিলা নজরুল অসুস্থ হয়ে যাবার পরই তিনি এদিকে ঝুঁকেন। এ সম্পর্কে আঙ্গুরবালা দেবীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। '... সেই কাজীদা ..... শোক পেয়েছিলেন বৌদি (শ্রদ্ধেয়া প্রমিলা নজরুল ইসলাম) অসুস্থ হওয়ার পর। এই সময় কাজীদা হাত দেখার বই যোগাড় করে তাই নিয়ে মেতে থাকতেন। আমরা এই নিয়ে প্রায় তাকে ঠট্টা করতাম। উনি রাগ করা দূরে থাক, নিজেও সেই ঠাট্টায় যোগ দিতেন। আবার কোনো সময় আমাদের কারো, না কারো হাত টেনে নিয়ে পরীক্ষা করতে বসে যেতেন।'[১২]

অনন্তর মানুষের হাতের ভাষাকে পড়ার জন্য নজরুল ইসলাম দেশ-বিদেশের বিখ্যাত হস্তরেখাবিদদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এবং একটি স্তিতধ্বী বিশ্বাসে উপনীত হন। হয়তো সে বিশ্বাসে কিছুটা ভাঙচুর ছিল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে বিশ্বাস কার্যকরভাবে ফলদায়ক হয়েছে। নজরুলের জীবনে এরূপ উদাহরণ খুব বিরল নয়।

আমি তখন আমার ডান হাতখানা কবির দিকে প্রসারিত করে বললাম- "দেখুন তো আমার হাতখানা, ভালোমন্দ যা বুঝেন, নিঃসংকোচে বলে যান।" তিনি অনেকক্ষণ ধরে একখানা মেগ্নিফাইং গ্লাস (বড় দেখবার কাচ) দিয়ে আমার হাতখানা দেখলেন ও

১২। কাজীদার গানের স্মৃতি ঃ আঙ্গুরবালা দেবী, নজরুল কথা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কোলকাতা, ১. ম. স. ১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, ১৬৯ পৃষ্ঠা)।

বললেন, 'তোমার ওকালতী করা হবে না, তুমি চাকরি করবে, বিচারক হবে, বৃদ্ধ বয়সে তুমি অনেক অসুখে ভোগবে। একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রী বিয়োগের রেখা আছে। তারপর তোমাকে সহস্র বান্ধব মাঝে একাকী জীবন যাপন করতে হবে।' তাঁর গণনার সমস্ত কথাই আমার জীবনে ফলেছে"।[১৩]

প্রাসঙ্গিক কারণেই এখানে একটু বলা দরকার এই জন্য যে, কুমিল্লায় নজরুল চর্চায় সুলতান মাহমুদ মজুমদারের ভূমিকাই সবচেয়ে উজ্জ্বল। কেননা কুমিল্লায় একমাত্র মজুমদার সাহেবই ছিলেন কবি নজরুলের একমাত্র বন্ধু-সুহৃদয়। শুধু কুমিল্লায়ই নয়, কোলকাতার জীবনেও তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব নজরুল গ্রহণ করেছিলেন হাসিমুখে।

প্রমিলার সঙ্গে নজরুলের প্রেমের সূচনাতেও এই সুলতান মাহমুদ মজুমদার (১৯০৫-১৯৮৭) সাহেবের ভূমিকা (দৌত্যগিরি) উজ্জ্বল ছিল। তিনি তখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। মজুমদার সাহেব ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকেরও ছিলেন অকৃত্রিম সখা! তিনি ছিলেন মূলত একজন উঁচুদরের নাট্যশিল্পী। ডক্টর হক মজুমদার সাহেবের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে কবি নজরুলের অনেক মধুময় স্মৃতির কথা স্মরণ করেন। অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি- 'কুমিল্লায় নজরুল চর্চা' প্রসঙ্গে কেউ খুব একটা তাঁর নাম উচ্চারণ করেন না। যত বাজে লেখকরাই আজ 'কুমিল্লায় নজরুল চর্চা'র অগ্রদূত!

মধ্য বয়সে নজরুল

আঙুরবালা দেবীর স্মৃতিচারণ থেকেও কবি নজরুল ইসলামের হস্তরেখা বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। শুধু অবহিত নয়, সাক্ষ্য-প্রামাণে এ চর্চা সম্পর্কে নিশ্চিতও হওয়া যায়। আমাদের সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে একজন তবলা বাজিয়ে ছিলেন, নাম

১৩। ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি/ সুলতান মাহমুদ মজুমদার, নজরুল পরিষদ, ১ম স. কুমিল্লা, জানুয়ারি, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

কৃষ্ণনগরে নজরুল (১৩৩৪)

রাসবিহারী শীল। খুব গুণী লোক। ... একদিন শোনা গেল জ্ঞানেন্দ্রনাথ গোস্বামী মশাই নৌকাযোগে কোথায় যেন গান গাইতে যাবেন, আর তাঁর সঙ্গে তবলা বাজাবার জন্য যাবেন রাসবিহারী শীল।

সেদিন যথারীতি আমরা রিহার্সলরুমে কাজীদার সঙ্গে গান-বাজনা নিয়ে মেতে রয়েছি। রাসবিহারী বাবু আমাদের সঙ্গে তবলা সজাত করছেন। গান-বাজনার ক্ষণিক বিরতিতে রাসবিহারী বাবু তাঁর নিজের ডান হাতটি কাজীদার সামনে মেলে ধরলেন। 'কাজীদা, আমার হাতটা একটু দেখুন না'।

এটা তাঁর জ্ঞানবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার আগের দিনের ঘটনা। কাজীদার মুখে সব সময়ই হাসি লেগে থাকতো। সেই হাসিমুখেই তিনি রাসবিহারী বাবুর হাতটি টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। রাসবিহারীর হাত দেখে কবি গম্ভীর হয়ে উঠলো। কবির গম্ভীরতা দেখে সবাই চুপচাপ। এর অল্পদিন পরই রাসবিহারী মৃত্যুবরণ করেন। রাসবিহারী হাত দেখে কবি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে।

কবি নজরুল 'চাঁদনী রাতে' কবিতায় লিখেছিলেন ঃ

'চির-দূরে থাকা ওগো চির-নাহি আসা।
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।
বাসনার বিপুল আগ্রহে-
জন্ম লাভ লোক লোকান্তরে।'

(অ-নামিকা)

অথবা

'তৃতীয় চাঁদের বাঁশী 'তের কলা' আবছা কালোতে আঁকা,

নীলিম প্রিয়ার নীলা 'গুল রুখ' অব-গুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
সেহেলি 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী-মশারি টানি'।

সাতাশ তারার ফল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
'মঙ্গল' তার মঙ্গল-দ্বীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে বুঝি বধূর নিশাস লাগে।
উল্কা-জ্বালার সন্ধানী-আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী,
'কাল-পুরুষ' সে জাগি' বিনিদ্র করিতেছে পায়চারি।
(চাঁদনী রাতে)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই সব উজ্জ্বল কবিতা স্তবকের উপমা-রূপক ও চিত্রকল্পে বিজ্ঞান-মনস্কতা ধরা না পড়লেও এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের ধারা অস্পষ্ট নয়।[১৪]

কবি নজরুল দাবা খেলায় ছিলেন দারুণ পারদর্শী। এ খেলায় বসলে নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে যেতেন। অনেক দিন আগে কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতিচারণে পড়েছিলাম মফস্বল শহরে একটি অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় এসে কবি তাঁর বাসায় উঠেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেনের এক আত্মীয়ার সাথে মেয়ে না ভাগিনী মনে নেই প্রায় দু'দিন একবসায় দাবা খেলেছেন। এর মধ্যে অবিরত চা পান করেছেন এবং পান চিবিয়েছেন। অনুষ্ঠানে কবির অনুপস্থিতির কারণে আয়োজকরা বিপদে পড়েন এবং ঢাকায় এসে কবিকে দাবা খেলায় রত দেখতে পান। দাবা খেলায় এমনই মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এ ছাড়া সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেবের স্মৃতিচারণেও এ ধরনের ঘটনা পাওয়া যায়। তিনি স্মৃতিচারণে লিখেছেন ঃ

কবির এই আত্মভোলা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেক সময় অনেক লোক অসুবিধায় পড়েছেন। হয়তো কেউ এসে ধরলেন, অমুক দিন অমুক সময়ে তাদের একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে। নজরুল হবেন প্রধান অতিথি। নজরুল স্বীকার করে বল্লেনঃ নিশ্চয়ই যাবো, আমার জন্য চিন্তা করবেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে নজরুলের পাত্তা নেই। সওগাত অফিসে আর নানা জায়গায় তাদের দৌড়াদৌড়ি। নজরুলকে তাঁরা খুঁজে পেলেন না। পরে জানা গেল, নজরুল একটি আড্ডায় বসে দাবা খেলায় মত্ত ছিলেন সারাদিন। অনুষ্ঠানে যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

১৪। তথ্য সূত্র ঃ তিতাস চৌধুরী, দৈনিক দিনকাল, ৪/১২/৯৭।

বাঙলার পরম জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
পঞ্চচত্বারিংশত্তম
জন্মতিথি উপলক্ষে
শ্রদ্ধাভিনন্দন

হে কবি! আজ তোমার ৪৫তম জন্মতিথি উৎসব পালন করিতে সমবেত হইয়া প্রথমেই তোমাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি—তুমি ইহা গ্রহণ করো।

হে কবি! একদা তুমি তোমার অমূল্য কাব্য-সম্পদের ভাব-তরঙ্গে আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অতুলনীয় প্রেরণা দিয়াছিলে, আমরা তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছি—তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করো।

হে কবি! তুমি এই দুর্ভাগা দেশের জন্য, দেশের কৃষক, শ্রমিক ও কোটী কোটী অসহায় নরনারীর জন্য যে বেদনা অনুভব করিয়াছ, তোমার কাব্যের মধ্য দিয়া তুমি যে বিপ্লবের বিষাণ বাজাইয়াছ এবং তাহার জন্য যে দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছ—জানি, তাহারই জন্য আজ তুমি রোগশয্যার মর্মন্তুদ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতেছ, আমরা প্রার্থনা করি তুমি অবিলম্বে সম্পূর্ণ নিরাময় হও।

হে কবি! সারাজগতে আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য্যের ধ্বংস সাধন শুরু হইয়াছে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র-উদ্ভূত বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যে—তুমি আজ এই দুর্দ্দিনে আমাদের পথে আলো ধরো, আমাদের অনুপ্রাণিত করো।

হে কবি! তুমি দীর্ঘায়ু হও—

কলিকাতা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

ইতি—
তোমার গুণমুগ্ধ দেশবাসী

কবি নজরুলের ৪৫তম জন্ম তিথি উপলক্ষে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন

বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে ঐতিহাসিক জাতীয় সংবর্ধনা

নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃস্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালীরূপেই পাইয়াছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তাহা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরিয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।

- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে কোলকাতা এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় অস্বাভাবিক জনসমাগম হয়েছিলো, বিশেষ করে অগণিত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক কর্মী এবং মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দুপুর দু'টোর সময় একটি ফুল শোভিত মোটর গাড়ি করে কবিকে সভায় আনা হয়। কবি সভাকক্ষে প্রবেশ করলে উপস্থিত সকলে জয়ধ্বনি করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সবার উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী উমাপদ ভট্টাচার্য, নজরুলের 'চল, চল, চল।' সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাংলাদেশ সম্মোহিত হইয়া আছে! তাই অন্যের প্রতিভা লোকচক্ষে তেমন করিয়া ধরা পড়িতেছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পাইয়াছি, তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, *নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি*

বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃস্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালীরূপেই পাইয়াছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তাহা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরিয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।"

সভাপতির ভাষণের পর 'নজরুল সংবর্ধনা সমিতি'র পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি এস ওয়াজেদ আলী নিম্নোক্ত অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন ঃ

অভিনন্দন পত্র

কবি

নজরুল ইসলাম

করকমলেষু

কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালীকে চিরঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার বিস্ময়ের উর্দ্ধে সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা-ঝোরার জল ধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা বিশ্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও!

বাঙলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক বন্দনা গ্রহণ করো।

তুমি বাঙালীর ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ; মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃত ধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ-ধারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে; তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ অভিবাদনে তুমি নয়নপাত

তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যাম-কোয়েলার কণ্ঠে [illegible] ুল-বাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ; রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙুর-লতিকার [illegible] ন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল শিরাজীর আবেশ-বিহবলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত-নিবেদন গ্রহণ কর!

ধুলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষী তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।

গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে

নজরল সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ।

কোলকাতা, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯।"

অভিনন্দন পত্র পাঠের পরে সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তুমুল করতালির মধ্যে

কবিকে সোনার দোয়াত কলম ও রূপার আধারে অভিনন্দন পত্র উপহার দেন। তারপর উমাপদ ভট্টাচার্য কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্যে নলিনীকান্ত সরকার কর্তৃক রচিত আবাহন-গীতি পরিবেশন করেন। গানটির প্রথম ও শেষাংশ ছিলো,

ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সরসীতে তুমি
সুন্দর সিত শতদল।
সঞ্চরে শ্যাম-সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা-পরিমল।।
দুর্যোগে ভরা তমসার রাত,
তোমার প্রকাশে লভিল প্রভাত,
অরুণের রাগে পরাগে পরাগে
রক্তিম তব হিয়া তল।।....
হে শুচিস্মিত, শুভ্র-কোমল,
সুরভি-স্নিগ্ধ শতদল!

আবাহন সঙ্গীতের পর বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে কবি উত্তর দিতে ওঠেন, কবির দীর্ঘ উত্তরটি হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

"বন্ধুরা!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মতো বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম!

এ বনফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠলো। নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে-অক্ষমতা ক্ষমা করবেন। আমি যে-নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান, সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তাছাড়া আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজকের দিনে যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজকের দিন তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়তো সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেলো। এ শুধু আপনাদের- যাঁরা এ সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড়ো বন্ধুদের কথা বলছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী করেই স্মরণ করছেন,- ফুল ফুটানোর চেয়ে হুল-ফুটানোতেই যাঁদের আনন্দ।

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশী রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উলটো, তারা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পানসে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই ক'রে জড়িয়ে ধরতে

না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার পর নিন্দার ধূলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয় নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেইদিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটিমাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতিনমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তাহলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।....

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো-মানুষ! কোনো অনাসৃষ্ট করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। পড়-পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙ্গে দেয়, অন্যায় তাঁর নয়, অন্যায় তার, যে ঐ পড়-পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' ব'লে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্সের মত আমারও মন্ত্র- "Beauty is Truth, Truth is Beauty."

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে, কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি; সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই!- এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি- এই হোক আমার সবেচেয় বড়ো পরিচয়। আমি জানি,এই পথযাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণা ভূজঙ্গ, প্রখর-দশন শার্দুল পশুরাজের ভ্রুকুটি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না। তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না বলে,- তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন! আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের-ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের উর্ধ্বে উঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছটাকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।.....

যৌবনের শক্ত-শিখ মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যারা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদ্দাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহজাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাতে দেখেছি, কারাগারের অন্ধ কূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।....

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও-দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে; তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে! আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেন না, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।.....

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধূলো-বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভ্‌বে, আমিও মর্‌ব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয়, তাহলে ঐ সমুদ্রমন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের! তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা- রসে খান, অমৃত আছে; সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ!"

নজরুলের উত্তর দানের পর খ্যাতনামা শিল্পী গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং উমাপদ ভট্টাচার্য পুনরায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গানের পর সভাপতির অনুরোধক্রমে
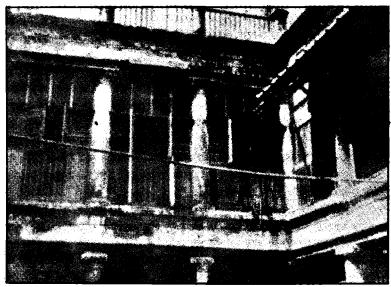
কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস। যুদ্ধ ফেরত সৈনিক নজরুল কলকাতায় এসে এখানেই প্রথম অবস্থান করছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ঃ

"স্বাধীন দেশে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীনবলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করবো- কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐইরূপ ঘটনা কম, অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশি। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়- সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাবো- তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখনো তাঁর গান গাইবো।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াই; বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু'র মতো প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

সাধনা ঔষধালয়ে (সামনের সারিতে) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মৌলভী আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র বসু ও কাজী নজরুল ইসলাম।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়- সমগ্র বাঙালী জাতির।"

সুভাষ বসুর পরে রায় বাহাদুর জলধর সেন সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ঃ
"আজিকার এই দিনে আমরা কবি নজরুল ইসলামকে সম্বর্ধনা করিবার জন্যে যেভাবে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়াছি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, দেশের প্রত্যেক মঙ্গল-আয়োজনে যদি সেইভাবে আমরা মিলিতে পারি; যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা হিন্দু বা আমরা মুসলমান; শুধুই যদি আমাদের মনে জাগে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা মায়ের সন্তান, তবে আমাদের নজরুল সম্বর্ধনা সার্থক হইবে।"

সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উপসংহারে বলেন ঃ
"আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি-মানুষে পরিণত হইবে।"

সর্বশেষে সভাপতি সুভাষ বসু ও সমবেত জনতার অনুরোধে নজরুল 'টলমল টলমল পদভরে' এবং 'দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু' এই দু'টি স্বরচিত গান গেয়ে শোনান। নজরুল গান শেষ করলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আবেগ ভরে কবিকে আলিঙ্গন করেন।[১]

১। মাসিক 'সওগাত' পৌষ ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

কবি-প্রশস্তি

'বাঙলার শেলী' কবিবর—

কাজী নজরুল ইসলাম মহোদয়

সমীপেষু—

হে অতিথি,

আমাদের ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা জন্মভূমিতে আবার তুমি আসিয়াছ—তোমায় নমস্কার করি!

গ্রীষ্মের রৌদ্র-দগ্ধ দুপুরে, বর্ষার বৃষ্টি-ঝরা প্রাতে তোমায় দেখিয়াছিলাম; তখন তোমার হাতে ছিল 'বিষের বাঁশী', কোলে ছিল 'অগ্নিবীণা', কণ্ঠে ছিল 'ভাঙার গান'। পশ্চিম সমুদ্রের 'সিন্ধু-হিন্দোলে' সেবার তুমি ছন্দ যোগাইয়াছিলে, বাড়বকুণ্ডের অগ্নি-শিখায় সুর খুঁজিয়াছিলে, 'তৃতীয়া চাঁদের সাম্পানে চড়ি' 'অনামিকা' 'গোপন-প্রিয়া'র সন্ধান লইয়াছিলে। বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে তোমায় আমরা তসলিম জানাইয়াছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলাম—'আজিকার কোলাহল কল্যকার নূতন জীবনের ভিত্তি হইতে পারে; বিদ্রোহ-অশান্তির মধ্যে পূর্ণতর জীবনের যে স্বপ্নাভাস, রহিয়াছে তাহারি পানে আমাদিগকে লইয়া যাও, হে কবি'।

শীতের সন্ধ্যায় আবার তুমি দেখা দিয়াছ, নূতন রূপে, নূতন ছন্দে। 'বিদ্রোহীর' হুঙ্কার আজ থামিয়াছে, 'প্রলয়োল্লাস' স্তব্ধ হইয়াছে, 'রক্তের' ঝাণ্ডা অবনত হইয়াছে, 'রণভেরী' নীরব হইয়া গিয়াছে।

বিদেশী ওগো! আজ হাতে তোমার বাঁশের বাঁশী, স্কন্ধে তোমার 'বুলবুলি', সাথী তোমার "পারুল-চম্পা-চখাচখী", বিদ্রোহের রথ থামাইয়া আজ তুমি অশ্রুর মালা গাঁথিতে শুরু করিয়াছ। তোমার এই "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন", কান্নার সওগাতের জন্য তোমায় নমস্কার করি!

আমাদের 'দৌলত' আলাওল-পরাগল নাই, 'নবীন চন্দ্রের কথা আজ পুরাতন, জীবেন্দ্র কুমার 'ধ্যানলোকে', পূর্বদেশের 'শশাঙ্ক' এখন অস্তমিত, বাংলার আজিজ, চট্টলার কাসেম আজ চির নিদ্রায় নিদ্রিত! হে কবি! কে তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে?

তোমার উপযুক্ত আদর করিবে তোমার বিরহী বন্ধু সিন্ধু, প্রাণ পাইবে তুমি কর্ণফুলীর আঁকে বাঁকে, রঙ্গ-মতীর গিরি দরী-উপবনে, চন্দ্রনাথের শৈল-শিখরে; কোল দিবে তোমায় বিবাগী বাউল, কড়িহারা মাঝি, ঘর-ছাড়া ভাটিয়াল। অতীতের স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া অনির্দ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছি আমরা, কি দিয়া তোমায় অভ্যর্থনা করিব। আমরা শুধু তোমায় সালাম জানাই, ওগো বিদেশী! তোমায় শুধু নমস্কার করি!!

তোমার প্রাণমুগ্ধ—

বুলবুল সমিতির সভ্যগণ।

এসলামাবাদ প্রেস, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম বুলবুল সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র

নজরুল ইসলামের কয়েকটি ঐতিহাসিক ভাষণ

'লীডারের কাছে শক্তি ভিক্ষা করো না, আল্লাহ্ এতে নারাজ হন। শক্তি ভিক্ষা করো একমাত্র আল্লাহ্‌র কছে। জয়ধ্বনি মহিমা কীর্তন করো একমাত্র আল্লাহ্‌র।'

- *কবি নজরুল*

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টেরব মাসের আরম্ভেই সিরাজগঞ্জে শুরু হয়ে যায় 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন'-এর আয়োজন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন এম সিরাজুর হক। তিনি কলিকাতায় নজরুল ইসলামকে পত্র লিখেন। ৩০ আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে নজরুল তার পত্রোত্তর দেন। পত্রটি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয় অনাগতের আগমনী গাহিতে চলিয়াছি' শিরোনামে। পত্রটি এই ঃ

অনাগতের আগমনী গাহিতে চলিয়াছি

আপনারা আমাকে অন্য জগতের আগমনী গাইতে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি অযোগ্য, তবু আহবান করেছেন সেজন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব জুড়ে আজ মহাজাগরণ। শিক্ষা ও ধর্মের নব নব স্ফুরণ। অভ্যুত্থানের বজ্রবিষাণ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বিশ্বব্যাপী মহাজাগরণের এই প্রদীপ্ত প্রভাতে বাংলার মুসলমান তরুণেরা কি মহানিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে? ধর্ম- অধর্মের অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কারের মহাসংঘর্ষের এই মহাসন্ধিক্ষণে তৌহিদের শান্তি-সাম্য ঐক্যমন্ত্রে সে কি ক্রান্ত শ্রান্ত-ভ্রান্ত মানবচিত্তের অবসন্নতা বিদুতির করবে না? জাতি ও কওমকে ধর্ম পথে সেরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত ও সংঘবদ্ধ করতে প্রচেষ্টা ও প্রয়াস পাবে না? তরুণ বন্ধুরা কি মহা কোরআনের মহাবাণী 'কুম্-বে ইজ্ নিল্লাহ' ওঠো জাগো-এ বাণী ভুলে গিয়েছে? আমি তো দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ঐ স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমাদের কীর্তিমান পূর্ব-পুরুষগণ আকুল পানে আমাদের কর্মের প্রতি চেয়ে রয়েছেন। তরুণদের মন-মন্দিরে তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্জ্বলিত হউক। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, সালাহউদ্দীন, খালিদ, তারিক, মুসা, হাঞ্জেলা, ওকবা'র সাধনা তাদের কর্মে রূপলাভ করুক। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, পরবশ্যতার প্রাচীন প্রাচীর চূর্ণ করতঃ বঙ্গীয় মুসলিম তরুণবৃন্দ জ্ঞান, চরিত্র, নীতি সখ্য ও মনুষ্যত্বের পথে কাতারবন্দী হউক-এই আশা অন্তরে পোষণ করেই আপনাদের নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। আপনাদের চেষ্টায় যুবকেরা নব জিন্দেগীর পথে অগ্রসর হোক- সকলের সাধনার জয়যাত্রা

মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত মুনশী মেহেরুল্লাহ

সাফল্য লাভ করুক এই কামনা।[১]

এরপর সম্মেলনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী (১৯০৬-৭১) কলিকাতায় নজরুলের সঙ্গে দেখা করেন। আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-৫৯) লিখেছেন, কাজীদা আর আমাকে সেই সভায় নিয়ে আসবার জন্য সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী এলো কলকাতায়। কাজীদা বললেনঃ "তোমার এ আহবান কি উপেক্ষা করতে পারি? জানো আব্বাস, সিরাজী হবে বাংলার তরুণদের নকীব। তুমি, আমি সিরাজী এই তিনজনে বাংলাদেশ জয় করতে পারি।[২] সিরাজগঞ্জে যাবার দু'দিন আগে নজরুল আরেকটি চিঠি পাঠান এম সিরাজুল হককে। চিঠির বয়ান এই ঃ

কলিকাতা
২ নভেম্বর ১৯৩২

জনাব সম্পাদক সাহেব,
তসলিম। আপনাদের নেতা আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর মারফত আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাংলাদেশ আমার বিরুদ্ধে, সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস। ধুমকেতুর সারথী রূপে নয়- যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিপষ বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আযাদি অনাগত-তারই আগমনী গাওয়া বা হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্যপথ ধরে যাত্রা করুন কোন বিঘ্নই যে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক! মুক্তি প্রাণে মুক্ত বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারবো, সেইদিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জনকয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন- এজন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারিদিকে বিপ্লব বিভীষিকা- অনাদর, অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে-তবুও পিছপা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই। আব্বাসউদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাআল্লাহ ৫ নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার ষ্টেশনে পৌছব।

নজরুলকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যাবে না। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই উপমহাদেশে এ ধারাটার সূচনা হয়, মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনা, আত্মপরিচয়ের সূচনা থেকে। মুনশি মেহেরউল্লাহ থেকে। মুনশি মেহেরউল্লাহ গ্রাম্য বাজারে একজন

১। ইজাবউদ্দীন আহমদ, 'বেতার বাংলা', অক্টোবর '৯৭, দ্বিতীয় পক্ষ।
২। 'আমার শিল্পীজীবনের কথা' ঃ আব্বাস উদ্দীন আহমদ।

যেন বহুকাল পরে পিতা তাঁহার হারানো পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন। তাহার বহুদিন পর আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাংলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, দেশপ্রেমিক মনীষীর কথাই বারে বারে মনে পড়িতেছে। এ যেন হজ্ব করিতে আসিয়া কা'বা শরীফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া! তাহারই বেদনায় হয়তো আমরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, তাহার জন্য দোয়া ভিক্ষা করিতেছি।[৩]

যৌবনের ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার প্রসার বিশাল, তাহার গতিবেগ বিপুল। ধর্মের গণ্ডি বা প্রাচীরে যৌবন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ধর্মে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তাহার প্রসারতা। এইখানেই যৌবনের গর্ব, মহত্ত্ব। নদী পবর্তে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সে কি পর্বতের চারিপার্শ্বেই জলধারার অর্ঘ্য বহিয়া চলিবে? সে কি পর্বত-নিম্নের সমতলভূমি করুণা-সিঞ্চিত করিয়া সাগর অভিযানে যাইবে না। যে না যায়, সে নদী নয়, সে খাল ডোবা কিম্বা খুব জোর ঝর্ণা। আমার ধর্মের শিখর হইতে নামিয়া আমার প্রাণধারা যদি আমারই দেশের উপত্যকা ফুল-ফসলে ভরিয়া তুলতে না পারে, তাহা হইলে আমার ধর্ম ক্ষুদ্র, আমার প্রাণ স্বল্পপরিসর। ধর্ম লইয়া বৃদ্ধেরা, পৌঢ়েরা কলহ করে করুক, আমরা যেন এই কুৎসিৎ কলহে লিপ্ত না হই। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।

এক দেশের জলে-বায়ুতে ফলে-ফসলে, এক মায়ের স্তন্যে পুষ্ট হিন্দু মুসলমানে যে কদর্য বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সভ্য জগতে আমাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিবার আর মুখ নাই। জননায়ক হইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। এই অশিক্ষিত হতভাগ্যদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হাতের ক্রীড়নক। ইহাদের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতাই হইয়াছে ঐসব সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতের অস্ত্র। যখন যেমন ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া ইহাদের ক্ষেপাইতেছেন। আমার মনে হয়, কাউন্সিল-এসেমব্লি প্রভৃতি বালাই না থাকিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের এমন ভীষণ কদর্যমূর্তি দেখিতাম না। আজ দেখি তিনিই হিন্দুদের নেতা যিনি স-কাবাব কারণ সলিল পান না করিয়া মায়ের নাম লইতে পারেন না। মুসলমানদেরও আজ তিনিই হঠাৎ নেতা হইয়া উঠিয়েছেন- যনি স-হ্যাম হুইস্কি পান না করিয়া ইসলামের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন না। ইহাদের অর্থ আছে, তাই যথেষ্ট ভাড়াটিয়া মোল্লা, মৌলবী, পণ্ডিত পুরুষ যোগাড় করিয়া কাগজে কাগজে ডঙ্কা পিটাইয়া স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য ওকালতি করিতে পারেন। খোদার বা ভগবানের তো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আছে, হিন্দু মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাহার আশীষ ধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারী করিতে যাই? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোশ পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায়

৩। যৌবনের ডাক, কাজী নজরুল ইসলাম; সওগাত, কার্তিক ১৩৩৯ দ্রঃ। আঃ মান্নান সৈয়দ, নজরুলের সিরাজগঞ্জ সফর, দৈনিক ইনকিলাব।

স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী (বাম থেকে ৪র্থ), কাজী নজরুল ইসলাম (৫ম) ও অন্যান্য
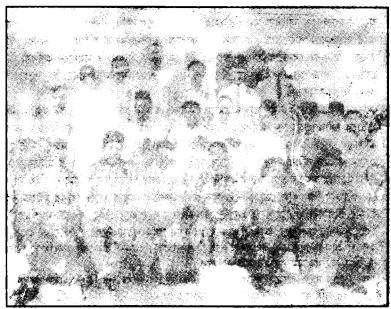
দেখিয়াছি। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই কুৎসিৎ সংগ্রামে লিপ্ত হয় বৃদ্ধের প্ররোচনায় তরুণেরা। আপনারা এই কদর্যতার বহু উর্ধ্বে আপনাদের বুদ্ধি সংকীর্ণতা মুক্ত, ইহাই হউক আপনাদের ধ্যান-মন্ত্র। ইসলাম ধর্ম কোন অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেয় নাই। ইসলামের মুলনীতি সহনশীলতা (Passive Resistance) ইমাম হাসান ও হোসেন তাহার চরম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের পরমত সহনশীলতার অভাবে, আমাদের অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির চরমসীমায় গিয়ে পৌছিয়াছে, আমাদের তরুণদের ঔদর্যে, ক্ষমায় আমাদের সেই পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। মানুষকে মানুষের সম্মান- হোক সে যে কোন জাতি, সে কোন ধর্ম, যে কোন সম্প্রদায়ের-দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম বলিয়া, তরুণ বলিয়া ফখর করেন।[৪]

[১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আপনারা এই ভিখারীকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলে , যিনি বিশ্বভূবনের পরম পতি, পরম গতি, পরম প্রভু, তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে ঘরে-বাইরে, সভায় বা

৪। ওসমান গনি, মাসিক সফর, আগস্ট '৯৬ দ্রঃ।

সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের, সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী- পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায় মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহংকার। এই অহংকারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহংকার Divine নয়, Demon। অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্ম-জগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব জীবন-মরণ কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবিবন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমার না-কি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্য-রস-পিপাসু মনকে- শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মত আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণা-দানের দক্ষিণ হস্তকে ঊর্ধ্বে, না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন; তাঁরা যখন এ কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকিত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে! যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যাম-ঘন মেঘ-রূপে আমি সহসা এসেছিলাম ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘন-ঘটায়, মুক্ত জটায় দিগ দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট প্রান্তরের তৃষা মিটিয়েছিলাম; আমার রুদ্র সুন্দর নৃত্য দেখে যারা দেখতে পান নি যে, এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষয় নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের অশ্রুধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল, শতদল, বৃন্ত; বনলতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কন্টকিত; এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূপুর-ধ্বনি, সুরের সুরধুনী গানের প্রবাহ,- সেই মেঘ একদিন দেখতে পেলো সে তুষারীভূত হয়ে শ্বেত শুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি- তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতারূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করতাম। সহসা মনে হত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে। খুঁজতে গিয়ে মন বুদ্ধি অহংকার- সবকিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন এক পরম শূন্যে।

১৯২৯ সালে রাজশাহী মুসলিম ছাত্রাবাসে কবি নজরুল ও অন্যান্য

তাই বন্ধুদের বলছি, এ আমার কার্পণ্য নয়, স্বার্থপরতা নয়- এ আমার স্বধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না। বলছেন আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বলে বিশ্বাস করেননি। ঘুড়ি উড়তে উড়তে গেছে ডালে আটকে, টানাটানি করলে সুতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে- অবুজ হাত তবু টানাহেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

আপনাদের এই সাহিত্য-সভায় রসের জলসায় আপনারা আমার অসহায় জীবনী শুনতে আসেন নি। আমি আমার এ অসহায় অবস্থার কথা আগেই জানিয়েছিলাম। যার গলায় হয়েছে টনসিল বা বেঁধেছে কুলের আঁটি, সে সঙ্গীত শিল্পীকে জোর করে গান গাওয়ালে সে যত না গাইবে গান তার চেয়ে অনেক বেশি করে প্রকাশ করবে তার কণ্ঠের অসহায় অবস্থা; সুরের চেয়ে আঁটি আর টনসিলের ব্যথাই বড় হয়ে উঠবে। আপনারা ইচ্ছা করে শাস্তি গ্রহণ করছেন, আমি নিরপরাধ। যে সিংহ আছে খাঁচায় আটকে- তার ন্যাজ দরে টেনে ন্যাজ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, হুঙ্কারও শুনতে পারেন, কিন্তু তাঁকে টেনে বের করতে পারবেন না। যিনি বন্ধ করেছেন, তিনি দয়া করে দুয়ার না খুললে আমার বাইরে আসার কোনো উপায় নেই।

আনন্দ-রস-ঘন স্বর্ণবর্ণের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমায় রস সরবরাহ করতেন- আগেই বলেছি, তিনি মহাশ্বেতা-রূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থা। তখন আমিও হয়ে যাই নীরব, আমার বাঁশি আর বাজে না, রসস্রোত হয়ে যায় তুষার ভূত,

আমার আনন্দময় তনু হয়ে যায় পাষাণ-বিগ্রহ। এ মৃত্যু নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিরানন্দময়। আজ আপনাদের কাছে বলে যাব- আবার নিদ্রিতা সমাধিস্থা শক্তি জেগেছেন, তবে তন্দ্রার ঘোর-সমাধির বিহ্বলতা কাটেনি। আমার সেই আনন্দময়ী শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরম শূন্যে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের যে সাম্যের যে আনন্দের গান গেয়ে যাব- সে গান পৃথিবী বহুকাল শোনেনি। আমার চির-জনমের প্রিয়া এই প্রেমাময়ীর প্রেম যদি না পাই- তাহলে বুঝব আমার এবারের মত খেলা ফুরালো। আমার বাঁশি বিরহ-যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব। শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে-যাওয়া বাঁশি ধন্য হবে।

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মধুর রূপ দর্শন করেছি তিনি যদি আমার সর্ব-অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত-রসধারা প্রবাহিত হয় আবার যদি তাঁর চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে- তাহলে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব; এই তৃষিত পৃথিবীর বহুকাল যে প্রেম, অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত- সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, সে প্রেম আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ মাত্র, আদার মাত্র; সেই সাম্য অভেদ, শান্তি, আনন্দ, সেই প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নিরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন। আপনাদের আনন্দের, মুক্তির রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি- তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের এই প্রেমের ভিক্ষা-পাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি; যদি আমি না পাই আপনাদের কেউ পান- সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ করে বলছি- তাহলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম তেমনি সমান আনন্দ পাব- সর্বাগ্রে আমি গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করব- সেব হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র করে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছে বলেন, তাহলে আশীর্বাদ করুন যে, আমার অর্থ-জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহকূলে আবার যেন জ্ঞানে, শক্তিতে, আনন্দে নিত্য-পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশি না বাজে- আমি কবি বলে বলছিনে- আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি- আমায় ক্ষমা করবেন- আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসি নি- আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম, সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস

১৯২৮ সালে সিলেটে গুণগ্রাহীদের সাথে নজরুল

পৃথিবী থেকে নীরবে অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে- এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলাম- অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম- আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না- তবু আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র-সুন্দররূপ আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অনুসরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকিত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়- তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমানের বলে দেখবেন না- আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলি উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাত বর্ষাসজল রাতের

মত অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন- মনে করবেন- পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনা তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্য কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোন বাধা বন্ধন স্বীকার করি নি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায় নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহু দিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহবানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই, এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মিঃ মুজাফফর আহমদ, মিঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে। আমাদের তখনকার আড্ডা ছিল সাহিত্যকারের জীবন্ত মানুষের আড্ডা। আমরা এই তথাকথিত অ্যারিস্ট্রোক্রাট বা 'আড়স্ট-কাক' ছিলাম না। বোমারু বারীন-দা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন- হ্যাঁ আড্ডা বটে? আজকের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি করে বসে আছে, আমরা তা করি নি; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়ত কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এই ভালোবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কিনা, আমার জানা নেই।

সাহিত্য-সাহায্য পুষ্ট করে তুলতে সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। সাহিত্য-সমিতি-বিত্তশালী হলে বহু তরুণ প্রতিভাকে আশ্রয় দিতে পারবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করতে পারবে।

আপনাদের শিক্ষা সমিতিতে এসেছি আমি আর একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে, আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাতি ধরে দেখেছি তাই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুসলিমের প্রবুদ্ধ ভারতের- এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্নরূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষঘর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয় দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক আদাওতি করে আসন জয় করা নয়, দাওত

১৯২৯ সালে রাজশাহী মুসলিম ক্লাবে নজরুল ও অন্যান্য

দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

কবি নজরুল ইসলাম ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"আপনাদের ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) হোক ওরিয়েন্টাল কালচারে পীঠস্থান-আরফাত ময়দান। দেশে-বিদেশে তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভীড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা। সে ঋণ আজ শুধু শোধই করবো না ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি। এতদিন সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে তা যদি না পারি সমুদ্র বেশী দূরে না; আমাদের লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎভার আপনারা গ্রহণ করুন। আমাদের এই শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে। প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যিই বুলবুলিস্থানে পরিণত হোক-ইরানের শিরাজের মত। শত শত সাদী, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শামসি তবরেজ এই নিরাজবাগে, এই বুলবুলিস্থানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকির মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণ ধারাকে মুক্তি দিন।"

১৯৪০ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে কবি নজরুল বলেছিলেন ঃ

'তরুণ ছাত্রদল বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও'। তিনি আরও বলেছিলেন- 'যে কওম, যে

জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে ফেরাও তাকে সেই পথে- যে পথে তারা একদিন পারস্য সাম্রাজ্য, রোম সাম্রাজ্য জয় করেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহীদের বাণী শুনিয়ে ছিল।' তিনি মুসলিম জাতির অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে ছাত্রদের বলেছিলেন, 'প্রিয় ছাত্রদল.... তোমাদের আমি দেখেছি তোমাদের অতিক্রম করে সহস্রাধিক বৎসর দূরে- ওহোদের যদ্ধে, বদরের ময়দানে, খয়বরের জঙ্গে। দেখেছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিকেরূপে, দেখেছি দূর আফ্রিকায় মুসা-তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মিসরের পিরামিডের পার্শ্বে পিরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নত শির। দেখেছি ইরানের বিরানমূলুক আবাদ করতে, তার আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া করে দিতে। দেখেছি জাবলুত তারেকের জিব্রাল্টারের আকুল জলরাশির মধ্যে নাঙ্গা শমশের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দেখেছি সেই জলরাশি সাঁতরে পার হয়ে স্পেনের কর্ডোভায় বিজয় চিহ্ন অঙ্কিত করতে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জেহাদের জঙ্গে সুলতান সালাহ্ উদ্দিনের সেনাদলের মাঝে, দেখেছি কুরূপা য়ুরোপকে সু-রূপা করতে। সেদিনও দেখেছি রীফ সর্দার আবদুল করিমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের পাশে...। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশান-বর্দার হয়ে।" তিনি ১৯৪০ খৃঃ এক ভাষণে তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'লীডারের কাছে শক্তি ভিক্ষা করো না, আল্লাহ্ এতে নারাজ হন। শক্তি ভিক্ষা করো একমাত্র আল্লাহর কছে। জয়ধ্বনি মহিমা কীর্তন করো একমাত্র আল্লাহর।'

তিনি এই বাংলাদেশের উপর ক্ষত্রিয় শক্তির লুটপাটের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণকে সতর্ক করে বলেছিলেন- "ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই মন্ত্র শেখাও- 'এই পবিত্র বাংলাদেশ বাঙালীর- আমাদের। দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়/ তাড়াব আমরা করি না ভয়, যত পরদেশী দুস্য ডাকাত/ 'রামাদের' গামাদের।"

শুধু তাই নয়, এ দেশের বঞ্চিত-নিপীড়িত মজলুম জনতাকে শির দাঁড়া করে উঠে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহবান জানিয়ে নজরুল লিখেছেন ঃ

"রক্ত মাংস খেয়েছে তোদের,
কঙকাল শুধু আছে বাকী
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা
'আজো বেঁচে আছি' বল ডাকি।"

তাই কালিদাস রায় কবি নজরুল সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন ঃ

"নজরুল নজরুল!
কখনো বা ভোমরা তুমি কখনো ভীমরুল
মিলন ভূমি মরুমেরু একাধরে অরুণ গরুড়
ভাষায় তোমার যেমন মধু তেমনি তীক্ষ্ণ হুল।"

সুতরাং মুনশি মেহেরউল্লাহ থেকে নজরুল পর্যন্ত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে

যদি মুনশি মেহেরউল্লাহ না আসতেন, যদি মওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী না আসতেন, মওলানা আকরম খাঁ না আসতেন তাহলে হঠাৎ করে নজরুলের আবির্ভাব হতে পারতো না। তাই লেখক-অভিনেতা আরিফুল হক নজরুলকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন ঃ

আজ যদি ধরিত্রীর খেয়ালে হঠাৎ শুকিয়ে যায় নায়াগ্রার জলপ্রপাত, কোন ফটোগ্রাফারের ছবি থেকে আর বোঝা যাবে না সেই প্রচণ্ড প্রবাহের জীবন্ত গতিবেগ কি বিস্ময়কর ছিল। আজ বাংলাদেশের চোখের সামনে যাদের কবি বলে জানি, গায়ক বলে জানি, সুরকার বলে জানি, তাদের জীবনের গতি ও ধারা থেকে বোঝা যাবে না কবি নজরুল ইসলাম কি ছিল? প্রচণ্ড বন্যার মত, লেলিহান অগ্নিশিখার মত, পরাধীন জাতির তিমিরঘন অন্ধকারে, জাতির ভাগ্য-বিধাতা নজরুলকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ধাঁচে গড়েছিলেন। কথাগুলো বলেছিলেন, ভারতীয় লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। আর একজন লেখক বলেছিলেন, "পাহাড় দেখলে আমার নজরুলের কথা মনে হয়। মনে হয় নজরুল পাহাড়ে চলাফেরা করেন। কেন এমন মনে হয় জানি না- তার উত্তর নেই।" নজরুল ইসলাম সুউচ্চ শৈলশিখরের মত। ঝড় সেখানে আঘাত হানে, মেঘ অন্ধকার বিছিয়ে দেয়, কিন্তু সেই উর্ধ্বতায় উঠতে পারলে আমরা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারি, যা আর কোথাও কারো কাছে সম্ভব নয়। সেই জন্যই নজরুল ইসলাম আমাদের শত বছরের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ অবদান। বহুযুগের বহু কোটি মানুষের দেহ-মন মিলিয়ে নজরুলের সত্তা সৃষ্টি হয়েছিল, তাই নজরুল সত্তা আমাদের কাছে মহামানবের সত্তা।

"মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুও বানিয়ে বলছিনে। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে- আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান- কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির।"

- কাজী নজরুল ইসলাম

মোঘল সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র পরিবার

যে জাতির মধ্যে এত সুন্দর রুচিবোধ, এত সুক্ষ্মতা, নিপূণতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান- সে জাতির দ্বীন-ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার স্থান ও মর্যাদা কত উন্নত হতে পারে! কত সরল ও নির্মল।

- ইফম্যান

(বিভাগ-পূর্ব ভারতের ইংরেজ আমলা, পরবর্তীতে নও-মুসলিম)

মুসলমান আগমনের আগে এ দেশের মানুষের আদাব-কায়দা, রীতি-নীতি বলতে কিছুই ছিলো না, জোর যার, মুল্লুক তাঁর এই ছিলো রীতি। এই নীতির ফলে কত নিরীহ আদম সন্তানের যে অকারণে প্রাণ সংহার হয়েছে এর কোন হিসাব নেই।

তাদের সভ্যতা-বৈভ্যতা দূরে থাক পোশাক-আশাকেও ছিলো না কোন শ্লীলতা ও রুচির ছোঁয়া। পুরুষেরা সেলাই ছাড়া ধূতি অথবা নিম্নাঙ্গে এক খন্ড কাপড় এবং মহিলারা বুকে আরো এক খন্ড কাপড় জড়িয়ে রাখতো। আর ভালো ও সুস্বাদু রান্নার কৌশল ও পদ্ধতিও ছিলো তাদের অজানা। মুসলমানদের আগমণের ফলে তাদেরকে সভ্য-বৈভ্য করে তোলে জাতে উঠায়। খাদ্য-খাবারে আনে নানা বৈচিত্র্য। পোশাকে-আশাকে আনে রুচিশীলতা ও শ্লীলতা।

শোনা যায়, নেহেরু নাকি একবার বলেছিলেন ঃ "আমি জাতিতে ভারতীয়, সংস্কৃতিতে হিন্দু, কৃষ্টিতে মুসলমান।" উক্তিটি কতটুকু সত্যি তা জানি না। কিন্তু তাদের মুঘল আমলের অনেক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এর সত্যতা প্রমাণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করলেও পোশাকে-খাবারে এখনো মোঘল সংস্কৃতি হিন্দুদের বিশেষ করে ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাঝে বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মুসলমানী পোশাক অনুসরণ করা হয়।

কারণ মুসলমানের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ছিলো উন্নত ও সুরুচির পরিচায়ক। উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম একথা বিশ্বের অনেক ঐতিহাসিক অকপটে তা স্বীকার করে গেছেন। এমনকি

অনেক অমুসলিম মুসলিম সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাকবি ইকবালের বর্ণনা করা দু'টি ছোট্ট ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

এক বৈঠকে ডঃ ইকবাল তাঁর জনৈক বন্ধু কাজী আব্দুল মজিদ কোরাইশীকে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে- গ্রাম ও পাড়ায় যেসব নও-মুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের ইসলাম গ্রহণ করার অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা জাগার হেতুগুলো যদি প্রকাশ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে আমার বিবেচনায় তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হতো। একথা ঠিক যে, ইসলামের সত্যতার পক্ষে বহু যুক্তিপ্রমাণ বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও অনুভূতিতে বিস্ময়কর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রমাণেরও প্রয়োজন রয়েছে বৈ কি। মন-মস্তিষ্কের কার্যপন্থায় ব্যবধান অনেক। ইসলাম গ্রহণের সম্পর্ক যতটা না মস্তিষ্কের সাথে তার চেয়ে লাখো গুন বেশী মনের সাথে। মস্তিষ্ক অনেক সময় দুর্বলতর বস্তু দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে; যার ফলে জীবনের সমস্ত গতি-প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্তরের কার্যকারিতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত পক্ষে মুসলিমদের অনুধাবন করতে হবে, কোন কোন বিষয় মানুষের মনে বেশী রেখাপাত করে এবং মন প্রভাবিত হয়। হালকা বা চটুল কোন বিষয় মস্তিষ্ককে সাময়িক উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু তা মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী ছাপ আঁকতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসে কাফের ও মুশরিকদের চরম ইসলাম বিদ্বেষ ও নবী-বিরোধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ভূরি ভূরি প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাদের পৈতৃক ধর্ম বিশ্বাস, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ইস্পাৎ-কঠিন মহীরূপের মতো; নিমেশে সেই ধর্ম বিশ্বাসে ছেদ টেনে ইসলাম কবুল করার সংখ্যাতীত কাহিনীও বিধৃত রয়েছে। ঐসব নও-মুসলিমের ইসলাম গ্রহণের আবেগ-অনুভূতি, কার্যকারণ ও বিবৃতি পুস্তকাকারে সংকলিত করা হলে আমার বিশ্বাস, 'জীবন বিপ্লবের নতুন এক জগৎ' ইসলামের মুবাল্লিগদের সামনে আবির্ভূত হতো। যা ইসলামের প্রসার-প্রচারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে প্রতিভাত হতো। কিন্তু আক্ষেপ, 'শুধু এ জাতীয় বই-ই নয়, মুসলমানদের ঘরে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ইসলামী বইয়েরও তীব্র অভাব।'

এরপর ডাঃ সাহেব কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন- 'আমি আপনার পুস্তকের জন্যে চমকপ্রদ নিম্নের উদাহরণ পেশ করছি ঃ

প্রসিদ্ধ ইংরেজ নও-মুসলিম জনাব ইফম্যানের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। কেননা, ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর কোন লেখাপড়া বা ধারণাই ছিল না। এমনকি, কোন আলেম-ফাজেলের সংস্পর্শে এসেও ইসলাম সম্পর্কে তিনি কিছুই আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি বিলেত থেকে বোম্বে এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁর বোম্বের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন রাজনীতিবিদ। ধর্মীয় গন্ডিতে তাঁর মোটেই যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু রাজনীতিতে আসার পর তাঁর বহু মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব হয়

এবং তিনি তাঁদের সাথে চলাফেরা আরম্ভ করেন।

একবার তাঁর এক সম্মানিত মুসলিম বন্ধু তাঁকে দাওয়াত করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন দস্তরখানে রং বেরং-এর খানা সাজানো রয়েছে। এর মধ্যে পোলাও ছিল। জীবনে এ-ই প্রথম তাঁর পোলাওর স্বাদ গ্রহণের প্রয়াস। পোলাও খেতে খেতে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে চিন্তিত দেখে জানতে চাইলাম, তিনি কি চিন্তা করছেন। ইফম্যান সাহেব জবাব দিলেন ঃ ডঃ সাহেব। এইটুকুই বলতে পারি, আমি পোলাও খাচ্ছি না, বরং; একটা কিছু চিন্তা করছি। চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে অনুভব করলাম আমার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসছে। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আমার সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। আমি অনুভব করলাম যে, অদৃশ্য জগৎ থেকে কি যেন আমার অনুভূতিকে সঞ্চালন করছে। সেই চিন্তাশক্তিই আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমি অনুভব করলাম যে জাতির মধ্যে এত সুন্দর রুচিবোধ, এত সুক্ষ্মতা, নিপূণতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান- সে জাতির দ্বীন-ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার স্থান ও মর্যাদা কত উন্নত হতে পারে! কত সরল ও নির্মল। এই বলে ইফম্যান সাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, আমাকে কোন আলেম বা সুফী সাহেব মুসলমান করেননি। আমি একমাত্র পোলাও ভক্ষণের মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইসলামের কোথাও হীনমন্যতা আমি দেখিনি। ইসলামের ইবাদত যতো উন্নত, সভ্যতাও তেমনি উন্নত, ঠিক সেভাবে ইসলামের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারও উন্নত। আমার দৃষ্টিতে, 'কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করেন তখন সমগ্র দুনিয়া হতে তিনি উন্নত হয়ে যান। তাঁর জীবনে তাঁর দ্বারা যত কাজ সম্পন্ন হয়, দুনিয়ার সমস্ত কার্যাবলী হতো তা হয় উন্নত।'

এরপর ইফম্যান তাঁর ইসলাম গ্রহণে পোলাওর প্রশংসা করতে লাগলেন। আমি বললাম, পোলাও জিন্দাবাদ! ইফম্যান বললেন, না; ইসলাম জিন্দাবাদ।

ডঃ সাহেব আরো বললেন, কিছুদিন আগের কথা, এখানে একজন হিন্দু জজ সাহেব প্রাণ ত্যাগ করলেন। এর কিছুদিন পর এই খবর শোনা গেলো যে, জজ সাহেবের বিধবা পত্নী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এতদশ্রবণে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে সাধারণতভাবে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিধবার নিকট তার আত্মীয়রা এসে তাকে বুঝাতে আরম্ভ করলেন, তাকে মুসলমান না হওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু বিধবা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। আত্মীয়-স্বজনদের পালা শেষ হওয়ার পর হিন্দু ধর্মের বড় বড় পন্ডিত-ব্রাহ্মণরা আসতে শুরু করলো। তারা এসে হিন্দু ধর্মের সত্যতার পক্ষে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে যুক্তি-তর্কের অবতারণা ঘটালো, হিন্দু ধর্মের অমীয় বাণী শুনালো, হিন্দু ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করা হলো। শিক্ষা-দীক্ষারও পাঠ দেয়া ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন পর্যন্ত চললো। কিন্তু কোন কিছুই মহিলার ফয়সালার উপর রেখাপাত করতে পারেনি। সবকিছু শোনার পর তিনি কেবল

এতটুকুই বললেন, আলবৎ আমি মুসলমান হবো।

অতঃপর আর্য সমাজের পালা আরম্ভ হলো ঃ তারা ইসলাম বিরোধিতার অফিস খুলে বসলো। মুসলমানদের নির্যাতন কাহিনী অতিরঞ্জিত করে পেশ করতে লাগলো। ইসলামী নির্দেশাবলী খন্ডন করলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জন্মাবার জন্যে সচেষ্ট হলো। তাকে সুলতান মাহমুদ গজনবী ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাহিনী শোনানো হলো। গো-মাতার নামে তারা আবেদন জানালো। কিন্তু মহিলা তার সংকল্পে দৃঢ়তা প্রকাশ করলো। তৃতীয় পর্যায়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মৃত্যুর হুমকি দেয়া হলো। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোভও দেখানো হলো। এতকিছুর পরও মহিলা বিচলিত হলেন না। এবার প্রশ্নোত্তর শুরু হলো।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তুমি কেন মুসলমান হতে চাও? তোমার কি কোন ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা আছে?

মহিলা জবাব দিলেন ঃ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ঘরে কোন কিছুরই অভাব নেই।

প্রশ্ন করা হলো ঃ তোমার কি কোন আত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে?

মহিলা বললেন ঃ আমার শারীরিক অবস্থা দেখেই তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো, আমি আর ক'দিন বাঁচতে পারি?

প্রশ্ন করা হলো ঃ কোন মুসলমান মৌলভী বা মুবাল্লিগ কি তোমাকে প্ররোচিত করেছে?

মহিলা জবাবে বললেন ঃ আমি জীবনে কোন মুসলমান মৌলভী বা মুবাল্লিগের সাথে সাক্ষাৎ করিনি।

বলা হলো ঃ কোন ইসলামী পুস্তক পড়েছো?

মহিলা বললেন ঃ আমি কোন ইসলামী বই-পুস্তক চোখেও দেখিনি।

আশ্চর্য হয়ে আত্মীয়-স্বজনরা জিজ্ঞেস করলো ঃ তাহলে কেন মুসলমান হতে চাও?

মহিলা বললেন ঃ আমার স্বামী বছরের পর বছর সাব-জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অনেক শহর-নগরে বদলী হয়েছিলেন। আমিও তাঁর সাথে থাকতাম। সবসময় আমার সাথে অভিজাত শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের মেলামেশা হতো। মুসলমান মহিলারাও মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসতেন। কিন্তু, তারা সবাই ছিলেন আমার সেবিকা। কখনওবা গাড়ী চালকের স্ত্রী, কখনও ধোপার মেয়ে, আবার কখনও আমিই কোন দোকানের মালিকের স্ত্রীকে ডেনে আনতাম। ব্যস, এর চেয়ে বেশী ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে আমার জানা নেই।

উপস্থিত শ্রোতারা কিছুটা উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো ঃ তাহলে তো তোমার মুসলমান হওয়ার পেছনে কোন কারণ দেখছি না।

জজ পত্নী বললেন ঃ হ্যাঁ, তা নিশ্চয়। যেসব মুসলিম মহিলার সাথে আমি মেলামেশা

করতাম তাদের অধিকাংশ গরীব ও অভাবগ্রস্ত এবং তারা ছিল অপরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদে আবৃত। ধনী মুসলিম মহিলাদের সাথে আমার মেলামেশা খুব কমই হতো। যে সব হিন্দু মহিলাদের সাথে আমার উঠাবসা হতো তারা সবাই ধনী, অবস্থাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশের। আমি সর্বদা হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের মধ্যে একটা পরিষ্কার পার্থক্য লক্ষ্য করলাম।

তার শেষ কথায় শ্রোতৃমন্ডলীর মন কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং সবার দৃষ্টি মহিলার উপর নিবদ্ধ হলো।

মহিলা বিস্ময়-বিহ্বলতার এক অপরূপ অবয়বে পরিণত হলেন।

মহিলা বলা আরম্ভ করলেন ঃ যতই আমি হিন্দু মহিলাদের সাথে মিশতাম ততই তাদের শরীর হতে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করতাম। কিন্তু এও দেখলাম, কোন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম মুসলিম মহিলার শরীর থেকে এ ধরনের গন্ধ পাওয়া যেতো না। স্বামীর জীবিত অবস্থা হতে এ পর্যন্ত আমি গবেষণা করলাম ঃ কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। কিছুদিন হলো এই সত্য উদঘাপিত হলো। আমি আবিষ্কার করলাম, যেহেতু মুসলমানরা খোদার পূজারী এবং তাঁদের আত্মাও পাক- সে জন্য মুসলমানদের শরীর হতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। তারা পরিষ্কার কাপড় পরিধান করুক বা অপরিষ্কার কাপড়ই পরিধান করুক- তাদের শরীর সে ধরনের গন্ধ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অপরপক্ষে হিন্দুরা যেহেতু মুশরেক তাদের আত্মা নাপাক। তাই তারা যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক- তাদের শরীর থেকে গন্ধ বের হবেই। এই ঘটনার পর রমণীর চক্ষু হতে অশ্রু গড়াতে লাগলো। তারপর চেহারায় ঈমান ও বিশ্বাস, যোশ ও দীপ্তির লোহিত রশ্মি দৃশ্যমান হতে লাগলো। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা আমাকে নিজের অবস্থার প্রতি ছেড়ে দাও। আমি ইসলামের তৌহিদের নূরের আলো দ্বারা নিজের রূহকে পবিত্র করতে চাই। আমি অবশ্যই মুসলমান হবো।

এই বলে সাহসী-বিদুষী মহিলা উত্তেজিত আত্মীয়-স্বজনের সামনে কালেমা পড়তে লাগলেন। আত্মীয়-পরিজন হা-হুতাশ করতে লাগলো। কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলো না। সেই মহিলা নিজের অঙ্গীকারে অটল অবিচল থাকলো। অবশেষে মুসলমান হয়ে গেলো।[১]

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর মুসলিম সংস্কৃতির অনেক কিছুই বিতাড়িত হয়। কিন্তু খানা ও পোশাক বিতাড়িত হয়নি। মুসলিম সংস্কৃতির অনেক কিছুই অনুশীলন করা হতো। এরমধ্যে অন্যতম হলো ঃ পোশাক ও মোগলাই খানা। দেশীয় খাবারের সাথে

১। মুহাম্মদ সাথি মিঞা, ইকবাল সাহিত্যে নও-মুসলিম প্রসঙ্গ, আল্লামা ইকবাল, নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যা, পৃঃ ৪৯-৫৩।

মোগলাই খানাও ঠাকুর বাড়ীর ডাইনিং টেবিলে মৌ মৌ সুগন্ধ ছড়াতো। মাংসের চপ, শিক কাবাব, রোস্ট, কাটলেট, পোলাও, কাবাব, পরোটা, বিরয়ানী, পায়েস, ক্ষীর, জর্দা, কালিয়া, কোপ্তা প্রভৃতি সুস্বাদু লোভনীয় খাবার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলিম সংস্কৃতির উদ্ভাবন বলে জোঁড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ীতে পরিত্যাজ্য হয়নি। রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ীর বাবুরা মাঝে মাঝে ধর্মীয় উৎসবে ধূতি পরলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় অথবা মুসলিম পোশাক পরিচ্ছদ আমৃত্যু পরিধান করে গেছেন।

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় 'জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সংস্কৃতি' শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখেছেন শ্রী শোভন। তিনি এই প্রবন্ধে বলেন ঃ "ঊনিশ শতকে ভদ্র বাঙালীর ব্যবহারিক পোশাক ছিল না। তারা নবাবী আমলের ভদ্র পোশাক চোগা-চাপকান-পাগড়ী পরতেন।"[২]

এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় ডঃ এম এ রহীমের "বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস" নামক সুবিখ্যাত বই-এর দ্বিতীয় খন্ডে। তিনি লিখেছেন ঃ

"উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন। মুসলমান পোশাক পরিধান করা তাদের নিকট বিরাট সম্মানের ব্যাপার বলে বিবেচিত হতো। আনন্দ-উৎসবের সময় হিন্দু অভিজাত ব্যক্তিগণ মুসলমানদের ন্যায় পোশাক পরতেন।"

সমকালীন হিন্দু লেখকগণের বর্ণনায়ও হিন্দু রমণীদের মুসলমানী পোশাকে চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তারা ঘাঘরা ওড়না এবং কাঁচুলী বা চোলি ব্যবহার করতো।"[৩]

শ্রী শোভন সোম তার উক্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আরো লিখেছেন ঃ

রাজা রামমোহন রায় নবাবী আমলের পোশাক পরে অভিজাত সেজে ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন। তিনি লিখেছেন, ছবিতে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও পাগড়ী-টুপি, চোগা-চাপকান ইত্যাদি যেসব পোশাকে দেখা যায়, সেই পোশাক মুসলিম জামানার উত্তরাধিকার। "এই পোশাকই ছিল ভদ্রতা, সামাজিকতা, সৌজন্য রক্ষার পোশাক"। শ্রী শোভেন সোম তাঁর উক্ত প্রবন্ধে আরও লিখেছেন, "আঠাবো শতকেও এ দেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা বাইরে একেবারে বেরোতেন না। বার আঙিনা পেরোনোও নিষিদ্ধ ছিল। ঊনিশ শতকে যখন মেয়েরা একে একে বাইরে বেরোতে লাগলেন, তখন দেখা দিল মেয়েদের পরিচ্ছদের সমস্যা। বয়স নির্বিশেষে বাঙালী মেয়েদের পরিচ্ছদ ছিল কেবল একটি শাড়ি। কোন অন্তর্বাস ছিল না। এদেশের মেয়েরা যখন প্রথম বাইরে বেরোন তখন ভব্যতা রক্ষার জন্য মেম সাহেবদের মত গাউন পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে

২। শ্রী শোভন, দেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যা দ্রঃ।
৩। ডঃ এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৩১৩।

কিম্ভুতকিমাকার পোশাকে বেরোতেন।"

তিনি আরও লিখেছেন, "এ যাবৎ বাড়ীর (ঠাকুরবাড়ীর) মহিলারা পালকি ছাড়া কোথাও যান নি। সেই সমস্যা দেখা দিল যখন জ্ঞানদা নন্দিনী বোম্বে অঞ্চলে স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে যাবেন তখন। অন্তর্বাসহীন শাড়ি এমনি পোশাক যে তা পরে বাইরে বেরোনো যায় না। তাই ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে বানানো হলো অদ্ভুত এক ওরিয়েন্টাল ড্রেস। বোম্বে গিয়ে পারসি গজরাতি মেয়েদের শাড়ির ধরন তার ভাল লাগলো। দু'বছর বাদে জ্ঞানদা নন্দিনী আর স্বর্ণকুমারী অন্তর্বাসসহ শাড়ি পরে দেশে ফিরলেন।"

জানা যায়, জ্ঞানদা নন্দিনী শাড়ি পরা শেখানোর জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই থেকে ঐ ধরনের অন্তর্বাসসহ শাড়ি পরার নাম হয় ঠাকুরবাড়ীর শাড়ি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই মাত্র সেদিন এ দেশের বাঙালীরা সুসভ্য হবার মত পোশাক আবিষ্কার করেছিল।

শ্রী শোভন সোম লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথদের তিন ভাই-এর সংগে (এক পার্টিতে) চললেন ধূতি-পাঞ্জাবী ও চটি পরে। পার্টি যারা দিয়েছিলেন আর যারা পার্টিতে গিয়েছিলেন তাঁদের সাজ পোশাক দেখে হতভম্ব। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বললেন না। পার্টিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন এ কি রকম ব্যবহার, এ কি রকম অসভ্যতা। লেডিজদের সামনে খালি পায় আসা"। মোজাবিহীন খালি পায়ে পার্টিতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে যেখানে 'অসভ্য' গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই থেকেই ধূতি পাঞ্জাবী পরা বাদ দিয়ে দার্জিলিং-এ দেখা তিব্বতীদের বকুর, সংগে মুসলমানি আলখাল্লা মিলিয়ে মাথায় ঈষৎ হেলানো তুর্কী টুপীর আদলে এক ধরনের লম্বা টুপী এবং পায়ে মোজাসুদ্ধ নাগরা জুতা ব্যবহার শুরু করে ছিলেন। এই পোশাকেই রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কারণ সে যুগে সেলাইবিহীন কাপড় সভ্য সমাজে চলত না। শ্রী শোভন সোম তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন "মজলিশে যেতে হত কাটা কাপড় পরে, ধূতি চাদর চলত না। আবার হিন্দুর বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পূজা ইত্যাদিতে ধূতি চাদর পট্টবস্ত্র পরতে হত, কাটা কাপড় চলত না।"[৪]

নীরদ চৌধুরী তাঁর 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর অভ্যাসমত অপ্রচুর পোশাক পরিয়া পিতার কাছে গেলেন, তখন তাঁহাকে চাপকান ও টুপি পরিয়া আসিতে বলা হইলো।"[৫]

পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ পোশাক-পরিচ্ছদে বাবার বরাবরই বেশ রুচি ছিল। তরুণ বয়সে তিনি ধূতির উপর

৪। তথ্যসূত্র ঃ আরিফুল হক, দৈনিক ইনকিলাব, ৭/৩/৯৭।
৫। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৫।

সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবী পরতেন। গলায় ঝোলাতেন সিল্কের চাদর এই বাঙালী বাবুর পোশাকে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাত। লোকে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করতো। বাংলাদেশের বাইরে তিনি যখন বেড়াতে বেরোতেন তাঁর পরনে থাকত টাউজার, গলাবদ্ধ, লম্বা কোট অথবা আচকান, আর মাথায় থাকত ছোট্ট একটা পাগড়ি। এই ভাঁজে ভাঁজে শেলাই করা পাগড়ি ছিল নতুন জ্যাঠামশাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবিষ্কার। লোকে এর নাম দিয়েছিল 'পিরালি পাগড়ি'। এর অনেক বছর পরে বাবা আচকানের বদলে ঢিলেঢালা লম্বা জোব্বা ধরলেন। কখনো কখনো একটি জোব্বার উপর আর একটি জোব্বা চড়ানো হত। মাথায় পরতেন নরম মখমলের উঁচু গোছের টুপি। রঙিন কাপড়ে বাবার কোন বিরাগ ছিল না- তাঁর পছন্দ ছিল ফিকে বাদামী বা কমলা রঙ। পরিণত বয়সে যাঁরা বাবাকে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে এইসব হালকা রঙের পোশাকে বাবাকে কি সুন্দর মানাত।[৬]

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন ঃ

রবীন্দ্রনাথকেও লুঙ্গি পরতে দেখেছি। পায়জামা তো ঠাকুর পরিবারের পুরুষরা সকলেই প্রকাশ্যে পরতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহিয়র্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৌখিনতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের দম্ভ প্রকাশেরও একটি মজার কাহিনী রয়েছে। কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন ঠাকুর পরিবারের সদস্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখেছেন ঃ

.... শ' বাজারের রাজবাড়িতে জলসা হবে, বিরাট আয়োজন। শহরের অর্ধেক লোক জমা হবে সেখানে, যত বড়ো বড়ো লোক রাজা-রাজড়া সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে। তখন কর্তা দাদামশায়ের বিষয় সম্পত্তির অবস্থা খারাপ- ওই যে সময়ে উনি পিতৃঋণের জন্য সবকিছু ছেড়ে দেন, তার কিছুকাল পরের কথা। শহরময় গুজব রটল বড়ো বড়ো লোকেরা বলতে লাগলেন- দেখা যাক এবারে উনি কি সাজে আসেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। বাড়ীর কর্মচারীরাও ভাবছে তাইতো। গুজবটি বোধ হয় কর্তা দাদা মশায়ের কানেও এসেছিল। তিনি করমচাঁদ জহুরীকে বৈঠকখানায় ডাকিয়ে আনালেন বিশেষ দেওয়ানকে দিয়ে। করমচাঁদ জহুরী সেকালের খুব পুরনো জহুরী- এ বাড়ির পছন্দমাফিক সব অলঙ্কারাদি করে দিত বরাবর। কর্তা দাদা মশায় তাকে বললেন, এক জোড়া মখমলের জুতোয় মুক্তো দিয়ে কাজ করে আনতে। তখনকার দিনে মখমলের জুতো তৈরি করিয়ে আনতে হত। এখন জামাকাপড় কী রকম সাজ হবে। সরকার দেওয়ান সবাই ভাবছে শাল-দোশালা বের করবে, না কি সিল্কের জোব্বা, না কী? কর্তা দাদা মশায় হুকুম দিলেন- ওসব কিছু নয়, আমি সাদা কাপড়ে যাব। তখনকার দিনে কাটা

৬। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ২২৩-২৪।

কাপড়ে মজলিসে যেতে হ'ত ধূতি চাদরে চলত না। জলসার দিন, কর্তা দাদামশায় সাদা আচকান জোড়া পরলেন, মায় মাথায় মোরাসা পাগড়িটি অবধি সাদা, কোথাও জরি কিংখাবের নামগন্ধ নেই। আগাগোড়া ধবধবে করছে বেশ, পায়ে কেবল সেই মুক্তো বসানো মখমলের জুতোজোড়াটি। সভাস্থলে সবাই জরিজরা কিংখাবের রংচঙে পোশাক পরে, হীরে মোতি যে যতখানি পারে ধনরত্ন গলায় ঝুলিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছেন- মনে মনে ভাবখানা ছিল দেখা যাবে দ্বারকানাথের ছেলে কী সাজে আসে। সভাস্থল গমগম করছে- এমন সময় কর্তা দাদামশায়ের সেখানে প্রবেশ। সভাস্থল নিস্তব্ধ- কর্তা দাদামশায় বসলেন একটা কৌচে পা দুখানি একটু বের করে দিয়ে। কারও মুখে কথাটি নেই। শ-বাজারের রাজা ছিলেন কর্তা দাদামশায়ের বন্ধু, তাঁর মনেও যে একটু যে ভয় ছিল না তা নয়। তিনি তখন সভার ছেলেছোকরাদের কর্তা দাদামশায়ের দিকে ইশারা করলেন- দেখ্ তোরা একবার চেয়ে দেখ্ এদিকে, একেই বলে বড়লোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি- ইনি তা পায়ে রেখেছেন।[৭]

এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায়ই প্রবাসে থাকতেন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। অল্প কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসতেন। তখন তাঁর প্রভাবে সমস্ত ঠাকুরবাড়ী গম্‌গম্ করতো। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন- "দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন।[৮]

সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের লোকেরা এই পাজামা, শেরওয়ানী এমনকি রুমি টুপিও পরলে বলা হতো 'ওরিয়েন্টাল ড্রেস'। আর মুসলমানেরা পরলে উপহাস করে বলা হতো ওটা মিয়া সাহেবের পোশাক। এই ওরিয়েন্টাল ড্রেস বা মিয়া সাহেবের পোশাক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয়দের কাছে রুচিশীল, সেলাই ছাড়া ধূতি পরা অরুচিকর এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এ পোশাক তাদের দেশে বর্জনীয় হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের অনুষ্ঠানে এ পোশাকের মহড়া দেখানো হয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় সংস্কৃতি উৎসব '৯৬' অভ্যাগত অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করা হয়েছে সেলাইবিহীন ধূতি পরা খালি গায়ের দু'জন ঢুলি দিয়ে।

তাই সচেতন মহল আশংকা করছেন, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বসুরীরা যে মুসলমানী পোশাক পরে নিজেদেরকে অভিজাত বোধ করতেন, সেই পোশাক বর্জন করে অরণ্য সভ্যতার ফিরে যাবার এ ইঙ্গিত দিচ্ছেন আমাদের এ দেশীয় রবীন্দ্র ভক্তরা আল্লাহই জানে।"

৭। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতি রাণীচন্দ ঃ ঘরোয়া, পৃঃ ২৩-২৪।
৮। রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ১৭, পৃঃ ৩০৬।

নজরুল একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত নজরুল মেলার হিন্দি পোস্টার

নজরুলের দারিদ্র্যতা

"হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান।
কন্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস।"

- *নজরুল*

কবি নজরুলের এককালের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি লুৎফর রহমান জুলফিকার দৈনিক মিল্লাতে লেখালেখির সুবাদে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায়ই আসতেন। সম্মানী বিল পাস করার জন্য সম্পাদক সাহেবকে না পেলে আমার রুমে অপেক্ষা করতেন। সে সুযোগে ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় ঘটে আর কবি নজরুলের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে আলাপ হয়। কবি লুৎফর ছিলেন দারুণ চা খোর। তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিলো চা পানের আগে একটি বিস্কুট খাওয়া। আমি এই সুযোগটি গ্রহণ করি। যখনই তিনি মিল্লাতে আসতেন তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ আলাপের আবহ সৃষ্টি এবং দীর্ঘক্ষণ আটকিয়ে রাখার জন্য ঘন ঘন চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করতাম। কবি লুৎফরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কবি নজরুল বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। এর মধ্যে অনেক তথ্য অতিরঞ্জিত বা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। নজরুলের প্রতি সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের ব্যবহার এবং অনেক ঘটনা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য।

তিনি নজরুলের সঠিক প্রাপ্য কোনদিনই পরিশোধ করেননি। আর্থিক সংকটে টাকা চাইতে গিয়ে অনেক সময় কবিকে অপমান-অপদস্থ হতে হয়েছে। অপমানজনক কথা হজম করতে হয়েছে। অথচ নজরুলের কাছ থেকে নাসিরুদ্দীন সাহেব লেখা আদায় করেছেন অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে কামরায় আটকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে। তিনি নজরুলকে ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থে। পরবর্তীতে তা শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিলো নাসিরুদ্দীন সাহেবের জন্য। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে এই সম্পাদক সাহেব ছিলেন নজরুল প্রেমে গদ্‌গদ্‌। সভা-সমিতিতে ও বিভিন্ন লেখায় নজরুল বিষয়ে অনেক চটকদার কথা বলে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন।

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড পাহাড়ে নজরুল

শুধু নাসিরুদ্দীন সাহেব নয়। অনেক প্রকাশক এবং পত্রিকার সম্পাদক কবি নজরুলের সঠিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, প্রতারিত হয়েছেন। এই তালিকায় বাংলার জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকও রয়েছে। এঁরা সবাই কবিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী কবি হিসাবে মূল্যায়ন বা মর্যাদা দেয়নি।

কবি নজরুল বরাবরই পদ-পদবী ও অর্থ-বিত্তের প্রতি ছিলেন উদাসীন, নির্মোহ। চিত্তও ছিলো উদার। এই উদারতার কারণে অনেক প্রকাশকের কাছেই প্রতারিত হয়েছেন অথবা সঠিক প্রাপ্য হতে বঞ্চিত হয়ে অশেষ আর্থিক কষ্ট ভোগ করেছেন। সময় মত বইয়ের অর্থ না পেয়ে অনেক সময় তিনি নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জানিয়ে সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য হতেন। নজরুল গবেষকদের বইয়ে এরকম বহু চিঠির কথা বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি চিঠির বিষয়বস্তু এখানে উল্লেখ করছি।

কবি নজরুল কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলী ধর বসুকে একখানা পত্রে লিখেন ঃ

'তোমার চিঠি যখন পাই, তখন আমি বিছানা-সই-হয়ে পড়ে আছি। তাই উত্তর দিতে পারিনি। প্রায় মাস খানেক ধরে জ্বরে ভুগে আজ দিন চারেক হ'ল ভাল আছি।

আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং চারিদিক দিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়েছি যে, এবার বুঝি সামলানো দায় হবে এই ভেবেছিলুম প্রথমে। অবশ্য সামলে যে উঠেছি তা-ও নয়। নিত্য অভাবের চিত্তক্ষোভ আমায় আরো দুর্বল করে তুলেছে। এখনও বাড়ী

ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই। আমি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু গজলের সুরে। তার কয়েকটা 'সওগাতে' দিয়েছি। দু'টো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি- 'বঙ্গবাণী'তে দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে দেবার জন্য। অন্য সব জায়গায় দশ টাকা ক'রে দেয় আমার প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, এ কথা ওদের বলো। গান দু'টি পেয়ে যদি ওরা টাকাটা দেয় তা'হলে আমার খুব উপকারে লাগে। আমাদের আর- মান ইজ্জত রইলো না। মুরলী দা, না! অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেয় শেষে।...... "নজরুল।"

১৯২৬-এ নজরুল কৃষ্ণনগরে ছিলেন এবং দুঃসহ আর্থিক অনটন তাঁর মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯২৬-২৭-এ কৃষ্ণনগরে থাকার সময়ে লেখা প্রায় প্রতিটি চিঠিতে তাঁর সেই দুঃসহ অভাবের কথা উল্লেখিত আছে। টাকা সাহায্য বা ধার চেয়ে বা পাওনা টাকা চেয়ে তিনি এ সময় অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠি লিখেছেন।

যেমন ব্রজবিহারী বর্মনকে লিখছেন ঃ

"চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাই সবচেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ জানেন। তোমার প্রেরিত পনর টাকা পেয়েছি। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলুম। অবশ্য, তোমারও বিপদ আপদের কথা শুনলাম। আরও যদি পাঠাতে পার এই দুর্দিনে। বড় উপকৃত হব।"

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখেছেন ঃ

"Variety entertainment-এর কী কতদূর করলি জানাবি। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল আমার পক্ষে। কেননা, আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'য়ে উঠছে।"

২৩.৪.২৭-এ শ্রী ব্রজবিহারী বর্মনকে লিখছেন-

"তুমি পত্রপাঠ মাত্র অন্ততঃ কুড়িটি টাকা T.M.O. ক'রে পাঠাও। নৈলে বড় মুশকিলে পড়ব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নেই। টাকা না পাঠালে বড় বিপদে পড়ব। বহু দেনা করেছি, আর টাকা পাওয়া যাবে না ধার এখানে।"

১২.১১.২৭ তারিখে মাহফুজুর রহমান খানকে লিখছেন-

শিরস্ত্রাণ পরিহিত নজরুলের আরেকটি বিশেষ ছবি

স্বদেশ টুপী পরিহিত নজরুল

"আমি অর্থ উপার্জন ছাড়া বোধহয় জগতের সবকিছু করতে পারি। ঐ জিনিসটের মালিক হ'তে হ'লে যতটা নীচে নামতে হয়, ততটা নামবার দুঃসাহস আমার নেই। এক এক সময় নিবিড় বেদনার সঙ্গে অনুভব করি যে, কত বিরাট সম্ভাবনার আশা আমার অভাবের আওতায় খর্ব হ'য়ে গেল।"

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সাহেবকে লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ হলো-

"গোপাল দা, একশ' টাকার সব টাকা দেননি। চিঠি লিখে উত্তর পাইনি।... অন্য পাবলিশারের কাছেও টাকা পাচ্ছি না চিঠি লিখে, লেখার দামও পাচ্ছিনে। যেখানে যেখানে পাবার কথা।".... নজরুল।

উল্লেখ্য, এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতা লেখেন। যেখানে তিনি দারিদ্র্যকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখেছিলেন-

"দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিল বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান যতবার নিতে যাই-
হে বুভুক্ষু তুমি অগ্রে আসি কর গান!
শূন্য মরুভূমি হেরি মম কল্পলোক।
আমার নয়ন আমারি সুন্দরে করে অগ্নি-বরিষণ!"

এই সম্পর্কে সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন লিখেন-

কবিতার বই বিক্রি করে প্রকাশক বা কবির লাভবান হওয়ার দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল। .. তদুপরি তাঁর গানগুলি সর্বত্র সমাদৃত হওয়ায় তিনি বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি এবং নাট্যমঞ্চের জন্য গান লিখে ও তাতে সুর দিয়ে যথেষ্ট অর্থ আয় করতে থাকেন। কাজেই

বলা যায়, ১৩৩৪ সালে সওগাতের কাজে যোগদান করার সময় হতে তাঁর অর্থ চিন্তা প্রবল ছিলোনা। গান লিখেই প্রচুর অর্থ পাওয়া যেত বলে তিনি সেদিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন। অর্থাগম ছাড়াও এ সময় তাঁর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে তিনি গান ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা লিখতে চাইতেন না। সওগাতেও মাঝে মাঝে দু'একটা কবিতা ছাড়া গানই বেশি দিতেন। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি থেকে ভালো রকম টাকা পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ছয় সিলিন্ডারের বড় আকারের একটি সুদৃশ্য আমেরিকান 'ক্রাইস্লাম' গাড়ী ক্রয় করেন। এই সময় তিনি বই-এর প্রকাশনার গান লেখা, রেকর্ড করা প্রভৃতি কাজেই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তখন নজরুল যেমন রোজগার করতেন, তেমনি দু'হাতে খরচও করতেন বে-হিসেবীর মতো। যার পরিণামে তাঁকে পুনরায় অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। ১৩৪৭ সালে কবিপত্নী প্রমীলা নজরুল অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নজরুলের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো। ১৩৩৪ সাল থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত নজরুল আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত হতে মুক্ত ছিলেন। অনেকে বলেন, নজরুল সারা জীবন আর্থিক দুর্গতির মধ্যে কাটিয়েছেন। এ কথা ঠিক নয়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে ও শেষের দিকে তিনি অর্থকষ্ট ভোগ করেছেন।[১]

দেখা যায়, নজরুলের সারা জীবনের মাত্র ১৩ বছর আর্থিক সচ্ছলতা ভোগ করেছেন। আর অধিকাংশ সময়ই তিনি চরম আর্থিক দৈন্যতায় কাটিয়েছেন। এ জন্যে তাঁকে জীবিকার তাগিদে কঠিন শ্রম দিতে হয়েছে। নয় বছরের সময় বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক দৈন্য-দুর্দশার কারণে মক্তবের শিক্ষকতা, মাজারের খাদেমগিরি, মসজিদের ইমামতি, জনৈক রেলগার্ডের বাসায় ও রুটির দোকানে চাকরি এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান ছাড়াও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য আরো অনেক কিছু তাঁকে করতে হয়েছে। কাজেই, যে বয়সে আর দশটি ছেলে যখন খেলাধুলা হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত থাকে, নজরুল তখন অপরিণত বয়সে জীবিকার তাগিদে চাকরি করছেন।

এ দারিদ্র্য ছিল তাঁর কাছে গৌরবের। দারিদ্র্য তাঁকে করে তুলেছিলো মহান। জমিদার তনয় উচ্চাভিলাষী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ভাষায় যখন শুনি-

"তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।"

কবি নজরুল অত্যন্ত অহংকার ও গৌরবের সাথে দীপ্তকণ্ঠে কবিতার ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ

"হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান
মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান।

১। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৭৬২।

কন্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস।"

তিনি আরো বলেন-

"দারিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দারিদ্র মোর ভাই,
আমি যেন মোর জীবনের নিত্য কাঙ্গালের প্রেম নাই
তাদের সাথে কাঁদিব, তাদের বাঁধিব বক্ষে মম
দারিদ্র, মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।"

কিন্তু তারপরেই কবির কাছে দারিদ্র্য এক তীব্রতম যন্ত্রণাদায়ক মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে ঃ

"দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!"

আবার দারিদ্র্যে নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত কবি আর্তনাদ করে উঠে আক্ষেপের সুরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেন ঃ

"পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!- মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি"

নজরুলের বন্ধুকে লেখা থেকে জানা যায়- নজরুল দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু রুচিতে তিনি অভিজাত শ্রেণী অথবা অর্থশালী লোকদেরও ছাড়িয়ে যেতেন। কোনো সময় কোন অবস্থাতেই তিনি তার জীবনের মান থেকে নিচে নামেননি। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিলো টাকা না থাকলে উপোস দিতেন; কিন্তু টাকা থাকলে ভালো জিনিসই খেতেন। পান আর জর্দা তিনি প্রচুর খেতেন। সস্তা দামের নিম্নমানের জর্দা তাকে কোনোদিন খেতে দেখেননি। বাজারের সেরা সোনালী-রূপালী তবক দেয়া খোশবুদার জর্দা তিনি খেতেন। টাকা থাকলে কোথাও যেতে হলে ট্যাকসীতে চেপে যেতেন, নতুবা যেতেন ট্রামে। কলিকাতার মানুষ টানা রিকশায় কখনো চাপতে তাঁকে দেখেননি।

আর্থিক দীনতার কারণে কবি নজরুল দামী পোশাক-পরিচ্ছদ তিনি পরতে পারেননি বটে; কিন্তু কম দামী পোশাক-পরিচ্ছদেও ছিলো দারুণ শালীনতা ও রুচিবোধের পরিচায়ক। খদ্দরের পাঞ্জাবী, নিমা, ধুতি ও চাদর তিনি পরতেন। এ ছাড়া শোনা যায়, রঙিন জামা-কাপড় ছিলো তাঁর দারুণ পছন্দ। হলদে কিংবা কমলা রংয়ের পাঞ্জাবীর সাথে চাদর দুটোও থাকতো একই রংয়ের। এর কারণ নাকি ছিলো অনেক লোকের মধ্যে চট করে নজরুলকে চোখে পড়া।

পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁর কতটা রুচির পরিচায়ক ছিলো তা জানা যায় জেলখানার একটি ঘটনায়। জেল-কয়েদীদের যে কাপড় ব্যবহার করতে দেয়া হয়, তাতে প্রথম আগতদের কাপড়ে ("A" Class Prisoner) থাকে সরু নীল রেখা। আর দ্বিতীয় বার আগতদের ("B" Class Prisoner) জন্য থাকে বেশ চওড়া রেখা টানা কাপড়। নজরুল নিজের বৈশিষ্ট্য, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের কারণে এই নীল সুতাগুলো টেনে বার করে ফেলেছিলেন জামা থেকে। ফলে তাঁর জামা হয়ে পড়েছিলো অন্যান্য কয়েদীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একেবারে সাদা। এটা জেল আইনের পরিপন্থী হলেও কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি করেননি। নজরুলের অনুসরণে অন্যান্য রাজবন্দী কয়েদীরাও তাদের জামা থেকে নীল সুতো তুলে ফেলেছিলেন।

যাহোক, কবি নজরুল আমৃত্যু পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলেন দারুণ সচেতন। আর তা ছিলো খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন :

কবি নজরুলের রুচিশীলতার বর্ণনা পাওয়া যায় খান মঈনুদ্দীনের স্মৃতিচারণে। তিনি যুগ স্রষ্ট নজরুল-এ লিখেছেন ঃ

একবার দশ টাকায় তিনি একসেট চা-এর সরঞ্জাম কিনেছিলেন। তার ভিতরে একসেট পেয়ালা-পিরিচ ছিল অতি সুন্দর। এর গায়ে ছিল বিদেশী আর্টিস্টের আঁকা একটি অপূর্ব ছবি। পাইল ভরে ছোট একখানা নৌকা তর তর করে এগিয়ে চলেছে, একটা গাছের ডাল এসে পড়েছে নদীর ওপর। সেই ডালে বসে আছে ছোট একটি পক্ষী-দম্পতি। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট দিয়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটু অসাধারণত্বই ফুটেছিল ঐ পেয়ালা-পিরিচের গায়ে আঁকা ছোট ছবিতে। আর রংটাও ছিল ভারী সুন্দর, ভারী মানানসই। তাই ওর বহিরসৌন্দর্য ছিল লোভনীয়। দেখলেই হাত বাড়াতে ইচ্ছা হয়।

একদিন চা খেতে বসে ঐ পেয়ালার দিকেই হাত বাড়িয়েছিলাম আমি। আর সে-দলে আমিই ছিলাম সবচেয়ে ছোট।

কিন্তু নজরুল স্নেহমিশ্রিত ধমকে আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন ঃ "এ্যাওঁ, থাম, থাম, ওদিকে লোভ দিস্‌নে।"

লজ্জিত হয়ে, হাত টেনে নিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম ঃ ও পেয়ালা-পিরিচ শুধু নিজে ব্যবহারের জন্যই কিনেছেন তিনি। ঐ পেয়ালায় অন্য কারো চা খাবার অধিকার নাই।

চরম দারিদ্র্যতা থাকা সত্ত্বেও কবি নজরুলকে বিচ্যুত করতে পারেননি তাঁর রুচিবোধ থেকে।

শিশু পুত্রের মৃত্যু শয্যায় বসে তিনি অনুবাদ করলেন রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ। হাফিজের বিখ্যাত পংক্তিমালার বাংলা তরজমা। বুলবুল গাড়ি চড়তে ভালবাসতো। তাই বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করে সন্তানের ইচ্ছাকে পূর্ণ করলেন স্নেহশীল পিতা কবি নজরুল।

শিরস্ত্রাণ পরিহিত নজরুল

এটাকে অনেকে কবির বিলাসিতা বা অপব্যায় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইতোপূর্বে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের বক্তব্যে কবি নজরুলের গাড়ী ক্রয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানা যায় খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন রচিত "যুগ স্রষ্টা নজরুল" গ্রন্থ থেকে ঃ

"একবার নজরুল নয় হাজার টাকায় একখানা মোটর কিনেছিলেন সাময়িক মোহে পড়ে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস, বই বিক্রি, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান প্রভৃতি নানা উপায়ে তখন বেশ টাকা-পয়সা আমদানি করছিলেন। ধারণা হয়েছিল ঃ মোটর রাখার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন। মোটর কিনেছিলেন তিনি ক্রম দেয় চুক্তিতে। এজন্য প্রথম যে কয়েক হাজার টাকা মোটর কোম্পানিকে দিতে হয়েছিল, তা দিতে হয়েছিল তাঁর 'অগ্নিবীণা'র খুব সম্ভব এক সংস্করণের স্বত্ব বিক্রি করে। এই মোটর কিনতে গিয়েও তিনি অত্যন্ত সুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। হল্‌দে রঙের জাঁকজমকপূর্ণ মোটর; মোটর-অধ্যুষিত কোলকাতা নগরীতে একটা দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় আধমাইল দূর থেকে দেখলেই বোঝা যেতো ঃ ঐ নজরুলের গাড়ী আসছে। জীবনের একটি সখ পূরণ এবং রুচির এই পরিচয় দিতে গিয়েও তাঁকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মোটরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাকে বহুবার। কলিকাতার দু'নম্বর ডিস্ট্রিকটের গো-খানার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন জনাব আব্দুল হামিদ সাহেব। কি এক উৎসব উপলক্ষে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে দাওয়াত করেছিলেন। এই উৎসবে গাড়ী নিয়ে নজরুলও এসেছিলেন। আর এসেছিলেন তৎকালীন ইনকামট্যাক্স অফিসার জনৈক খান বাহাদুর সাহেব। সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে যায়। সকল প্রকার যানবাহন তখন প্রায় বন্ধ। খান বাহাদুর সাহেব একাকী বাড়ী যেতে একটু বিপন্ন বোধ করছিলেন। কেমন করে তিনি বাড়ী ফিরে যাবেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। খান বাহাদুর সাহেব থাকেন পার্ক সার্কাসে; আর নজরুলকে যেতে হবে শ্যামবাজারে।

অর্থাৎ একজন থাকেন কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে, আরেকজন থাকেন উত্তর প্রান্তে। তবুও কবি নজরুল তাঁর গাড়ী করে ভদ্রতার খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করে খান বাহাদুর সাহেবকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেন। কিন্তু এর পরিণাম হলো বিপরীত। তিনদিন পর নজরুলের নামে নোটিশ এলো। তাঁকে আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব ইনকাম ট্যাক্স অফিসে দেখাতে হবে। নজরুল নোটিশ পেয়ে আকাশ থেকে পড়লেন। গাড়ী কেনার সখ মিটে যায়। চোখে সর্ষেফুল দেখেন। তাঁর হিসাবই নেই, তাঁর আবার হিসাবের খাতা কি? আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। ঘরে চলে নিত্য-নৈমিত্তিক ছুঁচোর কীর্তন। আর পকেটে তো সব সময় গড়ের মাঠ! দীর্ঘদিন উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর বন্ধু-বান্ধবদের অনেক চেষ্টা-তদবীরের ফলে পরবর্তীতে তা মিটমাট হয়েছিলো। পরবর্তীতে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে নাকি নজরুল অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন ঃ দেখলি তো ভদ্রতা দেখাবার পরিণাম?"[২]

কিছুকাল গাড়ী চালানোর পর নজরুলের জীবনে নানা বিপদের ঝঞ্ঝা এসে পড়ে। তিনি কোম্পানীকে চুক্তির শর্তাবলী মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে কোম্পানী কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে নজরুলের সাধের সুন্দর গাড়ীটি নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে নজরুল অত্যন্ত দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন।

এই চরম দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও কবি নজরুল তাঁর নীতি ও আদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে দারিদ্র্য ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কোন কিছুতেই তাঁকে কাবু করতে পারেনি। মেধা বিকাশের অন্তরায় হতে পারেনি। মানবতার কবি, মানুষের কবি শত দুঃখে দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়েও তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়াননি।

এমন চরম দারিদ্র্য নিয়ে কবি নজরুল যেভাবে দেশকে, দেশের জনগণকে ভালোবেসেছেন এবং জনগণের ভালোবাসা পেয়েছেন; অন্য কোনো কবির ক্ষেত্রে তা বিরল।

সম্পদ ও প্রাচুর্য যদি কোন মানুষকে মহামানবের স্তরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হতো; তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব হতো 'কারূন'। কিন্তু ইতিহাসে তিনি একজন ধিকৃত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতো মহামানব এসেছেন এবং চলে গিয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলো দরিদ্র। কবি নজরুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

মনীষী এডওয়ার্ড মূর বলেছেন ঃ "দারিদ্র্য মানবিক শিল্পের প্রধান উৎস, তেমনি কবির কল্পনায়ও প্রেরণা দাত্রী।"

এর সার্থক প্রতিফলন রয়েছে কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মে।

২। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, দ্রঃ।

কবি নজরুলের দুর্দিন

১৩৩৭ সালে কবি নজরুলের চার বছরের প্রিয় শিশু সন্তান বুলবুল গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। বুলবুলের রোগ শয্যার পাশে বসে কবি নজরুল বিখ্যাত পারস্যের অমর কবি হাফিজের 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' নামক কাব্য গ্রন্থটি "বুলবুল-ই-সিরাজ" নামে অনুবাদ শুরু করেন। যেদিন এই কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ শেষ হয়, সেদিনই বুলবুল মারা যান। বসন্ত রোগী বুলবুলের চিকিৎসার জন্য খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে এক সাধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন কবি। এদিকে বুলবুল মারা যান। আর সাধুকে না পেয়ে খান মঈনুদ্দীন ফিরে আসেন। বুলবুলকে হারিয়ে কবি নজরুল গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন খান মুহাম্মদ মঈনদ্দীন তার 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন ঃ

.......রাত তখন সাড়ে আট কি নয়টা হবে। আমাদের সাড়া পেয়ে কবি ওপর থেকে ছুটে নিচে নেমে এলেন। আর বুক জড়িয়ে ধরেই হু হু করে কেঁদে ফেললেন। ..সাধু কি এলোনা, সাধু কি মরা দেহে প্রাণ দিতে পারবে, বলে তিনি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন। হঠাৎ তার এমন অতর্কিত আক্রমণে, আর এই এলোমেলো কথায় হক চকিয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বার হলোনা! শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগলাম। ঘর ভরা গিজ গিজ করছে লোক। কবি বার বার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন আর ঐ একই কথার পুনরুক্তি করতে লাগলেন।

ঘরে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বোধ হয় আমার বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পারলেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন ঃ "মিনিট দশেক আগে বুলবুল মারা গেছে। আছাড় খেয়ে কবির বুকের উপর পড়লাম। বল্‌লাম ঃ "ভাই, মরাদেহে কি কেউ প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে?"

একজন কবিকে ধরে উপরে নিয়ে গেলেন। তার ঘন্টা খানেক পর ওখান থেকে বাসায় ফিরে এলাম।

... পরদিন সকাল ন'টা। কবির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। তখন অনেকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আবার অনেকেরই আসতে এখনো দেরী আছে। স্থির হলেছিল ঃ বাগ্‌মরী গোরস্তানে বুলবুলকে কবর দেওয়া হবে। সেখানেই গোসল এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

নজরুল বললেন ঃ "বাবা আমার খালি 'ভো-গাড়ীতে' চড়তে চাইতো। ওকে-কি

মোটরে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না?"

কেউ কেউ বললেন ঃ "হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখতে হবে। কোন ড্রাইভার বসন্ত রোগীর লাশ তার গাড়ীতে তুলতে চাইবে কিনা-বুঝতে পারছি না।"

এই সময় শুনতে পেলাম ঃ পূর্ব দিন যে সাধুকে দমদমে খবর দিতে গিয়েছিলাম, তিনি কাল এসেছিলেন। তখন রাত এগারোটা।

বহু চেষ্টার পর একজন শিখ ড্রাইভারের গাড়ী পাওয়া গেলো। তবে তাকে পাঁচ টাকা দিতে হবে। তখনকার বাজার দরের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশী।

কিন্তু টাকা? আর্য পাবলিশিং হাউস, ডি. এম. লাইব্রেরী অনেক জায়গায়ই লোক পাঠানো হয়েছিল টাকার জন্য। শুধু ট্যাক্সী ভাড়াই তো নয়। কাফন আছে, গোর-খোদাই আছে, তারপর জমি কিনে কবরের স্থান রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে-প্রায় দেড়শো টাকার দরকার। সে যুগে-দেড়শো টাকা তো অনেক। এতো টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? এই মুহূর্তে?

যে লোক টাকার জন্য গিয়েছিল, ফিরে এসে খবর দিলো, কোথাও টাকা পাওয়া গেলো না। আবার ডি.এম. লাইব্রেরীতে তাকে পাঠানো হলো। এরপর সম্ভবত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়ে ডি.এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী গোপাল দাশ মজুমদার মহাশয় নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। তবু অনেক টাকা বাকী রয়ে গেলো। জনাব হামিদ বাদবাকী টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।[১]

জনশ্রুতি রয়েছে, কবি নজরুল বুলবুলের লাশ ঘরে রেখে দাফন করার খরচের জন্য কোন এক প্রকাশকের কাছে গিয়ে কিছু টাকা চেয়েছিলেন। প্রকাশক অবশ্য জানতেন না যে, কবি সন্তানের লাশ ঘরে রেখে তার কাছে টাকার জন্য এসেছেন। টাকার বিনিময়ে একটি কবিতা লিখে দেয়ার জন্য প্রকাশক অনুরোধ জানালে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কবি তখন এই গানটি লিখে দিয়েছিলেন ঃ

"ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে
আমার গানের বুলবুলি।
করুণ চোখে বেয়ে আছে
সাঁঝের ঝরা ফাল্গুনি॥"

এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোন নজরুল গবেষকের সমর্থন পাওয়া যায়নি। অনেকে এটাকে নিছক গাল-গপ্পো হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমেদ একবার দৈনিক মিল্লাত অফিসে আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম। তিনিও একই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। গানটি যে কবি নজরুলের প্রিয় সন্তান বুলবুলকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে অনেকে তা

১। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃঃ ১৫৫-১৫৭।

স্বীকার করেছেন। এছাড়া বুলবুলের রোগ শয্যার পাশে বসে কবি নজরুল হাফিজের যে কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন তা প্রিয় পুত্রের স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ বইখানা উৎসর্গ করে লিখেছিলেন ঃ

বাবা বুলবুল,

তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে "বুলবুল-ই সিরাজ" হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি-উড়ে গেছ।...

জানিনা তুমি কোথায়? যে-লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ করো। তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুলবে। সিরাজী-বুলবুল-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি-

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শেয়রে তার।

বুলবুলের মৃত্যুর পর কবি জীবনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি অনেকটা আধ্যাত্মিকভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন। বুলবুলের মৃত্যুর বছরই কবি নজরুলের মৃত্যু ক্ষুধা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, নজরুল গীতিকা, ঝিলিমিলি, প্রলয় শিখা ও চন্দ্রবিন্দু বইগুলো প্রকাশিত হয়।

নজরুলের আধ্যাত্মিকতা

পুত্রের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পর ১৩৪৭ সালে কবি নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরকালের জন্য শয্যাশায়ী হন। এ সম্পর্কে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন "বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগে' লিখেছেন ঃ

"একে পুত্র শোকে তাঁর মন ভারাক্রান্ত তার উপর এই বিপদ মাথায় এসে পড়লো। স্ত্রীর রোগ সারাবার জন্য নজরুল প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেন। কবিরাজী, ডাক্তারী, দৈব চিকিৎসা, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, কিছুই বাকী রাখলেন না। দৈব ঔষধ পাওয়া যায় শুনে তিনি বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে দৌড়িয়েছেন। মন্ত্রবলে রোগ নিরাময় দেবে এই আশায় তিনি সন্ন্যাসী ফকিরদের কাছেও ধর্ণা দিয়েছেন। এ সময়ে কবির মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে।

...১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর রাজনীতিক দলের মুখপত্র হিসাবে দ্বিতীয়বার 'দৈনিক নবযুগ' বের করেন। কাগজ বের করবার কয়েক দিন আগে হক সাহেব এ সম্পর্কে আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন।

তিনি বল্লেন ঃ নজরুল ইসলামকে প্রধান সম্পাদক করলে কাগজ খুব চলবে। তাতে সে রাজি হবে কিনা জানা দরকার। পূর্বে একবার আমার কাগজ ছেড়ে রাগ করে চলে গিয়েছিল। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন রাজি করাতে পারেন কিনা, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

...নজরুলকে নিয়ে হক সাহেবের ঝাউতলা রোডের বাড়ীতে এলাম। ভৃত্য চেরাগ আলীকে দিয়ে খবর পাঠালাম। হক সাহেব তাড়াতাড়ি এসে বসলেন। নজরুল চুপ করে আছেন। হক সাহেব জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন আছ নজরুল? নজরুল বল্লেন ঃ ভালো আছি। আর কিছু বল্লেন না।

আমি নজরুলকে বল্লাম ঃ দৈনিক নবযুগ বেরুবে, আপনি হবেন প্রধান সম্পাদক। হক সাহেব বল্লেন ঃ তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে আমার কাগজ চলবে না, 'নবযুগ' যখন প্রথম বেরিয়ে ছিল, তখনও তুমি ছিলে এর সম্পাদক।

নজরুল এ কথার জবাব না দিয়ে হক সাহেবের দিকে এক দৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন, পরে ধীরভাবে বল্লেন ঃ আজকাল আমি অনেক বাণী পাই, গভীর রাত্রে সাধনা করি। আপনার জন্য কোনো বাণী এলে জানাবো।

এ ধরনের কথার প্রতি হক সাহেবের হয়তো আস্থা ছিল, তাই তিনি আশ্চর্য হলেন না।

হক সাহেব আমাকে বল্লেন ঃ আপনার উপর সব ভার দিলাম, আপনি নজরুলের সাথে কথা বলে সব ঠিক করে দিবেন।... কয়েকদিন পর 'নবযুগ' বেরুল। দেখে আশ্চর্য হলাম, নজরুল একটা কবিতা দিয়ে কাগজের সম্পাদকীয় লিখেছেন। যা একটি দৈনিক কাগজের নিয়মের ব্যতিক্রম এবং অশোভনও বটে। কয়েক দিন এভাবে চলল। কবির লেখা একটা গন্ডিতে আবদ্ধ। উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক দলের উপযুক্ত হলো না। ... নবযুগ বন্ধ হয়ে গেল।[২]

কবি নজরুলের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ

ইতিমধ্যে নযরুল ইসলাম সাহেবের মধ্যে একটু-একটু মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। আগেই শুনিয়াছিলাম তিনি বরদাবাবু নামক জনৈক হিন্দু যোগীর নিকট তান্ত্রিক যোগ সাধনা শুরু করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কাযী সাহেব মিষ্ট হাসি হাসিতেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক প্রাণ-চঞ্চল ছাদ-ফাটানো হাসি তিনি আর হাসিতেন না। তার বদলে উঁচু স্তরের এমন সব আধ্যাত্মিক কথা বলিতেন, যা সংবাদপত্র অফিসে মোটেই মানায় না। একদিন আফিসে আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ একটা জায়নমায ও ওযুর জন্য একটা বদনা কিনাইয়া দিন। তাই করা হইল। আফিসে দুতলার পিছন দিকে একটি ছোট কামরাকে নমাযের ঘর করা হইল। কাযী সাহেব সপ্তাহে দু'চার দিন যা আসিতেন

২। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ৮০৮-৮১০।

এবং দুই-তিন ঘন্টা যা থাকিতেন তার সবটুকুই তিনি ওযু ও নমাযে কাটাইতেন। ওযু করিতে লাগিত কমছে-কম আধ ঘন্টা। আর নমাযে ঘন্টা দুই। এ নমাযের কোনও ওয়াক্ত-বেওয়াক্ত ছিল না। কেরাত রুকু-সেজদা ছিল না। জায়-নমাযে বসিয়া হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিতেন এবং তার পরেই মাটিতে মাথা লাগাইতেন, সেজদার মত কোমর উঁচা করিয়া নয়, কোমর উরুর সাথে ও পেট জমির সাথে মিশাইয়া। এইভাবে ঘন্টার-পর-ঘন্টা এক সিজদায় কাটাইয়া দিতেন। আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাতে তিনি সিজদা শেষ করিয়া একবারই মাথা উঠাইতেন।

আমাদের দুশ্চিন্তার মধ্যেও এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে অন্ততঃ তান্ত্রিক সাধনা ছাড়িয়া তিনি মুসলমানী এবাদত ধরিয়াছেন। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, তাঁকে সেই দিনই পাঁচ শত নমায শিক্ষা কিনিয়া দিতে হইবে। কারণ তাঁর পাঁচ শত হিন্দু মহিলা শিষ্যা হইয়াছেন; তাঁদের সকলকে কাযী সাহেব নমায শিখাইবেন। তখন শেখ আবদুর রহিম সাহেবের 'নমায শিক্ষা'র দাম পাঁচ আনা। পাঁচশ কপি কিনিতে লাগে প্রায় দেড়শ টাকা। ম্যানেজার, একাউন্টেন্ট ও ক্যাশিয়ার গোপনে আমার সাথে পরামর্শ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হইল, দশটা টাকা দিয়া একজনকে বাজারে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। দশ টাকার যা পাওয়া যায় আনিয়া বলা হউক, মার্কেটে আর কপি নাই। তাই করা হইল। ত্রিশ কপি নমায শিক্ষা আনিয়া কাযী সাহেবকে দেওয়া হইল। ঐ কৈফিয়তটাও দেওয়া হইল। আশ্চর্য এই যে কাযী সাহেব ঐ ত্রিশ কপি পাইয়াই খুশী হইলেন এবং বিনা প্রতিবাদে চলিয়া গেলেন। আর কপি কোনও দিন চাইলেন না। আরও কপি কিনিবার ভয়ে কাযী সাহেবের হিন্দু শিষ্যাদের নমায শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধেও আমরা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিন্তু কাযী সাহেবের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আমার সহকর্মী মিঃ কালীপদ গুহ ও মিঃ অমলেন্দু দাসগুপ্ত এটাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এই দুই ভদ্রলোকের সংগে আমার আগের পরিচয় ছিল না। আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিক জীবনে বা কংগ্রেসী রাজনীতিতে এঁদের কোনও দিন দেখি নাই। তবু কাযী সাহেবের পীড়াপীড়িতে আমরা এই দুইজনকেই সহকারী সম্পাদক করিয়া নিয়াছিলাম। কাযী সাহেব এবং বোধ হয় ম্যানেজমেন্টের কেউ-কেউ আমাকে বলিয়াছিলেন যে উহারা 'যুগান্তর'- 'অনুশীলন' দলের বিপ্লবী লোক বলিয়াই কংগ্রেসী রাজনীতিতেও ওঁদের সাক্ষাৎ পাই নাই।...... কিন্তু আমি তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট হইলাম কাযী সাহেবের অসুখকে তাঁরা অগ্রাহ্য করিতেন বলিয়া। শুধু অগ্রাহ্য করা নয়, এটাকে তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। আমি ও-সব কথাকে প্রথমে হাসিয়া এবং পরে দৃঢ়তার সাথে উড়াইয়া দিতাম বলিয়া আমার সামনে তাঁরাও ও-বিষয়ে কথা আর বলিতেন না। ফলে লাভ এই হইল যে, কাযী সাহেব আমার রুমে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে না বসিয়া প্রায়ই সহ-সম্পাদকদের জন্য নির্দিষ্ট রুমে অমল বাবুদের সাথেই বেশি সময় কাটাইতেন।

.... গোড়াতে নযরুল ইসলামকে ঘিরিয়া মুসলিম ছাত্র-তরুণদের সমাগমে 'নবযুগ' আফিস সরগরম থাকিত। এইরূপ মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেওয়ার পর হইতে তিনি যেন ছাত্রদের এই ভিড় না-পছন্দ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁকে তাঁর সীটে থাকার পরামর্শ দিয়া অমল বাবু ও বরদা বাবুর যোগটোগের সমালোচনা করায় তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন ঃ বরদা বাবু সিদ্ধ পুরুষ, তিনি বার-বছর আগে মরা বুলবুলকে একদিন সশরীরে তাঁর সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলিলে তিনি মনে কষ্ট পান। আমার সমালোচনার এটা দৃঢ় প্রতিবাদ। এরপর আমি আর কোনও কথা বলি নাই।[২]

এখানে উল্লেখ্য, নজরুল সুস্থাবস্থায় তাঁর সাহিত্যকর্মে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্যে তিনি হিন্দু বাবুদের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাতিসত্তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন। আবেগে হোক; বা ভক্তির আতিশয্যেই হোক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন মন্তব্যও তিনি করেছেন যা তাঁর ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী, শেরকী অপরাধ। তিনি বলেছেন ঃ

"বিশ্ব কবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে যেমন করে ভক্ত তার ইস্টদেবকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোক কত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।[৩]

অসুস্থ হবার আগে তাঁর মাঝে ভাবান্তরের উদ্রেক ঘটেছিলো। অতীত ক্রিয়াকর্মের জন্য তিনি অনুশোচনা ও তওবা করেছিলেন। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ তিনি তাঁর বক্তব্যে রেখেছেন।

১৯৩০ সালের ৭ বা ৮ মে তারিখে মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের বাড়ীতে নজরুলের প্রিয়পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিকতার পথে নজরুল অধিকতর আকৃষ্ট হন। শ্রীবরদাচরণ মজুমদার লিখিত 'পথহারার পথ' গ্রন্থের ভূমিকায় কবির নিজেই তাঁর বক্তব্যে বলেছেন ঃ .... যখন আমি আমার পথ খুঁজিতেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইংগিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মৃত্যুর সাগরে হারাইয়া গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমায় ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ..... তাঁহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার চিরকালের ধ্যেয়, তাঁহার জ্যোতিঃরূপ দেখিলাম। .... আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি আমাকে চিনিয়াছি। .... আমি আমার আনন্দ-রসঘন স্বরূপকে দেখিয়াছি। কি দেখিয়াছি কি পাইয়াছি আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই

২। আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, পৃঃ ৩৬০-৩৬২
৩। নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৪।

নাই। ..... তবু কেবল মনে হইতেছে আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিঃতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।

আধ্যাত্মিকতার প্রতি এই আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে স্ত্রী প্রমীলার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার পর তাঁর এই অন্তর্মুখীন আকুলতা আরো বৃদ্ধি পায়। সম্বিত হারানোর পূর্বে তিনি প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্ম রাজ্যে ডুবে ছিলেন। এ সময়ে রচিত অসংখ্য গানে তাঁর এই মানসস্বরূপ চিত্রিত হয়ে আছে। সজ্ঞান জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর প্রদত্ত কয়েকটি অভিভাষণে, কবিচিত্তের স্বরূপটি যেভাবে ফুটে উঠেছে তা একাধারে কর্মজগৎ হতে তাঁর বিদায় এবং আধ্যাত্মরাজ্য অন্তর্লীনতার কথা সুস্পষ্ট এবং গভীরভাবে ব্যক্ত করে। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

"সাহিত্যের কোন কুঞ্জে আজ আর আমার কোন গতিবিধি নেই; আজ আমি যেন নীড়ভ্রষ্ট। রসকুঞ্জের পুষ্পিত পল্লবিত তরুলতার স্নেহচ্ছায়া-বিচ্যুত আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও আমার স্বরণাতীত। সংগীত-মধুর মহফিল থেকে কোন মহামৌনী যেন আমারও অজ্ঞাতসারে চুরি করে নিয়ে যেতেন কোন্ এক না-জানা শূন্যে; যেখানে বাণী নেই, সুর নেই- শুধু অনুভূতি, শুধু ইংগিত।"

"আজ আমার সকল সাধনা, তপস্য, কামনা, বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, জীবনমরণ, তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি।"

"আল্লাহ তাঁর এই দাসের-বান্দার জীবনকে ভেঙ্গেচুরে মিসমার করে নতুন করে গড়েছেন।"

"আপনারা জেনে রাখুন- আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই।"

শেষের দিকে কবি প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী হয়ে উঠেছিলেন। কবির কথায় "যে ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ আল্লাহতালায় সেই পরম আত্মসমর্পণ কার হয়েছে? আল্লাহে পূর্ণ আত্মসমর্পণ যার হয়েছে তিনি এই দুনিয়াকে এই মুহূর্তে ফেরদৌসে পরিণত করতে পারেন।"

কবি আরো লিখেছেন ঃ "অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর।"

শ্যামা সংগীতগুলো লক্ষ্য করে অনেকে কবিকে পরম কালীসাধক হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। 'দেবীস্তুতি' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"নজরুলের আসল পরিচয় ঃ কাজী নজরুল স্বভাবে স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।" অনুরূপভাবে ভজন কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য রচনায় যে আকুতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনেকেই কবিকে একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলে প্রচার

করেছেন। এসব প্রচারগুলোকে গ্রহণ করলে একই কবিকে একই সঙ্গে পরম বৈষ্ণব কঠোর কালী সাধক এবং নিষ্ঠাবান শাক্ত হতে হয়। বাস্তব জীবনে সেটি কখনই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রামোফোনের তাগিদেই কবিকে এসব রচনা করতে হয়েছে। ভাবের আবেগে এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি এগুলো রচনা করেছেন কিন্তু সকল সময় একটি 'কবি-দূরত্ব' বা 'ব্যবধান' রয়ে গেছে। লোকগীতি রচনা করলেই কেউ বাউল হয়ে যান না বা ঝুমুর লিখলে সাঁওতাল হন না, ভাবপ্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো তাঁর নৈর্ব্যক্তিক মননেরই প্রকাশ। কবি নিজেই একে বলেছেন ভাবপ্রকাশের 'ছদ্ম কবি-বেশ'। আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ মানসিকতায় কবির এই এক একটি নকল নৈর্ব্যক্তিক বেশকে এক এক নামে (কালীসাধক, শাক্ত বা বৈষ্ণব) ডাকতে ভালবাসি।

পরিশেষে আর একটি বিষয় আমরা বিশেষভাবে বিবেচনার মধ্যে রাখতে চাইঃ কোন মানুষই সম্ভবতঃ বাল্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। নজরুলের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই তিনি মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বাল্য কৈশোর প্রাকযৌবন কেটেছে গ্রামে-মুসলিম পরিবেশে, তৃতীয়তঃ তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়েছিল মক্তবে, চতুর্থতঃ তাঁর প্রাকযৌবনের দিনগুলি কেটেছে মসজিদের ইমামতি এবং মক্তবের শিক্ষকতায় অর্থাৎ নামাজ-রোজা ইত্যাদি ইসলামী বিধানগুলো তখন নিষ্ঠাভরে পালন করে চলেছেন তিনি, পঞ্চমতঃ আরবী-ফার্সীতে অভিজ্ঞ চাচা বজলে করিমের নিবিড় সাহচর্যও পেয়েছিলেন তিনি, ষষ্ঠতঃ সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পর তাঁর ফার্সী চর্চা তথা ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা প্রকট ছিল। অর্থাৎ যে বয়সের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি চর্চা মনমানসে শিলালিপির মত দাগ কেটে বসে যায় নজরুলের সেই অসামান্য হয়ে ওঠার কাল অতিবাহিত হয়েছে ইসলামী শিক্ষা ভাবধারা ও পরিবেশের মধ্যে জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যার প্রভাব তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে, তাঁর সৃষ্টি এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য দেয়, সুতরাং সর্বসংস্কার মুক্ত মহৎ হৃদয় কবি নজরুলের যদি কোন ধর্ম বিশ্বাস থেকে থাকে অবশ্যই তা হল ইসলাম ধর্মোৎসারি বিশ্বাস।

অনেকের লেখাতে আমি কবির যোগে বা ধ্যানে বসার কথা লক্ষ্য করেছি, এসব কথা লিখতে গিয়ে অনেক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, মনগড়া কথাও বলেছেন কেউ কেউ। বিষয়টি নিয়ে আমি আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান চালাতে থাকি। পৃথিবীতে বোধ হয় কোন আন্তরিক ও সৎপ্রচেষ্টা বিফলে যায় না। আকস্মিকভাবে আমি কবির বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাই- তার মধ্যে আধাত্ম্য জগৎ সম্পর্কে কবির ধ্যান-ধারণা এবং সাধনার পদ্ধতি-প্রকরণাদি বিষয়ে একটি দীর্ঘ লেখা চোখে পড়ে। দুঃখের বিষয় পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই। সূচনা আছে, তারপরই সম্ভবতঃ তিন-চার পৃষ্ঠা খোয়া গেছে। যা হোক, আল্লাহকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে তাঁর অভিমুখেই কবির সমগ্র সাধনা নিয়োজিত হয়েছে। এটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে ধর্ম বিষয়ে কবির

মনোভাব সম্পর্কে অনেকের অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস। সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত এই পান্ডুলিপির আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোন বিষয়ে কোন দিন কবির কোন গোঁড়ামি ছিল না- ধর্ম বিষয়েও না। সারা জীবন তিনি তো হিন্দু-মুসলিম এর মিলনই কামনা করেছেন। পান্ডুলিপিতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামী অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে হিন্দু-সাধনার প্রকলন পদ্ধতিতে যেসব জায়গায় মিল আছে কবি সেগুলোও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রায় প্রতিটি পংক্তিতেই আরবী শব্দের বাংলা অর্থ, ইংরাজী ও সংস্কৃতি প্রতিশব্দ বসিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতাকে কবি সৌখিন বিলাস হিসাবে গ্রহণ করেননি বরং এটি ছিল তাঁর হৃদয় উৎসারিত। এই পথে তাঁর অনুশীলন ও আন্তরিকতা যে কত গভীর ছিল। পান্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। এখন সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি আমরা পাঠ করতে পারি। লক্ষ্য করার বিষয় কবি 'আল্লাহ' এই আরবী শব্দটি দিয়েই তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন।[৪]

নজরুল গ্রহণ করলেন আল-কোরআনের এই মহামন্ত্র "ইন্না সালাতি ও নুসুকি ওয়া মাহয়্যায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন'- 'আমার সব প্রার্থনা, নামাজ, রোজা, তপস্যা জীবন-মরণ সব কিছু বিশ্বের একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহর পবিত্র নামে নিবেদিত।"

জীবনের সর্বশেষ অভিভাষণে কবি আরো স্পষ্ট করে বললেন ঃ "আমার সর্ব অস্তিত্ব, জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তারই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি।"

জীবনের শেষ লগ্নে কয়েকটি চিঠিতেও একই সুর বেজে উঠেছে। ১২.৩.১৯৪০-এ এক চিঠিতে ইজাবউদ্দীনকে কবি লিখছেনঃ "আমার আর কোন কর্মে (জাগতিক) স্পৃহা নেই।"

"আমার মন্ত্র- 'ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন।' কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব আমি স্বীকার করি না,একমাত্র তাঁর কাছে শক্তি ভিক্ষা করি।"

.... পুত্রের অকাল মৃত্যু শোকের আঘাতই যে তাঁকে আধ্যাত্মিকতার পথে দ্রুত চালিত করেছিল সে বিষয়েও সকলে একমত। কেবল দু'একজন কবির এই আধ্যাত্মিকতার পথে পদচারণাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করেছেন এবং এতেই যে কবির সর্বনাশ হয়েছে সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দহ। যেমন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমদ "পুত্রের মৃত্যু নজরুলকে ভ্রান্তির শিকারে পরিণত করল" শিরোনামায় লিখলেন ঃ

"পুত্রশোক ভোলার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করেছে। .... এত করেও নজরুল বাঁচতে পারল না, শোকাতুর পিতার মনে যে দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল তার নিকটে সে ধরা

৪। তথ্য সূত্র ঃ আবদুল আজীজ আল আমান, দৈনিক মিল্লাত, ২৫/৫/৯৩।

দিল। সে গেল লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মজুমদারের নিকটে।...... এখনা হতেই নজরুলের সর্বনাশের আরম্ভ হয়েছিল।”

মরহুম মুজফফর আহমদ ছিলেন শ্রদ্ধেয় এবং গুণী ব্যক্তি। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন কবি আধ্যাত্মিকতার পথে পদচারণা করলেন মুজফফর সাহেব তো রীতিমত ক্ষুব্ধ। সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন মানুষের জীবন একটা ছাঁচে ঢালাই হয়ে তৈরী হয়, আচরণ ও মতবাদ সেই ছাঁচই ঠিক করে দেয়। এইসব ভক্তিভাজন মানুষদের মুখের মত জবাব দিয়ে কবি “আল্লা পরম প্রিয়তম মোর” কবিতায় লিখেছেন ঃ

“বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোন,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।”

কবি নজরুলের অসুস্থ হবার ইতিবৃত্ত

কবি নজরুল ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন। এ-সব আন্দোলন সমর্থন এবং জেল খাটার কারণে হিন্দু-মুসলমানের কাছে নজরুলের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। মোহিতলাল মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেক হিন্দু ব্যক্তিত্বের কাছে কাজী নজরুল বিপুলভাবে প্রশংসতি হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি মেদিনীপুরে কবি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে সংবর্ধিত হন এবং সেখানে হিন্দু কুমারী মেয়েরা তাদের গলার হার খুলে কবি নজরুলের গলায় পরিয়ে দেন। মুসলমান কবি নজরুলের গলায় হার পরানোর অপরাধে হিন্দু কুমারী তরুণীরা স্বীয় ধর্মীয় সমাজের গঞ্জনা ও তিরস্কারে একজন মেয়ে নাইট্রিক এসিড পান করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলো।

পরবর্তীতে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দই কবি নজরুলের বহুমুখী প্রতিভা এবং বিপুল জনপ্রিয়তায় শংকিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে নেপথ্যে থেকে নজরুল-নার্গিসের বিয়ে পন্ড করে দেয় এবং হিন্দু মেয়ে প্রমীলা দেবীর সাথে নজরুলের বিয়ে দিয়ে গিরিবালা দেবীকে কবির সংসারে ঠেলে দেয়। যদিও প্রমিলা দেবী ছিলো খুবই পতিব্রতা কিন্তু এই গিরিবালা দেবীর কারণে কবির পারিবারিক জীবন ছিলো অশান্তিময়। ডঃ এস, এম, লুৎফর রহমানের অভিযোগ যথার্থ যে ঃ

“হিন্দুরা নজরুলকে বন্ধু বেশেও শেষ করেছে; শত্রু বেশেও শেষ করেছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। কবির নজরুলের ব্যক্তিগত চরিত্র হননে অনেক হিন্দু সাংস্কৃতিক নেতা অনেক গাল-গল্প ফেঁদে কুৎসা রটিয়েছেন। অনেক অতি উৎসাহী মুসলমান সাংস্কৃতিক সেবীরাও পিছিয়ে ছিলো না। তারাও হিন্দুদের অনুকরণে নজরুলের বিরুদ্ধে

মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্প-কাহিনী প্রচার করেছেন।"

এ সম্পর্কে নজরুল গবেষক জনাব শেখ দরবার আলমের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি 'অজানা নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

.. এই সব ভদ্রলোকরা নজরুল জীবন ও সাহিত্যের সময়ানুক্রমিক ধারাপাতটা কখনোই সচেতনভাবে খতিয়ে দেখার গরজবোধ করেননি। গাল-গল্পের আকর্ষণে এবং গপপো বলার ঝোঁকে এঁরা জনগণের মনে দিনের পর দিন অনেক আজব ও ভুল ধারণার প্রসার ঘটিয়ে চ'লেছেন। আমি এ প্রসঙ্গে দু'জন নজরুল সঙ্গীত শিষ্যের কাছে শোনা দু'টো গল্পের উল্লেখ করছিঃ (এক) নজরুল সঙ্গীত-শিষ্য বরদা গুপ্ত ১৯৭৪-এ কলকাতায় শ্যামবাজার এলাকায় তাঁর বাড়ীতে আমাকে বলেছিলেন যে, নজরুল শ্মশানে গিয়ে শব-সাধনাও করতেন, আবার তার বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে নামাজ পড়তেও তিনি দেখেছেন। (দুই) নজরুলের সঙ্গীত-শিষ্য বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮০-র মে মাসে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে আমাকে অকাতরে দু'টো পরস্পরবিরোধী আজব স্মৃতিকথা শোনান ঃ (ক) কবি রোজ বিকেলে গঙ্গাস্নান ক'রে ঘটে ক'রে গঙ্গার জল নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতেন, নিত্য কালী পূজা করতেন, ইত্যাদি।

(খ) বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ডাক্তার বাবা তাঁকে নিষেধ করতেন তিনি যেন কবির সঙ্গে মেলামেশা না করেন, কেননা; কানন দেবীর সঙ্গে সম্পর্কের দরুন না-কি তাঁর বিশেষ রোগ হ'য়েছিল।

এর জবাবে কবির সঙ্গীত-শিষ্য বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আমি বলেছিলাম ঃ 'কানন দেবী তো ওসব থেকে বহাল তবিয়তে এখনো ভাল আছেন।'

বিমলভূষণ বললেন ঃ 'কানন দেবী চিকিৎসা করিয়েছিলেন।'

আমি স্মরণ ক'রিয়ে দিলাম ঃ কবি না-কি আপনার বাবার কাছে চিকিৎসা করাতেন। তা হলে আপনার বাবা কি ভালো চিকিৎসক ছিলেন না?'

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পুঁজি তাঁর ছিলোনা। জবাব দেওয়ার জন্য সম্ভবত প্রস্তুতও ছিলেন না। বুঝলাম যে, এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন তিনি এর আগে কখনো হননি।

সে সময় তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, অনেক অপ্রকাশিত নজরুল সঙ্গীত তাঁর কাছে আছে। ও-কথা যখন বলেন, তার ঠিক কিছু দিন পরেই বলেন যে, অপ্রকাশিত ঐ গানগুলো, তিনি হরফ প্রকাশনীর মালিক আবদুল আজীজ আল-আমানের কাছে বিক্রি করেছেন। ও-কথা শুনে আমার বলতে ইচ্ছা করেছিল ঃ কবির পান্ডুলিপিতে তাহলে রোগ-জীবাণু জড়ায়নি।

কবি নজরুলের অন্যতম ভক্ত খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের লেখা "যুগ স্রষ্টা নজরুল" গ্রন্থেও 'কবি নজরুল ইসলামের রোগের কারণ' শিরোনামে একটি বিতর্কিত কাহিনী স্থান পেয়েছে। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর উল্লেখিত ভূমিকাসহ যেভাবে পরিবেশন করেছন তা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্জুমানে তাব্‌লিগুল্ কুরআনের প্রেসিডেন্ট, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন বইয়ের লেখক, আলহাজ্জ এস, এম আবদুল হামিদ এম, এ, কবি নজরুল ইসলামের বর্তমান অবস্থায় আসার প্রাথমিক কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা এ বইয়ের "ধ্যান স্তিমিত নজরুল' নিবন্ধে আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে বেশ মিল দেখা যায়। বিবৃতিটি তিনি দৈনিক পাকিস্তানের প্রধান সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের কাছে পেশ করেছিলেন। আমরা পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য উহা এখানে প্রকাশ করলাম ঃ

"ইংরেজী ১৯৪৫ সালে আমি মালদহ মাদরাসা ইসলামীয়া আরবীয়ার (১৯৪৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত) সেক্রেটারী হিসাবে মাদরাসার সীল মোহর রাবার স্ট্যাম্প প্রভৃতি করানোর জন্য কলিকাতায় যাই ও সেই সঙ্গে আমার 'স্তুপ' বইখানা ছাপানোর জন্য লইয়া যাই। তখন জনাব ডাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক সাহেব মালদহ জিলা-স্কুলের হেড মাস্টার ও আলোচ্য মাদরাসার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কলিকাতায় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মওলানা আহমদ আলী সাহেবকে আমার 'স্তুপ' নামক পুস্তকখানা ছাপানোর ব্যবস্থা করিতে বলিলে, তিনি বলেন যে, বাজারে কাগজ নাই। তবে পাশেই কমিউনিষ্টদের একটা প্রেস (ডিক্সন লেনে) আছে এবং তাদের স্টকে কাগজও আছে। তাঁর কথায় ঐ প্রেসের ম্যানেজার (বা মালিক) মনীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সাথে আলাপ করিলে তিনি বইখানা পড়িয়া খুবই খুশী হন এবং তাহা ছাপিতে রাজী হন। কিন্তু বই খুব কঠিন বলিয়া তার প্রুফ দেখার জন্য আমাকে প্রায় মাসাধিককাল কলিকাতায় থাকার জন্য অনুরোধ করেন। অতএব আমি মওলানা আহমদ আলী সাহেবের পরামর্শ মত নবযুগের প্রধান সম্পাদক জনাব কবি নজরুল ইসলাম সাহেবের অনুমতি লইয়া নবযুগের অস্থায়ী নিউজ এডিটরের কাজ গ্রহণ করি ও লোয়ার সার্কুলার রোডের আমজাদীয়া হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করিয়া সেখানে থাকি।

কয়েকদিন কাজ করার পর একদিন হাতে কাজ না থাকায় প্রায় একটার সময় ছুটি লওয়ার জন্য কবি সাহেবের কামরায় গেলে তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া নিম্নরূপে আলাপ শুরু করেন ঃ

কবি। আমি আপনার সাথে ধর্ম নিয়ে বাহাছ (তর্ক) করতে চাই।

আমি। আপনার মত এত বড় কবির সাথে আমি বাহাছ করতে চাইনা। তবে আপনি প্রশ্ন করেন, আমার জানা থাকলে উত্তর দিব।

কবি। ধর্ম সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

আমি। বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেন। আপনি কি- বিষয় জানতে চান?

কবি। আপনি কি মনে করেন যে, শুধু মুসলমানেরাই নাজাত (মুক্তি) পাবে?....

আমি। হ্যাঁ, কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ মতে এইরূপই বুঝি।

কবি। না, সব ধর্মের লোকই মুক্তি পাবে। তবে ইসলাম ধর্ম সব চেয়ে সোজা পথ।

কাজেই মুসলমানেরা তাড়াতাড়ি তাঁদের লক্ষ্যে পৌছবে।

আমি। না, তা নয়। কোরআন শরীফ নাযিল হওয়ার পর আগের সব রকমের ধর্ম অচল বা বাতিল হয়ে গিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ "ইন্নাদ্দীনা এন্দাল্লাহিল্ ইসলাম" (কোরআন) অর্থাৎ খোদার কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম।....

কবি। তবে যে বলা হয় "যত মত তত পথ"।

আমি। সেকথা তো ঠিকই। যার যেদিকে ইচ্ছা সে সেদিকে যাবে। কিন্তু খোদা পর্যন্ত পৌছতে একটাই পথ। আর তা হলো ইসলাম।

তখন তিনি একটা সাদা কাগজে প্রায় দশ ইঞ্চি ব্যবধানে দুইটা বিন্দু আঁকিয়া 'ক' ও 'খ' চিহ্ন দিয়া বলিলেন, 'মনে করুন 'ক' হচ্ছে মানুষ আর 'খ' হচ্ছে খোদা। এখন 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে একটা সরল রেখা টান্ছি। এটা হলো ইসলাম। তারপর 'ক' ও 'খ'-কে সংযোগকারী আরও কয়েকটা বাঁকা লাইন টানিয়া বলিলেন, এগুলি হলো অন্য সব মতবাদ বা ধর্ম। বিলম্বে হলেও তারা সবাই 'ক' থেকে 'খ'-এতে গিয়ে পৌছবে।

আমি। আপনি একটা Fundamental mistake (গোড়ায় গলদ) করেছেন। আপনি টর্চ লাইট ফোকাস করে দেখেছেন? দেখবেন সেটার আলো সব সময় সোজা পথে চলে। বাঁকা পথে কখনও যায় না।... তেমনি পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে ধর্মকে নূর বা আলো বলা হয়েছে। কাজেই এখন খোদা পর্যন্ত যেতে হলে ইসলামের সোজা পথই সকলকে গ্রহণ করতে হবে। এই কথায় তিনি খুব চিন্তিত হইয়া বলিলেন ঃ এ-কথা তো আজ নতুন শুনছি। কোন আলেম তো এর আগে আমাকে বলেনি। .... আচ্ছা, আমি যে হিন্দু মতে সন্ন্যাসীদের সাথে জপ করে শ্মশানে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, সেগুলির কি অর্থ হতে পারে?..

আমি। সেগুলি সব শয়তানের বা ভূতের খেলা। আসল সত্যের সাথে সে সবের কোনই সম্পর্ক নাই। যদি আমার মতো একজন মোল্লাও আপনার পাশে সে-সময় থাকতো, তবে কোন শয়তান বা ভূত কাছে আসতে পারতো না। আর আপনিও ওসব কিছুই দেখতেন না।

কবি। আচ্ছা, আমি যে মোরাকাবা (বিশেষ ধ্যান) করলে দেখে থাকি, তার মানে কি হয়?

আমি। আপনি কি দ্যাখেন, তা একবার আমার সামনে মোরাকাবা করে দেখেন দেখি। যা দেখেন, তা আমাকে বলবেন।

তখন তিনি বেশ শান্তভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে বলিলেন,- এই যে বেশ একটা নীল আলো দেখছি।...

আমি। আরও চেষ্টা করেন, এরপর কি দেখেন, তা বলেন। কবি (কয়েক মিনিট পর) এবারে লাল আলো দেখছি।.

আমি। আরও চেষ্টা করেন।

কবি। (কিছুক্ষণ পর চোখ খুলিয়া) নাঃ, আর কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন গোটা আসমানটা কালো কালি বা আলকাতরা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে।

আমি । হ্যাঁ, হিন্দু মতে সন্ন্যাসীরা এখানে এসেই (আমার মতে) ক্ষান্ত হয়ে যায়। আর এই অন্ধকারকেই (হয়তো) কালীরূপ দিয়ে তাঁরা পূজা করেন।.... কিন্তু আপনি তো মুসলমান। আপনার মধ্যে ইসলামের আলো আছে। কাজেই এবারে আপনি আপনার কলেমার অর্থের দিকে খেয়াল রেখে ধ্যান বা মোরাকাবা করে দেখুন। যদি ঐ কালো পর্দা ভেদ করে কিছুটা উপরে উঠতে পারেন, তবেই আশা করি সত্যের আলোর একটু ঝলক হয়তো দেখতে পাবেন।

এ কথায় তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া একাগ্রচিত্তে মোরাকাবা করিতে বসিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। আমিও একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম ঃ তাহার সদা হাস্যভাব দূর হইয়া গভীর চিন্তা ও দুঃখের ভাব ফুটিয়া উঠিল ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। হঠাৎ তিনি ভীষণ শব্দ করিয়া চীৎকার করিয়া হা হা হা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন ঃ আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, হায় পরকালে আমার কি গতি হবে...?

তাঁহার সেই চীৎকারে অফিসের দারোয়ান ও কর্মচারীরা ছুটিয়া আসিলেন। সবাই হতবাক হইয়া আমার দিকে দেখিতে লাগিলেন। আমি ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে বলিয়া ভাবি নাই। কাজেই খুব মুশ্‌কীলে পড়িলাম।... তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন- আপনারা সব ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এটা প্রাইভেট ব্যাপার। যান, সব এক্ষুণি যান, যান বলছি.... ।

আমিও বলিলাম ঃ তিনি বিশেষ কোন কারণে হঠাৎ খুব শক্ পেয়েছেন। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা দয়া করে বেরিয়ে যান। তারপর তাহারা বাহিরে গেলে তিনি দারোয়ানকে দোর বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে বলিলেন, যেন আর কেহ সেই কামরায় না আসেন।

আমি তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া তৌবা করাইয়া কলেমা পড়াইলাম ও বলিলাম ঃ আর কাঁদবেন না। এখন তো আপনি নিষ্পাপ হলেন। এরপর বরাবর ইসলামের বিধান মতে চলবেন। ইন্‌শাআল্লাহ তবেই বেহেশতে যেতে পারবেন।

প্রায় আধঘন্টা কাঁদার পর তিনি একটু শান্ত হইলে একজন কর্মচারী সে দিনের জন্য এডিটোরিয়াল (সম্পাদকীয়) লিখিয়া দিতে বলিলে তিনি তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাকে মওলানা আহমদ আলী সাহেবের কাছে যাইতে নির্দেশ দিয়া আমাকে বলিলেনঃ- চলুন, আপনাকে আমজাদীয়া হোটেলে পৌছে দিয়ে আমি একটু বাড়ী যাব (তাঁর বাসা শ্যামবাজারের দিকে, ট্রাম শিয়ালদহ স্টেশন হইয়া সেই পথে যায়)।

পরদিন দেখিলাম তিনি অফিসে আসেন নাই। পর পর তিনদিন তিনি অফিসে না

আসায় টেলিফোন করিয়া জানিলাম, তাঁর অসুখ ও আবোল তাবোল বকিতেছেন। তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা যাওয়ায় ডাক্তার তাঁর সাথে কাহারও দেখা করা নিষেধ করিয়াছেন এবং একটা কামরায় তিনি বন্দী হইয়াছেন। পরের দিন তাকে অনন্তঃ এক নজর দেখিয়া আসিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেশের বাড়ীর চিঠি পাইলাম। বড় ভাই সাহেব লিখিয়াছেন যে, আম্মাজান মৃত্যুশয্যায়। পত্রপাঠমাত্র আমার বাড়ী যাওয়া উচিত। কাজেই সেদিন রাত্রির ট্রেনেই বাড়ী (রাজশাহী) মুখে রওয়ানা হইয়া গেলাম কয়েকদিন পর সংবাপত্রে দেখিলাম যে, কবি নজরুল ইসলাম সাহেব বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে বড়ই-মর্মাহত হইলাম ও নবযুগের চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। (খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্ঠা নজরুল, পৃঃ ২৩৫-২৩৯)।

উক্ত স্মৃতিচারণের ঘটনাটি নিয়ে নজরুল গবেষকদের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক থাকার সঙ্গত কারণও রয়েছে। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই কবি নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু উক্ত ঘটনাটার সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ১৯৪৫ সালের। কাজেই অনেক গবেষক এই তারিখ হেরফেরের কারণে ঘটনাটিকে অবাস্তব বা বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন।

নজরুল অসুস্থ হবার আগে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা ছিলো। পরবর্তীতে কবি নজরুল অসুস্থতার জন্য আদালতে হাজিরা দিতে পারেননি। এ সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের ২২ জানুয়ারী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী আর. গুপ্ত রিপোর্ট দেন যে- "কবি প্রায় ১৫ মাস যাবৎ এতখানি অসুস্থ যে, অফিসে আসতে পারেন না বা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।"

সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টের প্রায় এক বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে আলহাজ্ব এস. এম. আবদুল হামিদের সাথে কবি নজরুলের 'নবযুগ' অফিসে বসে সাক্ষাৎকার ও মোরাকাবা বিষয়টি অনেকেই অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন।

খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন কর্তৃক লেখা নজরুলের অনেক ঘটনা অনেক নজরুল গবেষক কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। এমনকি সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের স্মৃতিচারণেও নজরুলের সাথে সম্পৃক্ত অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন এমন বানোয়াট ঘটনাটিকে কেন তার গ্রন্থে সংযোজন করেছেন তা বোধগম্য নয়। অনেকে এটাকে তারিখের ভুল; অনেকে এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছেন। জানিনা কোনটা সত্য। আর এটা যদি সত্য হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় কবির দুর্ভাগা যে মিথ্যার বেসাতি থেকে হিন্দুদের থেকে তো বটেই; কবির অন্তরঙ্গ মুসলিম বন্ধুদের কাছ থেকেও রেহাই পাননি।

উল্লেখ্য, কবি নজরুলকে প্রকাশকেরা ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈকি স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কেউই তার ন্যায্য প্রাপ্য ঠিক মতো দেয়নি। সবাই তাকে বঞ্চিত করেছেন। এমনকি জনপ্রিয় ও জনদরদী বলে কথিত এ, কে

ফজলুল হকের কাছ থেকেও কবি নজরুল বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নজরুলের তেমন একটা ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশিত হয়নি। যেমন হয়েছে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে। কবি নজরুল শেরে বাংলার বিরুদ্ধে কতোটা ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এর প্রমাণ মিলে সুফী জুলফিকার হায়দার রচিত 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে প্রকাশিত একটি চিঠিতে। অসুস্থ হওয়ার সাত দিন পর সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা নজরুলের চিঠিটি নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় হাইদর,

খোকাকে পাঠালাম। তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এস। আমি Blood pressure-এ শয্যাগত। অতি কষ্টে চিঠি লিখ্ছি। আমার বাড়ীতে অসুখ, ঋণ, পাওয়ানাদারদের তাগাদা প্রভৃতি Worries, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনী। তারপর নবযুগের Worres ৩/৪ মাস পর্যন্ত। এইসব কারণে আমার Nerves shattered হয়ে গেছে। ৭ মাস ধ'রে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মতো ৫/৬ ঘন্টা বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু মুসলিম equity-র টাকা কারু বাবার সম্পত্তি নয়। বাঙলার বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা ক'রতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য Sincerely appeal ক'রেছ সত্যিকার বন্ধু হ'য়ে। আমার হয়ত এই শেষ পত্র তোমাকে। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু? কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে কত কষ্টে দু'একটা কথা বল্‌তে পারি। বললে যন্ত্রণা সর্বশরীরে। হয়ত কবি ফেরদৌসির মত ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ ক'রছি আমার আত্মীয়-স্বজনকে।

হয়ত ভালই আছ।

তোমার
নজরুল
১৭-৭-৪২।

উপরোক্ত চিঠির ভাষ্য মতে দেখা যায়, কবি নজরুল ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই অসুস্থ হবার পরও সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন। কবি নজরুলের অসুস্থ হবার পরবর্তী দিনগুলো অসহায়ত্ব সম্পর্কে মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় লুতফর রহমান জুলফিকার-এর লেখায়। তিনি দৈনিক মিল্লাতের ১৯৮৮-৮৯ বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

...আমি স্বচক্ষে দেখেছি কাজীদার পাঁচ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীর দোতলায় একটি ছোট্ট কামরায় আবদ্ধ করে বাহির থেকে বিরাট তালা লাগিয়ে কবিকে আটক করে রাখা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় শ্রীমতি গিরিবালা বা অন্য কেউ অসুস্থ কবিকে দেখাশুনার দায়িত্বে নেই। কবি কিছুক্ষণ পর পর রোগের যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন। পরিচিত জনদেরকেও বাড়ীর লোকজনকে ডাকাডাকি করছেন। আমি প্রায় আধ ঘন্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট কবির এমনি অসহায় অবস্থা দেখে খুবই বেদনাবোধ করতে লাগলাম। আমি নিজেও আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে কাউকে দেখতে পেলামনা। অগত্যা অচল ও অসুস্থ কবি স্ত্রীর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম কবিকে দেখাশোনার জন্য কোন লোকজন আছে কিনা। কবি স্ত্রীর ক্ষীণ স্বরে বললেন, না তেমন কেউ নেই। আমি

কবি স্ত্রীর মা শ্রীমতি গিরিবালার কথা জিজ্ঞেস করলাম তিনি কোথায় গেছেন। উত্তরে জানতে পারলাম শ্রীমতি গিরিবালা কলকাতায় কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। আমি একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। চাকর-বাকরের কথা জিজ্ঞাস করলাম তাও জানতে পেলাম চাকরটি নিয়মিত কাজকর্ম করে না। কবির স্ত্রীর মলিন মুখ দেখে আর সংসারের করুণ অবস্থার কথা শুনে খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। (দৈনিক মিল্লাত, ১৯৮৮-৮৯ বর্ষ সংখ্যা)।

অসুস্থ কবি নজরুলের অসহায়ত্ব এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সেন্ট্রাল নজরুল এইড ফান্ডের সদস্য মিঃ এস, মজহারুল হক ও মিরদেহ্ আসাদুর রহমান ৫১ বৈঠকখানা রোড হতে দেয়া বিবৃতিতে লিখেছেন যে, "বাঙলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বহুদিন যাবৎ পক্ষাঘাতে শয্যাগত। অশক্ত হইয়া পড়ায় তিনি এখন নিঃস্ব ও কপর্দকহীন। তাঁর স্ত্রীও পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী। চিকিৎসা দূরের কথা, এখন এরূপ সঙ্গতি নাই যে, শিশু পুত্রদ্বয়, রুগ্না পত্নী ও নিজের আহার্যটুকু জোটে। বাঙ্গলার জাতীয় কবির প্রাণ রক্ষায় সহৃদয় সর্বসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য একান্ত আবশ্যক।"

এছাড়া 'বিহার হেরাল্ড' ও 'প্রভাতী' পত্রিকার পরিচালকদের যৌথ উদ্যোগে 'নজরুল সাহায্য ভান্ডার' গঠিত হয়। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় নজরুলের অসুস্থ হবার খবর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয় এবং সাহায্যের আবেদন জানানো হয়।

কবির এই অসুস্থতার কারণ নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে। যেমন ঃ (১) সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কেউ তাঁকে বিষ খাইয়েছে। (২) বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে বিষ খাইয়েছে। (৩) ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ তাঁকে বিষ খাইয়েছে। (৪) বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কেউ, সাম্প্রদায়িক কিংবা ঈর্ষান্বিত কেউ বা কোন দল তাকে কোনো এক রাতে মেরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখে।(৫) 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল'-এর রচয়িতা আজহারউদ্দিন খান অসুখের কারণ হিসাবে বিষাক্ত সমাজের কদর্য পরিবেশ ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাত'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। (৬) মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে এস, এম, আবদুল হামিদ এম,এ,-র নিবন্ধ উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, কবি নজরুল ইসলামের রোগের কারণ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ। (৭) যোগ সাধনায় অনিয়মের ফলে এমনটা ঘটেছে। (৮) কবিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের অভিমত ঃ দায়ী অনুদার রাজনীতি, অনুদার সহজ আর অনুদার নেতৃবৃন্দ। কবির গলার পেছনের দিকে অর্থাৎ ঘাড়ে কঠিন আঘাতের সন্ধান পেয়েছেন মেডিকেল বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা। এই আঘাত, ষড়যন্ত্র, উপযুক্ত চিকিৎসাহীনতা অর্থাৎ দীর্ঘ দিন যাবৎ উপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ইত্যাদির বন্দোবস্ত না করাটাই তাঁর অসুস্থতাকে এক সময় দুশ্চিকিৎসা ক'রে তুলেছে।

নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম তাঁর "অজানা নজরুল" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন শুক্রবার ২৫ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৫ জমাদিয়াসসানি ১৩৬১ ঃ ১০ জুলাই ১৯৪২ তারিখে কিংবা এর আগে। কিন্তু সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে তার চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হলো এক দশকেরও অধিক সময় পর। চিকিৎসার্থে কবি লন্ডনের উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশন ত্যাগ করেন রবিবার দ্বাদশী ২৭ বৈশাখ ১৩৬০ঃ ২৫ শাবান ১৩৭২ ঃ ১০ মে ১৯৫৩ তারিখে। এই দশ বছরেরও অধিক সময় যাবৎ রোগটাকে যে দুরারোগ্য করে বা পাকিয়ে তোলা হয়েছে শুধু তাই নয়, অনেক গুজব সৃষ্টি ও রটনার সুযোগও করে দেওয়া হয়েছে।

কবির শরীরে বৃটিশ সরকার বিষ প্রয়োগ করেছে, এ সন্দেহের হয়তো একটি ভিত্তি থাকতে পারে, কেননা হুগলী জেলে থাকতে তার ঘর থেকে দু'বার বিষধর সাপ বেরনোর খবর সে সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকায়ও পেয়েছি। কিন্তু পাগল হয়ে যাওয়া, সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা যে নেহায়েত-ই গুজব সে প্রমাণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিবৃতিতে আছে। (শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৬৩৮)।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের বিবৃতি প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। এর আগে নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ-এর লেখা থেকে কিছু মন্তব্য এবং নজরুলের ব্যক্তিগত চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করছি। ১৯৯৫ সালে ২৬ মে, দৈনিক সংগ্রামে 'নজরুলের চিঠি তাঁর সৃষ্ট-রূপের দর্পণ' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ

"নজরুলকে নিয়ে অনেক কৌতূহলীর যে প্রশ্ন এত ভালো স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৪৩ বছর বয়সে নজরুল কেন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন? সে কি কোন চক্রান্তের ফল? সে কি নজরুলের বেপরওয়া জীবন যাপন? তাঁর প্রতিভার ঈর্ষান্বিত শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কি এই পরণতি? তিনি কি হয়েছিলেন কোন স্লো পয়েজনিং-এর শিকার? নজরুলের চিঠিপত্রে কি খুঁজে পাওয়া যাবে তার কোন আভাস?

নজরুল জীবনে কিছুমাত্র খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন যে, নজরুলের প্রতিভাই ছিল তাঁর প্রধান শত্রু। এই প্রতিভার প্রতাপ যাদের পরাজিত করেছিল তারা সমবেতভাবে নজরুলের বিরুদ্ধতা করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করেনি। নজরুলের চিঠিতে যখন আমরা পড়ি-

"মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে? পিঞ্জরায় পুরে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ-এই পশুর জন্যই আমি গান গাই-তারই জন্য আছি আজো বেঁচে। এদেরকে আর পানি দেবার অবসর দেবনা, এদের মঙ্গলের জন্যই এদেরে ছেড়ে যাবো দূরে-ওদের নাগালের বাইরে। মনে হয়, এরা এখন আমায় ভুললেই বেঁচে যায়।" (১২-১১-২৭ তারিখে মাহফুজ রহমান খানকে লেখা চিঠি)।

"মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে উঠে-

তা-ও আমি ভালো করেই জানি।" (১৯২৭-এ ইব্রাহীম খাঁকে লেখা চিঠি)।

"কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ লেখক ঈর্ষা-পরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছেন।' (ঐঃ পূর্ণোক্ত)।

"রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত কীট্‌স-এর মত খুব বড় একটা Tragedy আছে তুই প্রস্তুত হ!" (২৪-২-২৮ এ ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠি)।

অনেকে বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নজরুলের অঘোষিত অভিভাবক। রবীন্দ্রনাথ যতো দিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন নজরুলের উপর কোন আঘাত আসেনি। তিনি পুত্র স্নেহে তাঁকে আগলে রেখেছেন। কিন্তু সজনীকান্তের কুৎসা, মোহিতলালের অভিশাপ এবং রবীন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারী তা প্রমাণ করে না। ইতোপূর্বে আমি বলেছি রবীন্দ্রনাথের সাথে সজনীকান্তের ছিলো দারুণ সখ্যতা। কিন্তু একদিনের জন্যও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা থেকে সজনীকান্তকে বিরত রাখেননি। সুতরাং নজরুলের বিরুদ্ধে হিন্দু বাবুদের সুগভীর চক্রান্তের ধারাবাহিকতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ডি, এফ, আহমদ লিখেছেন ঃ

.... নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে কিছু দোষ-ক্রটির কথা পিছনে সমালোচনা হলেও প্রকাশ্যে কেউ কিছু করতে পারতেন না। প্রখ্যাত গায়ক কে, মল্লিককে অনেকে অমুসলমান বলে জানতেন। তাই অনেকে তার সামনে নজরুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা বলে ফেলতেন এর একটি বিষময় পটভূমিও রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেন হত্যা নয় নজরুলকে বিনষ্ট করতে হবে। কে. মল্লিক গোপনে নজরুলকে সাবধান করে দেন। কিন্তু নজরুল কে. মল্লিককে পাত্তা দেন নাই- তার শক্তি কবিরাজ (রবীন্দ্রনাথ), তার ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী (শেরে বাংলা), ব্রাহ্মণ কন্যা তার সহধর্মিনী। ষড়যন্ত্রকারীরা শেষের দুই ক্ষমতা উড়িয়ে দেন। তবে কবি গুরুর জীবদ্দশায় কিছুই করা সম্ভব নয়। একই সময়ে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী তথা নজরুলের চাচী-শাশুড়ী কলিকাতায় এক অভিনেত্রীর বাড়ীতে গিয়ে নজরুলের কারণে তাকে স্যান্ডেল দিয়ে প্রহার করেন। অভিনেত্রী তখন ছিলেন নিউ থিয়েটার্স এর মাহিনা করা শিল্পী। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ সরকার ওরফে চিত্রণ সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে অভিনেত্রীকে তার প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে দিবার সিদ্ধান্ত নিলে এক যোগে তাকে বাধা দেয়া হয়। আলোচ্যকালে সাইগল ও অভিনেত্রীর মাসিক মাহিনা ছিল সাড়ে সাত শ' টাকা। বি, এন, সরকার সাইগলের মাহিনা বাড়িয়ে হাজার টাকায় উন্নীত করেন, অভিনেত্রীর আপত্তি অগ্রাহ্য করলে তিনি নিজেই নির্বাসন নেন। ১৯৪০ ও ১৯৪১ খৃস্টাব্দে বেকার থাকেন। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে প্রমথেশ বড়ুয়া তাকে এমপি প্রডাকশনে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দেন। ঘটনাটি জানতেন কে. মল্লিক, ঢাকার কবি আব্দুল কাদির ও সুফী

জুলফিকার হায়দার। আরো কেউ কেউ জানতে পারেন তবে তাদের কথা আমার জানা নেই। উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে এই অভিনেত্রী নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম অংশদারণী হন। আলোচ্যকালে (১৯৩৯) সুরেশ চক্রবর্তী রেডিও অফিসের গাড়ী নিয়ে গিয়ে নজরুলকে রেডিওতে তিনি অনুষ্ঠানের ভার দেন। নজরুল সরল বিশ্বাসে এই সুদুরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের টের পেলেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াণের পর কে. মল্লিক আবার গেলেন নজরুলের কাছে। কিন্তু এবার বিতাড়িত হন। কে. মল্লিক অগত্যা একান্ন বছর বয়সে গানের জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে বসে যান। আমার অন্যতম বন্ধু সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া (৭২) স্মৃতিচারণ করেন যে আলোচ্য কালে তিনি কে. মল্লিকের সাথে তাদের কাছারীতে বসে ক্যারাম খেলেছেন। উল্লেখ্য কে. মল্লিক আমার গ্রামের নিকট সৈয়দ কুলুট গ্রামের জামাতা ছিলেন (জিলা মুর্শিদাবাদ থানা ভরতপুর) জনশ্রুতি আছে যে, পানের সাথে অল্প অল্প করে কাঁচা কল্কি ফলের রস দিয়ে মানুষ পাগল হয়ে যায়। কে. মল্লিক স্মৃতিচারণ করতেন (আমার সেজো ভাই তার গানের ছাত্র ছিলেন) যে ১৯৪২ খৃস্টাব্দেও যখন ওষুধ ধরছিল না তখন একদল ভাড়াটিয়া গুন্ডা নজরুল রেডিও অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে গভীর রাত্রিতে তার উর্ধাঙ্গে প্রহার করে রাস্তায় ফেলে দেয়। প্রত্যুষে একদল ছাত্র তাকে উদ্ধার করে বাসায় পৌছে দেয়। পরবর্তীকালে ঘটনাকে বিকৃত করে বলা হয় যে, নজরুল রেডিওতে অনুষ্ঠান করতে করতে বাকরুদ্ধ হন। কে. মল্লিক দাবী করেন যে, একটা বানোয়াট প্রচার। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কবি বিদ্রোহী কবি, জাতীয় চেতনার কবি, মুসলিম সত্ত্বা ১৯৪২ খৃস্টাব্দের শেষের দিক থেকে জাগরণের কবি কাজী নজরুল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হারিয়ে যান। নিরাময়ের চেষ্টায় নজরুলের চিকিৎসা চলে কিন্তু সবই ব্যর্থ প্রয়াস। (ডি. এফ. আহমদ, দৈনি সংগ্রাম, ২৬ জুন, ১৯৯৮)

এই ঘটনাটি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আমরা এই পুস্তকে ইতোপূর্বে দেয়া খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের বর্ণিত ঘটনাটি সত্য বলে ধরে নিতে পারি।

তখন মনে না হয়ে পারে না প্রতি মুহূর্তে কাঁটার পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে। আর এই কাঁটার ক্ষত থেকে যে রক্ত ঝরেছে, তাতেই দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছে তার জীবনীশক্তি।.... নজরুল সুফী জুলফিকার হায়দারকে ১৭-৭-৪২ তারিখে তিনি 'মধুপুর' থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও চিঠি লিখেছেন। সুফী জুলফিকার হায়দার নজরুলের চিঠি পড়ে তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁর চিকিৎসার জন্যে তৎপর হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অবিভক্ত বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রী সভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এল ডি ছিলেন। ১৯৩৪-এ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। রাজনীতিতে ইনি ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা।) নজরুলকে দেখতে আসেন এবং নজরুলকে মধুপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। মধুপুরে গিয়ে নজরুল শ্যামাপ্রসাদকে ১৭-৭-৪২ তারিখে চিঠি লেখেন। দু'টি বিষয় উল্লেখ করার মত। নজরুল সুফী জুলফিকার হায়দারকে চিঠি লেখার দু'দিন আগে ১৫-৭-৪২-এ শ্রী

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে যে চিঠি লিখেছেন সে চিঠি বাক্য বিন্যাসে অসংলগ্ন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু দু'দিন পরে ১৭-৭-৪২ এর সুফী জুলফিকারকে যে চিঠি লিখেছেন তা সংলগ্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা সুফী জুলফিকার হায়দারের লেখা মারফৎ জানতে পারছি যে, ভয়ানক অসুস্থ নজরুলের কথা বুঝতে পারছেন না বলে নজরুল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখে তাঁর বক্তব্য বোঝাচ্ছেন। এর পান্ডুলিপি কম্পিত হাতের লেখা কিন্তু প্রতিটি বাক্য শুদ্ধ এবং বুদ্ধি সচেতন এবং মধুপুরে যেয়ে শ্যামাপ্রসাদকে লেখা নজরুলের চিঠি একজন সম্পূর্ণ সুস্থ সচেতন মানুষের সংলগ্ন বক্তব্য। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নজরুল সুফী জুলফিকার হায়দারকে যে চিঠি লিখেছেন তার সঙ্গে মিল আছে শ্যামাপ্রসাদকে লেখা চিঠির। সেখানেও নজরুলকে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে দেখা যাচ্ছে। এতে প্রতীয়মান হয় উভয় চিঠি নজরুলের লেখা। কিন্তু তারিখের গোলমালটা কেন?

আব্দুল কাদির "নজরুল রচনা সম্ভার"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সুফী জুল্‌ফিকার হায়দারকে ৭-১০-৪২ তারিখ লিখা যে চিঠি ছেপেছেন আবদুল কাদিরের মতে সেটি ১০-৭-৪২-এ লেখা চিঠি। আবদুল কাদিরের মতে মানসিক অসুস্থতা হেতু তিনি তারিখ সঠিকভাবে লেখেননি। সুফী জুল্‌ফিকার ও শ্যামাপ্রসাদের কাছে লেখা পরবর্তী চিঠির তারিখ সঠিক না হওয়ারও কারণ হয়ত একই। শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং সুফী জুলফিকার ও শ্যামাপ্রসাদের কাছে চিঠির ভাষার ও বাক্যনির্মাণের পার্থক্য, অসংলগ্নতা ও সংলগ্নতা দেখে মনে হয়, নজরুলের অসুখ তখন অসুস্থতা ও সুস্থতার মধ্যে দোল খাচ্ছিল। ঠিক আধাবিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রিক বাল্বের মত। নেগেটিভ-পজিটিভ মিললেই আলোর বাল্ব বা টিউব জ্বলে উঠে যখন আলাদা হয়ে যায় তখন নিভে যায়। এবং একইভাবে ঐ তার যখন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় তখন বাতি সম্পূর্ণ নিভে যায়। তেমনি নজরুলের মস্তিষ্কের চেতন অচেতনের তার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নজরুল তার জ্ঞান-বোধ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নজরুল তার জ্ঞান-বোধ বুদ্ধ সম্পর্ণ হারিয়ে নির্বাক হয়ে যান। এইভাবে এই চিঠি থেকে নজরুলের অসুস্থের প্রথম আক্রমণ ও তার পরিণতির একটা লক্ষণ আমরা আবিষ্কার করতে পারি। এবং ঐ চিঠি থেকে আমরা এও আবিষ্কার করি কঠিন মানসিক আঘাতও তাঁর চেতনা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। সুফী জুলফিকারকে তিনি লিখেছেন-

Blood pressurre- এ শয্যাগত। অতি কষ্টে চিঠি লিখছি। আমার বাড়িতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারের তাগাদা প্রভৃতি Worrees, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনী। তারপর নবযুগের Worries ৩/৪ মাস পর্যন্ত। এই সব কারণে আমার nerves shatterde হয়ে গেছে।'

নজরুলের অসুস্থতার কারণ অনেকে জানতে চান, কারণগুলো তো নজরুল নিজে দেখিয়েছেন। তিনি তো ঐ চিঠিতে বলেছেন, কেন তার nerves shatterde হয়ে গেছে। যে-কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে সে কারণে মানুষ আত্মহত্যা না ক'রে আত্মশক্তিকে ভর করে বাঁচতে গেলে চেতনা সংযোগকারী নার্ভের তার ছিঁড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব এবং

বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিসঙ্গত। (তথ্য সূত্র ঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ মে ১৯৯৫)।

কবি নজরুল অসুস্থ হবার প্রায় সাত মাস আগে 'নবযুগ' পত্রিকায় "ভয় করিওনা হে মানবাত্মা' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। উক্ত কবিতায় নজরুল লিখেছেন ঃ

"এক আল্লারে ভয় করি মোরা
কা'রে-ও করিনা ভয়,
মোদের পথের দিশারী
এক সে সর্বশক্তিময়।"

এই কবিতার কয়েক পংক্তিতে পরম স্রষ্টা আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দার আত্মসমর্পণের আকুতি বা আর্জি প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর প্রতি কবি নজরুলের যে কতো অগাধ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিলো কবিতায় তা সুস্পষ্টভাবে নির্ণিত হয়েছে। অথচ অসুস্থ হবার পর কবি নজরুল বরাদাচরণ মজুমদার নামে এক ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে না-কি কালিমাতার নাম করে বিশেষ যোগ সাধনা করতেন। কিন্তু যোগ সাধনা তাকে রোগমুক্তি করতে পারেনি। প্রতারিত হন তিনি। অনেকে মনে করেন তৎকালে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিলো প্রাথমিকভাবে সঠিক চিকিৎসা করলে কবি নজরুল আরোগ্য লাভ করতেন।

অর্থভাবে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে কবি নজরুলের সঠিক চিকিৎসা হয়নি। তন্ত্র-মন্ত্রের চিকিৎসার পর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে এবং ডাঃ আবুল আহসানের প্রত্যক্ষ চিকি ৎসাধীনে কবিকে বহুদিন রাখা হয়েছিলো। এরপর তাকে লুম্বিনী পার্কে রাখা হয়। মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোহাম্মদ হোসেনও পরীক্ষা করেছিলেন কবিকে। কবি নজরুলকে পাঠানো হয়েছিলো রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে। কিন্তু এখানেও কোন ফল হয়নি। অসুস্থ হবার প্রায় ১১ বছর পর লন্ডনে পাঠাবার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

১৯৫২ সালের ২৭ জুন কলিকাতার সাহিত্যিকেরা মিলে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করেন। আর তার সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব কাজী আবদুল ওদুদ। ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান নজরুল সমিতি' গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ। উভয় বাংলার জনসাধারণের চেষ্টায় যে টাকা সংগৃহীত হয়েছিলো তা দিয়েই নজরুলকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জনাব মীজানুর রহমানের চেষ্টায় 'নজরুল একাডেমী' গঠিত হয়। ওখান থেকেও সাহায্য পাঠানো হয়- ছ' হাজার টাকা।

১৯৫৩ সালের ১০ মে নজরুল লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সহগামী হন তাঁর রুগ্না স্ত্রী প্রমীলা নজরুল, কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ, রবীউদ্দিন আহমদ ও একজন শিক্ষিতা নার্স।

.........লন্ডনে ২০ জুন ডাঃ সার্জেন্ট উইলিয়াম কবিকে প্রায় দুইঘন্টা পরীক্ষা করেন।....প্রাথমিক Medical report-এ বলেন যে, কবির সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া

আশাতীত। তবে রাঁচি মানসিক হাসপাতালের সুপারিন্ট্যান্ট মেজর ডেভিস-এর রিপোর্ট-এর সঙ্গেও তিনি একমত হতে পারেননি। এরপর বোর্ডের অপর দু'জন ডাক্তার ই, এ, বেটন ও স্যার রাসেল ব্রেন পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন। এঁরাও একমত হতে পারেননি। তাঁরা আলোচনা করে স্থির করেন যে, কোন প্রকার চিকিৎসা প্রয়োগের পূর্বে কবির মস্তিষ্কের অবস্থা Air encephalogram (এক প্রকারের পরীক্ষা পদ্ধতি, যাতে রোগীর শিরদাঁড়া ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়া প্রয়োজন মতো বায়ু মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে মস্তিষ্কের X-Ray গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার 45.C.C পরিমাণ বায়ু কবির মস্তিষ্কের প্রবেশ করানো হয়েছিলো) করে অবশ্য দেখতে হবে। ২৭ জুলাই এঁরা লন্ডন ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার সময় দেখতে পান কবির চক্ষু সজল আর অসহায় ব্যক্তির মতো তিনি নীরবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন)।....

এক্স-রে রিপোর্ট দেখে স্যার রাসেল ব্রেন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন ঃ কবির মস্তিষ্কের Cells যেভাবে নষ্ট হয়েছে, তা আরোগ্যের অতীত। এরপর তাঁরা লন্ডনের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ উইলি ম্যাক্‌ফিস্‌কসহ এক কনফারেন্সে মিলিত হন।.... তারা বলেন, "মাক্‌ফিস্ক অপারেশন" নামক অস্ত্রোপচার দ্বারা কবির মস্তিষ্কের সম্মুখভাবে অবস্থিত ফ্রন্টো থ্যালামিক ট্রাক্ট নামক স্নায়ুপথ যদি মস্তিষ্কের অপরাংশ হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে কবি অনেকটা আরোগ্য লাভ করতে পারেন।

... ডাঃ রাসেল ব্রেন এই মত সমর্থন করেননি। এ অবস্থায় তিনি কোন প্রকার চিকিৎসাই সঠিক বলে মনে করেননি। চিকিৎসকগণ দ্বিধায় পড়ে বিভিন্ন নজরুল সমিতির মতামত নিয়ে সুইজারল্যান্ডে ও জার্মানীর বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করেন। তাঁরা মত প্রকাশ করেন, 'অস্ত্রোপচারে কবির আরো ক্ষতি হতে পারে।' ভিয়েনার স্নায়ুবিদ্যাবিদ ডাঃ হান্‌স্‌ হফ্‌ বলেন, আমি নিজে একবার কবিকে পরীক্ষা করতে চাই। কারণ সমস্ত রিপোর্ট-এর মধ্যে কবি যে কি ব্যাধিতে ভুগছেন, তা নির্ণিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এক্স-রে রিপোর্ট হতে পরিষ্কার যে, অস্ত্রোপচার তাঁর পক্ষে রীতিমত ক্ষতির কারণ হবে। এই রিপোর্টের পর সকলেই কবিকে ভিয়েনায় নিয়ে শেষ চেষ্টার জন্য লিখে পাঠালেন।

....৭ ডিসেম্বর কবিকে ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয়। ৯ ডিসেম্বর কবির উপর সিরিব্রাল আলজিওগ্রাফী পরীক্ষা করা হয়। এটা এক প্রকারের পরীক্ষা, যাতে রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে গণ্ডদেশ ছিদ্র করে মস্তিস্কের মধ্যে রক্ত সঞ্চারণ করে মস্তিস্কের এক্স-রে ছবি গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ডাঃ হফ্‌ বলেন যে, কবি পিক্‌সডিজিস্‌ নামক মস্তিষ্ক রোগে ভুগছেন। এই ব্যাধিতে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কবির ব্যাধি এতো পুরাতন হয়ে গেছে যে, আরোগ্যের আশা অল্প। তিনি একটি চিকিৎসার ব্যবস্থালিপি লিখে দেন। তাতে কিছুটা উপকার হতেও পারে এবং তা কলিকাতাতেও পরীক্ষা করা যেতে পারে। অবশেষে কবি ১৯৫৩ সালে ১৪ ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরে আসেন। (তথ্য সূত্র ঃ খান মুহাম্মদ

মঈনুদ্দীন, অজানা নজরুল, পৃঃ ২১৭-২২০)।

কবির ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ মঙ্গলবার ৭ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ২৭ শাবান ১৩৯৬ ঃ ২৪ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের চিকিৎসক প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের বিবৃতি ঃ

"কবির রোগের কারণ সম্পর্কে আমি বহুদিন ধরে বহু রকম শুনে আসছি। সবচেয়ে যে ধারণাটি সাধারণের মনে বদ্ধমূল হ'য়েছিল, সেটি হ'চ্ছে বোধ হয় জীবনের উচ্ছৃংখলাজনিত একটি বিশেষ রোগে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি ১৯৬৫ সাল থেকে কবির চিকিৎসা ক'রে আসছি এবং ১৯৬৯ সালে সরকারীভাবে কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হই। কবির চিকিৎসা করতে এসে, কবিকে ভালো করে পরীক্ষা ক'রে বুঝলাম, তাঁর একটি বিশেষ রোগে ভোগার জনশ্রুতি সম্পূর্ণ ভুল।

আমি দিনের পর দিন নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে জানতে পারলাম, এই অসাধারণ কবির রোগও অসাধারণ। একটি বিশেষ রোগের যা লক্ষণ পা দু'টো দুর্বল হয়ে যাওয়া-তা কবির ছিলনা। তিনি চমৎকার হেঁটে বেড়াতেন এবং এ ঘর থেকে ওঘরে ভালোভাবে যাতায়াত ক'রতেন। কবির ব্রেনে জার্ম বা রক্তে এই বিশেষ রোগের কোন লক্ষণ ছিলনা। তিনি মাঝে মাঝে মৃগীতে আক্রান্ত হতেন এবং মাঝে মাঝে রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেত। আবার সঠিক চিকিৎসায় সব কিছুই নিরাময় হত। (সূত্র ঃ শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৬৩০)।

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, কবি নজরুল রোগাক্রান্ত হবার পেছনে একটি অদৃশ্য অশুভ চক্রের চক্রান্ত যে ছিলোনা- একথা তুড়িমেরে উড়িয়ে দেয়া যায়না।

রোগাক্রান্ত হবার পর কবির পরিবার চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। এ সম্পর্কে জনাব নূরুল হুদা বলেছন ঃ

"সে সময় যে সকল মুসলমান নজরুলকে সাহায্য করতেন, পাকিস্তান হওয়ার পর তারা সব এদেশে চলে আসলে কবিকে অসামান্য আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয়।" (দৈনিক মিল্লাত, ২৮ মে ১৯৯০)।

পরবর্তীতে অসুস্থ কবির অসহায় পরিবারকে ভারত সরকার মাসিক ৩০০ টাকা ও পাকিস্তান সরকার ৩৫০ টাকা মাসিক সাহিত্যিক বৃত্তি প্রদান করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরো ১০০ টাকা বৃদ্ধি করলে কবির সর্বময় মাসিক বৃত্তি দাঁড়ায় ৭৫০ টাকা। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকার কবির বাসস্থানের কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে কবি ক্রিস্টোফার রোডের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দু'কামরার একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে তাঁর বড় ছেলে কাজী সব্যসাচীর সাথে থাকতেন। কবির বাসস্থানের সমস্যাটি ছিলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এ সম্পর্কে মুজাফ্‌ফর আহমদ মন্তব্য করেছেন ঃ

"দুই কামরার ফ্ল্যাটে কাজী সব্যসাচী তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সস্ত্রীক বাস করে। ছেলে-মেয়েরা ক্রমেই বড়ো হচ্ছে। আসলে দু'কামরায়, সব্যসাচীদেরই স্থানের সংকুলান

হবার কথা নয়, অথচ এই স্থানটুকুর ভিতরে কবিকেও থাকতে হচ্ছে। তাঁর পরিচারকদেরও স্থানের সমস্যা আছে। কেউ যদি কবিকে দেখতে আসেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট দেখে তাঁরা চলে যান। বাসস্থানের সমস্যাটি বাস্তব ও কঠোর। কমপক্ষে পাঁচটি কামরা তাঁদের জন্য চাই। আমি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করছি। ইচ্ছা করলেই তাঁরা কবির বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।" (তথ্য সূত্র ঃ মুজাফ্ফর আহমদ, বাংলা সাহিত্যের সওগাত যুগ, পৃঃ ৮১৬)।

এরপরও ধর্মনিপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িকতার দাবীদার ভারত সরকার কবি নজরুলের জন্য একটি সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করেননি। পরবর্তীতে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম বঙ্গে কলিকাতায় সফরে গেলে কবিকে দেখতে তাঁর বাসস্থানে যান। স্বল্প পরিসরের এই বাসস্থান দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। অবশেষে তিনি ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে ১৯৭২ সালের ২৩ মে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। বাংলাদেশ সরকার কবির ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় খরচ বহন এবং ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৮ নম্বর সড়কের ৩৩০ বি,-এর বাড়িটি কবির জন্য বরাদ্দ করেন। কবির জন্য শেখ সাহেবের এই আন্তরিক উদ্যোগ সর্বমহল কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিলো।

সবুজে ঘেরা সুপরিসর লন পেয়ে কবি খুব উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়েছিলেন। যা অসুস্থ কবির আচরণে প্রকাশ পেতো বলে শোনা যায়। এছাড়া খোলামেলা এই বাড়ীটিতে কবি খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন এবং দোতলা থেকে তিনি কিছুতেই নিচে নামতে চাইতেন না।

কবির চিকিৎসক ডাঃ ডি, কে রায় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, কবিকে বাড়ীর বাইরে কোন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তখন থেকে কবির বাড়ীতেই অনুষ্ঠানাদি হতো এবং সেখানেই ফুলে আর গানে কবিকে উৎফুল্ল রাখা হতো। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বরাদ্দ কবি ভবনেই নজরুল অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই সন্ধ্যার পর পিজি হাসপাতাল থেকে একটি এ্যাম্বুলেন্স এসে কবিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন সবেমাত্র কবি প্রাত্যহিক নিয়ম মতো নলে পায়চারী সেরে তাঁর কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সকলে কবির নাশ্তার জন্য ব্যস্ত। নাস্তা সেরে কবি গান শুনবেন। অকস্মাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা শুনে কবির পরিবার বিস্মিত হন। কবিকে হাসপাতালের ১১৭ নং রুমে রাখা হবে বলে সরকারের সিদ্ধান্তের চিঠিখানা তাদেরকে দেখানো হয়। তাঁকে নামাবার জন্য স্ট্রেচার আনা হয়েছিলো কিন্তু কবিকে দোতালা থেকে নিচে জোর করে হাঁটিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। কবি কিছুতেই নীচে নামতে চাইছিলেন না। জোর করে রেলিং আঁকড়ে ধরে ছিলেন। হাত ছাড়িয়ে ফিরে যেতে চাইছিলেন তাঁর নিজের ঘরে। এ বাড়ী ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না কবি। ডক্টর রফিকুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে খুবই মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে জনৈকা এসপি'র পত্নীর নামে বাড়ীটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো। কবিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা ছিলো সাজানো নাটক। কারণ কবির চিকিৎসার্থে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যে দিন একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিলো ঠিক সেদিনই সন্ধ্যায় কবির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থেকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এ সম্পর্কে কবির চিকিৎসক ডাঃ ডি, কে, রায় বলেছেন ঃ

কবিকে কেন অসুস্থ বলে হাসপাতালে ভর্তি করা হ'ল তা ২৩ জুলাই বোঝা গেল। ২৩ জুলাই অর্থাৎ কবিকে স্থানান্তরিত করার পরদিন কবি ভবন সীল করা হয় এবং বরাদ্দ করা হ'ল তৎকালীন ঢাকার এসপির নামে। কিন্তু কেন? ওদিকে ১৯৭৫ সালের ৯ মে তারিখের নির্দেশটি তো প্রত্যাহার করা হয়নি? ঐ নির্দেশে গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় উক্ত ভবনটি কবির জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। কবির হাসপাতালে ভর্তি হলে তাঁর বাড়ী কেন সীল হবে? বাংলাদেশের জনগণ এই ভবনটি তো 'কবি ভবন' বলেই জানতো। কবি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তবে তাঁর চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা কি কবি ভবনেই করা যেত না? এটা বলে রাখা দরকার যে, গত ৩৪ বছর ধরে কবি যে অবস্থায় রয়েছে ওটাই তখন তার নর্মাল অবস্থা। কবি বহুদিন পূর্বেই চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু কথা হ'ল, কবিকে কেন তাঁর বাড়ী থেকে সরানো হ'ল? পরদিন সকালেই তাঁর বাড়ী সীল করা কেন হ'ল? গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী কবি ভবন সীল করতে এসেছিলেন, তাঁকে হাজার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কবির সমস্ত জিনিসপত্রসহই বাড়ী সীল করে ছিলেন। যে ছবিটি কবির পাশে প্রত্যহই থাকতো সে কবিপত্নী প্রমিলার ছবিটিও নেই।

আট মাস ধরে কবি হাসপাতালে একই অবস্থায় রয়েছেন। হাঁটা-চলা-ফুর্তি সবই ভুলে গেছেন। গান-বাজনা বন্ধ, যা সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত করা হ'ত। ২২ জুলাই পর্যন্ত কবি গান-বাজনা শোনা, টেলিভিশন দেখা ও মুক্ত বায়ুতে চলাফেরার জন্য যে শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন সেটাই তাঁর একমাত্র চিকিৎসা। এ ছাড়া কবির অনেক ভক্ত রয়েছেন যাঁরা কবিকে দেখতে চান কিন্তু হাসপাতালের কঠোর নিয়মে তাঁদের পক্ষে কবিকে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং কবিকে তাঁর পূর্ব পরিবেশে কবি ভবনে নিয়ে যাওয়াই কাম্য।

কবিকে হাসপাতালে নিয়ে রাখায় অনেকে দুঃখিত হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ তিনি তখন হাসপাতালে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন না। যে বাড়ীটি কবির নামে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই কবি ভবনে কি তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না? যাঁরা হাসপাতালে কবির চিকিৎসা করছিলেন, তাঁরা কি কবি ভবনে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা করতে পারেন না? সেখানে কি পরিচালিকা রেখে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা যায় না? যে পরিবেশ কবি ভালোবাসেন সেই পরিবেশ কি সৃষ্টি করা যায় না, তাঁকে মুক্ত প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করতে দিয়ে, ফুল দিয়ে আর গান শুনিয়ে? বাংলাদেশে আসার পর কবি তো সে পরিবেশেই ছিলেন।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন-কবি ভবনে তাঁর পরিচর্যার ব্যাপারে অব্যবস্থা সৃষ্টি

হয়েছিল। বহু অর্থের অপব্যয় ও অপচয় ঘটেছিল। কিন্তু তার প্রতিকার কি কবিকে হাসপাতালে একটি কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা না কবি ভবনে কোনো অব্যবস্থা থাকলে তা দূরীভূত করা? (তথ্য সূত্র ঃ শখ দরবার আলম, অজানা নজরুল)।

বালাদেশ স্বাধীন হবার পর অবাঙ্গালীদের বহু পরিত্যক্ত বাড়ী দখল করার হিড়িক পড়েছিলো। কবি নজরুলের নামে বরাদ্দকৃত বাড়ীটি বাদ দিয়েও অন্য যে কোন বাড়ী ঐ এসপির পত্নীর নামে বরাদ্দ দেয়া যেতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই কবির। জীবন সায়াহ্নে এসেও একজন সামান্য পুলিশ কর্মকর্তার প্রয়োজনের কাছে হেরে গেলেন বা হারিয়ে দেয়া হলো কবিকে। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও বাসস্থানের একটু সুখ ভাগে জোটেনি কবির। কবিকে ঢাকায় এনে শেখ সাহেব সবার কাছে নন্দিত হয়েছিলেন। আর তাঁরই জীবদ্দশায়, তাঁরই শাসনামলে কবিকে অসম্মানজনকভাবে বাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য করা ছিলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যা সর্বমহল কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। অনেকে এটাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করেছেন।

অসুস্থ কবি নজরুলকে যে নির্মম ও অসম্মানজনকভাবে তৎকালীন সরকার বাড়ী ছাড়া করেছে তা নিয়ে সে সময়ে নাসিরুদ্দীন সাহেবরা ছিলেন একেবারে নীরব। এর বিরুদ্ধে কেউ জোরালো প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। কিন্তু কবির মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে ছিলেন একেবারে সরব।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৯৭৬ সালের মে মাসে বাংলা একাডেমী আয়োজিত কবির জন্মবার্ষিকী সভায় সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন ঃ

'কবি বর্তমানে পিজি হাসপাতালের একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। কিন্তু খোদা না করুন, হাসপাতালের এই কক্ষেই যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তা'হলে কবির বাসভবনে স্মৃতিচিহ্ন বলে কিছু থাকবে না। সাগরদাড়িতে মাইকেলের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বহন করতে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিলাইদহের কুঠিবাড়ী; আর নজরুলের মৃত্যুর পর আমরা কি দেখতে পাব, তা নিয়ে এখন থেকেই চিন্তা ভাবনা করা দরকার। আমরা দেখতে চাই, কবির নামে একটি 'কবি ভবন', যাতে থাকবে কবির বাস-কক্ষ ও তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্র। এই ভবনেই থাকবে কবির সম্পূর্ণ রচনাবলী, অসংখ্য গানের রেকর্ড, তাঁর সম্পর্কে লিখিত দেশ-বিদেশের গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি এবং আর যা যা সংগ্রহ করা সম্ভব তা-ও এই কবি-ভবনে থাকবে। আমি মনে করি সরকার ও উ ৎসাহী জনগণের পক্ষে ইহা অসম্ভব কাজ নয়।

পুনরায় অনুরোধ করি, নজরুল ভবনের উদ্বোধনকল্পে সরকার যেন অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কাজে জনসাধারণ ও সরকারের সাথে সহযোগিতা করবেন। আমরা কেবলমাত্র কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার দ্বারাই আমাদের কর্তব্য শেষ করতে পারি না।" (তথ্য সূত্র ঃ বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ)

সেদিন নাসিরুদ্দীন সাহেবরা কবির জন্মবার্ষিকী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার অভিলাষ ব্যক্ত করেই কবির প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শেষ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন যদি

তাঁরা অত্যন্ত প্রতিবাদী বক্তব্য ও কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতেন তাহলে কবির বাসস্থানটি সরকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হতো। অন্তত্ব কবি নজরুল নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মার প্রশ্বস্তি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তাঁরা কেউ সেদিন এগিয়ে আসেননি।

এগিয়ে না আসার কারণে জীবদ্দশায় কবি আর বাড়ীটি ফিরে পাননি বা নিজস্ব ভবনে ফিরে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে কবির মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে বাড়ীটি 'নজরুল ভবন' হিসাবে বহাল রাখা হয়নি। এরশাদ আমলে ১৯৮৫ সালে তা 'নজরুল ইন্সটিটিউটে' পরিণত হয়।

১৯৭২ সালের ২৫ মে প্রথম স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে নজরুল একাডেমীর পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে নজরুল জয়ন্তী পালনের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কাজী আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে কয়েকজন কর্মকর্তা তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন দিবসের প্রধান অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে তা প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির তৎকালীন স্পেশাল অফিসার মাহবুব তালুকদার "বঙ্গভবনে পাঁচ বছর" স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

বিষয়টি সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। ১৬ মে, ১৯৭২ তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকা হাতে করে রাষ্ট্রপ্রধানের কক্ষে ঢুকে পড়লাম। বললাম, আপনি নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? কোন অসুবিধা আছে কি? তিনি আমার বলার ধরন দেখে প্রশ্ন করলেন।

বললাম, একটু অসুবিধা আছে। তবে আপনি যখন তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তখন অসুবিধার কথা বলা ঠিক হবে কি-না ভাবছি।

ভাবনার কিছু নেই। তোমার যা বলার, বলে ফেল।

আমি জানালাম, আমার মতে নজরুল একাডেমী আসলে নজরুল একাডেমী নয়, রবীন্দ্রবিরোধী একাডেমী। আপনার কি মনে আছে, বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার পর সরকার হঠাৎ নজরুল সঙ্গীতের পরিচর্যায় উঠে পড়ে লেগে যায়? প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকায় এসে নজরুল একাডেমীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের নাম-গন্ধ মুছে ফেলার সব ধরনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে যান।

রাষ্ট্রপ্রধান বোধ করি বিব্রত হলেন আমার কথা শুনে। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তারপর ডাইরেক্ট টেলিফোন তুলে কাউকে ফোন করলেন। বললেন, আপনি আমাকে নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানে যেতে বলেছিলেন।

ও-প্রান্ত থেকে কে কি বললেন বুঝতে পারলাম না। রাষ্ট্রপ্রধান বললেন, আচ্ছা। আপনি এখনই আসুন। আমাকে বললেন, তুমি তোমার ঘরে যাও।

নিজের ঘরে এসে মনে হল আগ বাড়িয়ে কথাগুলো আমি না বললেই পারতাম। রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলা আমার উচিত হয়নি। কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরের দেয়ালে বৈদ্যুতিক সংকেত অর্থাৎ লালবাতি জ্বলে উঠল। রাষ্ট্রপ্রধানের ঘরে অভ্যাগত কেউ এসেছেন। প্রায় আধঘন্টা পরে বাতি নিভল এবং তার পরপরই আমার ডাক পড়ল। একটু জড়সড় হয়ে ঘরে ঢুকলাম। কি জানি কি বলেন। সসংকোচে তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, বস।

বসলাম।

যেন রসিকতা করছেন এমন ঢংয়ে তিনি বললেন, মন্ত্রী যদি কোন বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দেন আমি তার কথা শুনব, না তোমার কথা শুনব?

আপনি যা যুক্তিসংগত তা-ই শুনবেন। কে পরামর্শ দিল তা বড় কথা নয়, কি পরামর্শ, সেটাই বড়। তবে মন্ত্রীর মন্ত্রণা যুক্তিগ্রাহ্য হলে মানা সঙ্গত।

তিনি হাসলেন। বললেন, দু'জনের পরামর্শ এক হওয়ায় বাঁচা গেল। একটু আগে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী এসেছিলেন। তোমার সামনে তাঁকে ফোনে নজরুল একাডেমীর কথা বলতেই তিনি বললেন, আমি এখনই আসছি স্যার। তারপর তিনি এসে যা কিছু বললেন, তা ঠিক তোমারই কথা। আমার মনে হল দু'জনে পরামর্শ করে একই কথা বলেছো। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিনি তোমাকে চেনেন। তবে নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়নি। তিনি যদিও নজরুল একাডেমীর হয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আমাকে যেতে মানা করলেন।

আমি হেসে বললাম, ইউসুফ আলী সাহেবের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আমার যোগাযোগ হয়নি।

নজরুল একাডেমীর ঐ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপ্রধান শেষ পর্যন্ত যাননি। এমনকি অধ্যাপক ইউসুফ আলীও যাননি; যদিও তার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তথ্য ও বেতারমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী তাতে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন কাজী আনোয়ারুল হক। (মাহবুব তালুকদার, বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, পৃঃ ৩৭, ৩৮)।

এই অতি উৎসাহী আমলা ও বুদ্ধিজীবী নিছক একটি অজুহাত দাঁড় করিয়ে নজরুল একাডেমীকে রবীন্দ্র বিরোধী আখ্যায়িত করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত রেখেছিলেন। যা অত্যন্ত হাস্যকর। এ ধরনের অতি উৎসাহী অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত আমলা ও বুদ্ধিজীবী আমাদের দেশে বহু রয়েছে। এদের কারণেই বোধ হয় নজরুল কবি ভবন থেকে অতি সূক্ষ্ম কৌশলে ধানমন্ডির কবি ভবন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জীবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারিক জীবন ছিলো অশান্তিময়। এর জন্য মূলতঃ দায়ী ছিলো কবি নিজেই। আগেই উল্লেখ করেছি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরকীয়া প্রেমের বলি হয়েছিলো কাদম্বরী দেবী। তাই নিয়তির নির্মম প্রতিশোধ থেকে কবির কন্যারাও রেহাই পায়নি। পাপের প্রায়শ্চিত্য বোধ হয় কবির নিষ্পাপ তিন কন্যাকেও দিতে হয়েছে।

কলিকাতার 'দেশ' পত্রিকা ১৩৯৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত ৯২টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিলো। এরমধ্যে ৮৭টি চিঠি আগে অপ্রকাশিত ছিলো। এই সব ব্যক্তিগত চিঠি এবং বিভিন্ন সময়ে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালী হিন্দু বাবুদের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিলো তিনকন্যা। বড় কন্যার নাম ছিলো মাধুরীলতা। কবির ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সবচাইতে ফর্সা বেশ শান্ত ও নম্র, অথচ অভিমানিনী ছিলেন এই মাধুরীলতা। কবি আদর করে ডাকতেন বেলা, কখনো বেলু বা বেল বুড়ি। এই মেয়েকে কবি লেখাপড়া শিখিয়েছেন একেবারে আলাদা ধরণে। তিনজন ইংরেজ শিক্ষিকা, লরেন্স সাহেব ও হেমচন্দ্র ভট্টচার্যের কাছে লেখা পড়া শিখিয়েছেন। বাবার কাছেই তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত দীক্ষা নিয়েছেন। দ্বিতীয় কন্যার নাম ছিলো রেনুকা (রাণী) এবং তৃতীয় কন্যার নাম ছিলো মীরা (অতসী)। এই তৃতীয় কন্যা যেন ছিলো একই বৃন্তে তিনটি ফুল। অথচ একটি ফুটে না উঠতেই অকালে ঝরে যায়। আর একটি জীবনের মাঝপথে এসে থেমে যায়। শেষেরটিও জীবনের দাবাদয়ে দয়াহীন এই সংসারে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। সে কাহিনী বড় করুণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কলিকাতার একটি পত্রিকায় পূজা সংখ্যা ১৩৮৯-তে 'ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে লিখেছেন ঃ

এই তিন কন্যাকে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের ছিলো এক রকম অশান্তি, অন্য রকম অশান্তি ছিলো তিন জামাইকে নিয়ে। তিন জনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের পছন্দ করা। তিন জনকেই তিনি পরমস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। কন্যাদের ভবিষ্যতের ভারও নিয়েছিলেন তিনি।

বড় জামাই শরতকুমার চক্রবর্তীকে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠান ইংল্যাণ্ড, মেজ জামাই

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর কাছে আবেদন করছেন, বিশ্বভারতীকে নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্বের প্রতিশ্রুতি দিতে

সতেন্দ্র ভট্টাচার্যকে পাঠান আমেরকায়-হোমিওপ্যাথি শেখাতে, কৃষিবিদ্যা শিখতে ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিও যান আমেরিকায়। অথচ তিন জনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রণার অন্ত ছিলনা। ছোট জামাই শেষদিকে কনিষ্ঠা কন্যা মীরাকে ফেলে ইংল্যান্ডেই চলে গেলেন, মেজ জামাই শ্বশুরের একগাদা টাকা নষ্ট করে তড়িঘড়ি আমেরিকায় থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই মধ্যমা রেনুকা মারা যান এবং বিপত্নীকে মেজ জামাইয়ের সঙ্গে এক আত্মীয়ার পুনর্বিবাহ দেওয়ার পরই মেজ জামাই মারা যান।

বড় জামাই শরতকুমার কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র নয় বছরের ছোট। ১৮৭০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মজঃফরপুরে জন্ম। বরাবরই মেধাবী, পড়াশোনা করেছেন জলপানি পেয়ে-হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সিতে। অনার্স ছিল ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনে। বিএ-তে ফাস্টক্লাস ফাস্ট, এম এ-তে ফাস্ট ক্লাস ফার্স্ট। আইন পরীক্ষাও পাশ করেন ভালভাবে। শরতকুমারের খোঁজ দেন কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেন। বড়লোক নয়, মফস্বলের ছেলে, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাল জানেন- রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ। সবচেয়ে আদরের মেয়ে মাধুরীলতার (বেলা) সঙ্গে শরতকুমারের বিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এমনকি বরপক্ষের পীড়াপীড়িতে কুড়ি হাজার টাকা পণ দিতেও রাজি হয়ে যান। এই পণ দেওয়া নিয়ে অনেক মনোমালিন্য হয় এবং অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর ১৯০১ সালে বিয়ে হয়। শরতকুমার প্রাকটিস শুরু করেন মজঃফরপুরের আদালতে। রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি, নিজে মজঃফরপুরে গিয়ে দেখে আসেন মেয়ে কেমন আছেন এবং স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে চিঠিতে লেখেন, বেলা সুখেই আছে, শরৎ ছেলেটিও চমৎকার।

বছর কয় পর শরতকুমার ও মাধুরীলতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে চলে আসেন। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিলেত পাঠান ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৯০৯ সালে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে প্র্যাকটিস করতে থাকেন কলকাতার হাইকোর্টে-ঠাকুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়েই। মেজ জামাই ততদিনে অকালমৃত, ছোট জামাইও ঘরজামাই। কিছুদিন সদ্ভাবে থাকার পর শুরু হল দুই জামাইয়ে মনোমালিন্য। এই বিবাদ দুই বোন-মাধুরীলতা ও মীরার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে নীরব থাকেন। এই নীরবতা কনিষ্ঠ জামাতার প্রতি শ্বশুরের পক্ষপাতিত্ব বলে শরতকুমার ও মাধুরীলতা মনে করতে থাকেন। এই অবস্থাতেই ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেত যান পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। শরতকুমার ছিলেন স্বাধীনচেতা ও স্পষ্ট বক্তা, তদুপরি নিরীহ প্রকৃতির, অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি ছিলেন অনেক বেশি সপ্রতিভ ও সুচতুর। শোনা যায়, পুত্র রথীন্দ্রনাথ সঙ্গী থাকায় বিলেত যাওয়ার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ সাংসারিক কিছু দায়িত্ব ছোট জামাই নগেন গাঙ্গুলি মশাইকে দিয়ে যান। অনর্থ বৃদ্ধি তখন থেকেই। ঠাকুরবাড়ির কয়েকজনের কাছে শুনেছি, হেমলতা দেবী তাদের বলেছেন, নগেন্দ্রনাথ খরচ কমাতে ভায়রাভাই শরতকুমারের জন্যে নির্দিষ্ট স্টেটসম্যান কাগজ রাখা বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্রের একনিষ্ঠ পাঠক শরতকুমার তাতে অপমানিত বোধ করেন। তারপর কলহ আপন গতিতেই অগ্রসর হয়

কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী লতা দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুর পরিবার (১৯০৪)

এবং ভুল বোঝাবুঝি এমন স্তরে পৌঁছায় যে, দুই বোনের মধ্যে কথা বলা শুধু নয়, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ শরতকুমার রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সস্ত্রীক এন্টালির ডিহি শ্রীরামপুর রোডে বাড়ি ভাড়া করে চলে যান।

তারপরের ইতিহাসও অজানা নয়। ১৯১৮ সালে মাধুরীলতা গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী হলে রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে দেখতে যেতেন, যেতেন তখনই যখন জামাই বাড়িতে নেই। কদাচিং দেখা হলেও দু'জনে কথাবার্তা ছিলনা। এমনকি টেবিলের উপর পা থাকলে শ্বশুরকে দেখে পা নামানোরও প্রয়োজন মনে করেননি শরতকুমার। রবীন্দ্রনাথের অপমানের এক শেষ। কিন্তু কী করবেন, মৃত্যু পথযাত্রী কন্যার কথা ভেবে এই অপমান তিনি মুখ বুঝে সহ্য করেছেন। মীরাদেবী নাকি দিদিকে দেখতে যেতে চেয়েছিলেন। জানতে পেরে শরতকুমার মানা করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জোড়াসাঁকো থেকে আর কেউ মাধুরীলতাকে দেখতে যাননি। মাধুরীলতার 'যাত্রাপথে' কল্যাণ কামনা করে রবীন্দ্রনাথ যেদিন ডিহি শ্রীরামপুর রোডে গিয়ে বুঝতে পারলেন মেয়ে আর নেই, তখনই ঘোড়ার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন, তেতলায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সারাদিন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শরতকুমার প্রাকটিস ছেড়ে দিয়ে মজঃফরপুর চলে যান। সব ছেড়ে ছুড়ে কৃষি ও উদ্যান রচনায় ব্যাপৃত হন। তিনি মারা যান ১৯৪২ সালের ১৩ জুলাই। তার এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বিদায় নেন। তখনও ক্ষুব্ধ শরতকুমার একটি শোকবার্তা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাননি। তবে শরতকুমার ভ্রাতৃস্পুত্র জ্যোতিময় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাঁর সেজকাকা শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সারাদিন আকুল ক্রন্দনে উদ্ভ্রান্ত ছিলেন। হয়ত ছিলেন, কিন্তু তিনি একবারও বুঝতে পারেননি, দুই ঘরজামাইয়ের কলহে, শ্বশুরের কিছু করার ছিল না। মাধুরীলতাও বাবার মনে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিলেন। এ আঘাত মৃত্যুশোকের আঘাতের চেয়েও বড়। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ঘনিষ্ঠ এক পরিজন যখন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, আপনি তো আপনার বড় মেয়েকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, তখন রবীন্দ্রনাথ নাকি বিষন্ন কণ্ঠে বলেন, ও কি তা বুঝত? একথা আমাকে বলেছেন সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত কবির নাতবৌ অমিতা ঠাকুর।

এই তো হল, একটি স্নেহের সম্পর্কের পরিণতি। অথচ কি সহজ ও সুন্দর সম্পর্ক ছিল সূচনায়। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন থেকে সংগৃহীত এ যাবৎ অপ্রকাশিত দুটি চিঠি উপহার দেব। তার মধ্যে একটি শরতকুমার চক্রবর্তীর। ঐ একটি চিঠিতেই রবীন্দ্রসদনে আছে। তাঁর লেখা অন্য কোন চিঠি আগে কোথাও ছাপা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের চিঠি শরতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা। চিঠিটি শ্বশুর জামাই মনোমালিন্যে নতুন আলোকপাত করবে। ঠিক নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রাক্কালে সারা ইংল্যান্ড যখন রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ঠিক তখনই কবি বিষাদে মলিন। ১৯১৩ সালের ২১ মে লন্ডন থেকে তিনি লিখছেন, "আমার দেশে ফেরাবার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু তোমাদের মন আমার প্রতি বিমুখ হয়ে রয়েছে একথা মনে করলে দেশে ফেরবার সুখ আমার নষ্ট হয়ে যায়।

সত্তরতম রজত জয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ
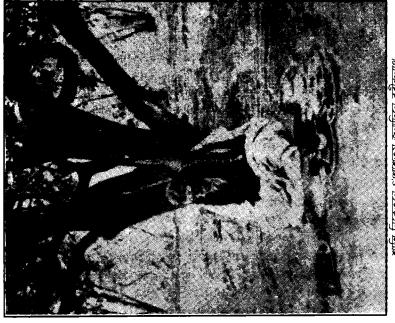
শান্তি নিকেতনে পঞ্চাশতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখছেন 'আজ নয় কিন্তু, এরকম ভুল বোঝা যে বেলার মনে দীর্ঘকাল স্থান পেয়েছে তা আমি পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলুম।' এই চিঠি পড়ে আর একটা সন্দেহ হয়। মতান্তরের সূচনা কি বেলাকে দিয়েই? তিনিই কি ভুল বোঝাবুঝি বা কোন রকম অবিচারের প্রথম শিকার হন এবং তার স্বামী স্ত্রীর মন ও মান রক্ষায় এগিয়ে এসে ক্ষুব্ধ হন? সবই অনুমান, তবে গোটা ব্যাপারটাই যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃখজনক তাতে সন্দেহ নেই। ফলে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মুখে যখন তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রসন্ন থাকার কথা, ঠিক তখনই জামাই মেয়ের কথা ভেবে তিনি বিষন্ন। যাই হোক, রবীন্দ্রজীবনীর পক্ষে অতি মূল্যবান এই চিঠি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম। স্নেহের টানে ও পারিবারিক শান্তিরক্ষায় সব দোষ নিজের উপর জোর করে, টেনে এনে তিনি বলেছেন" তোমরা কোন মতেই ক্ষমা করতে পারবে না।" আরও বলেছেন "আমাদের যে সম্বন্ধ তাতে পরস্পরকে তো বারবার ক্ষমা করতেই হবে।"

বিশ্ববিখ্যাত শ্বশুর সামান্য একজন জামাইয়ের কাছে নত হয়ে এমনভাবে চিঠি লিখছেন, যেন তিনিই অপরাধী, যেন তার দুর্ব্যবহারের জন্যেই সব গণ্ডগোল। অথচ কী দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের, জামাই তো বটেই আদরের মেয়েও বাবাকে বাকি জীবন ভুল বুঝে থাকলেন, ক্ষমা করলেন না। চিঠিটা এই রকম-

কল্যাণীয়েষু শরৎ,

কিছুদিন থেকে অনুভব করতে পারছি যে তোমরা কোন কারণে আমার উপর রাগ করেছ এবং এই ব্যাপারে মনের মধ্যে খুব কষ্টও বোধ করছি। এর ভিতরকার কারণটা কী তা আমি ভেবে স্থির করতে পারিনি, কেন না আমি ইচ্ছে করে তোমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিনি। কিন্তু অনেক সময় স্বভাবের দোষে, ইচ্ছা না থাকলেও পরস্পরকে বেদনা দিয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহেই আমার কোন ব্যবহারে তোমরা সে রকম কোন পরিচয় পেয়ে থাকবে। কিন্তু তার থেকে যদি তোমরা মনে করে থাকো যে, তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহের অভাব আছে তাহলে তোমরা ভুল বুঝেছ- এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারিনে। আজ কিন্তু, এ রকম ভুল বোঝা যে বেলার মনে দীর্ঘকাল স্থান পেয়েছে, তা আমি পূর্বেই বুঝতে পেরিছিলুম। কিন্তু এরকম বিষয় নিয়ে কথাবার্তা কইতে আমি পারিনে- এর আমার স্বভাবগত-এর ফল আমি ভুগি, কিন্তু এর প্রতিকার আমি করতে পারিনে।

যাই হোক, সংসারের স্বভাবের গতিকে বা নানা কারণে আত্মীয়দের মধ্যে সংঘাত ঘটে থাকে- অপরাধের হাত ক'জনই বা এড়াতে পারে? আমার মধ্যে সেরকম ত্রুটি যদি তোমরা দেখে থাক, তাহলে সে কি তোমরা কোনমতেই ক্ষমতা করতে পারবে না? তোমাদের মনে যখন গুরুতর আঘাত লেগেছে দেখতে পাচ্ছি তখন কারণ সম্বন্ধে কোনো রকম কৈফিয়ৎ দিয়ে তাকে আমি হালকা করতে চাইনে- নিশ্চয়ই আমার তরফে কোন অনবধানতা কিংবা কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের যে সম্বন্ধ তাতে পরস্পরকে তো বার বার ক্ষমা করতেই হবে- এ সম্বন্ধকে তো একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সরে যাবার জো নেই।

আমাদের দেশে ফেরবার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু তোমাদের মন আমার প্রতি বিমুখ হয়ে রয়েছে, একথা মনে করলে দেশে ফেরবার সুখ আমার নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যে তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে মনের মধ্যে যে সমস্ত গ্লানি জমে উঠেচে তাকে

একান্ত অবসরে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পাশে উপবিষ্ট ভৃত্য বনমালী
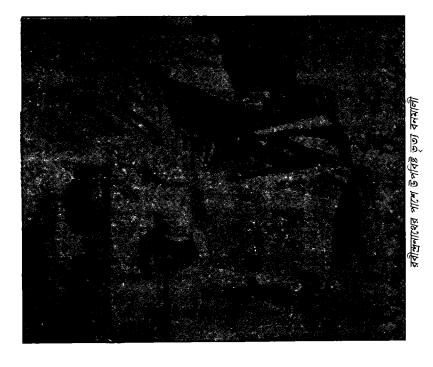
শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে বসন্ত উৎসবে রবীন্দ্রনাথ

আর একবার মুছে ফেলে আবার একবার আমাদের সম্বন্ধকে নির্মল ও নিষ্কন্টক করে আরম্ব কর। আমাদের মধ্যে কী ঘটেছে না ঘটেছে সে কথা তোলবার দরকার নেই, সে কথা ভোলবার চেষ্টা করাই ভাল। তাছাড়া আমিতো সংসার থেকে অনেকটা সরে এসেছি এবং আরো সরে যাব বলেই স্থির করেছি।- আমার মধ্যে যা কিছু পীড়াদায়ক আছে আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে থেকে তা দূরেই থাকবে। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ যাতে হয়ে ওঠে এই আমার কামনা-সেইদিকে কোনো বাধা বা সঙ্কোচ না থাকে, আমার স্বভাবের কোন দীনতাবশত সেদিকে তোমাদের আমি আঘাত না করি এই আমার লক্ষ্য রইল।

ইতি-শুভানুধ্যায়ী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি পাঠান, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঠিকানায়। তিনি জানতেন না ততদিনে মেয়ে জামাই জোড়াসাঁকো ছেড়ে ২৭/১ ডিহি শ্রীরামপুর রোডে বাড়ি ভাড়া করে চলে গেছেন। চিঠির ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নতুন বাড়িতে। শুধু ঠিকানার কাটাকাটি নয়, বড় জামাইয়ের সঙ্গে এবং কার্যত বড় মেয়ের সঙ্গেও সম্পর্কের কাটাকাটি হয়ে গেল তখন থেকেই, জোড়াসাঁকোর সঙ্গে ডিহি শ্রীরামপুর রোডের আর জোড়া লাগল না। জামাইয়ের কাছে অবনত হয়েও শ্বশুর রবীন্দ্রনাথ সাড়া পেলেন না। রবীন্দ্রনাথের দুঃখের হিসাবের খাতায় আর একটি বড় বিয়োগ অংক যোগ হল।

শান্তি নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে রবীন্দ্রনাথ
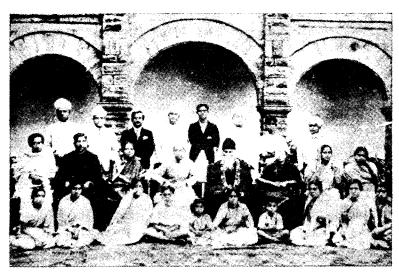
ওয়ালটেয়ারে সপরিবারে রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ (মাঝের সারির বাঁ দিক থেকে প্রথমে অনিল কুমার চন্দ এবং পরে কালীমোহন ঘোষ)। ডিসেম্বর ১৯৩৩

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ও লেডি রানু মুখোপাধ্যায়

জনসভায় সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল ও অধ্যাপক তান-য়ুন-শান। কলকাতা, ১৯৩৯

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব (শান্তিনিকেতন, ১৯৪০)

নিকেতন উৎসবে এলমহার্স্ট ও রবীন্দ্রনাথ, পিছনে নির্মলকুমারী

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আনা দ্য নোয়াই, পারি (১৯২০)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দুর্লভ ছবি

পিতৃ শ্রাদ্ধান্তে কবি (১৩১১)
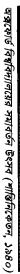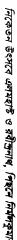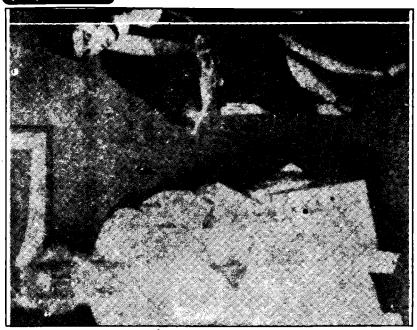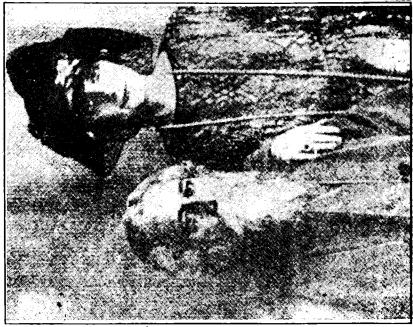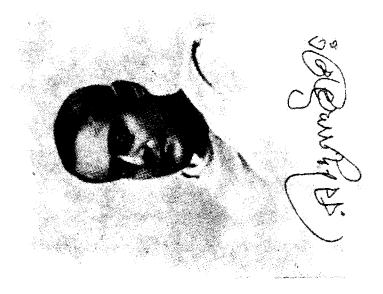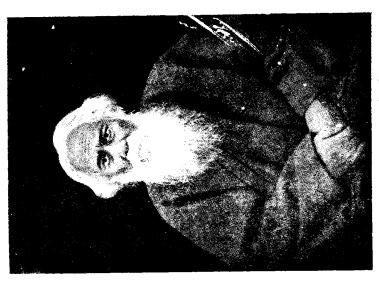
প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ
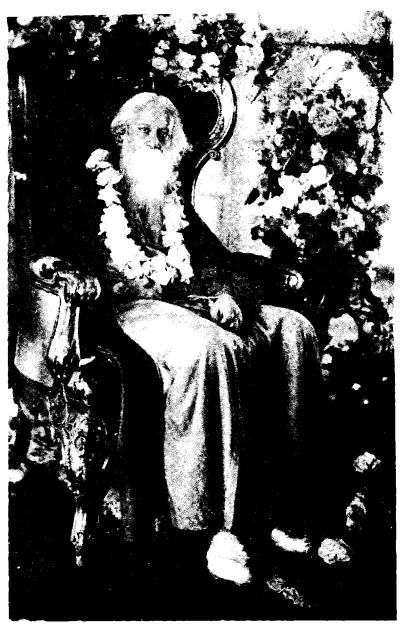
তেহরানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩২)

হাফিজের সমাধি পাশে রবীন্দ্রনাথ
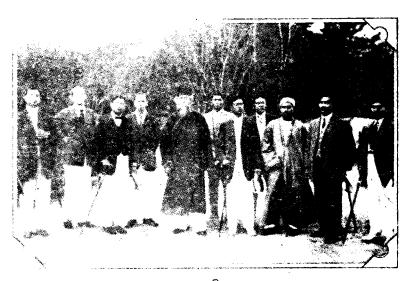
জাপানে রবীন্দ্রনাথ

বিলেতে রবীন্দ্রনাথ, ১৮৯০

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

অসবর্ণ বিয়ের বিষময় ফল এবং নজরুলের পারিবারিক জীবন

নজরুলের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লেখার শুরুতে আমার বক্তব্য স্পষ্ট ও সহজ করার উদ্দেশ্যে মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে কিছু অপ্রসাঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাসির কবি সুকুমার রায় তাঁর একটি হাসির কবিতায় লিখেছেন ঃ

হাঁস ছিলো সজারু,
ব্যাকরণ মানিনা।
হয়ে গেলো হাঁসজারু
কেমনে তা জানিনা।

সুকুমার রায় সজারু'র ব্যাখ্যা না জানলেও তাঁর পূর্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা এর ব্যাখ্যা ভালো ভাবেই দিয়েছেন। প্রাচীন আর্য ব্রাহ্মণরা মনে করতো প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমানের সাথে ১০০% হিন্দু রমনী বিয়ে কিংবা মিলন ঘটলে যে শংকর সন্তান জন্মলাভ করবে, সে হবে ৫০% মুসলমান এবং ৫০% হিন্দু ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় প্রজন্মের সেই ৫০% মুসলমানের সাথে আবার যদি ১০০% অমিশ্রিত কোন হিন্দু রমণীর বিয়ে হয়, তাহলে যে শংকর সন্তান জন্মাবে, সে হবে ১৭% মুসলমান এবং ৮৩% হিন্দু ভাবাপন্ন। এভাবে তৃতীয় প্রজন্মে সেই ১৭% মুসলমান পুরুষের সাথে যদি কোন ১০০% হিন্দু রমণীর বিয়ে বা মিলন ঘটে, তাহলে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে ৯৩% হিন্দু এবং ৭% মুসলমান। এভাবে তিনি প্রজেন্মই একজন খাঁটি মুসলমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুভাবাপন্ন হতে বাধ্য হবে। তারা এই বিশেষ প্রক্রিয়ার নামকরণ করেছিল "তিন প্রজন্ম প্রকল্প।" এই তিন প্রজন্ম প্রকল্প ছিলো অনেকটা "হাসজারু' জীব ধরণের। মুখটা হাঁসের মতো অথচ দেহটা সজারুর কাঁটায় ভর্তি। এই হাঁসজারু এক ধরণের অদ্ভুত কাল্পনিক জীব।

আর্য্যরা 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প নীতি' নামক এই 'হাঁসজারু' পদ্ধতির দ্বারা শক-হুন এবং বিশেষ করে ভারতের মুসলমান শাসনামলে নাকি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। সে সাফল্য ছিলো একটি শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ভারতের সমস্ত রাজা-মহারাজারা একত্রিত হয়ে ৫০০

অসবর্ণ বিয়ের বিষময় ফল ঃ মোঘল পরিবারে শিব পূজা

রণহস্তী, ৮ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে মোঘল সম্রাট বাবরকে আক্রমণ করেছিলো। এতে বিপুল রণসম্ভার নিয়ে 'খানুয়া' যুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা অনুধাবন করলো সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। সম্রাট হুমায়ুনের আমলে তারা মোঘলদের বন্ধু সেজে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ণবাদী হিন্দুরা নারী ও সুরার জমজমাট হেরেম গড়ে তোলে।

প্রথম জীবেন আকবর অত্যন্ত ধর্মভীরু একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন বলে অনেক ইতিহাসবিদ মত প্রকাশ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি জামাতের সাথে আদায় করতেন। এমনকি কোথাও সফরে বের হলে ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বের হতেন। এসব কারণে চতুর্দিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ষোল বছর বয়সে আকরব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ষোল বছরের অশিক্ষিত বালক আকবর রাজনীতিতে ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বর্ণবাদী হিন্দুরা সম্রাট আকবরকে সুরা-নারীতে তালিম দেয়। বাদশা শাহজাদাদের সঙ্গে বর্ণবাদী হিন্দুরা আপন ভগ্নি-কন্যাদের বিয়ে দিয়ে সঙ্গে দাসী বাঁদির বহর পাঠিয়ে শাহী মহল দখল করে নেয়। অম্বর রাজ বিহারীমল আকবরকে আপন কুমারী কন্যা দান করেন। সেই কন্যার গর্ভেই জন্ম নেয় পরবর্তী সম্রাট সেলিম বা জাহাঙ্গীর। মানসিংহের আপন ফুফু জয়পুরী বেগমকেও বিয়ে দেয়া হয় আকবরের সাথে। মানসিংহের আপন বোন রেবা রাণীকেও পাঠিয়েছিলেন আকবরের হেরেমে। কিন্তু 'মহামতি' আকবর রেবা রাণীকে নিজে গ্রহণ না করে পুত্র জাহাঙ্গীরের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। এভাবে যোধপুরের রাজা উদয় সিংহ এবং জয়সলমীরের রাজাও আপন প্রিয়তমা কন্যাদের আকবরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিকানীরের রাজা রায় সিংহও আকবর দি গ্রেটের হাতে আপন কন্যা দান করেছিলেন, আকবর সেই কন্যাকেও পুত্র জাহাঙ্গীরের হাতে

তুলে দেন। মোঘল হেরেমের এইসব রাজপুত বালারা কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা মোঘল হেরেমে এসেও স্ব স্ব ধর্ম পালন এবং প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন। এই সম্পর্কে শ্রী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী টেকনাফ থেকে খাইবার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"বুদ্ধি-মেধা, বীর্যের দিক থেকে সম্রাট আকবর যে মুসলিম শাসকদের শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইহা তাঁহার চরম শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু কুসুমে কীটের ন্যায় আকবরের চরিত্রও দুর্বলতার দানা বেঁধে উঠেছিল। বিরাট সাফল্যের বুকে সৃষ্ট চরম অহমিকায় আঁতুড় ঘরেই এ কীট জন্ম নিয়েছিল। এ কীটের রূপ ও অবয়ব গভীরভাবে পরখ করেই রাজপুতদের অবয়বে হিন্দু প্রতিভা রাজপুত সুন্দরীদের মোঘল হেরেমে প্রতিষ্ঠা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সততা প্রমাণের জন্য সম্রাট আকবর ইসলামের অনেক বিধি-নিষেধ অমান্য করতে শুরু করেন। মুসলমানগণ বহু ধর্মীয় অধিকার সুযোগ সুবধিা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ দেশে মূর্তিপুজা ও অগ্নিপুজার অবাধ অধিকার লাভ করেন। শাহী মহলে মূর্তিপূজা, অগ্নিপুজা একটি নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

জালাল উদ্দিন আকবর শাহ গাজী স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা পরে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। ইহাই "শঠে শাঠ্যাং নীতি।" তারা সম্রাট আকবরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে "দিল্লীস্বরো বা জলগদিস্বরো" এই ধ্বনিতে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে সম্রাট আকবেরর মতিভ্রম ঘটিয়েছিল। সম্রাট আকবরের প্রশংসা কীর্তনে তারা এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, দেবী বন্ধনা রচনার ক্ষেত্রেও হিন্দু ভক্ত কবি গেয়েছেন ঃ

"হেথা একদেশ আছে নামে পঞ্চগৌর।
সেখানে রাজত্ব করে বাদশা আকবর॥
অর্জ্জুনের অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্বে তুলনাহীন জআনে বৃহস্পতি॥
ত্রেতা যুগে রাম জেন অতি সযতনে।
এই কুলযুগে ভুপ পারে প্রজাগণে॥[১]

এভাবেই হিন্দুরা বাদশাহের প্রশস্তি গেয়ে এবং শাহজাদাদের খেলার পুতুল বানিয়ে মোঘল শাহীর বড় বড় পদগুলো দখল করে সারা ভারতে পরবর্তী তিন প্রজন্মেই শক্তিশালী মুসলমান শাসকদের নির্বংশ করেন এবং মুসলিম শাসনের অবসান ঘটান।

১। টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃঃ ৪৮, ৪৯।

অসবর্ণ বিয়ের বিষময় ফল ঃ শাহজাদা সেলিম ভক্তিভরে হিন্দু যুগীর বাণী শ্রবণ করছেন

বর্ণবাদী হিন্দুরা মুসলমানদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়েও তাদের পরাজয়ের গ্লানি প্রশমিত হয়নি। সব সময়ই এরা বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কৌশলে মুসলিম শাসকদের চরিত্র হননে, কালিমা লেপনে ছিলো সদা সচেষ্ট। তাদের কাছে একমাত্র 'গ্রেট আকবরই' ছিলো এর ব্যতিক্রম। এই আধুনিক যুগেও হিন্দুরা তাঁর প্রশস্তি গেয়ে থাকে। ভারতের তৈরি জনপ্রিয় টিভি "আকরব দি গ্রেট'-এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। ধুরন্দর বাবুরা- মুসলমান লেখক দিয়ে সম্রাট আকবরের যেমন গুণকীর্তন করা হয়েছে; ঠিক তেমনি অনেক আপত্তিজনক বক্তব্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। এই সিরিজে আকবরকে একজন মহান ব্যক্তিত্ব, মহানুভব ধর্মরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক সম্রাট আখ্যায়িত করে তাঁর প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত চাতুর্যতার সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শনে আঘাত হানা হয়েছে। যেমন ঃ

পূর্বে আছে তার পূণ্য ভূমি
পশ্চিমে আছে পবিত্র কাবা
দু'টি কুসুম যে একই বৃন্তে
একই সূর্যের দুই আলোক আভা॥
মসজিদে পূণ্যভূমিতে
তার গরিমার নেই ভাষা।
একমনে দোয়া কর ভাই
পূর্ণ হবে সব আশা॥

অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে গানটি রচনা করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। "পুর্বে আছে তার পূর্ণভূমি বলতে হিন্দুদের তীর্থভূমি 'কাশী'কে বুঝানো হয়েছে। ইচ্ছা করেই 'কাশী' শব্দটাকে এড়িয়ে 'পূণ্যভূমি' বলা হয়েছে। আবার একটু পরে 'মসজিদে

পুণ্যভূমিতে তার গরিমার নেই ভাষা' বলা হয়েছে। এখানেও 'মন্দির' শব্দ এড়িয়ে পুণ্যভূমি বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরগুলো শুধু 'কাবা এবং মসজিদ' আর ওদেরগুলো 'পূণ্যভূমি'। আবার মুসলমানদের কাবা ও হিন্দুদের 'কাশী'র মধ্যে তুলনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে ঃ

"দুটি কুসুম যে একই বৃন্তে
একই সূর্যের দুই আলোক আভা।"

কত বড় ঔদ্ধত্য! আল্লাহর ঘর 'কাবা'র সাথে 'কাশী'র তুলনা! 'কাবা' ও 'কাশী' একই বৃন্তের দু'টি কসুম যেমন হতে পারেনা, তেমনি একই সূর্যের দুই আলোক আভাও হতে পারে না। এমনকি সম্রাট আকবরকে দিয়ে বলানো হয়েছে, "মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই, কেউ বলে আল্লাহ, কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে কাবা, কেউ বলে কাশী। এই ভাবে প্রতি সিরিজে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে আঘাত হানা হয়েছে। যার অন্তর্নিহিত অর্থ সাধারণ দর্শকদের উপলব্ধি করা সম্ভব ছিলোনা।

এই অসবর্ণ বিবাহ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদেরই পতন ঘটায়নি। তুরস্কের উসমানীয় খেলাফতের পতনও একই কারণে ঘটেছিলো। সুলতান আওর খান খৃষ্টান মহিলা থিয়োডোরাকে বিবাহ করে তাকে স্বধর্মেই রেখে দিয়েছিলেন। সেই ঘরের সন্তান সুলতান মুরাদও বিবাহ করেছিলেন বুলগেরিয়ার সম্রাট সীসম্যানের কন্যাকে। এভাবেই তুরস্কের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সুলতান সোলায়মান বিয়ে করেন রোক্সেলীন নামক এক রাশিয়ান মহিলাকে এবং এই কুচক্রী মহিলার গর্ভজাত সন্তানদের হাতে খিলাফত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

এককালের মিসরের প্রভাবশালী বাদশাহ ফারুক ক্ষমতা থেকে দুঃখজনকভাবে বিতাড়িত হয়েছিলেন ঠিক একই কারণে। বাদশাহ ফারুকের জীবন আকাশে যখন খ্রীস্টান রমণী এন্টেনীও পিল্লী দুষ্ট গ্রহের মতো উদিত হন তখন থেকে তাঁরই প্ররোচনায় ধীরে ধীরে বাদশাহ অসৎ পথে পা বাড়াতে থাকেন। সুরা আর নারীর প্রতি আসক্তি হয়ে। ভয়ানক উচ্ছৃংখলা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। যার শেষ করুণ পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মুসলমানেরা স্পেন শাসন করেছিলো প্রায় আটশ' বছর। মুসলিম শাসকেরা জ্ঞানে-বিজ্ঞনে, শিক্ষায়-সভ্যতায় স্পেনবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছিলো। কিন্তু ব্যাপকহারে অসবর্ণ বিয়ে এবং নারী ও সুরার কারণে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে চরম খেশারত দিয়ে বিতাড়িত হতে হয়েছিলো।

এখানে অপ্রসাঙ্গিকভাবে দীর্ঘ ভূমিকা দেযার উদ্দেশে হলো ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিরূপ চক্রান্ত অতীতে চলেছে তা স্পষ্টভাবে পাঠকদের সামনে

কবি পরিবার

বাম হতে ডানে ঃ আয়া, কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী, পুত্র বুলবুলকে কোলে নিয়ে দাঁড়ানো নজরুল ইসলাম, কবিপত্নী প্রমীলা ইসলাম

তুলে ধরা। এই চক্রান্ত থেকে অনেক প্রতিভাবান, ক্ষমতাধর, প্রভাবশালী প্রথিতযশা মুসলমান রক্ষা পায়নি। এই কীর্তিমান মুসলমান পুরুষেরা বিজাতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়নি। বরং অনেক স্ত্রীদের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলে তাদের গর্ভজাত সন্তানেরা কেউই পরবর্তীতে মুসলমান থাকেনি।

বর্তমান পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবীদ জনাব আলী আহসান পশ্চিম বাংলা ভ্রমণ করে সাপ্তাহিক বিক্রমে "ভাবছি কি লিখি" কলামে এই প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

"বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করি পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীত্বের অথবা বাঙালীবোধের একটি অন্বেষণ চলছে। সুনীল বন্দোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সমরেশ মুজমদার একটি বাঙালী স্বরূপকে উন্মোচন করতে চাচ্ছেন যে স্বরূপটা মূলত হিন্দুদের। তাদের পরিকল্পিত জীবন চর্চায় কোন মুসলমান নেই। কিছু দিন আগে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখেছি একটি মধবিত্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিচয় চতর্দিকে প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের শতকরা ৩০% জন মুসলমান, কিন্তু শতকরা একজনও বাঙালী বৃত্তের মধ্যে নেই যারা আছেন তাদের অনেকেই হিন্দু মেয়ে বিবাহ করেছেন। অনেকেই ধূতি পরেন এবং দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে মুসলমান পরিচয়টি গোপন করেন। হিন্দুত্বের ওই আগ্রাসনের কথা বাংলাদেশের মুসলমানের মনে রাখা দরকার।[২]

ভারতের বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ হুমায়ূন কবির বিয়ে করেছিলেন শান্তি দেবী নামের একজন হিন্দু মহিলাকে। তিনি স্বধর্মে বিশ্বাসী থেকে স্ত্রীর ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন হুমায়ূন কবীরের সন্তান জন্ম নিল, তখন নাম রাখা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হুমায়ূন কবীরের ইচ্ছে ছেলের নাম হবে মুসলামনী; আর স্ত্রীর ইচ্ছে ছেলের নাম হবে হিন্দুয়ানী। শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বে সালিশ গিয়ে গড়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তিনি "KAMAL" লিখে বলে দিলেন, একজন ছেলেকে 'কামাল' ডাকবে, আরেকজন ডাকবে 'কমল'। কি চমৎকার সমাধান!

এই আন্তঃবিবাহের বিষময় ফলে তাঁর ভাগ্যে জানাজাও জুটেনি। জানাজা ছাড়াই এই প্রতিভাবান মুসলিম ব্যক্তিত্বের কবর দেয়া হয়।

সমকালীন বিশ্বের দিকে তাকালেও এই চক্রান্তের অশুভ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন পিলও নেতা ইয়াসীর আরাফাত এবং ক্রিকেট তারকা আজহার উদ্দিন ও ইমরান খানের অসবর্ণ বা আন্তঃধর্মীয় বিয়ে। তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা করছেন যথাক্রমে

২। সাপ্তাহিক বিক্রম '৯৫।

নজরুল, প্রমীলা, সর্বসাচী ও অনিরুদ্ধ
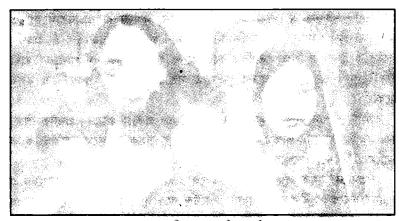
হিন্দু মেয়ে নৌরিন, ইহুদী মেয়ে জামিমা ও সুহা। তবে আজহারের নয় বছরের সংসার ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে গেছে। এই অসবর্ণ বিয়ের চক্রান্তের ফাঁদ থেকে কাজী নজরুল ইসলামও রক্ষা পায়নি। গত শতাব্দীর একবারের শেষ মুহূর্তে ১৮৯৯ সালে যখন বাঙালী মুসলমান সমাজ বর্ণবাদী হিন্দু জমিদারদের নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় এবং নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধকারের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিলো ঠিক তখনই হৈ-হৈ, রৈ-রৈ করে আবির্ভাব ঘটেছিলো কাজী নজরুল ইসলামের। পরবর্তীতে সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্যের বলয় যখন হুমকির সম্মুখীন তখন এটা হিন্দুবাদীদের কাছে ছিলো অসহ্য। তাই, হিন্দুবাদীরা তাদের চিরায়ত চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় নজরুলের অসাধারণ ও বিস্ময়কর প্রতিভাকে একেবারে শেষ করে দেয়ার জন্য বেছে নেয় অসবর্ণ বা আন্তঃধর্মীয় বিয়ের। ১৯২১ সালের ১৭ই জুন কুমিল্লার আকবর খানের ভগ্নি নার্গিসের সাথে বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু নাটের গুরু ও মুজফ্ফর আহমদ ও বিরজা সুন্দরীর চক্রান্তে তাদের মিলন ঘটেনি। বিয়ের রাতেই নজরুলকে নিয়ে তারা নৌকা করে কুমিল্লা ত্যাগ করেছিলো। এর প্রকৃত রহস্য আজো উদঘাটিত হয়নি। বিভিন্ন নজরুল গবেষকদের মধ্যে এর প্রকৃত রহস্য নিয়ে বির্তক রয়েছে। বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের সাথে নজরুলের বন্ধুত্বের সুবাদে প্রমীলা সেনগুপ্তার সাথে নজরুলের প্রণয়ের উন্মেষ হয় এবং ১৯২৪ সালে ২৪ এপ্রিল কলিকাতায় নজরুলের সাথে প্রমীলার বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। বিয়ের প্রথম দিকে ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজ এবং সেনগুপ্ত পরিবারের নিকট আত্মীয়রা এই অসবর্ণ বিয়ের চরম বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে যারা বিরোধিতা করেছিলেন তারাই নজরুল পরিবারের একান্ত আপনজনের মতো যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু নজরুলের আপনজনদের

কবির কনিষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধ ইসলাম

আসা-যাওয়া অজ্ঞাত কারণে চিরকালের মতো নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

গত বছরের ('৯৭) ৩১ অক্টোবর নজরুল একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত "কাজী নজরুল ইসলামের নাটক" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রখ্যাত লেখক ও শিক্ষাবিদ জনাব ডঃ এস এম লুৎফর রহমান তাঁর প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে বলেছেনঃ

"কলকাতার হিন্দু বাবু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দু'টি গ্রুপ ছিল। একটি গ্রুপ সমাজতন্ত্রী হিন্দু বুদ্ধিজীবী। এই সমাজতন্ত্রী হিন্দু বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীটি নজরুলের প্রতি কিছুটা নমনীয় ভাব দেখালেও গোঁড়া কংগ্রেসপন্থী সাম্প্রদায়িক হিন্দু বুদ্ধিজীবীরাই নজরুলকে ধ্বংস করেছে। নজরুলের দুরারোগ্য ব্যধির কারণও ঐ সাম্প্রদায়িক হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। তিনি বলেন, নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেজেও অনেকে তাঁর সর্বনাশ করেছে।"

বাঙ্গালী মুসলমানের গর্ভ ও অহংকার এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের অগ্রদূত কাজী নজরুলের রাজনৈতিক সামাজিক জীবন তো বটেই পারিবারিক জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে ডঃ রহমানের উল্লেখিত অভিযোগের নির্মম সত্যের বাস্তবতা দৃশ্যমান হবে। বিভিন্ন তথ্য এবং নজরুল গবেষকদের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যে জানা যায়- কবি নজরুল যে সহজ সরল মমত্ববোধ নিয়ে শ্রীমতি প্রমীলাকে সামাজিক সকল প্রকার বাঁধা-বিঘ্ন অতিক্রিম করে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছিলেন সেই মিশ্র বিবাহের বিষময় পরিণতির চরম খেশারত ও পরম অশান্তি তাঁকে সারা জীবন ভোগ করতে হয়েছে। এই সম্পর্কে অনেক সত্য কথা এবং বাস্তব ঘটনা কবি নজরুলের একালীন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের লেখায় ও স্মৃতিচারণে উল্লেখ রয়েছে।

কাজী নজরুলের স্ত্রী আশালতা বা প্রমীলা সেন গুপ্তার মা ছিলেন শ্রীমতি গিরিবালা। বিয়ের সুবাধে প্রমীলার মা গিরিবালা দেবী এসে নজরুল পরিবারের কর্তৃত্ব গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিলেন। এই গিরিবালা ছিলেন ভয়ানক স্বার্থপর, কুটিল ও জটিল প্রকৃতির মহিলা। অসবর্ণ বা মিশ্র বিয়ের সুযোগ নিয়ে শ্রীমতি গিরিবালা কবি নজরুলের ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনে যে "বিষবৃক্ষটি' রোপন করেছিলেন এর বিষাক্ত আবহাওয়ায় কাজী নজরুল তিলে তিলে পলে পলে চিরতরে কঠিন "অক্টোপাসে'

কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী

নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। এই সম্পর্কে কবি লুৎফর রহমান জুলফিকার দৈনিক মিল্লাতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"সত্যি কথা ও বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করতে গেলে আমাকে অবশ্যই বহু তিক্ত কথার অবতারণা না করে উপায় নেই। কাজীদার শাশুড়ি শ্রীমতি গিরিবালার আচরনে ও কাজ-কারবারে একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, শ্রীমতি গিরিবালা কাজীদার পারিবারিক জীবনে একা মস্তবড় "অশনি সংকেত" হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শ্রীমতি গিরিবালা তার মেয়ে কঠিন রোগে অচল হয়ে গেলে সংসারের কর্ত্রী সেজে কাজীদার পরিবারে যে অরাজকতা ও অবিমৃশ্যকারিতার সৃষ্টি করেছিলো, তাকে এক ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

... সব সময়ই কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানের মত অতিথি অভ্যাগতদের মাসের পর মাস স্বপরিবারে অবস্থান করেছেন এবং ওসব আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই শ্রীমতি গিরিবালাদের ঘনিষ্ঠ স্বজন ও সম্পর্কিত লোকজন। কখনও কখনও দেখেছি এসব অতিথিদের কেউ কেউ ছয়মাস থেকে একবছরের উর্ধ্বে কবির সংসারে জেঁকে বসেছেন। এদের সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশের কম ছিলনা। কবি পরিবারের কবি নিজে, কবি-স্ত্রী, দুই ছোট ছেলে সব্যসাচী, অনুরুদ্ধ ও শাশুড়ী শ্রীমতি গিরিবালাসহ মোট পাঁচজন সদস্য। সেখানে কবি কঠোর পরিশ্রম করে দিবরাত্রি খেটে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত "হিজ মাস্টারস ভয়েসে" সংগীত রচনা করে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে যে অর্থ উপার্জন করতেন তা তৎকালে যথেষ্ট আয় ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু কবির পারিবারিক জীবনে অনাবশ্যক অতিথি অভ্যাগতদের অত্যাচারে এবং শ্রীমতি গিরিবালার অবিমৃশ্যকারিতার কারণে কবিকে চরম আর্থিক সংকটে হিমশিম খেতে হয়েছে। একদা দেখা গেল কবির ভয়ানক অসুস্থতার জন্য সংসার জীবন যখন নিমজ্জিত অর্থের অভাবে চতুর্দিকে অন্ধকার সেই অসহায় অন্ধকারের ভেতর কবির শাশুড়ি শ্রীমতি গিরিবালা কবির সংসার ছেড়ে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। এতবড় নির্মম নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিক আচরণ একান্তভাবে অবিশ্বাস্য ঘটনা। কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেও শ্রীমতি গিরিবালার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া

লন্ডনে নজরুল, ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার জন্য

যায়নি। কয়েক বছর পর পরম্পরের মারফতে জানা গেল শ্রীমতি গিরিবারা বৈষ্ণবী সেজে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ না করে উপায় নেই। কাজীদা যখন সুস্থ-সচল ছিলেন তখন শ্রীমতি গিরিবালার নানারকম অরাজকতা ও অবিমৃশ্যকারিতা তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে গেছেন। একদিনকার একটি ঘটনা দেখে আমি ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেলাম।

কাজীদার ছোট ভাই কাজী আলী হোসেন তাদের চুরুলিয়ার বাড়ী থেকে কাজীদার বাসায় বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোটেলে করা হয়েছে এবং হোটেলের খরচা বাবত কাজীদা ভোট ভাই আলী হোসেনকে কিছু টাকা পয়সা দিলেন। কাজীদার সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কেউ যদি দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন তাহলে তাকে কাজীদা "হিজ মাস্টারস ভয়েস" অফিসে নিয়ে আসতেন এবং ওখানে চা নাস্তার ব্যবস্থা করতেন। কাজীদার পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে শ্রীমতি গিরিবালা তাদের হিন্দু কালচার ও উৎসব ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণ করতে দেখা গেছে। কাজীদা শত চেষ্টা করেও শ্রীমতি গিরিবালাদের জেদকে ভাঙ্গাতে পারেনি। অতএব, সারাজীবন তাঁর শাশুড়ি অরাজকতার জন্য তিনি পারিবারিক জীবেন আদৌ 'অ্যাডজাস্ট' করে চলতে পারেননি। পারিবারিক জীবনে কাজীদাকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পরিস্থিতির জন্য চিরদিনই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে। কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে, কারসাজি ও কান্ড-কারবারে অবশেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

মতান্তরে জানা যায়, কবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন কবি পরিবারে চরম দুর্দিন

অসুস্থতার প্রথম দিকে অবাক দৃষ্টিতে নজরুল

নেমে আসে। গিরিবালা দেবীর ষোলকলা পূর্ণ অথবা নিদারুণ দরিদ্র সমাজের বেঁচে থাকা কবি পরিবারের দুঃখ-দৈন্যতা সহ্য করতে না পেরে ১৯৪৬ সালে কোন একদিন গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ হন। কেউ কেউ বলেন, গঙ্গায় ডুবে মরেন।

এই পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন রচিত যুগস্রষ্টা নজরুল গ্রন্থ থেকে। তিনি স্মৃতি চারণে উল্লেখ করেছেন ঃ

... সভার কাজ শেষ হলো সন্ধ্যার একটু আগে। জানতামঃ আমরা যদি সন্ধ্যার এই ট্রেন ধরতে না পারি, তা হলে কবির ওখানে আমাদের পাত পাততে হবে। দু'জনার একবেলার আহারের ভারও তাঁর ওপর জুলুম। যতই লক্ষ্মীছাড়া হই না কেন, এতোটুকু সাংসারিক বুদ্ধি আমাদের ছিল। কবি তাঁর বন্ধুদের বেলায় অকুণ্ঠিতভাবে খরচ করতেন। এটা আমরা কোনো সময়ই সমর্থন করি নাই।

আমরা দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করলামঃ এই ট্রেনেই আমাদের যেতে হবে, বল্লাম "কোলকাতায় একটা ভীষণ কাজ ফেলে এসেছি, এই ট্রেনেই না গেল আমাদের ক্ষতি হবে। -এবার আমরা যাই।"

কবি যেন আঁৎকে উঠলেন! বল্লেনঃ এখন কোথায় যাবি রে? খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব চাটগাঁয়ের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেনঃ তাঁর নাতিকে নিয়ে এসেছিছ। বল্লেই হলো- এখন যাই?"

বল্লামঃ "আর একদিন সময় হাতে নিয়ে আসবো। আজ যাই, বিশেষ দরকার আছে।"

লন্ডনে চিকিৎসাধীন কবি ও কবি পত্নী

কবি বল্লেন ঃ "তা কিছুতেই হয়না। তা ছাড়া তুই তো রোযা আছিস। ইফতারের সময়ও হয়ে এসেছে। অন্ততঃ ইফতার তো করে যা।"

তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে বাড়ীর ভিতর থেকে কবির ভীষণ রাগারাগির শব্দ কানে এলো। অন্দরের দরওয়াজায় কান পেতে আমরা দু'জনে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। বুঝলাম ঃ আমাদের নিয়েই কবি তাঁর শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করছেন। তার প্রতিপাদ্য বিষয় হলোঃ "যখন তিনি জানেন যে আমরা রোযা আছি, তখন কেন ইফতারী তৈরী করে রাখা হয় নাই?"

তাঁর শাশুড়ী বলেছেনঃ আমি কি জানি বাপু ইফতারী কাকে বলে, আর তাতে কি কি দরকার হয়।"

একটু পরে কবি আদার কুচি, লবণ, শশা প্রভৃতি নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। বল্লেন ঃ 'ভিজা ছোলা আর হলো না রে।"

বল্লাম ঃ "তাতে আর কুণ্ঠা কি! ওঁরা তো আর জানেন না যে, রোযা রেখে আমরা এখানে আসবো। আর ও-তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই সকালবেলা ছোলা ভিজিয়ে রাখতে হয়।"

হো হো করে কবি হেসে উঠলেন। বল্লেনঃ "শরবৎটা একটু পরে খা' বরফ আনতে পাঠিয়েছি। আসতে দেরী হবে না।"

ভাবলাম ঃ বিদ্রোহী কবির এ-কি রূপ? আমার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে তা-ই না, এ-তাঁর কবি-জীবনের স্বাভাবিক কোমলতা/ কোনটা?

বল্লামঃ "এটা আপনার ভারী অন্যায় ভাই! মাসীমা তো আর এ সব ব্যাপারে অভ্যস্ত নন যে, আপনি, তাঁর ওপর অনর্থক রাগারাগি করলেন? আমরা কিন্তু এখান থেকেই সব শুনতে পেয়েছি।"

চোখ দু'টো তাঁর যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। বল্লেনঃ "মুসলমানের ঘরে মেয়ে দিতে পারলেন, আর এ সব জানবেন না মানে? তাঁকে জানতে হবে।"

উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকে সহজেই অনুমেয় করি নজরুলের পারিবারিক জীবন কেমন ছিলো। কবি নজরুল হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ইসলামী সংস্কৃতির ভক্ত। কিন্তু তিনি নিজের বাড়ীর পরিবেশ হিন্দুত্ব মুক্ত করতে পারেননি তাঁর শ্বাশুড়ী গিরিবালার কারণে। প্রমীলা দেবীও মনে প্রাণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই না পুড়িয়ে তার লাশ ইসলামী মতে স্বামীর ভিটে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে সমাহিত করা হয়েছিলো। কাজেই প্রশ্ন জাগে কবি পত্নী খাঁটি মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে এবং গিরিবালা কর্তৃক সংসারের কর্তৃত্ব হাতিয়ে নেয়াই কি কবিপত্নী প্রমীলার অসুস্থতার কারণ? অনেকে মনে করেন কবি নজরুলকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্যে যতোগুলো চক্রান্ত হয়েছে; প্রমীলা অসুস্থ হয়ে যাওয়াও কোন বিচ্ছিন্ন

১৯৫৭ সালে বিহার-এ কবি পত্নী প্রমীলার সাথে একটি বিশেষ মুহূর্তে বাকশক্তিহীন কবি নজরুল ইসলাম

ঘটনা নয়।

কবির জন্মস্থান চুরুলিয়ায়। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক দীনতার কারণে নিজ গ্রাম থেকে প্রাথমিক শিক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত করতে পারেননি নজরুল। অর্থের প্রয়োজনে এবং শিক্ষা লাভের প্রত্যাশায় কৈশোর বয়সেও তাঁকে ঘুরতে এবং থাকতে হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। লেখাপড়াও করেছেন বিভিন্ন উপায়ে উপার্জন করে চুরুলিয়া গ্রামে অবস্থানরত তাঁর মাতা-ভাইদের অর্থ পাঠিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কবির মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি তখন কোন সাহায্য করতে পারেননি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, বিনা চিকিৎসায় তাঁর মা মারা গেলে রাগে-দুঃখে তিনি দাফন পর্যন্ত করতে যাননি। পরে ব্যাপারটিকে অনেকেই বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছেন।

শেখ দরবার আলম "অজানা নজরুল" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন নির্বিঘ্ন হ'তে পারেনি মূলত আর্থিক অনটনের কারণে। এই দারিদ্রই বাল্য ও কৈশোরে তাঁকে স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে থাক্তে দেয়নি। এ উল্লেখ নজরুল ইস্‌লামের কবিতা ও সঙ্গীতে শুধু নয়, বিবিধ গদ্য রচনায়ও বিদ্যমান। যৌবনেও কবি চুরুলিয়ায় বসবাস করেননি। সেনাবাহিনী থেকে সম্ভত একবারই চুরুলিয়া ফিরেছিলেন তিনি। সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মূল কর্মস্থল হয়েছিল কলকাতা। এই কলকাতাতেই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তিনি আহত ও অসুস্থ হ'য়ে পড়েন ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট। দীর্ঘ এক দশকেরও অধিক সময় কোনো উপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি তাঁর।

আনুমানিক আটাশ বছর নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী হ'য়ে থাকার পর ৩০শে জুন ১৯৬২ তারিখ কবি-পত্নী প্রমিলা নজরুল ইস্‌লাম ইন্তেকাল করেন। তাঁর সমাধি হয় কবির স্বগ্রাম চুরুলিয়ায়। মৃতা পত্নীর সঙ্গে এ সময় একবার চুরুলিয়া আনা হয়েছিল সম্বিতহারা কবিকে।

..... কবির সমাধি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে। মসজিদের পাশে তাঁর কবর দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এইভাবে পূরণ করা হয়। অবশ্য তাঁর গানে চুরুলিয়ার সেই মসজিদটির কথাও সুস্পষ্ট উল্লিখিত হয়নি। কবিতায় তিনি লিখেছিলেন ঃ "দেশে দেশে মোর ঘর আছে।" দেহাবসানে সেই ঘরই হয়তো খুঁজে পেয়েছেন। কেননা, নিজ ঘরে পরবাসী হওয়ার স্বীকৃতিও তাঁর কবিতায় আছে।

শৈশবে কবি চুরুলিয়ায় পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের দরগাহে খাদেম ছিলেন। তাঁর এই গ্রামের মসজিদে ইমামতি করেন। গ্রামে গ্রামে মিলাদ পড়ান। মোল্লাকি করেন। অজস্র লেটো গান এবং বহু পালা নাটিকা লেখেন এ সময় থেকেই বাল্য ও কৈশোরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে। ১৯১৬-র সেপ্টেম্বর মাসের আগে। অর্থাৎ বিভিন্ন

চুরুলিয়ায় কবি পত্নী প্রমীলার কবরের পাশে নজরুল, কবির পুত্র বধূদ্বয় ও অন্যান্য

বিদ্যালয়ে ছাত্র জীবনেও তিনি লিখেছেন। স্কুল জীবনে বহু কবিতাও লিখেছেন তিনি। তখনও চুরুলিয়া তাঁর চিন্তা থেকে হারিয়ে যায়নি। সৈনিক জীবন তাঁকে চুরুলিয়া থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে আনে। তাঁর কলকাতার নাগরিক জীবনেও চুরুলিয়ার অস্তিত্ব যে-কারণেই হোক, উল্লেখযোগ্য ছিল না। এর নেপথ্যে আছে কোনো এক রহস্যজনক পারিবারিক বা এর সেই বঞ্চনাজনিত কারণ যা কবিকে চূড়ান্তভাবে মর্মাহত ক'রে থাকবে। তাই নজরুল জীবনে তাঁর স্বগ্রাম একটি পৃথক গবেষণার বিষয় হ'তে পারে। একজন প্রবাসী, এমন কি., একজন সাধারণ দেশত্যাগীর চিন্তায়ও তাঁর স্বগ্রাম বা জন্মস্থান যে জায়গা স্বাভাবিকভাবেই দখল ক'রে থাকে, নজরুলের লালিত আবেগে চুরুলিয়ার সে স্থান ছিল না। এর কারণ নিশ্চয়ই কোনো মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। (শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৭৭, ৭৮)

কবি নজরুলের সন্তানেরা গিরিবালার প্রভাবের কারণে হিন্দু সংস্কৃতির কবল থেকে রেহাই পায়নি। নজরুলের দুই পুত্র বিয়ে করেন হিন্দু ঘরে। এদের মধ্যে বড় ছেলে

কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী উমা কাজী পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে ছেলে ও বড় মেয়েকে নিয়ে মুসলিম জীবন যাপন করলেও তাঁর ছোট মেয়ে মিষ্টি কাজী একজন অমুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর নজরুলের ছোট ছেলে কাজী অনিরুদ্ধের পরিবার মিষ্টি কাজীর মতো একই পথের যাত্রী হয়ে ঐতিহ্যবাহী কাজী পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সব সম্পর্ক মিটিয়ে দিয়েছে।

নজরুল পরিবারে এখন জীবিত আছেন তাঁর পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েরা। কবিপত্নি প্রমীলা নজরুল অসুস্থ হয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে। ১৯৬২ সালে ৩০ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। নজরুলের বড় ছেলে সব্যসাচী মারা যান ১৯৭৯ সালে। বর্তমানে সব্যসাচীর স্ত্রী উমা কাজী, একমাত্র পুত্র বাবুল কাজী ও মেয়ে খিলখিল কাজী থাকেন ঢাকার বনানীতে সরকারের দেয়া একটি বাড়ীতে। বিবাহিতা কন্যা মিষ্টি কাজী থাকেন ব্যবসায়ী স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে আলাদা বাসায়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে সেবিকার চাকরি নিয়ে নজরুল পরিবারে এসেছিলেন উমা কাজী। অসুস্থ নজরুলের এই সেবিকা পরবর্তীতে সব্যসাচীর স্ত্রী হিসাবে স্থায়ী হয়ে যান পরিবারে। নজরুলের স্মৃতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "বাবা কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু তিনি শুনতেন এবং বুঝতেন সবই। আসন পেতে না দেয়া পর্যন্ত খেতে বসতেন না। গেঞ্জি উল্টে দিলে ঠিক করে পরতেন। ভালবাসতেন মিষ্টি, ফুল, শিশু এবং গান। নিজের জন্মদিনের উৎসব তিনি উপভোগ করতে পারতেন।" প্রায় তিন বছর পূর্বের এক তথ্যে জানা যায়, বাবুল কাজী আরব-বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করতেন। তা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করার কথা ছিলো। খিলখিল কাজী গান এবং নজরুল সম্পর্কিত লেখালেখিতে সময় কাটান বলে জানান।

নজরুলের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ মারা যান ১৯৭৪ সালে। তাঁর স্ত্রী কল্যাণী কাজী, দু'ছেলে কাজী অনির্বান ও কাজী অরিন্দম এবং কাজী অনিন্দিতা থাকেন কলকাতায়। এদের সবাই বিবাহিত। কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ যথাক্রমে আবৃত্তিকার এবং গীটার বাদক হিসাবে ভারত উপমহাদেশে খ্যাতিমান ছিলেন। কাজী অরিন্দম গীটার বাদনে এবং কাজী অনির্বান চিত্রাঙ্গনে খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে কাজী অনির্বানের চিত্রকর্মের এক প্রদর্শনী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

সে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণের জন্য কবির পৌত্র অনির্বান দৈনিক মিল্লাত অফিসে এসেছিলেন। সে সুবাদে তাঁর সাথে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত বর্তমান মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে
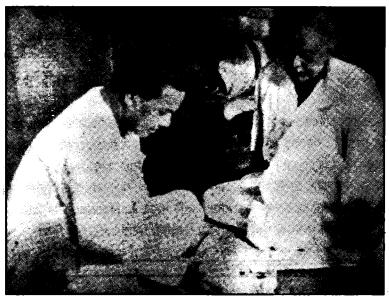
কলকাতায় দুই কবি ঃ নজরুল ও গোলাম মোস্তফা

দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। তাঁর সাথে দীর্ঘ আলাপ করে বুঝতে পরলাম তিনি ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী নয়। সম্পূর্ণ হিন্দু সংস্কৃতির আচার-আচরণে অভ্যস্ত। এই কবির বংশধরেরা পিতৃধর্মে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেও কবির নাম ভাঙ্গিয়ে জীবন-ধারণ করছে। কবি নজরুল একদিন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান
কোথা সে মুসলমান"

অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এই গানের কথাগুলো আজ কবির বংশধরদের জন্যই প্রযোজ্য হয়েছে। কবির বংশধরেরা শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান নয়, তাদের জীবনে পিতৃধর্মের কোন চিহ্নই নেই। অসবর্ণ বা মিশ্র বিবাহের কারণে দু'পুরুষের মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী কাজী পরিবার থেকে ইসলাম ধর্ম বিদায় নিয়েছে।

ঢাকায় নজরুল
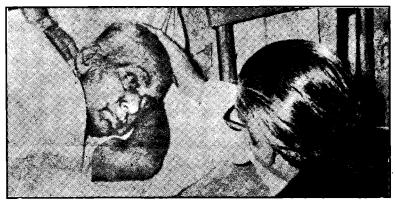
১৯৭২ সালে ধানমন্ডির কবি ভবনে নজরুলের পাশে প্রধানমন্ত্রী (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) শেখ মুজিবুর রহমান
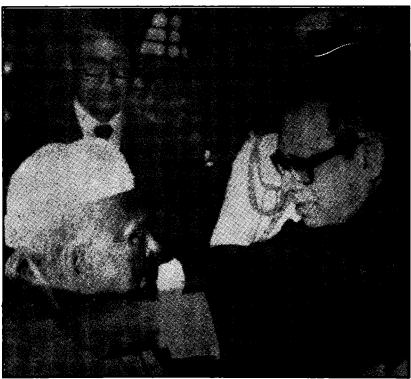
১৯৭৬ সালে বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কবিকে একুশে পদকে ভূষিত করছেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েম

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম. এ. জি. ওসমানী কবিকে মাল্য ভূষিত করছেন
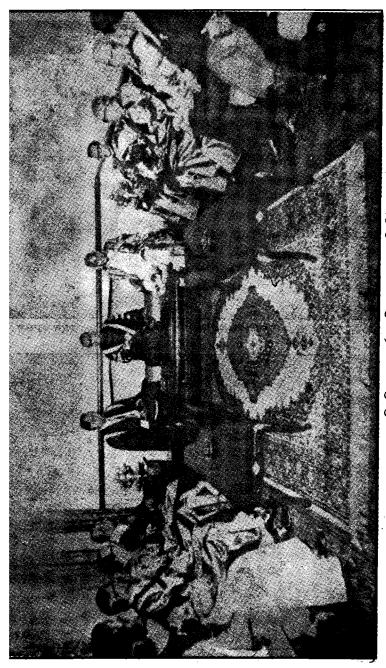
১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি,লিট প্রদান উপলক্ষে উপস্থিত (ডান থেকে বামে) কবি নজরুল, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোহাম্মদ উল্লাহ উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী ও অন্যান্য

ধানমন্ডির কবি ভবনে পরিবারের সদস্য ও দেশী-বিদেশী অনুরাগীদের মাঝে নজরুল
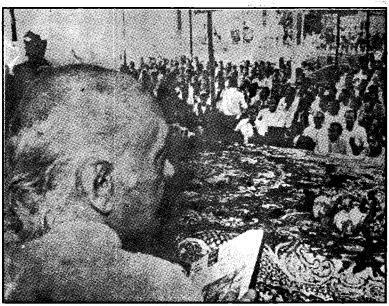
বাংলা একাডেমীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নজরুল

জনৈক সোভিয়েত লেখকের সাথে কবি

১৯৭৫ সালের মে মাসে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কবি নজরুল ও কবি জসীমউদ্‌দীন

ঢাকা ঃ ২১-এর পদক গ্রহণ অনুষ্ঠানে নজরুল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পুত্রবধূ উমা কাজী (মাঝে), নাতনি খিলখিল কাজী (বাঁয়ে) এবং মিষ্টি কাজীর কন্যা স্নেহা

কবিভবন প্রাঙ্গণে নজরুল

পত্রিকা হাতে কবি

কবিকে গান শোনাচ্ছেন রেনু ভৌমিক
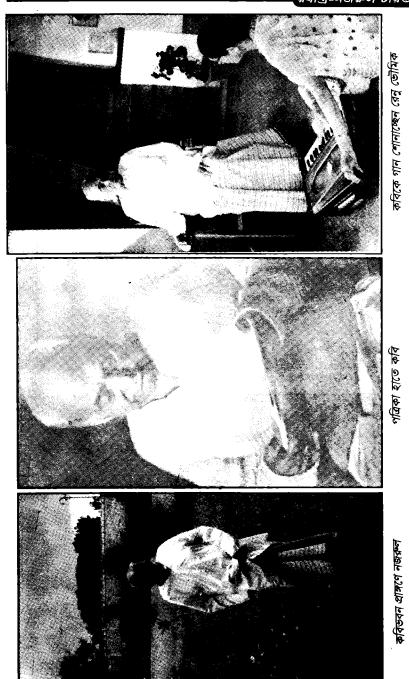
কলকাতার বাসভবনে কবিকে খাওয়াচ্ছে তাঁর নাতনী মিষ্টি কাজী

কবিভবনের প্রাঙ্গণে তাঁর পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী ও শকী চাকলাদারের সহায়তায় হাঁটছেন কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরবিদায় নিয়ে কিছু কথা

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস আগে 'গল্পসল্প' শিরোনামে ছোটদের জন্য একটি গল্পের বই লিখেছিলেন। এই বইটিই কবির জীবনের শেষ বই লেখা। এই বইয়ের একটি কবিতার শেষ দিকে কবি লিখেছিলেন ঃ

সাঙ্গ হয়ে এল পালা
নাট্যশেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে
রঙ্গিন ছবির দৃশ্যরেখা
ঝাপ্‌সা চোখে যায় না দেখা,
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা-

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো আঁচ করতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবন প্রদীপ ফুরিয়ে আসছে। যা উক্ত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতা থেকে সপরিবারের এসেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। তিনি শান্তি নিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ''সব পিয়েছির দেশে' নামে একটি বই লিখেছিলেন। রবীন্দ্র-তিরোধানের কয়েকদিন পর তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এই বইতে লিখেছেন ঃ

"আমরা যখন গিয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথ থাকতেন 'উদয়নে'র একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলিতে। অসুখের পরে তিনি একটু গ্রীষ্মকাতর হয়ে পড়েছেন, তাই তাঁর শোবার ঘরে ঠান্ডাযন্ত্র বসানো হয়েছে। ঘরটি বৃহৎ নয়। একদিকে দেয়াল লগ্ন লম্বা টেবিলে সারে-সারে ওষুধ পথ্য শিশি বোতল গেলাশ। আর আছে একটি খাট, একটি ইজি চেয়ার, ছোটো বুককেসে কিছু বই, আর অভ্যাগত বসবার জন্য কয়েকটি চামড়া-আঁটা মোড়া। দেয়ালে তাঁর নিজের আঁকা খান দুই, আর চীনে চিত্রী জুপিয়ঁ-র একটি ঘোড়ার ছবি, তা ছাড়া একখানা জাপানি মেঘের দৃশ্য। পাশে আর একটি ঘর, সেটি আরো
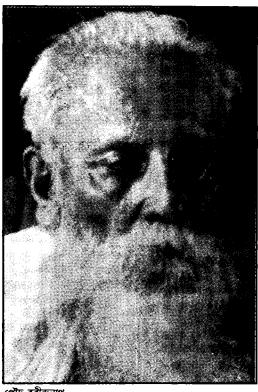
পৌঢ় রবীন্দ্রনাথ

ছোটো। সমস্ত পৃথিবী, পৃথিবীর সব পর্বত প্রান্তর সমুদ্র নদী নগর, সমস্ত সঙ্গ ও নির্জনতা আজ কবি জীবনে এসে মিলেছে এ দু'টি ছোটো ঘরে আর দু'দিকের বারান্দায়।"

বুদ্ধদেব পরিবার তেরো দিন শান্তি নিকেতনে ছিলেন। শান্তি নিকেতন থেকে চলে আসবার দিনের বর্ণনা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন ঃ

"চলে আসার দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম রোগ শয্যায়। ভাবিনি এমন দৃশ্য দেখতে হবে। বাইরে বিকেলের উজ্জ্বলতা থেকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে চমকে গেলুম। অন্ধকার; এক কোণে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত ইজি চেয়ারে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে কবি চোখ বুঁজে চুপ।- আমরা যেতে একটু চোখ মেললেন, অতি ক্ষীণ স্বরে দু-একটা কথা বললেন, তাঁর দক্ষিণ কর আমাদের মাথার উপর উষৎ উত্তোলিত হয়েই নেমে গেলো। বলতে পারবোনা তখন আমার কী মনে হলো, কেমন লাগলো। হঠাৎ প্রচন্ড ঘা লাগলো হৃদযন্ত্রে, গা আটকে এলো, কেমন একটা বিহবলতায় তাঁর দিকে ভালো ক'রে তাকাতেও যেন পারলুম না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসুস্থতার লক্ষণ দেহে ছড়িয়ে আছে। মুখ শীর্ণ হয়ে গেছে, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে; মাথার চুল গাঢ় বেয়ে নামতো- সেই চুল ছোট করে ফেলা হয়েছে। গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে গেছে। প্রথমদিকে কবির কবিরাজী চিকিৎসা চলে। কিন্তু রোগ আরোগ্য হবার কোন লক্ষণ নেই। শরীর সব সময় জ্বর লেগেই আছে। শরীরেও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ডাক্তারেরা অপারেশন করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু অপারেশনে কবির ভয়। কবি বলেন, "বিধাতা আমার এই দেহখানা সুন্দর করে গড়ে ছিলেন। এখান থেকে বিদায় নেবার সময় এই দেহখানা তেমনি সুন্দর অবস্থাতেই তাকে

ফিরেয়ে দিতে চাই।" দেহে অস্ত্রঘাতের কল্পনা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। তাই একদিন কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষকে ডেকে কবি রবীন্ত্রদনাথ বললেন, "দেখো হে, ডাক্তারদের সঙ্গে আমিস্‌টিস্‌ করা গেছে। এইবার ছাড়ো তোমাদের ব্রহ্মাস্ত্র। ওরা বলেছে একমাস আর দেখবো, তার মধ্যে যথেষ্ট উপকার না দেখতে পেলে অপারেশন করতেই হবে। একমাস মোটে সময়-এর মধ্যে যেমন করে পারো লেগে আমাকে অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করো।" কবিরাজ আশ্বাস দিচ্ছেন। দিন কয়েক একটু ভালোই মনে হলো, পরে আবার যা-কে তাই।

কবির একমাত্র দৌহিত্রী নন্দিতার (বুড়ীর) জন্মদিন। সেদিন ভোরবেলাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশ্চিমের জানালার ধারে বসে একটি খাতায় কি যেন লিখছেন। একজন কাছে যেতেই বললেন, "আজ আমার দিদি মনির জন্মদিন। সকাল বেলা বসে ক'টা লাইন ওর জন্যে লিখতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু আঙ্গুলগুলো এমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে অক্ষর যেন কিছুতেই বেরুতে চায়না।" একমাত্র নাত্‌নির জন্ম দিবসের লেখা সমাপ্ত করে নির্মলকুমারী মহলানবিশ ও রাণী চন্দনকে ডেকে হাতে দিলেন। আর তারপরেই তাঁর চোখ ফেটে কান্না এলো। বললেন, "আমি কি আর আজকাল লিখতে পারি? বিধাতা আমার সব শক্তি কেড়ে নিলেন।...."

প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ বিধান চন্দ্রের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক কবিকে পরীক্ষা করবার জন্য কলিকাতা থেকে শান্তি নিকেতনে আসেন। পরীক্ষা শেষে তাঁরা অভিমত দিলেন অতি সত্ত্বর কবিকে অপারেশন করতে হবে। আগেও কয়েকবার অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো কিন্তু কবি ও কবি পরিবারের আপত্তির কারণে সে সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। এবারও কবি ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি জানালেন। কিন্তু ডাক্তারেরা অভয় দিয়ে বললেন, অপারেশন অতি সামান্য। অপারেশন করলেই জ্বর আর আহারে অরুচি এবং অন্যান্য উপসর্গ সব চলে যাবে।

যে দিন অপারেশনের সিদ্ধান্ত হয় সে দিনই সন্ধ্যেবেলা কবির পুত্রবধু প্রতিমা দেবী ঘরে ঢুকলেন কবির শুশ্রুষা করবার জন্যে। তাঁকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "মা মনি, আজ সব ঠিক হয়ে গেল। এরা আমাকে কাটবেই, কিছুতেই ছাড়বেনা।" ছেলে মানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন কবি।

অপারেশন কলকাতায় হবে। যাবার আগে বারবার বলছেন, মাথার চুল বড় হয়েছে, কেটে দাও। চুল কেটে দিলেন পুত্রবধু প্রতিমা দেবী। চুল কাটা হয়ে গেলে বড় রুগ্ন দেখাতে লাগলো মুখখানা।

৯ই শ্রাবণ। আজ কলিকাতা চলে যাবেন কবি। স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে পথশ্রম যাতে ভোগ করতে না হয়। শান্তি নিকেতনের সঙ্গে সত্তর বৎসরে স্মৃতি জড়িত। সেই কবি এসেছিলেন বাবা মশায়ের সাথে হিমালয় যাত্রার প্রাক্কালে। আজ যাবার সময় বারবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

শান্তিনিকেতন হতে শেষ বিদায় কিলকাতার পথে ২৫ জুলাই ১৯৪১

অসুস্থ কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেছেন। নতুন উদ্যমে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। আশি বছর আগে এ বাড়ির কোনো ঘরে পৃথিবীর প্রথম আলো তিনি দেখেছিলেন।।

১০ই শ্রাবণ। ডাক্তার কবিকে গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে এসেছেন। তাঁর সাথে বেশ গল্প-গুজব করলেন। ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। এরপরই অসম্ভব কাঁপুনি শুরু হয় ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো। সকলে ভাবলেন, নতুন করে বুঝি জ্বর এসেছে। তাই গায়ের উপর কাঁথা-কম্বল ইত্যাদি চাপানো হয়েছে। কিন্তু তেমনিই কাঁপছেন। রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আনা হলো ডাক্তারকে। ডাক্তার বললেন, ওটা গ্লুকোজের রিয়্যাক্‌শন্‌।

পরদিন ১১ শ্রাবণ সকাল বেলা কী আশ্চর্য খুশি হয়ে আছেন কবি। কারণ কী? বোঝা গেল একটু পরেই। বললেন, একটা কবিতা লিখেছেন এরই মধ্যে।......

কবিতাটি শোনালেন ঘরে যারা ছিলেন তাদেরকে। একটি ছোট্ট সুসম্পূর্ণ কবিতা ঃ

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে,
কে তুমি...
মেলি নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি........
পেল না উত্তর।

১৩ই শ্রাবণ। আগামীকাল অপারেশন হবে। কিন্তু কবি জানেন না, কেননা ভয় পাবেন বলে কেউই বলেনি তাঁকে। রোজই গ্লুকোজ দেয়া হচ্ছেঃ আর তিনি কেবলই জিজ্ঞেস করছেন "সেই বড় খোঁচার ভূমিকাস্বরূপ এই ছোটো খোঁচাগুলো আর কতদিন চালাবে?" খোঁজ নেন, কবে দিন ঠিক হলো। এরূপ ভয় ও উদ্বেগের মধ্যেও আরেকটি কবিতা লেখা হয়ে গেলো বিকেল বেলা-

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে..........

মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিফলন ঘটে। সুন্দর ও অসুন্দরের প্রকাশ ঘটে। আলো ও আঁধারের পূজারীদের অথবা একত্ববাদী ও বহুত্ববাদীদের মৃত্যুকালে কিছুটা হলেও শুভ-অশুভের স্বাক্ষর বা অলিখিত রেখে যায়। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন ঃ "এবং একদিন আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো, তৎপর যারা অংশীবাদিতা করছে তাদিগকে বলবো, তোমাদের সেই অংশী উপাস্যরা কোথায় যাদিগকে তোমরা নিশ্চিত ধারণা করতে? তৎপরে তাদের ছলনা কার্যকরী হবে না- বরং তারা বলবে যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর পথে আমরা অংশীবাদী ছিলামনা। দেখ তারা স্বীয় প্রবৃত্তির উপর কিরূপ মিথ্যা বলে এবং তারা যা ধারণা করতো তা বিভ্রান্ত হবে"। (সুরা আনয়াম, আয়াত ২২-১৪)

১৪ই শ্রাবণ ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই সকাল ৯টায় অপারেশন টেবিলে যাবার আগে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলে গেছেন একটি কবিতা। শ্রীমতি রাণীচন্দ কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন-

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজলে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিস্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির-সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়াম্বিতা।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতেই পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভান্ডারে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। তখন সাড়ে ন'টা। রাণী চন্দকে আবার ডাকলেন, আবার বলে গেলেন ঃ

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

লেখা শেষ হয়ে গেলে বললেন, "সকাল বেলার কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস।" এভাবেই জীবনের সর্বশেষ কবিতা রচিত হয়ে যায়।

সাড়ে দশটার সময় আয়োজন সম্পূর্ণ হলে ডাক্তার কবির কক্ষে। এসে বললেন, 'আজকের দিনটা ভালো যাচ্ছে। আজই তা হলে সেরে ফেলি, কি বলেন? এই আকস্মিকতার চমকে উঠলেন কবি, "আজই?" তারপর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ' তা একরকম ভালোই। এ রকম হঠাৎ হয়ে যাওয়া মন্দ না।" তারপরেই চুপ হয়ে গেলেন। অনেক পরে বললেন, সকালের কবিতাটি আবার শোনাতে। কিঞ্চিৎ মাজা-ঘষার দরকার ছিল যদিও তবু করলেন না, বললেন, "ডাক্তাররা তো বলেছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভালো হয়ে পরে ওটা মেজে-ঘষে দেবো।"[১]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য "পরে ঠিক করব খন" এর সুযোগ আর পাননি। "ছলনা" শব্দটি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুর পূর্বে মুহূর্তে স্বীকার করে যান। 'ছলনাময়ী' কে এবং কাকে উদ্দেশ্যে করে কবি তাঁর শেষ রচিত কবিতায় বলে গেছেন তা বলাই বাহুল্য।

১। তথ্য সূত্রঃ হায়াৎ মামুদ, রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী।

নির্বিঘ্নে অপারেশন শেষ হয়। কোন অসুবিধাই হয়নি। অপারেশনের পর কবি সারাদিন ঘুমায় এবং জ্বরও অন্যদিনের চেয়ে কম। এইভাবে দু'দিন অতিবাহিত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। মাঝে মাঝে চৈতন্য হারায় এবং হেঁচকি তুলছেন অবিরত। সাথে টোট্কা চিকিৎসাও চলে। ১৯ তারিখে মনে হয় যেন কিছুটা ভালো। সকালে কিঞ্চিৎ আহার করেছেন। কিন্তু আচ্ছন্ন অবস্থা তন্দ্রার মতো ঘোর তেমনিই আছে। ওষুধ খেতে চান না, ডাক্তারের ভিড় বাড়ছে। ডাক্তার বিধান রায় রোজ আসতে পারেন না, তবু সময় ক'রে প্রায়ই আসছেন। পর দিন শারীরিক অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। কবি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিডনিও ঠিক মতো কাজ করছেনা। ২০ তারিখের রাত থেকে কবিকে স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়। একুশে শ্রাবণের সন্ধ্যা। শান্তি নিকেতনের চীনা ভবনের অধ্যাপক এসেছেন, কবির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের তসবী গুনতে গুনতে উপাসনা করলেন। কবিকে শোয়ানো হয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে, পূর্ব দিকে মাথা রেখে শায়িত। রাত শেষ হয়ে গেলো অজ্ঞান অবস্থায়।

অবশেষে ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল (৭ আগস্ট ১৯৪১) স্তব্ধ দুপুর বারোটা দশ মিনিটে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত শারদীয় "শনিবারের চিঠি" ১৩৯২ সংখ্যায় বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ চৌধুরী "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? শীর্ষক প্রতিবেদনে অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরেছেন ঃ

"স্ট্রেচারে করে বারান্দায় আনা হল তাঁকে। প্রস্টেট কাটা হয়, তলপেটে একটু জায়গায় ফুটো করে ইউরিন বেরোনোর রাস্তা করে দেয়। ডাক্তারি শাস্ত্রে যাকে বলে সুপ্রা পিউরিক মিস্টোস্কপি। লোকাল এ্যানাস্থেশিয়া দিতে পঁচিশ মিনিট লাগল। রবীন্দ্রনাথ সব টের পেলেন। ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করলেন চোখ বুঁজে। ৩ আগস্ট থেকে অবস্থার অবনতি হলো। ৫ আগস্ট থেকে জ্ঞান ছিল না। ৭ আগষ্ট মারা গেলেন। হল সেপটিক, হল ইউরেনিয়া। বাড়ির বারান্দায় ভাল প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়া অপারেশন করলে এমনিতেই তো হবে। কেন, ভাল নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন? তাহলে এতো কষ্টের মধ্যে তাঁকে বিদেয় নিতে হত না। প্রথমে চিকিৎসা বিভ্রাট, পরে অবিবেচনায়, অযত্ন। আশ্চর্য।[২]

মৃত্যু তো হলো, তারপর আরও অবিবেচনা। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার প্রতি আবার বৃদ্ধাগুষ্ট প্রদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর যেন শোক মিছিলে কোন উদ্দামতা না হয়। আমার নামে কোন জয়ধ্বনি যেন না দেয়া হয়। কিন্তু! রবীন্দ্রনাথ বললে কি হবে, তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে রবীন্দ্রনাথের মরদেহকে ছেড়ে দিলেন বিশৃংখল জনতার হাতে। রথীন্দ্রনাথ দিশেহারা হয়ে অন্য ঘরে নিষ্ক্রান্ত, প্রশান্ত মহলালবিশ বরানগরে জ্বরে শর্য্যাশায়ী, ডাক্তারা সব নিজেদের বাড়িতে শান্তিনিকেতনে

২। ডঃ অমিতাভ চৌধুরী, শনিবারের চিঠি, ১৩৯২ সংখ্যা।

কেউ গান গাইছেন, মালা গাঁথছেন, মন্ত্র পড়ছেন, শেষ শয্যা সাজাচ্ছেন, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার খাট বানাচ্ছেন, কাঁদছেন, আর ততক্ষণে ঠাকুরবাড়ির কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে জনতা মহর্ষিভবনে ঢুকে টেনে হিঁচেড়ে দেহ নিয়ে চলে গেল জনস্রোতের মাঝখনে।

সেখানে কেউ তাঁকে বহন করার ছিল না। তাঁর অমন সুন্দর শরীর নিমতলার দিকে ভেসে চলল এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে। সেই সঙ্গে মুর্হুর্মুহু ধ্বনি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি জয়' বন্দে মাতরাম' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভাল, তার দেহ ঠেলাঠেলিতে মাটিতে পড়ে যায়নি। পড়লে নিমতলায় নিয়ে যাওয়ার আগে কলকাতার রাস্তায় পদদলিত হয়ে কবরস্থ হতে হত। বিশ্বভারতীয় বা কলকাতার এমন কেউ ছিলেন না যে, জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা সুশৃংখল শোক মিছিল করবেন। আরও দুর্ভাগ্যের কথা, একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথ মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে পারেননি। তিনি বাড়িতেই মুহ্যমান হয়ে শুয়েছিলেন। সম্পর্কিত এক নাতি কলকাতার দিকে নিমতলার ঘাটে যেতে না পেরে হাওড়ায় গিয়ে ওপার থেকে নৌকা করে এপারের ঘাটে আসেন। এবং কোনমতে মুখাগ্নি করেন। যখন মুখাগ্নি করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের মুখমন্ডল বিকৃত। জনতার এতই রবি অনুরাগ ছিল যে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি সব উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই হল গিয়ে বিশ্বকবির প্রয়ানের শেষ দৃশ্য। সারা জীবন সুন্দরের সাধক বলে কথিত রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় নিতে হলো অসুন্দরের হাতে। তাঁর নিকটজনেরা যদি অপারেশন না করাতেন, তাহলে আরও কিছুদিন বাঁচতেন তিনি, আমরা আরও কিছু অসাধারণ রচনা পেতাম-অন্তত কিছু গান ও কবিতা। কিন্তু তা হতে দেয়া হল না। তারপর সিদ্ধান্তহীনতায় বন্দী হয়ে বিশ্বভারতী ও ঠাকুরবাড়ির লোকেরা তাকে ঠেলে দিলেন উচ্ছৃংখল জনতার মাঝখানে।[৩]

জর্জ বার্নার্ড নিজকে সব সময় সবার উপরে মনে করতেন, কখনও কোন অবস্থায় কারুর নিকট নতি স্বীকার করতেন না। সেই বার্নার্ডশ' একবার সর্বসমক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন "আপনাকে দেখে আমার খুব হিংসা হয়।" শুনে রবীন্দ্রনাথ বর্তে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন, "কী যে বলেন?" রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তার প্রতিভার কথা হয়তো বলছেন বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক। কিন্তু তাকে একেবারে নিরাশ করে জর্জ বার্নার্ডশ বললেন, "আপনার দাড়িটা আমার চেয়ে বড়।" চিতায় উঠবার আগে মুখাগ্নি দেয়ার সময় রবীন্দ্রনাথের মাথায় এই সুন্দর চুল এবং মুখে সুন্দর শখের দাড়ি একটিও ছিলো না। চুল-দাড়িবিহীন বিকৃত কদাকার মাকুন্দা হয়ে বিদায় নিতে হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম ইচ্ছে ছিলো তাঁর দেহটাকে স্রষ্টার কাছে সুন্দর ভাবে ফেরত দিবেন। কিন্তু কবির সে ইচ্ছাও পূরণ হয়নি। তাকে চলে যেতে হয়েছিলো বিকৃত ভাবে। সারা

২। ডঃ অমিতাভ চৌধুরী, শনিবারের চিঠি, ১৩৯২ সংখ্যা।
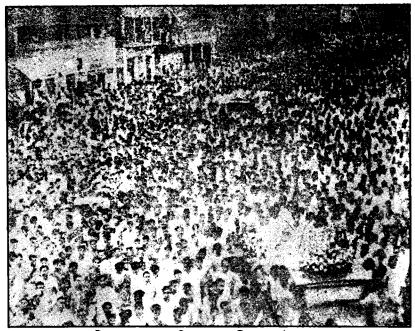
২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মরদেহ নিয়ে শ্মশানমুখী শোকার্ত মানুষের ঢলের একাংশ

জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় নিতে হয়েছিলো অসুন্দরের হাতে।

কি মর্মান্তিক পরিণতি! বিশ্বকবি-কত নাম ডাক অথচ তার অপারেশন হলো কিনা এ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই, সজ্ঞানে কল্পনাতীত যন্ত্রণা দিয়ে আর পরে তা সিপটিক হয়ে মারা গেলেন। ডঃ অমিতাভ চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন "ভাল নার্সিং হোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন? তাহলে এতো কষ্টের মধ্যে তাকে বিদায় নিতে হতো না।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু স্মরণে কবি নজরুল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন দীর্ঘ কবিতার রচনা করে। নজরুল লিখেছেন-

"কাব্যগীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে। বাণী, বেনুকা ও বাণী
নীরব হইল।
ধূলার ধরনী জানি না সে কতদিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না।.......

কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও,
উর্ধ্বে থাকি এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও।"

নজরুলের চিরবিদায় নিয়ে কিছু কথা

নিয়মির কি নির্মম পরিহাস! বিশ্ব কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'চিরবিদায়' নিতে হলো অসুন্দরের হাতে, অথচ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের চিরবিদায় ছিলো অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানজনক। আগেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত থাকাকালেই অভিভক্ত ভারতে জাতির পক্ষ থেকে এক সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিলো। যা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটেনি। এছাড়া বিশ্ব কবির বিজাতীয় নোবেল প্রাইজের অধিকারী হলেও নজরুলের ন্যায় জাতীয় কবি হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৬-এর জানুয়ারী মাসে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। এর আগে কবি বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে। কিন্তু ভারত সরকার এ দেশের জনগণের কবির প্রতি আবেগ ভালবাসার কথা চিন্তা করে কবিকে ভারতে সরিয়ে নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কবিকে একুশে পদকে ভূষিত করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৬ সালের ২৫ মে কবির ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে গিয়ে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি 'ক্রেষ্ট' উপহার দেন। এর মাত্র দু'মাস পরই কবি ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। এখানে উল্লেখ্য তৎকালীন প্রদানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭২ সালে কবির চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা টিম গঠন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে চিকিৎসার্থে কবিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তৎকালীন অর্থ মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সরকারি ফাইলে নোট দেন যে, এতে জনগণের মাঝে অতিরিক্ত আশার সঞ্চার হবে। কিন্তু পরবর্তীতে রহস্যজনক কারণে কবিকে চিকিৎসার জন্য আর সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠানো হয়নি।

হাসপাতালে স্থায়ী বন্দী দশার কারণে কবির স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯৭৬ সালের ২৭ আগস্ট শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে কবির গায়ে সামান্য জ্বর আসে। পরদিন পহেলা রমজান শনিবার সকাল ১১টার পর কবির জ্বর বৃদ্ধি পায়। তখন জ্বর ছিলো ১০৩ ডিগ্রী। ২৯ আগস্ট রবিবার সকালে জ্বর বৃদ্ধি পেয়ে একশ' পাঁচ ডিগ্রী ছাড়িয়ে যায়। কবি সে সময় অস্থিরভাবে করুণ চোখে কাকে যেন খুঁজেছিলেন। শেখ

পিজি হাসপাতালে কবি ও তাঁর সেবিকা

দরবার আলম তার অজানা নজরুল গ্রন্থে কবির অন্তিমকালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো ঃ কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর ডাক্তার নাজিমুদ্দীন চৌধুরী আসেন ভারতীয় সময় সকাল ৮টায়। ডাঃ নজরুল ইসলামও এলেন। সকাল পৌণে ন'টায় সিস্‌টার বেগম, শামসুন্নাহার মাহমুদ কবির মুখে চার চামচ পানি তুলে দেন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরেরও বেশি অসুস্থতার পর কবির শ্বাস-প্রশ্বাস যখন বন্ধ হয় তখন ভারতীয় সময় সকাল ৯টা বেজে ৪০ মিনিট। প্রথমে ব্রাদার ওয়াহিদুল্লাহ ভূঁইয়া আচমকা চিৎকার করে ওঠেন, কবির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ছুটে এলেন প্রেসিডেন্ট সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়া, রিয়ার অ্যাডমিরাল মোশাররফ হোসেনসহ সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। কবির পুত্রবধূ উমা কাজী সেদিনও ঢাকায় ছিলেন। আর ছিলেন কবির বহু বছরের সাথী ও ভৃত্য কিশোর সাহু। ঢাকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে কবি মোট এক বছর এক মাস এক সপ্তাহ থেকে চিরবিদায় নেন।

১১৭ নম্বর কেবিনের সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে হাসপাতাল সংলগ্ন বিশাল এলাকা জুড়ে জমায়েত শোকাতুর জনতার হাতে ফুল, লোবান, আগর বাতি আর দু'চোখ ভরা পানি। ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকার ১৩৮৪'র নজরুল স্মারক সংখ্যায় 'শেষ

১৯৭৬ সালে পিজি হাসপাতালে জন্মদিনে কবি

সালাম' শিরোনামে আবদুল মুকীত চৌধুরীর এক বিবরণে দেখেছি, জনতার নানান প্রশ্নের জবাবে কবির কেবিনের দায়িত্বভার প্রাপ্ত স্টাফ নার্স বিলকিস বেগম বলেছেনঃ 'আমরা আমাদের ছুটির দিনেও তাঁর পরিচর্যা করতাম। কবিও আমাদের সঙ্গ পছন্দ করতেন। কবি অত্যন্ত সতীর্থকাতর ছিলেন।.... একদিন আমি এক মজার গল্প বলায় কবি খুশী হ'য়ে আমার পিট চাপড়ে দিয়েছিলেন।

কবির বহু দিনের সাথী ও ভৃত্য কিশোর সাহু বলেছেন ঃ 'বারো বছর বয়সে কবি পরিবারে এসে কবির আকর্ষণেই আমি এতো দীর্ঘদিন থেকে যাই। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'য়ে কবি-পত্নী মারা গেলে কবি দারুণ আঘাত পান। কবির স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘদিন আমি আমার মা-বাবাকে দেখতে যাইনি। আজ সকাল বেলা দু'বার দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

পি,জি হাসপাতালের ষ্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী বললেন ঃ 'আমি কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে কবি কাদঁতেন। আমি ভয় পেতাম। কবি কেন কাঁদতেন তা আমি বুঝতাম না।

...আমরা তাঁকে কখনে রোগী হিসাবে দেখিনি দেখিছি নায়েবে রসূল হিসাবে। তাঁর কবিতা, গান গজল আমাদের মনে এই ভাবমূর্তি এঁকে দিয়েছে।"

মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ ইচ্ছে বাস্তবায়িত না হলেও কাজী নজরুলের শেষ ইচ্ছে আল্লাহ কবুল করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্মে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে তাগিদ দেয়া হয়েছে তা পরিপুর্ণভাবে পালন করা হয়েছিল। কবির ইচ্ছে ছিলো ঃ

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে

চিরনিদ্রায় নজরুল

'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙ্গিব না।
নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ বিধূর ধূপ।

গোর আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইব রেহাই।
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত;
ঐ মসজিদে করে ভাই কোরান তেলাওয়াত।
সেই কোরআন শুনে আমি যেন পরাণ জুড়াই।
কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙ্গিনাতে।
আল্লাহর নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নাম জপতে চাই।"

কাজী নজরুল ইসলাম একজন সত্যিকার ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাই শেষ ইচ্ছে অপূর্ণ থাকেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাশ নাপাক অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে যায় জনতা। কিন্তু কবি নজরুলের লাশ সযত্নে গোছল করিয়ে পাক সাফ করে নিয়ে কাফন পরিয়ে অত্যন্ত নম্রতা, পবিত্রতা, এবং ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বহন করা হয়। ভক্তের দল রবীন্দ্রনাথের সুন্দর চুল-দাড়ি উপরে ফেলার কারণে অন্তষ্টিক্রিয়ার আগে তার চেহারা হয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত বিকৃত ও বীভৎস্য। তাঁকে দেখে সবাই আঁৎকে উঠেছিলেন। আর নজরুলের চেহারা অবিকৃত ছিলো এবং নুরানী হয়ে উঠেছিল। অমিতাভ বাবুর বর্ণনা
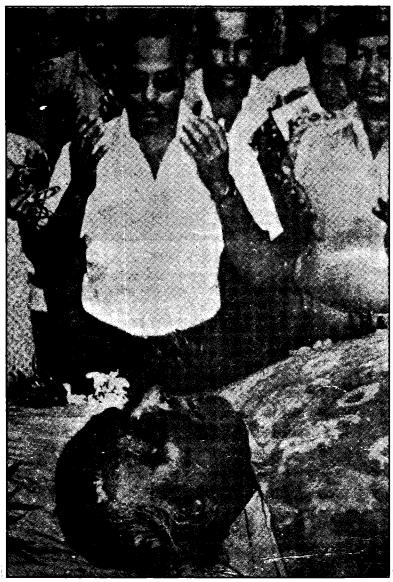
কবির লাশের পাশে তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করছেন।

অনুযায়ী "বিশ্ব ভারতীয় বা কলিকাতায় এমন কেউ ছিলেন না যে, জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা সুশৃংখল শোক মিছিল করবেন।" কিন্তু কবি নজরুলের লাশ যখন পিজি হাসপাতাল থেকে বের হয় তখন অগণিত শোকাহত জনতার মিছিল ছিলো অত্যন্ত সুশৃংখল। লাশবাহী ট্রাক ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে পৌঁছতে এতটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে সময় গেলেছিলো প্রায় আধঘন্টা।শোকাহত মিছিলটি ছিলো যেন অলৌকিক। বিশাল মিছিলে এতটুকু বিশৃংখলা দেখা দেয়নি। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর ও পবিত্র পরিবেশে বিশাল মিছিলটি এগিয়ে চলে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথ মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে পারেননি। তিনি বাড়িতেই মুহ্যমান হয়ে শুয়েছিলেন। সম্পর্কিত এক নাতি কলকাতার দিকে নিমতলার ঘাটে যেতে না পেরে হাওড়ায় দিয়ে ওপার থেকে নৌকা করে এপারের ঘাটে আসেন এবং কোনমতে মুখাগ্নি করেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তষ্টিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হয়নি। কিন্তু কবি নজরুল সমাহিত হয়েছেন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। রবীন্দ্রনাথের মরদেহ তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্বজনও বহন করেননি। বহন করেছেন অতিভক্ত রবীন্দ্র ভক্তরা। আর কবি নজরুলের লাশ বহন করেছেন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান। এই সম্পর্কে শেখ দরবার আলম লিখেছেন ঃ কবির ইন্তেকালের খবর প্রথম রেডিও টেলিভিশনে জানান নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম। নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে বাংলাদেশে রেডিও টেলিভিশনে কবির ইন্তেকালের খবর ঘোষণা শুরু হয়। এ খবরে সারা উপমহাদেশ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। কেবিনের সামনে কাতারে কাতারে যেন তামাম দুনিয়ার নজরুল ভক্তদের জমায়েত শুরু হয়। কবির ইন্তেকালের মাত্র পনের মিনিটের মধ্য ছুটে এলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান; রিয়ার এডমিরাল মোশাররফ হোসেন খান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কবি শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, দিনমজুর, রিকশাওয়ালাসহ সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। আপামর জনসাধারণ।....

দর্শনেচ্ছু ভক্ত জনতাকে লাইন করাতে পুলিশ হিমশিম খাচ্ছিলেন। বাংলাদেশ সময় বেলা সোয়া এগারটা, ভারতীয় সময়ে পৌনে এগারটায় কবির মরদেহ হাসপাতাল থেকে আউটডোরের দোতালায় ঘরের উঁচু মঞ্চে রাখা হলো। এখানেও ভিড়ের প্রবল চাপ এক্তিয়ারে রাখা সাধ্যাতীত হয়ে উঠে। লোবান, আগরবাতি পুড়ছিলো নশ্বর দেহকে ঘিরে খোশবু। সুগন্ধিত পরিবেশ। মরদেহের পাশে কুরআন শরীফ পাঠ করেছিলেন অনেকেই। উত্তাল জনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। অন্তহীন নজরুল ভক্তের মিছিল ক্রমেই দুর্বল হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হলো। ইতোমধ্যে অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল এবং নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং

১৯৭৬ সালের ২৯ আগষ্ট ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে কবির জানাজা।
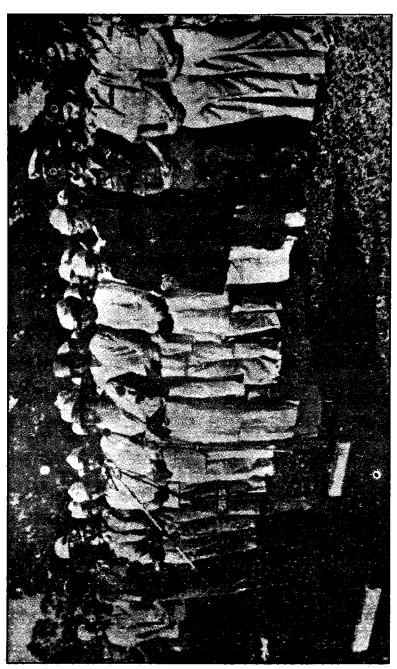
প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ এলাকায় গিয়ে সমাধির স্থান নির্বাচন করলেন যেখানে এই মহান জাতীয় কবির শেষ শয্যা পাতা হবে।

বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটা। ভারতীয় সময় বেলা দুটো নাগাদ কবির লাশবাহী ট্রাক ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পথে রওয়ানা হয়। শোকাতুর জনতার মিছিল ঠেলে এই সামান্য পথটুকু আসতে সময় লেগেছে পুরো আধ ঘণ্টা। রাস্তার দুপাশে চলমান শোকাতুর জনতার কণ্ঠে কালিমা শাহাদাৎ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে জনসমুদ্র যেন আছড়ে পড়ছে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র। কবির মরদেহ নিয়ে পৌঁছানোর আগে থেকে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট দর্শনার্থী জনতার বিপুল ভিড় হয়েছিল। অজস্র ফুল, ফুলের তোড়া মালা নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জনগণ। বিশাল এলাকা জুড়ে জনতার ভিড় ক্রমে যেন ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ দুর্নিবার সমুদ্রের চেহারা পায়।

জানাযা ও দাফনের আগে প্রেসিডেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা কর্নেল এম, এস হকের তত্ত্বাবধানে পিজি হাসপাতালের স্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী কবিকে শেষ গোসল দেন। এরপর কবির লাশ নিয়ে বিশাল শোক মিছিল যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে রওয়ানা হন তখন বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে চারটা, ভারতীয় সময় বিকেল চারটা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সারা অঙ্গ জুড়ে লাখো লাখো মানুষের ঢল নামে। বেদনাতুর মানুষ। সর্বস্তরের মানুষের হয় এক বিশাল মাহফিল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটা, ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় বিশাল জনসমুদ্র এই মহান কবির নামাযে জানাযা পড়ে। এই জানাযায় প্রেসিডেন্ট, তিন বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান ছাড়াও শরীক হন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ খুরশিদ। আফগানিস্তানসহ বহু মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতও জানাযায় শরীক হন।

জানাযা শেষে দাফনের জন্যে নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে যারা লাশ বহন করে নিয়ে যান তাদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-মুখ্য সারিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌ-বাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল মুশাররফ হুসেন খান, বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ।...

আসরের নামাযের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবির মরদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করার জন্য যখন আনা হয় তখন বিকেল পাঁচটা। অপেক্ষমান ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সৈনিকের কাছে তখন কমান্ড আসেঃ লাষ্ট প্রেজেন্ট আর্মস। একের পর এক বিশটি রাইফেল গর্জে ওঠে। ফায়ার শেষ হলে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অবনমিত হয় রেজিমেন্টাল কালারর্স, রেজিমেন্টের নিজস্ব পতাকা। জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত সেকেন্ড রেজিমেন্টের বিউগলে বেজে ওঠে লাষ্ট পোষ্ট তথা শেষ
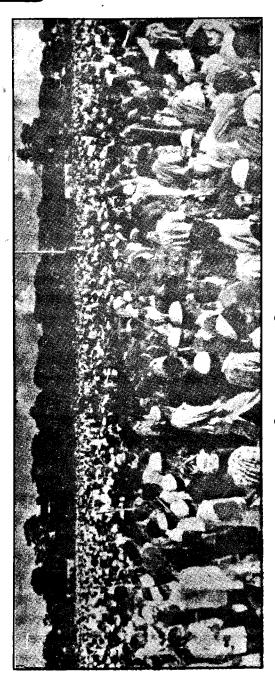
কবিকে শেষ দেখার জন্য বিশাল জনতার একাংশ

বিদায়ের করুণ সুর। একুশ বার তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাফনের ওপর থেকে ফুলের স্তূপ সরিয়ে কবির লাশ যখন কবরে নামানো হয় তখন বাংলদেশ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা। তখনও তিন মিনিট ধরে কেঁপে কেঁপে বাজছিল বিউগলে লাষ্ট পোষ্ট। অন্তিম সুর। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এ সময় সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবির ঢাকায় রচিত বিখ্যাত গান "চল চল চল" কে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রণসঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবি সৈনিকের কবরে তখন সবাই ছড়িয়ে দেন মাটি। পড়েন, 'মিনহা খালাক নাকুম.... উখরা।" উচ্চারিত হয় হাজারো মুখে কলেমায় শাহাদৎ- আশহাদু আল লা ইলাহা....।' মহান কবির শেষ শয়ান তার দাফন শেষ হলো। প্রেসিডেন্ট সায়েম, বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের তরফ থেকে সমাধিতে মাল্যদান সমাপ্ত হলে তিন বাহিনী প্রধান এবং বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান কবি সৈনিককে শেষ সামরিক অভিবাদন জানালেন,।'[১]

প্রতিভাবান কবি হলেই যদি মহামানব হওয়া যেতো তাহলে আবু জেহেল হতো শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি বারবার কাটকাটি, ঘষা-মাঝা করে কবিতা লিখেননি। তিনি কথায় কথায় মুখে মুখে কবিতা রচনা করার অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অথচ তিনি আখ্যায়িত হয়েছিলেন মুর্খের সর্দার। কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জন্য অবশ্যই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ব্যক্তি মানুষটিকে নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশিষ্ট অভিনেতা ও কলামিস্ট জনাব ওবায়দুল হক সরকারের একটি মন্তব্য লক্ষ্যণীয়। তিনি কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ

> "বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মান আমরা অবশ্য অক্ষুন্ন রাখবো। মানুষ "ঠাকুর" রূপে (রবীন্দ্র সঙ্গীত এবাদত) নয়। তার মৃত্যুবার্ষিকী সর্বত্র সসম্মানে পালিত হওয়া উচিত তবে কোথাও যেন সীমা অতিক্রম না করা হয়। সীমা অতিক্রমকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না- আমাদের প্রতিটি কাজে এ কথা স্মরণে রাখা উচিত। কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' হলেও সীমা অতিক্রম করে যাননি মূল (মৌলবাদী) তিনি বিস্মৃত হননি। তাই মৃত্যুর পর তাঁর মূল্য তিনি পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ। প্রগতি অর্থ দুর্গতি নয়- বাংলাদেশের রবিভক্তরা নিশ্চয়ই তা মনে রাখবেন। বিশ্বকবি যথাযোগ্য মর্যাদায় আমাদের মাঝে অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকুন এ কামনা অবশ্যই করি।"

কবি নজরুলের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী মসজিদের পাশে কবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে আযানের সুমধুরধ্বনির সাথে কপোত-কপোতীদের

১। তথ্য সূত্র ঃ শেখ দরবার আলম, নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৯ পৃঃ ৪২২।

কবির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক দল 'রেজিমেন্টাল কালার' অবনমিত করছেন

প্রেমালাপও তারা শোনাচ্ছে কবিকে। প্রতি দিন মাজারের উপর বসেই এক শ্রেণীর যুবক-যুবতী প্রেমের আসর জমায়। শুরু করে নিষিদ্ধ সব সংলাপ ও আচরণ। এই কপোত-কপোতীরা এমন অশ্লীল ও দৃষ্টিকুট ভাবে অবস্থান করে যে অনেক পথচারী লজ্জা পেলেও এদের এ দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিতকালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "শান্তি নিকেতন'। আর এদেশে কবি নজরুলের মৃত্যুর পর তাঁর মাজারকে রহস্যজনক ভাবে তৈরি হয়েছে 'প্রেম নিকেতনে'। শুধু তাই নয় কবির মাজারকে বানানো হয়েছে নেশাখোর ও জুয়ারীদের আড্ডাখানায়। অশুভ পদচারণায় জাতীয় কবির মাজার এলাকা পরিণত হয়েছে দূষিত এলাকায়। তা দেখে রসিকজনেরা মন্তব্য করছেন-

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই,
আমার কবরের পাশ দিয়ে ভাই কত প্রেমিক প্রেমিকা যাবে,
পবিত্র সেই প্রেমের বাণী, এ বান্দা শুনতে পাবে।
যেন গোরে থেকেও প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমলাভ শুনতে পাই।

প্রশাসন নজরুলের ইচ্ছোটকে বোধ হয় এভাবে বুঝেছেন নইলে কবির মাজার থেকে মাত্র কয়েক শ' গজ দূরে জাতীয় নেতাদের মাজার। সেখানে মাজারের নামফলক বা সাইন বোর্ডলাগানো হয়েছে অথচ কবি নজরুলের মাজারে তা নেই। জাতীয় নেতাদের মাজারের দ্বার জনগণের জন্য সবসময় উন্মুক্ত থাকে। অথচ জাতীয় কবির মাজারের প্রধান ফটক বন্ধ থাকে। মসজিদ চত্বরে কর্তৃপক্ষ ২টি ছোট আকারের বিজ্ঞপ্তি বোর্ড সযত্নে লাগিয়ে দিয়েছেন। এতে লেখা রয়েছে, 'মসজিদ ও মাজার এলাকায় ধর্মীয় কার্যাবলী ব্যতীত অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। অন্যথায় আইনতঃ দণ্ডনীয় হবেন' বলে

কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছেন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য জনসাধারণ মাজারে যাবার সুযোগ না পেলেও কপোত-কপোতীরা ঠিকই কবির মাজারে গিয়ে প্রেমের আসর জমায়। প্রেমিক-প্রেমিকাদের অশালীনভাবে মাজারের অবস্থান কি ইসলাম ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? এতে কি মাজারের ধর্মীয় পবিত্রতা নষ্ট হয় না? জাতীয় নেতাদের মাজার কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছেন অথচ কবি নজরুলের মাজারে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। এটা কি ইচ্ছাকৃত না কোন চক্রান্ত?

এ সম্পর্কে কবি নজরুলের নাতনী খিলখিল কাজী কয়েক বছর আগে আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

ঢাকায় বসবাসের ব্যাপারে সকল সরকারের দেয়া সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ নেই। সরকারী বাড়িতে থাকেন। বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং দেড় হাজার টাকা টেলিফোন বিল সরকারই দেয়। এ ছাড়া সরকারী ভাতাও তাঁদের পরিবার পাচ্ছে। জানা গেছে, এ ভাতার পরিমাণ প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা। এ ছাড়া কবির গ্রন্থ প্রকাশকদের কাছ থেকে তাঁরা রয়ালটি পেয়ে থাকেন। রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন রয়ালটি দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বলে তাঁরা জেনেছেন। খিলখিল বলেন, দাদুকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মসজিদের পাশে কবর দিয়েই যেন সকলের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। পরিচর্যাহীন সেই কবরে টোকাইরা কাপড় শুকায়। রাতে অন্ধকারে ঢেকে যায় এলাকাটি। আর দিনে তরুণ-তরুণীরা এমনভাবে বসে থাকে. যা আপত্তিকর। দাদু ফুল ভালবাসতেন। কিন্তু সেখানে ফুল নেই।

তিনি বলেন, মাজারটি সংরক্ষণ করতে তেমন কোন খরচ নেই। তবুও কেন এ অবহেলা, তিনি বুঝতে পারেন না। খিলখিল বলেন, সারাদেশে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে নজরুল সম্পর্কে ও তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নজরুল সম্পর্কে ভাসা-ভাসা ধারণা আছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা না কাটিয়ে উঠলে, শুধু জন্ম ও মৃত্যু দিনে কবিকে স্মরণ করে কি লাভ? বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত স্কুল পর্যায়ে নজরুল সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রচলনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, যাঁরা নজরুলকে জানেন, চেনেন এবং ভালবাসেন- নজরুল সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ডে তেমন ভাল ও যোগ্য ব্যক্তিদের ঠাঁই দেয়া উচিত।

খিলখিল বলেন, "দাদুর জন্মদিন মানেই ফুল, শিশু আর গান। তিনি বুঝতেন সবই। জীবিত অবস্থায় ধানমন্ডিতে তাঁর জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানে একটি ছোট শিশু ফুলের মালা নিয়ে দাদুর কাছে পৌঁছতে পারছিল না। তা বুঝতে পেরে দাদু হাত বাড়িয়ে মালা নিয়ে নিজেই নিজের গলায় পরে নেন। দাদু শিল্পীদের গানে খুশি হয়ে হারমোনিয়ামের ওপর মালা রাখতেন। এখনকার জন্মদিনে আগের চেয়ে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে। কিন্তু

কবিকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বিউগলে বাজানো হচ্ছে লাস্টপোস্টের করুণ সু

জন্মদিনের সেই আন্তরিকতা আর নেই।" সুস্থাবস্থায় নজরুল শেষবার ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে। স্বাধীন বাংলাদেশে অসুস্থ কবিকে সপরিবারে আনা হয় ১৯৭২ সালের ২৪ মে। তখন খিলখিল ছিলেন খুব ছোট। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তগুলো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি। আবেগে আপ্লুত লিখিল বলেন, সেদিন তেজগাঁ এয়ারপোর্টে দাদুর বিমানকে ঘিরে ছিল শুধু মানুষ আর মানুষ। বিমানের সিঁড়ি আনা যাচ্ছিল না; যেন দাদুকে বের করলেই কোলে তুলে নেবে সবাই। দাদুকে নামানো হলো। চারদিক হতে উড়ে এলো হাজার হাজার ফুল। এ দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলবো না। এখন মনে হচ্ছে- এ যেন স্বপ্ন ছিল। তিনি বলেন, এখন নজরুলের স্মরণ অনুষ্ঠানে লোক হয় না। নজরুল মেলা দর্শকহীন। এ ব্যর্থতা সবার।

খিলখিল আবেদন জানান, নজরুলের সঠিক মূল্যায়ন যেন হয়। জন্মদিন আর মৃত্যুদিনেই যেন তা সীমিত না থাকে। (জনকণ্ঠ, ২৫/৫/৯৫)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ এস, এম, লুৎফর রহমান ১৯৮৯ সালের ২৬ মে "বাংলাদেশে রবীন্দ্র রাজনীতির কৃষ্ণ বিকাশ ও ভীষ্মের প্রতি শর-নিক্ষেপ" শিরোনামে দৈনিক মিল্লাতে প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধের শেষে কতকগুলো নির্মম অপ্রিয় সত্য কথা লিখেছিলেন। চারদিকে অতি রবীন্দ্রভক্তদের উন্মনিষকতা এবং নজরুলের প্রতি অবহেলা দেখে বার বার সে কথাগুলো সব সময়ই
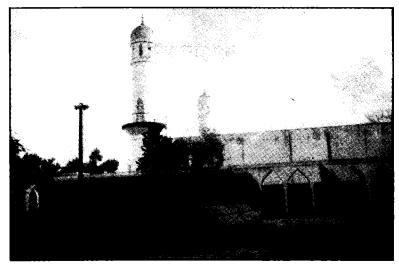
কবির সমাধি-সৌধ

আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে দোলা দেয়। তাঁর কথাগুলোর সাথে একাত্মা ঘোষণা করে দীপ্ত কণ্ঠে তা পুনরাবৃত্তি করছি।

.... চূড়ান্ত বিচারে-রবীন্দ্র-পূজার মধ্যে কোন সাহিত্য, সঙ্গীত বা শিল্পকলার প্রশ্ন নিহিত নেই এর ভেতর নিহিত রয়েছে- এক দেশদ্রোহী রাজনীতির প্রশ্ন। অখন্ড বাঙলার পক্ষে বাঙালী সংস্কৃতির চর্চার বা বাঙালী জাতীয়তাবাদ-এর প্রচার-প্রসারের অন্যতম অবলম্বন এই রবীন্দ্র-রাজনীতি, সারবস্তুতে যা দেশদ্রোহী, দেশীয় সংস্কৃতিদ্রোহী এবং নজরুল বিরোধী। ১৯৮৯ সাল থেকে এই নিন্দনীয় রাজনীতির প্রসার এদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- তাকে রুখবার জন্য আজ জাতীয়তাবাদী জনগণের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্যও।

বর্তমান সময়ে, বাঙালী জাতীয়তাবাদী পাণ্ডব সৈন্যদের সাথী হয়ে যাঁরা ভীষ্মসম নজরুল ইসলামের পরেলোকগত আত্মার পিঠে শরনিক্ষেপে ব্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ তাদের সামনে শিখন্ডী মাত্র। এ শরনিক্ষেপ অবশ্যই ব্যর্থ হবে। কেননা, কুরক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম-শিখণ্ডী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-রাজনীতির অপতৎপরতারমূলক এই স্নায়ুযুদ্ধে ভীষ্ম-শিখণ্ডী কেউই উপস্থিত নেই। অতএব, হাওয়ায় যত তীরই নিক্ষেপ করা হোক না কেন, তা ভীষ্মকে স্পর্শও করবে না। রবীন্দ্র-রাজনীতির কৃষ্ণ-বিকাশ এদেশে ব্যর্থ হবেই।”

নজরুল মূল্যায়নে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

এ দেশীয় অতি রবীন্দ্র ভক্তরা রবীন্দ্রনাথকে দেবতা বানিয়ে সকল মহলে সমাদৃত করতে তাদের চেষ্টায় যেন কোন বিরাম নেই। যে রবীন্দ্র 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে প্রতাব চরিত্রের মুখ দিয়ে ম্লেচ্ছদের (মুসলমানদের) 'দূর করিয়া' আর্য ধর্মকে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করার সংকল্প করলেন, 'গোরা' উপন্যাসে গোরার জবানীতে আমাদের ধর্ম বিষয়ে যে জঘন্য কটূক্তি করলেন সেই রবীন্দ্রনাথ নাকি মানবিকতার ও গুণাবলীতে উজ্জীবিত অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ ও তাঁর দেখানো আলোয় নয়; রবীন্দ্রনাথের দেখানো আলোয় নাকি অনেকে পথ দেখেন এবং অন্যকেও এ থেকে আলোকিত হবার নসিয়ত করেছেন।

বেশ কয়েক বছর আগে ১৯৯০ সালের ১৮ই জুন একটি বামপন্থী দৈনিকে জনৈক বুদ্ধিজীবী "বাংলার হাদী রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল" শীর্ষক এক চিঠিতে এই দুই কবিকে একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন ঃ "মহাপুরুষগণ সত্য ও সুন্দরের ধারক-বাহক, স্বয়ং স্রষ্টাই তাদের মাধ্যমে বিকশিত প্রকাশিত। দেশ-কাল, ভাষা সম্প্রদায়ের গন্ডিতে তাদের আবদ্ধ করা ঠিক নয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরই তিনি মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে তার মহা ফতোয়া জারি করে ঘোষণা করেছেন-

"অতএব বাংলা ভাষাভাষি মানব সম্প্রদায়ের কেউ যদি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে চায় তাকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে, সত্য ও মিথার মধ্যবর্তী কোন পথ নেই মোনাফেকী ছাড়া।"

নজরুলের একনিষ্ঠ অনুসারী না হলে এদেশের কেউ মুসলমান থাকতে পারবে না, এই কথা তিনি কোরআন-হাদিসের কোথায় পেয়েছেন তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেননি। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথকে জাতে তোলার খায়েশেই তিনি তাকে নজরুলের সমপর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ বুদ্ধিজীবীর ফতোয়া অনুসারে কোনও মুসলমান যদি সত্য-সত্যই ঐ দুই কবির একনিষ্ঠ অনুসারী হতে চান, অথবা দেখতে পান যে একজন লাশরিক আল্লাহর নামে কুরবানি করেছেন এবং অপরজন দেবদেবীর নামে বলিদান করেছেন, একজন গরু খেয়ে হজম করে ফেলেছেন এবং অপরজন গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছেন, তাহলে তার জন্য উভয়ের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার উপায় কি?

বুদ্ধিজীবী সাহেব তার ফতোয়ার পোষকতায় দুইটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। একটি নজরুলের 'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিক ইসলাম, সত্য যে চায় আল্লার মানে, মুসলিম তারি নাম।" অপরটি ইকবালের "মুশরিক আজ মুসলিম বেশে করিতেছে কোলাহল।" স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথকে লাশরিক আল্লায়ই বিশ্বাসী মুসলমান বলে প্রমাণ করা এবং যারা রবীন্দ্রনাথের "একনিষ্ঠ অনুসারী" নয় তাদের মুশরিক বলে প্রমাণ করাই বুদ্ধিজীবীর আসল ও একমাত্র মতলব। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত কলামিষ্ট ওসমান গনি (বর্তমানে মরহুম) চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন। তিনি দৈনিক মিল্লাতে 'খাকছারের খতিয়ান' শিরোনামে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"…. হিন্দু শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হাজামত করিয়ে, ওজু গোসল দিয়ে তওবা করিয়ে, কলেমা পড়িয়ে সরাসরি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছেন। এহেন মহা বিদ্যান মহাপন্ডিতদের কথার প্রতিবাদ করি তেমন বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নাই। সুতরাং আমি অন্যদের কাছ থেকে কিছু ধার-কর্জ করছিঃ হিন্দু মেয়ে বিয়ে করা, বাংলা ভাষা শেখা, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাহচর্য থেকে তার

"একনিষ্ঠ অনুসারী" ভক্তে পরিণত হওয়া বিহারী (নামে মাত্র) মুসলমান আবু সাঈদ আয়ুব বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ যৌবনে তৌহিদবাদী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে সব বর্জন করে আবার তেত্রিশ কোটি দেবী ও দেবতায় বিশ্বাসী পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২২ সালে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় ইংরেজদের ভারত ছেড়ে না যাবার অনুরোধ জানান এই কারণে যে, তাহলে ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে অসহায় অবস্থায় পতিত হবে। সেকালে 'ধূমকেতু'র জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকার এর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৯২৬ সালের মে মাসে, কৃষ্ণনগরে (বর্তমান ভারতের বাংলা রাজ্যে) কংগ্রেস এর প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট (ঐক্য চুক্তি) যখন বাতিল হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি করে বলেছিলেন ঃ

"হিন্দু না ওরা মুসলিম এ বিজ্ঞাসে কোন্ জন।
কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ। সন্তান কার মার।[২]

পাকিস্তান আমলে একজন প্রবীণ কবির কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একেবারে অরুচিকর। এ কবি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক আহমদ ছফার একটি বক্তব্য লক্ষণীয়। ঃ

"আগে প্রতি রোববার তার বাসায় খেতাম। তাদের স্নেহছায়ায় অনেকদিন বড় হয়েছি। তার স্ত্রীকে আমি খুব পছন্দ করি। তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়তে চাইতেন না। আমি তাকে induce করলাম যে, রবীন্দ্রনাথ পড়েন। এতে আপনার কবিতার Smartness এর কিছু ক্ষতি হলেও ব্যাপ্তি এবং depth বাড়বে। বলে যে, আমি এ লোকটা পড়তে পারি না। আমি বলি, কেন? বলে যে, লোকটা যাকে তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে। ও আল্লাহ্, এখন শামসুর রাহমানের এর সার্টিফিকেট দেয়ার চোটে পোলাপানরা ভয়ে ভয়ে থাকে যখন শামসুর রহমান তারিফ করে ফেলে।[৩] বর্তমানে এ কবির কাছে দেবতার স্থান দখল করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, গীতিকার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম সম্প্রদায়কে তাঁর সাহিত্যে যেভাবে চিত্রিত করেছেন এ জন্যে অনেক বাংলা ভাষী মুসলমান তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও অসাধারণ প্রতিভার জন্যে তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও গর্ববোধ করে। কিন্তু কিছুতেই কোন ধর্মপ্রাণ তোহিদবাদী মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে দেবতা এবং তাঁর সঙ্গীতকে এবাদত হিসাবে গণ্য করতে পারেনা। হিন্দু বাঙ্গালী ও রবীন্দ্রনাথের সাথে বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাষা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিন্ন সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। উভয় সম্প্রদায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্ব স্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি বা দর্শনে নিয়ন্ত্রিত। তাই এক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মূর্ত-প্রতীক বলে বিবেচিত হতে পারে না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে আমাদের এ দেশে কতিপয় মুসলিম নামধারী বাঙ্গালিত্বের নামে তাদের কথায়, চিন্তায় ও কর্মে বিজাতীয় দর্শন বা সংস্কৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তাদের এই অতি আদিখ্যেতা দেখে নিজেই লজ্জা পেতেন বা বিব্রতবোধ করতেন। জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্তাবকদের স্তাবকতার বহর দেখে অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক আলী আহসান একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখায় মজার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি সাপ্তাহিক বিক্রমে "ভাবছি কি লিখি" শীর্ষক শিরোনামে লিখেছেন ঃ

উইলিয়াম রাদিচে একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্য সেবক। ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় খুব দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি পেয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন যা পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বাংলাদেশের

১। পান্থ জনের শখা, দে-জ পাবলিশিং, ১৩/বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১৯৭৩, ১৫৬-১৫৭ পৃঃ।
২। ডঃ এস, এম লুৎফর রহমান, নতুন সফর, আগস্ট '৯৬
৩। ঢাকা ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

রবীন্দ্র-প্রেমিকদের কাছে অসম্ভব প্রিয় হয়ে উঠেছেন। বইটিতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিতাগুলো স্থান পায়নি। অনুবাদক সহজেই অনুবাদ করা যায় এমন কিছু কাহিনী-কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার সহজ কিছু বক্তব্যের কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। বইটির ব্যাপারে ভদ্রলোকের বিশেষ কোন অভিমান নেই। তিনি নিজেই একবার আমাকে বলেছিলেন, "বইটি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। পাশ্চাত্যের ইংরেজী পাঠকরা সহজেই বিদেশী ভাব প্রকল্পের কিছু কথা ও কাহিনী যাতে অনুভব করতে পারে সে জন্যই আমি অনুবাদটি করেছি।"

ভদ্রলোক প্রায়ই বাংলাদেশে আসেন। কয়েক মাস আগেও এসেছিলেন। একবার এক পর্যায়ে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-দল বলে শিক্ষকদের মধ্যে একটি দল আছে। এই দলের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে মনে করেন। এ দলের কোন সদস্যই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কোন গবেষণা করেছেন বলে জানা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথের নামে তারা শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের নামে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও থাকেন। এদেরই এক দল প্রতিনিধি রাজশাহী এয়ারপোর্টে ফুলের মালা এবং তোড়া নিয়ে রাদিচেকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। রাদিচে তো অবাক। বেচারী লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার মাত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিও তাঁর নেই, তিনি কোন রকম মহাপুরুষও নন। সুতরাং এহেন অভ্যর্থনায় তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি অনুভব করতে পারেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন বলে একজন দেবতা হয়ে উঠেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন লোকের গৃহে তিনি ভোজনে আপ্যায়িত হন, কিন্তু এক মুহূর্তও অভিভূত হন না। তাঁকে নিয়ে এই হৈ চৈ তাঁর কাছে কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছিল। চলে আসার আগে তিনি একজন সিনিয়র অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-পাগল কয়জন আছেন"? শুনেছি নিকটেই পাগলদের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। সেখানে এদেরকে পাঠাতে পারেন না? যাঁকে রাদিচে একথা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং যাঁর কাছ থেকে এ তথ্য আমি পেয়েছি তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "এদের ব্যাধিটা মস্তিষ্কসঞ্জাত, তাই নিরাময় হবার নয়।" রাদিচে রাজশাহী থেকে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর নতুন গবেষণা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং আমার সাহায্য চেয়েছেন। যতবার আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে মধুসূদন সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি কখনও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কথা বলেননি। আমার মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণার গৌণ বিষয়, কিন্তু মুখ্য বিষয় হচ্ছে মধুসূদন। কিন্তু আমাদের দেশের রবীন্দ্র প্রেমিকরা, যাদেরকে রাদিচে রবীন্দ্র-পাগল বলেছেন, তাঁরা কিন্তু রাদিচেকে দেবতা বানিয়ে ছেড়েছেন।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গবেষণা যে খুব বেশী হচ্ছে তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিয়ে পাগলামী হচ্ছে খুব। রবীন্দ্রনাথ নিজে বেঁচে থাকলে এই শিষ্যদের কান্ড দেখে কি বলতেন জানি না, তবে ধারণা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের খুব নিকটের লোক ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। তিনি রবীন্দ্র জীবনের অনেক ঘটনা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন। এরকম একটি ঘটনা হচ্ছে কলিকাতার এক বিবাহযোগ্য- জমিদারকন্যার রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলন। জমিদারের গৃহে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সামনে মেয়েটি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেছিল। সঙ্গীতের একটি চরণ ছিল "তবুও মরিতে হবে।" মেয়েটি প্রতিটি শব্দে অনস্বার বসিয়ে উচ্চারণ করেছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি আনুনাসিক পরিবেশন। ফিরতি পথে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "গুরুদেব, অনুষ্ঠানটি আপনার কেমন লাগলো? মেয়েটির বিয়ে হবে তো?" গুরুদেব উত্তর করছিলেন, "যেতে দাও, মেয়েটির বিয়ে হবে কিনা জানি না, কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে আমার মৃত্যু অবধারিত।" আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি পরিত্যাগের পর যখন তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন তখন

সেখানকার ভারতীয় ছাত্ররা তাঁকে একটি সংবর্ধনা দিয়েছিল। সুনীতিবাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনার এক পর্যায়ে কবিতা পাঠ ছিল। অর্থাৎ কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে কবিতা পাঠ। মধ্য প্রদেশের একটি ছাত্র উর্দুতে একটি কবিতা পাঠ করেছিল। কবিতার একটি চরণ ছিল, 'তুম্ নে ইয়ে সর পর লাথ মারা'। ছেলেটি ভেবেছিল এটি একটি মহৎ উপমা হয়েছে, কিন্তু এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করলো না দেখে ছেলেটি ব্যাখ্যা করে বলল যে সর শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছে দুটি অর্থে- একটি হচ্ছে মস্তক, অপরটি হচ্ছে স্যার উপাধি। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ স্যার উপাধি ত্যাগ করে ইংরেজদের মাথায় লাথি মেরেছেন। উক্ত সভাস্থল থেকে বেরিয়ে সুনীতিবাবু রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "গুরুদেব, কবিতাটি কেমন লাগলো?" রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন, "কবিতার এই বীভৎস মৃত্যুতে ছেলেটির জন্য আমার অনুকম্পা হচ্ছে। ভাবছি এত টাকা খরচ করে এরা বিলেতে কি শিখতে আসে?"

আমাদের দেশে রবীন্দ্র-চর্চার অর্থ হচ্ছে কে রবীন্দ্র বিরোধী আর কে রবীন্দ্রনাথের পক্ষের তা নিয়ে বিতর্ক তোলা। আমাদের দেশের রবীন্দ্র বিরোধী কথাটি যেন একটি গালিতে পরিণত হয়েছে! রবীন্দ্র-প্রেমিকরা রবীন্দ্রনাথের নামটি সর্বকর্মে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। যার ফলে রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছেন এবং বিকারগ্রস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এরা আসলে রবীন্দ্র প্রেমিক নয়, যথার্থ অভিধায় বলতে গেলে বলতে হয় এরা রবীন্দ্রনাথের চরম শত্রু। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি শান্তি নিকেতনে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে। আমি তখন কলকাতায়। এ খবরটা কাগজে বেরুলে একজন বাংলাদেশী রবীন্দ্র-প্রেমিক পয়সা খরচ করে শান্তি নিকেতনে গিয়ে প্রবোধ চন্দ্রকে বলে এসেছিলেন যে আমি নাকি রবীন্দ্র বিরোধী। তার এই প্রচারণায় কোন ফল হয়নি। আমি সম্মানিত অতিথি হিসেবে শান্তি নিকেতনে গিয়েছিলাম এবং সংবর্ধিত হয়েছিলাম। পরে ডঃ প্রবোধ সেন সমস্ত ঘটনাটা আমাকে বলেন। তিনি মন্তব্য করেন, "মনে হয় আপনাদের দেশের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নামটি ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা কিন্তু গুরুদেবের প্রতি অসম্মান।"[৪]

আমাদের মাত্রাতিরিক্ত রবীন্দ্র প্রেমের আধিখ্যেতা দেখে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত হতবাক। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের নয়াদিল্লী থেকে রেবতী ঘোষ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট একটি পত্র দিয়েছিলেন। কলকাতার 'নবজাতক' পত্রিকায় পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই প্রকাশিত পত্রে লিখা হয় ঃ

"আপনার গুরুদেব যে এত বড়ো ঋষি উত্তরকালের ইতিহাসে কে তা জানতো? সমস্ত ঘটনাটা যেন এক মন্ত্রঘটিত ব্যাপার, ঐন্দ্রজালিকের কান্ড বলে মনে হয়। আমাদের মাতৃভাষায় কি জাদু তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন যার শক্তিতে একটা গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল জীবন বাজি রেখে। অমন যে ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রুকটি তাও তুচ্ছ হয়ে গেল। আমরা কলকাত্তিয়া সাহিত্যিকেরা তাঁকে হয় ভুলতে চেষ্টা করেছি না হয় শিকেয় তুলতে তৎপর হয়েছিলাম। নেথান সঙ্গীত (তাও স্বরলিপি সর্বস্ব তোতো বুলির মত) ধারা দিয়েই রবীন্দ্র চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু ওরা কাব্য সঙ্গীত দর্শন সব মিলিয়ে গোটা রবীন্দ্রনাথকেই মনে হয় আত্মাসৎ করে নিল।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ বেঁচে নেই। যদি তাঁর ধর্ম বিশ্বাস মতে পুনর্জন্ম হতো তাহলে দেখতে পেতো তাঁর জন্মভূতিতে তাঁর রেখে যাওয়া সাহিত্যকর্ম ও স্বজাতির পরিণাম। সব খুঁইয়ে একেবারে ফতুর। তাদের অর্জনের খাতা আজ শূন্য। যে সংস্কৃতি নিয়ে বিশ্ব কবি একদিন গর্ববোধ করতেন, সে সংস্কৃতির দম্ভ তাঁর স্বজাতিরা ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে কলিকাতার অলিতে গলিতে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে পথ খুঁজছে। রবীন্দ্রনাথের 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' এই গানের কথাগুলো আজ তাঁর স্বজাতির জন্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। আর যাদেরকে রবীন্দ্রবাবুরা উপহাস করে বলতো- 'তাদের কোন কালচার নেই, আছে

৪। সৈয়দ আলী আহসান, সাপ্তাহিক বিক্রম, ৩-৯ জুলাই '৯৫।
৫। ডাকঘর ঃ নবজাতক (কলিকাতা) ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা ঃ অষ্টম বর্ষ ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭৮।

এগ্রিকালচার' সেই চাষা-ভূষার ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে আজ বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পতাকা ও মানচিত্রের অধিকারী হয়ে গর্ব এবং অহংকার নিয়ে দুনিয়ার কাছে বলতে পারছে 'আমরা বাংলাদেশী'। কবি রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন; আর বাঙ্গালী মুসলমানদের এই অহংকার ও গর্ববোধ দেখতেন তাহলে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি হতো জানি না। তবে এ দেশীয় যারা রবীন্দ্রনাথকে সর্ব রোগের মহৌষধ মনে করে 'ওম রবীন্দ্র, ওম রবীন্দ্র' জপমালা করছেন; সেই স্তাবকদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্যই সক্রোধে বলতেন- "বন্ধ কর এই সব স্তাবকতা।"

ডঃ হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি গ্রন্থে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মতো রবীন্দ্রনাথকে দেবতা বানিয়ে অন্ধ ভক্তের পরিচয় দেয়নি বটে; কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য যে হিন্দু ধর্মীয় পৌরানিক কাহিনী ও পৌত্তলিকতার ভাবধারায় পরিপূর্ণ এ বিষয়ে ডঃ আজাদ রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করেননি বা কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি; যেভাবে তিনি নজরুলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। একই বইয়ে অত্যন্ত নগ্নভাবে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন কবি নজরুলের ইসলামী গান ও কবিতা লেখার অপরাধে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত 'আমার অবিশ্বাস' গ্রন্থে ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন ঃ

"বাঙলা লেখকদের লেখাপড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম, যখন তাঁরা চিন্তা করেন তখন তারা অনেকটা শিশু, তাদের অধিকাংশই অবিকশিত, অনেকাংশ অজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞানের অভাবে আদিম বিশ্বাস প্রবল তাদের; তাঁরা স্বস্তি পান কুসংস্কারে, পুরনো বাজে কথায়। কুসংস্কার কীর্তনে তারা অকুণ্ঠ। তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা-পড়ার সময়ও; তিনি মাঝারি লেখক বলে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক বলে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বাঙালী মুসলমানের ওপর; বাঙালী মুসলমান তাঁকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারবে না বহুদিন। বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীলরাও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল, আর তারা পড়ে না, নজরুলকেও পড়ে না, শুনে শুনে বিশ্বাস করে যে, নজরুল বিদ্রোহী। প্রচারে প্রচারে তাঁকে আমি বিদ্রোহী বলেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশ কিছু গদ্যে পদ্যে দেখেছিও তার বিদ্রোহীরূপ, কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান। বেশী ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গানের পরে গানে লিখেছেন,

'নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।/ তোর আখেরের কাজ করে যে, সময় যে আর নাই", "শোনো শোনো য়্যা এলাহি আমার মুনাজাত।/ তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস রাত; 'আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়; 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,/ যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই'; 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি; মোরে নিয়ে যারে মদিনা'; 'খোদার প্রেমের সরাব পিয়ে বেহুঁস হয়ে রই পড়ে'; 'আল্লাহ আমার প্রভু'; আমার নাহি নাহি ভয়। আমার নবী মোহাম্মদ যাঁহার তারিফ জগৎময়।' অবশ্য এগুলোকেও অনেকে মনে করতে পারেন খুবই বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল কান্ড; কিন্তু এখানে কোনো বিদ্রোহীকে পাচ্ছি না, পাচ্ছি একজন ইসলাম অন্ধকে।"[৬]

ডঃ হুমায়নের লেখা বইটি আমি পড়িনি। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নেয়া হয়েছে একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে। ডঃ আজাদের 'আমার অবিশ্বাস' বইটি পড়ে একটি চমৎকার ও যুঁথসই জবাব দিয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও লেখক ওবায়দুল হক সরকার। তিনি লিখেছেন ঃ

এই 'ইসলাম অন্ধ' কবি এসেছিলেন বলেই অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ আজ বুদ্ধিজীবী হতে পেরেছেন নয়তো কৃষিজীবী হয়ে আজও কোন অখ্যাত, অজ্ঞাত গ্রামের খেতে-খামারে পড়ে থাকতেন। ইতিহাস সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকলে জানতে পারতেন অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানরা হিন্দু জমিদারের 'লাইভস্টক' বা 'গৃহপালিত পশু' হয়েছিলো। 'লাঙ্গলে মঙ্গল' বলে মুসলমানের হাতে লাঙ্গল ধরিয়ে দেয়া হলো। মুসলিম জাগরণের কবি নজরুলের ডাকে

৬। হুমায়ুন আজাদ, আমার অবিশ্বাস, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০৩, পৃঃ ৪১।

মুসলমান লাঙ্গল ফেলে কলম ধরার সুযোগ পায়। হিন্দুদের আয়োজিত 'সাংস্কৃতিক অচলায়তনের' দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করে মুসলমানরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ পায়।[৭]

ইতিহাস বলে সারা ভারতে যখন হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই আন্দোলন চলছিল, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে তখন বলা হচ্ছিল হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। আর বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাসকেও ঐভাবে সম্মান করা হচ্ছিল। যেহেতু আমাদের এক সঙ্গে বাস করতে হবে তাই নজরুল তাঁর রচনায় হিন্দুদের ইতিহাস, সংস্কৃতিও তুলে ধরেছিলো। মা কালী, লক্ষ্মী এদেরকে নিয়ে কীর্তন ও শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন। এর বিরুদ্ধে যখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনা হয় তখন নজরুল নিজেই স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন- 'আমি হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় এনে হ্যান্ডসেক করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি মাত্র।'

এছাড়া তিনি যা বলেছিলেন ঃ "আমি মুসলমান; কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল জাতির।" সকল জাতির, সকল দেশের কবিতা লিখেও শুধুমাত্র মুসলমান হবার এবং ইসলামী কবিতা-গান লিখার অপরাধে কবি নজরুল তাঁর স্বজাতি কর্তৃক একজন ইসলাম অন্ধ হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত মাঝারি লেখক হিসাবে অভিহিত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন ডক্টরধারী এই হুমায়ূন আজাদ। অথচ এই উদারচেতা অসাম্প্রদায়িক কবি নজরুল সম্পর্কে মনীষী বিপিনচন্দ্র দৈনিক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (১৮ জুন, ১৯২৯) একটি নিবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্য অপেক্ষা নজরুল সাহিত্য জাতীয় জীবনের পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয় বলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। সেই অনুপাতে রবীন্দ্রনাথের জন্য তিনি ব্যয় করেছেন সংবাদপত্রের কলামের হিসাবে সাড়ে তেরো পঙক্তি আর অষ্টম পৃষ্ঠায়, তৃতীয় কলামে পৃথক উপশিরোনামে 'নজরুল ইসলাম'-এর ওপর তাঁর লেখা ৪৮ পঙক্তি। 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে লেখার পর 'নজরুল ইসলাম' সম্পর্কে আলাদা উপশিরোনামে তিনি লিখেছেন ঃ

"তারপর সর্বকনিষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম। বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার দুই একটা অত্যন্ত খেপাটে গান শুনিয়া আমার বিরূপ ভাব জন্মিয়াছিল। তাঁহার কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম- এত কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতালা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা হইতে নামেন নাই। কর্দ্দমময় পিছিল পথের উপর পা পড়িলে কেবল তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেন, নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছিলেন জানিনা, কিন্তু তাহার কবিতায় প্রাণের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিস বেশী নাই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান। ওয়েল হুইটমেনের কবিতা আপনারা পড়িয়াছেন কিনা জানিনা। তাঁহার ভিতর কেমন একটা মানব প্রীতি, মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসা, মানুষের ছায়াকে, মানুষের গন্ধকে ভালবাসার ভাব আছে- তিনি বলিয়াছেন- আমি যদি দেখি কোন মানুষের পিঠ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে- আমার নিজের পিঠে হাত দিই- মনে করি আমার নিজের পিঠ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই যে মানুষের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দেওয়া ডুবাইয়া- মানুষকে একাত্মসাধন এ অতি অল্প লোকেই করিয়াছে- কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে সেইরূপ মনুষ্যাত্মক বুদ্ধি দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি। দোহাই, আপনারা তাঁহাকে নষ্ট করিবেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন ওঠেন, তখন অক্ষয় কুমার সরকার বলিয়াছিলেন- ভাই, হাততালি দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে যেমন নষ্ট করিয়াছেন, দোহাই তোমাদের সেইভাবে এই নবোদিত তরুণ কবিতে নষ্ট করিও না।' আমিও বলি- হাত তালি দিয়া নজরুলকে নষ্ট করিবেন না- তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিন। যে সাধনায় তিনি অগ্রসর হইয়াছেন সেই সাধনায় তাঁহাকে সিদ্ধিলাভ করিতে দিন। সম-বয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা সহায়তা করুন; কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করুন।"[৮]

ইংরেজ পদলেহী হিন্দু লেখক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে নজরুল সাহিত্যের সঠিক ও বলিষ্ঠ মূল্যায়ন না হলেও হিন্দু বামপন্থী ও উদারপন্থী হিন্দু লেখক, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক নেতা

৭। ওবায়দুল হক সরকার, দৈনিক সংগ্রাম, ৫/৪/৯৭।
৮। দ্রঃ শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৬।

কর্তৃক নজরুল সাহিত্য উচ্চ প্রশংসিত ও সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে যা মুসলমান লেখক-সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক নেতা কর্তৃকও হয়নি।

কবি নজরুল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনে তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ঠিক এর পাশাপাশি বাংলাভাষী মুসলমান এর পুনর্জাগরণে কবি নজরুল তাঁর ইসলামী গানে ও কবিতার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাই মরহুম আবুল মনসুর যথার্থই বলেছেন ঃ "এটা অবধারিত সত্য যে, কবি নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ না করলে অন্তত বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ তার আজিকার জয়যাত্রার অগ্রগতি থেকে সম্ভবত এক শতাব্দী পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হতো। নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবর' এক তকবীরের হায়দরী হাঁক মেরে ঝড়ের বেড়ে এসে বাংলা সাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম বাংলা ভাংগা কিল্লায় নিশান উড়িয়েছিলেন। একদিন দূর করে দিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা। মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনে এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবের একমাত্র ইমাম নজরুল।"

এই বিপ্লবের ইমাম হতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে কবি নজরুলকে হতে হয়েছিলো চক্ষুশূল। কংগ্রেসে যোগদান না করার অপরাধে তীব্র শব্দবাণে জর্জরিত হতে হয়েছিলো হিন্দুদের কাছে, আর মুসলিম লীগে যোগদান না করার অপরাধে তা হতে হয়েছিলো মুসলমানদের কাছে। ইসলামী গান-কবিতা লিখার অপরাধে কটাক্ষ-উপহাস বিদ্রুপের যেমনি পাত্র হতে হয়েছিলো বর্ণবাদী হিন্দুদের কাছে; ঠিক তেমনি কালি-কৃষ্ণ-বিষ্ণুকে নিয়ে কবিতা-গান লিখার অপরাধে তীক্ষ্ণ, তীব্র ও নগ্ন সমালোচনা, অপপ্রচার-অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বৃটিশের চক্রান্তমূলক শিক্ষানীতিতে সৃষ্ট কিছু কাঠমোল্লাদের দ্বারা। কবি দীপ্ত কণ্ঠে- "আমি মুসলমান; কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল জাতির" ঘোষণা করেও জীবদ্দশায় তো বটেই; মরেও রেহাই পায়নি। তবে পার্থক্য এই যে, বিভাগ পূর্ব ভারতে ইসলামী কবিতা-গান লিখার কারণে নজরুলকে সমালোচনা করেছে বর্ণবাদী হিন্দুরা; এখন সেই সব কবিতা গান লিখার জন্য সমালোচনা করছে মুসলিম নামধারী ডঃ হুমায়ূন আজাদরা। হায়রে নজরুল!

তবে জীবদ্দশায় এই সমালোচনাকারীদের কড়া জবাব দিয়েছিলেন কবি নজরুল তাঁর একটি লেখায়। 'আমার লীগ-কংগ্রেস' শিরোনামে একটি নিবন্ধে এই সব সমালোচনাকারীদের দু'গালে কষে চপেটাঘাত করে তিনি লিখেছিলেন ঃ

আমার স্বধর্মী কোনো কোনো ভাই বা তাঁদের কাগজ প্রচার করছেন- আমি নাকি মুসলিম-লীগ-বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ নিত্য-পূর্ণ পরম অভেদ, নিত্য-পরম-প্রেমময়, নিত্য-সর্বদ্বন্দ্বাতীত। কোনো ধর্ম্ম, কোনো জাতি, বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্ম্মে নাই, কর্ম্মে নাই, মর্ম্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত ধারণা বা বিদ্বেষবশতঃ আমার নামে এই নিন্দাবাদ করছেন- তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি 'নবযুগে' যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে, 'নবযুগ' আনার জন্য। এ আমার অহংকার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলংকিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে- আল্লার বান্দারূপেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। 'ইসলাম' ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে- কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উদগীত হয়েছে। .... এক আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব-ধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো 'কুফর' বা 'গুনাহ' করে থাকি তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লাহর কাছ থেকে নেবো, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ লা-শরীক, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে 'দ্বিতীয়' আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারুর নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত। আল-কোরআন আমার পথ-প্রদর্শক।

এছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই, শাফায়ত-দাতা নাই, মুর্শীদ নাই। আমার আল্লাহ 'আল-ফাদুলিল আজিম'- পরমাদাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোনো দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে-হাত কলংকিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, আশ্রয়-ভিক্ষুকে হাত ধ'রে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমা-সুন্দর আল্লার পূর্ণক্ষমা পেয়েছি, সত্যপথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি- আমি উপলক্ষ মাত্র। বাণীর বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আমার কবিতা যারা পড়েছেন, তাঁরাই সাক্ষী; আমি মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, তাদের জড়ত্ব, আলস্য কর্ম-বিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাঙলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য- যে শির এক আল্লাহ ছাড়া কোনো সম্রাটের কাছেও নত হয়নি- আল্লাহ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন- তাই দিয়ে বলেছি, লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্যশক্তিকে তথাকথিত 'খর্ব্ব' করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ঈমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে, জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজোও আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবর্দ্দাররূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারণ করেছি- আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থ যাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি; আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লীগ-কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? আজোও 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সংঘবদ্ধ করতে - তাদের প্রবল করে তুলতে- তাদের 'মাটরিয়ার'-শহীদী সেনা করতে। বাঙলার মুসলমান বাঙলার অর্দ্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাঙলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাঙলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। 'নবযুগে' এসেও সেই কথাই বলেছি ও লিখেছি। এই 'নবযুগ' আসার আগে বাঙলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে 'ন্যাতা-টানাটানি'র ব্যাপার চলেছিল- সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনী ও তলোয়ার নিয়ে আমার অনুগত নির্ভীক দুর্জ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌজোয়ান'দের নিয়ে- ভাই-এ ভাই-এ মিলনের পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ্ জানেন, আর জানেন যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা। আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। 'লীগ' কেন, 'কংগ্রেস'কেও আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি। আমার 'ধূমকেতু' পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনদিন কিছু লিখিনি। কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে-কোনো আন্দোলনের হউক, নেতারা যদি পূর্ণ নির্লোভ, নিরহংকার ও নির্ভয় না হন, সে আন্দোলনকে একদিন না এক দিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেরূপ 'গদাই-লস্করী' চালে চলছিল, তাতে আমি আমার অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি। হঠাৎ লীগ নেতা কায়েদে আজম যে দিন পাকিস্তানের কথা তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন 'আমরা ব্রিটিশ ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব' সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলছিলাম হাঁ, এতদিনে একজন 'সিপাহসালার'- সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠল।

আমি 'লীগ', 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না। মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্ব্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্য দেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি কিন্তু করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল-কয়েদীদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রাম-ছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার-খাসী; কারুর গলার বাঁধন টুট্‌ল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হ'ল না, অথচ তারা ঠুকে এ ওকে ঢুঁস মারে! দেখে হাসি পায়।

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয়; যে সব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দর, নির্যাতনে বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি- 'ভাইসরয়'। মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রিলোকের বাদশাহী পেতে পারে- এ আল্লারই নির্দ্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লার সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব্ব নির্য্যাতন সর্ব্ব অশান্তি থেকে মুক্ত করতেই মানুষের জন্ম! আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্ম্মল করব এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সর্ব সৃষ্টি- এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী- এ আমার বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতই অটল। "ফিরদৌসআলা"- পূর্ণ আনন্দধাম- থেকে আমরা এসেছি, পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব- এই আমাদের তপস্য। এই পৃথিবীর রাজ রাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ্। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবী করে, তারা শয়তান। যে ভীরু, সে মুসলমান নয়! সেই শয়তানদের সংহার ক'রে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে-মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে সৈনিক হতে পারে না, সে মুসলমান নয়! এই ভীরুতা, এই তামাসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ ছাড়া আমার অন্য লীগ-কংগ্রেস নাই!

সুতরাং কবি নজরুলের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমেই ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের গোলামীর জিনজিরে আবদ্ধ অচেতন বাঙ্গালী মুসলমান পেয়েছিল মুক্তির মন্ত্র। ঘুমন্ত বাঙ্গালী মুসলমানকে জাগিয়েছিল ইসলামী গানে ও কবিতায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলমানের সামনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আশার আলো। সেই আলোর রশ্মি পথহারা মুসলমানকে দেখিয়েছিলেন সঠিক পথের সন্ধান। জাতীয় জীবনে এসেছিল বিপ্লব। সেই বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় এ দেশের মানুষ বিপ্লবের মাধ্যমে বহু রক্তের বিনিময়ে দু'দু'বার আজাদীর পতাকা বদলিয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়েছে। পরান্নভোজী বুদ্ধিজীবী এবং অবিবেচক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ না পেলেও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পেয়েছে এ দেশের জনগণ। এই আজাদী লড়াইয়ে কবি নজরুলের ইসলামী গান ও কবিতার অবদান ছিল অপরিহার্য। এখনকার কতিপয় বুদ্ধিজীবী স্বীকার করুক বা না করুক অনেক প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী অকপটে স্বীকার করেন। নজরুলের ইসলামী গানে ও কবিতায় এ দেশের জনগণের মধ্যে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করেছিলো। সেই সচেতনতাবোধেই মুক্তির স্পৃহায় এ দেশের জনগণ আজাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৪৭ সালের আজাদী লড়াই এদেশের বাঙ্গালী মুসলমানের অবদান ছিল শতকরা ৯৫ জনের। তখন যদি এই সচেতনতাবোধ সৃষ্টি না হতো তাহলে পশ্চিম বাংলার ন্যায় আমাদেরকেও দিল্লীর কবলে পড়ে গোলামীর জিনজিরে আবদ্ধ হয়ে আজও পরগাছা জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হতো। আজকে যারা ডক্টরেট ডিগ্রীধারী হয়ে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন তা কবি নজরুলের ইসলামী গান ও কবিতার ফসল।

কবি নজরুল ১৯২৮ সালের ১৮ মার্চ অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "দশ তারিখের লেখা চিঠিটা পোস্ট করিনি, রোজই মনে করেছি- হয়ত তোমার চিঠি চলে আসবে আজ। তার পরেই এটা দেবো। ... দৈনিক 'বসুমতি'তে দিনকতক আগে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যে, কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক মৃত্যু শয্যায় শায়িত কোনো সুস্থকার যুবকের কিছু রক্ত পেলে তিনি বাঁচতে পারেন। তিনি কলকাতাতেই থাকেন। আমি রাজি হ'য়েছি রক্ত দিতে। আজ ডাক্তার পরীক্ষা করবে আমায়। .... এখুনি বেরুব ডাক্তারের কাছে।"

পরবর্তীতে ৩১ মার্চ রক্ত না দিতে পারার তিক্ত অভিজ্ঞতার ঘটনা কাজী মোতাহার হোসেনকে পুনরায় চিঠি লিখে জানান-

"১৮ মার্চ ১৯২৮ তারিখে শনিবার রক্ত দিতে কবি ডাক্তারের কাছে গেলে, 'হার্ট দুর্বল' এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাঁর রক্ত নেয়া হয়নি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রোগী 'মুসলমানের' রক্ত নিতে রাজি হয়নি। দুঃখ করে নজরুল উক্তি করেছিলেন, হায়রে মানুষ, হায় তা'র ধর্ম! কিন্তু কোনো হিন্দু যুবক আজও রক্ত দিলে না। লোকটা মরছে- তবুও নেবে না নেড়ে'র রক্ত।"[৯]

আর কবি নজরুল সারা জীবন হিন্দু মুসলমানের একই প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে ইসলামী সঙ্গীতের পাশাপাশি দেব-দেবীদের নিয়ে বহু কীর্তন শ্যামা লিখেও এদেশের কতিপয় মুসলমানধারী অধ্যাপকদের অপবাদ থেকে রেহাই পায়নি। নিজের রক্ত দিয়ে একজন ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে সেই মৃত্যুপথযাত্রী ব্রাহ্মণ মৃত্যুকে বরণ করেছে কিন্তু এই ন্যাড়ে নজরুলের রক্ত গ্রহণ করেননি। এরপরও কবি নজরল 'ইসলামী অন্ধ'। এ দেশে সাপ, ব্যাঙ, লিঙ্গ, কীটপতঙ্গ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর পূজা করলে বা দেব-দেবীকে নিয়ে কবিতা-গান লিখলে ধর্মান্ধ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় না। মানবতার ধর্ম ইসলামের কথা কেউ লিখলেই সে হয়ে যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা ধর্মান্ধ। হায়রে অধ্যাপক!

প্রায় একশ' নব্বই বছর ইঙ্গ-ব্রাহ্মণদের গোলামী করেও আমাদের গোলামীর মানসিকতা এখনো দূর হয়নি। এই গোলামীর মানসিকতা মিশে আছে অস্থি, মজ্জায় ও রক্তে। প্রবাহিত হচ্ছে শিরায় শিরায়। তাইতো অনেক সময় মহাপন্ডিতের অধিকারী হয়েও অনেকের মাঝে গোলামীর রক্ত টগবগিয়ে উঠে। গোলামীর রক্ত যখন টগবগিয়ে উঠে তখন অনেকে বোধ হয় স্থির থাকতে পারেন না। মৃগী রোগীর ন্যায় প্রলাপ বকতে থাকেন। এই অর্থহীন প্রলাপ থেকে কবি নজরুলও বাদ যায়নি।

আমাদের দেশে একটা প্রবচন রয়েছে 'দারোগার চেয়ে মাঝির দাপট'। গত ২৬ বছর যাবত আমাদের রাষ্ট্র প্রধানেরা কবি নজরুলের প্রতি যে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন এবং এর বিপরীতে এ দেশের কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা নজরুলের প্রতি যে অবজ্ঞা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন তা দেখে বার বার এই প্রবচনটি মনে পরে।

কবি নজরুল প্রায় তেরো বার ঢাকায় সফর করেন। মতান্তরে আরো বেশী। তাঁদের মতে, কবি নজরুল বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বার বার ঢাকায় সফর করেছেন। সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশবার কবি নজরুল আসেন ১৯৭২ সালে ২৪ মে, ১৩৭৯ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ। কবির জন্মদিনের একদিন আগে লেখনীশক্তিহারা নির্বাক কবি ঢাকায় আসেন। সাথে ছিলো ভৃত্য কিশোর সাহু, পুত্রবধূ উমা কাজী এবং কবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এই সম্পর্কে "নজরুল চর্চা ও আমাদের নেতৃবৃন্দ" শিরোনামে শেখ দরবার আলম দৈনিক ইনকিলাবে লিখেছেন ঃ

১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট যখন নজরুলের জীবনাবসান হলো এর কিছুদনি পর কলিকাতার পার্ক সার্কাসে চিত্রশিল্পী খালেদ চৌধুরী তাঁর বাসায় একদিন আমাকে বলেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী মুজিবুর রহমানের কাছে নজরুলকে ভেট হিসাবে দিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সাহেবের কাছে শুনেছি, '৭২-এর ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাবে শেখ মুজিব যখন কলিকাতায় জনসভায় ভাষণ দিতে যান তখন তিনি এবং তৎকালীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা এবং কলাকুশলীদের কয়েকজন নজরুলের ওপর একটা ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি করেন। পরে এটি বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে টেলিকাস্ট করা হয়।

শেখ সাহেব সেটা দেখে দ্বিতীয়বার সম্প্রচারের নির্দেশ দেন। সেই ডকুমেন্টারী ফিল্মে নজরুল তখন কলিকাতার সিআই বিল্ডিং-এ একটা অপ্রশস্ত ঘরে কিভাবে ছিলেন সে চিত্রটি ছিল। এটা দেখার পরই শেখ সাহেব কলিকাতা থেকে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসার একটা সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ নেন এবং এই উদ্যোগটি শেখ সাহেব নেওয়ার কারণেই সফল হয়।

১৯৭২-এ কবির জন্ম দিবসের আগের দিন কবিকে তাঁর দুই পুত্র, তৃতীয় সন্তান কাজী সব্যসাচী ইসলাম, চতুর্থ সন্তান কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম এবং তাঁদের পত্নী যথাক্রমে উমা কাজী ও কল্যাণী কাজী এবং তাঁদের সন্তান-সন্তুতিদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন

৯। তথ্য সূত্রঃ শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃঃ ৪১৭।

সরকার ঢাকায় এনেছিলেন।

নজরুল ইন্সটিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর কাছে শুনেছি, ভারত সরকার এই সঙ্গে কবির বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য ইন্টেলিজেন্সের একজন লোককেও পাঠিয়েছিলেন। সে সময় কবির সঙ্গে তোলা অনেক ছবিতেও তাঁকে দেখা যায়। এ থেকে আবার এই ধারণাটা হওয়াই স্বাভাবিক যে, ভারত সরকার কবিকে একেবারে দিয়ে দেননি।

নজরুলের ঢাকায় আনার ব্যাপারে মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের নিজস্ব আবেগ অনুভূতিই কাজ করেছিল বলে আমার বিশ্বাস। কেননা, নজরুল যখন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সিংহভাগ এবং রাজনীতির অনেকটাই শাসন করছিলেন, তখন তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তখনকার দিনের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান থাকতেন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহচ্ছায়ায় কলকাতার তালতলা এলাকায় অন্যতম মুসলিম ছাত্রাবাস কারমাইকেল হোস্টেলে।

তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে, যারা কোন দিনই শেখ মুজিবুর রহমানকে পছন্দ করতে পারেননি বলে মনে হয়েছে তারাও তাঁর এই কাজটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করা হয়। নজরুল চর্চায় উৎসাহী সাংবাদিক হেদায়েত হোসেইন মুর্শেদের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ দরবার আলম লিখেছেন- বিশেষত তারই (হেদায়েত হোসেইন) সুপারিশক্রমে প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে কবি সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহকে বসিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি জিয়াউর রহমান শুরু করতে চেয়েছিলেন। নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলো হোক, এ বিষয়ে জিয়াউর রহমান সাহেব যে উৎসাহী ছিলেন সেটা উল্লেখ করতে গিয়ে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খালিদ হোসেন এক সাক্ষাতকারে কিছু স্মৃতিকথা বলেছিলেন আমাকে। খালিদ হোসেন বলেছেন, নজরুল সঙ্গীত চর্চার প্রসার কিভাবে ঘটানো যায় সে বিষয়ে জিয়াউর রহমান তাকে একটা প্রকল্প পেশ করতে বলেছিলেন বঙ্গভবনের এক অনুষ্ঠানে। এ প্রকল্প খালিদ হোসেন প্রণয়ন করেননি। প্রকল্প প্রণয়ন করার ব্যাপারে কারো সহায়তাও সম্ভবত তিনি চাননি।

পরে বঙ্গ ভবনের আর এক অনুষ্ঠানে জিয়াউর রহমান সাহেবের সঙ্গে তার যখন দেখা হলো তখন জিয়াউর রহমান সাহেব তাকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'প্রকল্প কোথায়?' সে প্রকল্প খালিদ হোসেন সাহেব দিতে পারেননি। কাউকে তা দিতেও বলতে পারেননি।

আমাদের দেশে একটা সমস্যা এই যে, শাসন ক্ষমতায় আসীন উদ্যোগী ব্যক্তিটির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ কাজের লোকটির যোগাযোগ প্রায়শই ঘটে না। কারণ, আসল কাজের প্রতি যার নিষ্ঠা এবং ভক্তি থাকে, তাঁরা থাকেন কেবল তাঁদের কাজ নিয়েই। আর সরকারের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিটির সঙ্গে এই নিষ্ঠাবান কাজের লোকদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার মতো কোনো সচেতন কর্মী বাহিনীও সরকারের থাকে না। ফলে জাতীয় পর্যায়ের অনেক প্রয়োজনীয় কাজও হয় না। একজন রাষ্ট্র প্রধানের একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও একজন নজরুল শিল্পীর আন্তরিকতার অভাবে সেদিন প্রকল্প দেননি। কাউকে তা দিতেও বলতে পারেননি।

পরবর্তীতে এরশাদ সাহেবের আমলে জিয়ার স্বপ্ন নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ দরবার আলম লিখেছেন- নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারী প্রতিষ্ঠান নজরুল ইন্সটিটিউট এখন থেকে একযুগ আগে প্রতিষ্ঠিত হয় হুসেন মুহম্মদ এরশাদের আমলে। নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনেছি এরশাদ সাহেব নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন ধানমন্ডির ওই ক্ষুদ্র পরিসরে নয়, শেরে বাংলানগর এলাকায় অনেকটা জায়গা দিয়ে। কিন্তু যাকে বসিয়ে এই কাজটি তিনি শুরু করতে চেয়েছিলেন সেই তিনিই নাকি অতটা চাননি।

নজরুল ইন্সটিটিউটের কাজকর্ম শুরু হয় কবি ভবনে অর্থাৎ ধানমন্ডির যে বাড়িতে কবিকে রাখা হয় ঠিক সেখানে। পাকিস্তান আমলের অবাঙালী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ি সেটি।

এরশাদ সাহেব মাঝে মাঝেই নজরুল ইন্সটিটিউট পরিদর্শনে যেতেন। লোনা ধরা দেওয়াল, স্বল্প পরিসর জায়গা, এসব দেখেই তিনি নতুন বাড়ি নির্মাণের কথা কেবল চিন্তাই করেননি, নিজেই উদ্যোগ নিয়ে সেটা কার্যকরও করেছিলেন এবং কাজটি যাতে লাল ফিতার বাঁধনে আটকে না পড়ে সে বিষয়েও তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে সেটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকর করেছিলেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজটা তিনি করেছিলেন কেবল নিজের হাত দিয়ে নয়, একই সঙ্গে কবি পৌত্রী খিলখিল কাজীর হাত দিয়েও।

এ বিষয়ে জাতীয় যাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ডক্টর এনামুল হক বলেছেনঃ জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরুল জয়ন্তী পালনের বিষয়ে এরশাদ সাহেব একটা মিটিং ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ইচ্ছার কথাটা যখন ব্যক্ত করেন তখন ডক্টর এনামুল হক সাহেবই তাকে বলেছিলেন যে, এভাবে জাতীয় পর্যায়ে কেবল নজরুল জয়ন্তী পালন করা হলে কোনো কোনো মহল থেকে একটা বিরূপ সমালোচনা উঠতে পারে। অতএব, একই সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীও পালন করা হোক।

এরপর ব্যাপারটা এরশাদ সাহেবের পক্ষে নীরবে অনুমোদন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকলো না। এমনটাই মনে হতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নজরুল অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি বা নজরুল চেয়ারের প্রবর্তন এরশাদ সাহেবের উদ্যোগেই হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই উৎসাহ ও আন্তরিক উদ্যোগকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তেমন কাজে লাগায়নি।

নজরুল বিষয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের একটা আন্তরিকতার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন নজরুল অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনেছিলাম। নজরুল বিষয়ক পঠন-পাঠন এবং গঠনমূলক কাজকর্মের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এরশাদ সাহেব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল অধ্যাপকের একটা মিটিং ডেকেছিলেন। আলোচনার সময়সীমা তিনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরশাদ সাহেব যখন জানলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল অধ্যাপকদের মধ্যে নজরুল বিষয়ে ডক্টোরাল থিসিস করেছেন একমাত্র ডক্টর রফিকুল ইসলাম তখন নির্ধারিত সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে চল্লিশ মিনিটই তিনি ব্যয় করেছিলেন ডক্টর ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করে। ডক্টর ইসলাম কি তাঁর কাছে নজরুল বিষয়ক জরুরি ও অপরিহার্য কাজকর্মগুলোর কথা তুলে ধরেছিলেন?

কবি পরিবারকে ঢাকার বনানীতে বসবাসের জন্য একটা বাড়ির বন্দোবস্তও করে দিয়েছিলেন এরশাদ সাহেব। মাসিক কয়েক হাজার টাকা ভাতার বন্দোবস্তও করে দিয়েছিলেন তিনি। কবির পৌত্রী মিষ্টি কাজী যাতে তার স্বামীকে নিয়ে ঢাকায় থাকতে পারেন সে জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা পারমিটও তিনি করে দিয়েছিলেন।

ঢাকার সিএমএইচ-এ রেখে কবির পুত্রবধূ উমা কাজীর চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা যখন করেন তখন নিজেরা যেভাবে ব্যাপারটা তারা দেখেছিলেন তাতে সেখানকার অনেকেই সে সময় উমা কাজীকে প্রশ্ন করেন, 'ফার্স্ট লেডী রওশন এরশাদ কি আপনার বোন? রওশন এরশাদ তাকে দেখতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েছেন তার কাছে। ইতোপূর্বে হঠাৎ এই পরিবারের যখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার পানি-বিদ্যুতের বিল পৌঁছল তখন তারা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের দোরে দোরে ধরনা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন ফার্স্ট লেডী রওশন এরশাদ তাদেরকে কাগজপত্র নিয়ে যেতে বলেন। এরপর কবি পরিবারের প্রয়োজনটা তারা মিটিয়ে দেন এবং বলেন, যে কোনো প্রয়োজনে কবি পরিবারের লোকেরা যেন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং তাঁর পত্নী ফার্স্ট লেডী রওশন এরশাদ প্রায়ই নিজে ফোন করে কবি পরিবারের খোঁজ-খবর নিতেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকবারই কবির মাজারে গেছেন।[১০]

শেখ দরবার আলম বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে যে সব কথা বলেছেন জানি না তা কতটুকু তথ্যবহুল। কারণ এরশাদের সময়ে জাতীয় পর্যায়ে যেভাবে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী

১০। তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৩/৫/৯৭।

পালন করেছেন তা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে ঐ সব তথ্য যে অতিরঞ্জিত তা বলাই বাহুল্য। সস্তা জনপ্রিয়তা বা জনগণের মাঝে চমক লাগানোর জন্য নজরুলের জন্য কিছু ভালো কাজ যে করেননি তা অস্বীকার আমি করছি না। কিন্তু একজন জাতীয় কবি হিসাবে দেশে-বিদেশে নজরুলকে যেভাবে তুলে ধরার কথা ছিলো এর কিছুই হয়নি। তবুও আমি বলবো আমাদের বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় কবি নজরুলের প্রতি সরকার প্রধানদের গভীর ভালোবাসা, পরম শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও উৎসাহের কোন অভাব ছিলো না উল্লিখিত ঘটনাগুলোই তা স্পষ্ট। অথচ কবির প্রতি এরূপ আচরণ কবি-সাহিত্যিকদের কাছে ছিল প্রত্যাশিত। কারণ কবি-সাহিত্যিকেরা নজরুলকে যেভাবে উপলব্ধি বা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন সরকার প্রধানদের কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য রহস্যজনক কারণে নজরুলের ব্যাপারে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত।

এ দেশের সরকার প্রধানেরা কবি নজরুলকে জাতীয় কবির যথার্থ মর্যাদা দিতে কোন কার্পণ্য না করলেও কতিপয় ভারত ভজন বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সে আসনটি দেয়নি। নজরুলকে এঁরা শুধু জাতীয় কবি বলে মুখে উচ্চারণ করলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এর কোন প্রতিফলন নেই। স্কুল পর্যায়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই জানে না আমাদের জাতীয় কবি কে? এ ছাড়া জাতীয় কবিকে সর্বক্ষেত্রে হেয় করাই যেন নজরুল বিদ্বেষীদের জাতীয় কর্তব্য। কয়েক বছর আগে টিভিতে প্রচারিত একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মান শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাতের জন্য বরাদ্দ ১৬০ নম্বর, পক্ষান্তরে জাতীয় কবির জন্য বরাদ্দ মাত্র ২৬টি নম্বর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য ১০০ নম্বর; আর জাতীয় কবির জন্য মাত্র ৪০ নম্বর। বাংলা পাঠ্যসূচীতে নজরুলকে বাদ দিয়েও অনার্স ও এম, এ ডিগ্রী নেয়া যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই নয়; প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকেও কবি নজরুল অবহেলিত ও উপেক্ষিত। আমরা জানি এবং ছোটকালেও আমরা পড়েছি কবি নজরুলের ছোটদের জন্য রয়েছে অসাধারণ কবিতা। ভাষায়, ছন্দে, ভাবে ও প্রকাশে অতুলনীয় এবং শিক্ষণীয় উপাদানে ভরপুর। যেমন ঃ

"পার হয়ে কত নদী কত যে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু জাদুকর

★ ★ ★

কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি,
সোনার জিয়ন-কাঠি, মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হোল কি জানিস্ গুন।"

★ ★ ★

"ভোর হোলো, দোর খোলো খুকুমনি ওঠ রে!
ঐ ডাকে, জুঁই-শাখে ফুল-খুকী ছোটে রে!
খুলি হাল, তুলি পাল ঐ তরী চল্‌লো
এইবার এইবার খুকু চোখ খুল্‌লো।"

★ ★ ★

"আমি হব সকাল বেলার পাখী
সবার আগে কুসুম বাগে
উঠবো আমি ডাকি।"

★ ★ ★

"আমি সাগর পাড়ি দেব

আমি সওদাগর
সাত সাগরে ভাসবে আমার
সপ্ত মধুকর।"

★ ★ ★

"থাকব না'ক বন্ধ ঘরে দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে
ছুট্‌ছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।"

★ ★ ★

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।"

★ ★ ★

"ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো
ঘুম আয় রে, আয় ঘুম।
ঘুম আয় রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা!
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।

★ ★ ★

"আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠ্‌লে মাগো, রাত পোহাবে তবে।"

শিশুদের এই ধরণের কালজয়ী অন্যন কবিতা কাজী নজরুলের অসংখ্য রয়েছে। অথচ ২/১টা হেলাফেলাভাবে পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেলেও রবীন্দ্রভক্ত শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের বদৌলতে পাঠ্যপুস্তক হতে কবি নজরুলের এইসব শিক্ষণীয় কবিতা উধাও। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ঃ ৫ম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য ''আমার বই''-এর ১২ পৃষ্ঠায় স্থান দেয়া হয়েছে অন্নদা শঙ্করের ''শিশুর প্রার্থনা" কবিতাটি। সূরা আল-ফাতিহা'কে নিয়ে কবি নজরুল ও গোলাম মোস্তফার রয়েছে অসাধারণ কাব্যানুবাদ। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শতকরা নব্বই ভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী এই কাব্যানুবাদকে বাদ দিয়ে শতকরা দশ ভাগ মানুষের স্বার্থে জুড়ে দেয়া হয়েছে ধার করে আনা ভারতের অন্নদা শঙ্কর রায়ের 'সংকল্প' কবিতাটি। আর উল্লেখিত বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠায় জাতীয় কবি নজরুলের 'সংকল্প' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে এবং কবি দ্বাদস ক্রমিকে স্থান পেয়েছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইয়ে ৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে কবি নজরুলের 'ঝিঙেফুল' কবিতাটি। এর আগে আহসান হাবীব, সুফিয়া কামাল ও সত্যেন্দ্রনাথ সহ অনেকের কবিতা ছাপা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে জাতীয় কবি নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটি স্থান পেয়েছে ৮৩ পৃষ্ঠায়। এর আগে স্থান পেয়েছে অতুল প্রসাদ, শামসুর রহমান, সুকুমার রায়, কুসুম কুমারী, বন্দে আলী মিয়া, ফররুখ আহমদ।

কবি নজরুলের নাটকের ক্ষেত্রেও বিটিভি ও পোষ্য দালালদের অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক টিভিতে প্রচারিত হলে নামী-দামী শিল্পীদের জড়ো করা হয়। সেট থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে থাকে তাঁদের নিখুঁত, নির্ভুল সুনিপুণ শিল্পকর্মের ছোঁয়া। আর

নজরুলের নাটক হলে সেখানে থাকে চরম অবহেলা। বড়ো মাপের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তো দেখাই যায় না। সেখানে সেট থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে থাকে অবহেলা ও অবজ্ঞার ছোঁয়া। এমনকি নজরুলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নাটকে রবীন্দ্রসঙ্গীত জুড়ে দেয়ার স্পর্ধা ও কুৎসিত দৃষ্টান্তও জাতি দেখেছে। বিটিভি কর্তৃক নজরুল সঙ্গীতের প্রতি কিরূপ অবহেলা ও উপেক্ষা করা হচ্ছে এই বইয়ের অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এঁরা পাদ্রীর চেয়ে বড়ো খ্রীষ্টান। আর আমাদের দেশের প্রবচনে বলতে হয়- "দারোগার চেয়ে মাঝির দাপট।" এসব সেবাদাস বুদ্ধিজীবীরা প্রভুর অঙ্গুলি হেলনে উঠে আর বসে।

"কবি নজরুল যে কি" এটা আমাদের শাসকগোষ্ঠী ভালোভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও বাম-রাম বুদ্ধিজীবীদের প্রভুরা ভালো করেই জানে। কারণ আমরা মুসলমানধারীরা দুধ বেচে তামাক খাই; আর আন্তর্জাতিক মুরুব্বীরা তামাক বেচে দুধ খায়। কাজেই নজরুলের ভাষা আমরা না বুঝলেও তাঁরা ঠিকই বুঝেছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে শিখণ্ডী করে নজরুলের বিরুদ্ধে অঘোষিত ক্রুসেড বাংলাদেশে। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদকে '৭১কে উপলক্ষ্য করে যেভাবে শেষ করে দেয়া হয়েছিলো; সেভাবে কবি নজরুলকে সরাসরি মোকাবেলা করার দুঃসাহস এ দেশীয় দালালদের নেই। '৭৬ সাল পর্যন্ত যদি কবি নজরুল নির্বাক বা বাকরুদ্ধ না হতেন; তিনি কি লিখতেন জানি না; তবে ফররুখ আহমদের চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করতে হতো এটা নিশ্চিত।

সুতরাং আজকে যারা মুখে নজরুল-প্রিয়তা দেখাচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে কবি নজরুল তাদের অন্তরে নেই। তাদের অন্তরে নেই বলেই কাগজ-পত্রে 'জাতীয় কবি' রয়েছে; কিন্তু জাতীয় কবির মর্যাদা ও স্থান নেই। জাতীয় কবি নজরুলের প্রতি রাম ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অবজ্ঞা, উপহাস দেখে এবং তাদের বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য পড়ে কবি আবদুল হাই অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে সাপ্তাহিক বিক্রমে "নজরুল আছে, নজরুল নেই" শিরোনামে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেছেন ঃ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী যতোটুকু পালিত হয়েছে- তাও দায়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে, ক্ষেত্রবিশেষে লোক দেখানোর জন্য। সব মিলিয়ে মনে হয়েছে এই আন্তরিক আকাশে, বাতাসে, মৃত্তিকায়, জনপদে, কোলাহলে, ভিড়ে কাজী নজরুল ইসলাম কোথাও নেই। অথচ ১২ কোটি মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয় নাম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্য বাংলাদেশের মানুষের দরদ এই কারণে নয় যে তিনি মুসলমান। হিন্দু মেয়ে বিয়ে করার জন্যও নয়। তার মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল ছিলো, তিনি হাসতেন ছাদ ফাটিয়ে, পথ চলতেন হৈ হৈ রৈ রৈ করে। তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরোজায় তালা লাগিয়ে দিলে তিনি বস্তা বস্তা কবিতা আর অগণন গান লিখে দিতেন। এসব হয়তো তাঁর ব্যক্তি জীবনের এক একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি হয়েছেন অন্য কারণে। তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান রূপকার। পথ নির্দেশক। জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনকারী। বাংলা সাহিত্যে সেঁত সেঁতে ভিজে উঠানে তিনিই প্রথমবার উদ্বোধন ঘটালেন পৌরুষের। ন্যাকামীর জায়গায় এলো দৃপ্ত ও দৃঢ় উচ্চারণ। নতজানু নীতি বিতাড়িত হলো। এলো অহংকারের জয়জয়কার। মাথা নুইয়ে দেয়ার বদলে জাতিকে বলা হলো মাথা সোজা করে দাঁড়াও। তোষণ, তাঁবেদারি, পদলেহনকারীদের রুখে দেয়া হলো। এলো সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দিন। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে রক্ত ও আগুন মেখে মহিমান্বিত হয়ে উঠলো বাংলাদেশ। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে তিনিই প্রথম ও প্রবলতম কবি আমাদের।

মানুষ যে ধর্মের, যে বর্ণের, যে গোত্রেরই হোক, মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। এই মানুষের জয়গাঁথার নাম কাজী নজরুল ইসলামের রচনাবলী। দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ না জানা এক নতুন চেতনা তিনি। সারা দুনিয়ার সকল শোভিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, নিগৃহিত, ব্যথিত, দুঃখী মানুষের মৌলিক ও প্রধান মুখপাত্র তিনি। বাংলা সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক চেতনার-উদগাতা তিনি। প্রতিপালক তিনি। এবং তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম।

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, প্রত্যাশা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনাচার সবকিছুর প্রতিভূ কাজী নজরুল ইসলাম। মুসলমান জীবনকে বটতলার পুঁথি থেকে উদ্ধার করে পাইয়ে দিয়েছেন আধুনিকতার সাহচর্য। তার হিম রক্তে, হতাশা চেতনায় একই সঙ্গে সংযোগ করেছেন আগুন ও বারুদ। মুক্তপক্ষ বলাকার মতো দেখিয়েছেন ভোরের আকাশ। তাকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য জাগিয়েছেন মানসিক খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষা। তারপর শক্ত পোক্ত পাটাতনের মার দিয়েছেন দাঁড় করিয়ে। কবিতায়, গানে, কথায়, কাহিনীতে বাঙালী মুসলমান সমুদ্র সম্ভোগের সৌরভ পেয়ে সেই প্রথম ধন্য হলো।

বাঙালী হিন্দুকে মানুষ করার জন্যও তাঁর অবদান অনেকখানি। কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবীদের শয়তানীর ফলে হিন্দু রক্তে ও বিষ অনেকদূর মিলে গিয়েছিলো- নজরুলই প্রথম তা থেকে 'রক্ত রক্ষার' ব্রত নিয়ে মাঠে নামলেন। তিনি সম্প্রীতির কথা বললেন, সমঝোতার কথা বললেন। ভ্রাতৃত্বের কথা বললেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে ভালোবাসার কথা বললেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলকে ডেকে বললেন তার সাহিত্যের ছায়ায়। গানে, কবিতায়, লেখায়, রেখায় তাদের হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন হাত। বুকের সঙ্গে বুক।- সেই প্রথম প্রভাত। সেই প্রথম মিলনের মোহনা।

নজরুল কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার। বাংলা ভাষার তিনিই প্রথম কবি যিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। তিনি আমাদের ভাষার প্রথম কবি যিনি অভিনয় করেছেন চলিচ্চত্রে। তিনিই আমাদের ভাষার প্রথম এবং একমাত্র সৈনিক কবি। তিনিই আমাদের ভাষায় প্রথম স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তিনিই আমাদের ভাষার প্রথম কবি যিনি স্বাধীনতার জন্য কবিতা লিখে জেল খেটেছেন। তিনিই আমাদের ইতিহাসের প্রথম সাংবাদিক যিনি সাংবাদিকতার জন্য সহ্য করেছেন জেল-জুলুম। বাংলা ভাষায় 'সাম্যবাদ' শব্দটিরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকা প্রায় জেহাদের সমতুল্য। বাংলাদেশে মানবাধিকার আন্দোলনেরও পথিকৃত নজরুল ইসলাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধেরও অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা নজরুল ইসলাম। অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও যুলুমের বিরুদ্ধে তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন লড়াই করতে। সব মিলিয়ে এক কথায় বলা যায় আমাদের মানসিক পৃথিবীর তিনিই অধিপতি।

সেই নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো দায়সারাভাবে। যেনতেন প্রকারে। না করলেই নয় বলে। সে জন্যই রেডিওতে তিনি প্রায় শূন্য। টিভিতে তিনি নেই। বাহারী পত্র-পত্রিকার পাতাগুলোতে তিনি নেই। মঞ্চে নেই। ময়দানে নেই। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে নেই। প্রেসিডেন্টের ভাষণে নেই। এমন কি কারণে-অকারণে অষ্টপ্রহর ভ্যাজর ভ্যাজর করা যেসব অধ্যাপকদের অভ্যাস তাদের ঠোঁটেও নজরুল নেই।

যেটুকু আছে তাও না থাকলে ভালো হতো। হুমায়ুন আজাদের মতো সস্তা স্ট্যান্ডবাজ, যিনি মানুষের জন্য যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, 'যুদ্ধ' শব্দটিও শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারেন না, তার চোখে নজরুল প্রতিক্রিয়াশীল। মুনতাসীর মামুনের কথা আর কি বলবো। অধ্যাপনা ও গবেষণার মতো সম্মানজনক কাজ বাদ দিয়ে যিনি ইদানীং গায়ের ঝাল মেটানোর জন্য হলুদ সাংবাদিকতাকে জীবনের মোক্ষ মেনেছেন।- সেই লোকের চোখেও নজরুল ভালো কিছু নয়। অবশ্য এসব ব্যক্তিবিশেষকে গাল দিয়েই বা কি হবে। বাংলাদেশে যারা নজরুল চর্চা করেন তারাই বা কি করছেন। সরকারী নজরুল ইন্সটিটিউটে কি নজরুল আছে? উত্তর দিতে অনেকে দ্বিধা করবেন। ওখানে নজরুলের বইপত্র কি আছে? নেই। নজরুলের ওপর লেখা বই আছে। নজরুলের প্রামাণ্য জীবনী কি আছে? নেই। নজরুল একাডেমী তো মৃত্যুশয্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নজরুল অধ্যাপক আছে। কিন্তু নজরুল নেই। বাংলা একাডেমীতে নজরুল ছিলেন আর নেই। বাজারে নজরুলের রচনাবলী নেই। সুলভে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নজরুল রচনাবলী কোথাও নেই। নজরুলের নামে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। নজরুল নেই। নজরুলের নামে অনেকে অনেক পদ-পদবী বাগিয়েছেন। কিন্তু নজরুল নেই। আবার ক্ষেত্রবিশেষে নজরুলের নাম আছে। নাম ভাঙ্গিয়ে কাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু নজরুল নেই। নজরুল চর্চা নেই। সর্বত্র ঢাক ঢাক গুড় গুড় আছে। চাপা আছে। চোয়ালবাজী আছে। কিন্তু নজরুল নেই।

এই না থাকাটা সত্যি দুঃখের। ক্ষোভের বেদনার। কিন্তু ভুললে চলবে না এসব বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। এর সব কিছুর সাথে জড়িয়ে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র।

সেই ষড়যন্ত্রকারীরা জানে, নজরুল ও বাংলাদেশ হলো এক ও অবিভাজ্য সত্তা। এর একটিকে ধ্বংস করতে পারলে অন্যটি আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। সে জন্যই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে এই চরম ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলো আমাদের দেখতে হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে বাহ্যিকভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নজরুলের নিধন যতোই চলুক নজরুল আছে এ দেশের ১২ কোটি মানুষের হৃদয়ে। আত্মার গভীরে। সেখান থেকে তাকে উৎপাটন করা যাবে না। তবে আত্মার অবস্থানটিকে নির্মল ও নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এই ষড়যন্ত্রকারীদের অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। এই মোকাবিলা যতো ত্বরান্বিত হবে ততই মঙ্গল।[১১]

১৯৬১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। কিভাবে তারা রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী তারা পালন করেছেন তা শোনা যাক আরিফুল হকের ভাষায়। তিনি বলেছেন ঃ

বাংলা সাহিত্যের আর একজন মহান কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হতে দেখেছিলাম ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে। সেই উৎসবের আয়োজন করেছিল দশ বছর আগে থেকে। সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী বিক্রি করা হয়েছিল, সারা ভারতে এমনকি মহকুমা শহরেও রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সমন্বিত করে, সারাবছর ধরে জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছিল, রবীন্দ্র জন্মদিনকে ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছিল, আর কত কি করেছিল তারা তাদের জাতীয় কবির জন্ম শতবর্ষে।[১২]

এরপর তিনি লিখেছেন ঃ

আমরা কিভাবে পালন করবো আমাদের জাতীয় কবির পূর্ণ জন্ম শতবার্ষিকী। আমাদের কি জেলা শহরগুলোতে নজরুল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচীতে নজরুল সাহিত্য যে পড়ানো হয় না সেদিকে নজর দেয়ার সময় কি আমাদের হবে? প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সাত খণ্ডের 'রবীন্দ্র জীবনী'র পরও প্রশান্ত পালের 'রবি জীবনী' মৈত্রেয়ীদেবীসহ আরও বহু বিশেষজ্ঞরা যেভাবে রবীন্দ্র জীবনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনভাবে কি নজরুল জীবনী রচিত হবে? নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন নিয়ে এ পর্যন্ত একটি গ্রন্থও তো রচিত হল না। আজও কবির লেটোর দলের জীবন এবং করাচীর পল্টন জীবন আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেল। নজরুলের চলচ্চিত্র, নজরুলের গ্রামোফোন, নজরুলের সাংবাদিকতা, নজরুলের রাজনীতি, নজরুলের সাহিত্য, কবিতা, গান, নজরুলের জীবন দর্শন নিয়ে সামান্য কোন গবেষণামূলক কাজ কি হয়েছে বিগত একশ' বছরে? তাহলে অমরা পুর্ণাঙ্গ নজরুলকে জানবো কি করে? হিমালয়সম এই বিশাল মানুষটিকে স্পর্শ করবো কি করে, যদি না তার ধারে কাছেই পৌছতে পারি। আসলে নজরুলকে ধারণ করার মত আত্মার ব্যাপ্তি হয়তো বাঙালি মুসলমানের নেই। সেদিন এক বিদেশী বলল, তোমাদের জাতীয় কবির কিছু সৃষ্টকর্ম আমি দেশে নিয়ে যেতে চাই। বললাম সরি! কবির তেমন কোন অনুবাদ কর্ম এ পর্যন্ত এদেশে হয়নি। বিদেশী অবাক হলেন। অবাক হবারই কথা। আমরাও অবাক হই। একশ' বছরেও নজরুলের অনুবাদ গ্রন্থ নেই। বাঙালি মুসলমানের নিবিড় তমসা আচ্ছন্ন যুগে আলোর মশাল হতে, উদ্যত কৃপাণের বীর্যস্নাত অগ্নিপুরুষ হয়ে যিনি মৃতপ্রায় বাঙালি মুসলমানকে নব যৌবন মন্ত্রে উদ্দীপিত করলেন, জাতীয় চেতনার উৎসরণে যে কবি নবীন তূর্যবাদকের ভূমিকা পালন করলেন, যাকে ঘিরে একটি মৃতপ্রায় জাতির নবজাগরণের সূচনা হল- তাকে আমরা মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলাম কিভাবে? তার জন্য কি কিছুই করার নেই আমাদের?

জাতীয় পর্যায়ে সরকারীভাবে কবি নজরুলের শত জন্মবার্ষিকী পালনের লক্ষ্যে গত ১১ জ্যৈষ্ঠ

১১। সাপ্তাহিক বিক্রম, ২-৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা, '৯৭।
১২। আরিফুল হক, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫/৫/৯৮)

বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠন হয়ে গেলো। সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকারীভাবে জাতীয় পর্যায়ে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হলেও রহস্যজনক কারণে ঢাকা ভার্সিটি ছিলো একেবারে নীরব। এই সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ রিপোর্টটি লক্ষ্যণীয়। পত্রিকাটি "নজরুল জন্মবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠান নেই" শিরোনামে লিখেছেন ঃ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত। এ জন্য মাজার সংরক্ষণ ও এর পরিবেশ রক্ষার দায়-দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য বছর পুষ্পমাল্য অর্পণ, ফাতিহা পাঠ ছাড়াও মাজারে পাশে বিশেষ মঞ্চ নির্মাণ করে সারাদিন কোরআনখানি, আলোচনা সভা, মসজিদে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু এবারই এসব কর্মসূচীর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সারাদেশ যখন জাতীয় কবির শততম জন্মজয়ন্তীতে এবং শততম জন্মবার্ষিকীর সূচনায় উৎসবমুখর পরিবেশে নানা কর্মসূচী উদযাপন নিয়ে ব্যস্ত তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছিল একেবারে নিশ্চুপ। কেবল ভিসির দায়সারা গোছের পুষ্পমাল্য অর্পণ ছাড়া গতকাল নজরুলের উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আর কোন কর্মসূচীই ছিল না। অথচ এ বছর নজরুল জন্মবার্ষিকীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ৯ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বে যে কমিটি গঠন করেছিল গতকাল মাজার এলাকায় তাদের তেমন কাউকেই দেখা যায়নি। প্রতি বছর যেখানে মাজারের পাশে বিশেষ মঞ্চ নির্মাণ করে মাইক লাগিয়ে কোরআনখানি ও আলোচনা সভা করা হয় এবার তার কিছুই করা হয়নি। মসজিদে মিলাদ মাহফিলটুকুও না। অপরদিকে সকাল ১০টার পর পরই মাজার এলাকা সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য হয়ে পড়লে কিছু টোকাইকে মাজারের ফুলের মালা লন্ডভন্ড করে লুটপাট করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। বিকেলে দেখা যায়, প্রেমিক-প্রেমিকারা জুটি বেঁধে নির্জন মাজারের পাশে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সারাদিন একজন পাহারাদারও রাখার অনুভব করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এসব ব্যাপারে রাতে ভিসির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গতকাল ছাত্র নেতাদের সাথে বিশেষ মিটিংসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় নজরুল সম্পর্কে কোন অনুষ্ঠান করা যায়নি। তবে পরে এক সময় করা যাবে। কিন্তু নজরুলপ্রেমী সচেতন মহল এ নিয়ে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেউই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অবহেলাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। সর্বত্রই এ বিষয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়।[১৩]

এ সম্পর্কে একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন কবি আবদুল হাই সিকদার। তিনি সাপ্তাহিক বিক্রমে 'নজরুল উৎসব নয় নজরুল মচ্ছব' শিরোনামে লিখেছেন ঃ

গত একটি মাস ধরে জাতীয় কবির জন্ম শতবার্ষিকী নিয়ে সরকার, আমলা, তস্য আমলা, দেশের পেশাদার নজরুল ব্যবসায়ী নব্য নজরুল প্রেমিক, নজরুলের নামটি পর্যন্ত যারা জিহ্বায় তুলতে বিরক্তি বোধ করতেন, রহস্যজনক কারণে এরা সবাই ভয়ংকর রকম নজরুল ভক্ত সেজে যে হুলুস্থুল কারবার বাধিয়ে বসেছিলো, তাতে দেশের সাধারণ মানুষের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠেছিলো। সরকারের প্রধানমন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী, সিকিমন্ত্রী এবং মিডিয়াগুলোর চিৎকার, চেঁচামেচিতে অনেকেরই কানের বারোটা বেজেছিলো। এসব হাউকাউ কতো ডেসিবল পর্যন্ত ছুঁয়েছিলো তা অবশ্য বুঝিয়ে বলার কায়দা নেই।

শোনা যায় ১৫ থেকে ২৫ কোটি টাকা ছিলো নজরুল জন্ম শতবার্ষিকীর বাজেট। বাহারী

১৩। দৈনিক ইনকিলাব, ১৬/৫/৯৮।

পোস্টার বেরিয়েছে কয়েক প্রকার। সরকারী নজরুল ইনস্টিটিউটের নাকি গলদঘর্ম অবস্থা। নামী-দামীদের নিয়ে মিটিং আর মিটিং। মুহূর্তে উধাও হচ্ছে টেবিল টেবিল খাদ্যদ্রব্য। বাতাস মৌ মৌ করে সুগন্ধে। হচ্ছে ফিল্ম, স্মারকগ্রন্থ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কোণায় কোণায় 'হ্যাগো নজরুল, ওগো নজরুল' ভাব।

দেশের মোহতারেমা প্রধানমন্ত্রী মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন। সেখানে ১০০ শিল্পী, ১০০ আবৃত্তিকার গান গাইছে, কবিতা পড়ছে। আর নাচছে ১০০ জন ছেলেমেয়ে। এসব মহাজনী কাজ কামে আমলাদের তো ঘুম না হওয়ারই কথা। হাড়িতে ভাত থাকুক আর না থাকুক গগন তো ফাটাতেই হবে। খালি খালি ফাটালে চলবে না। সমাজে ফাটাতে হবে। অতএব তারা সব ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে।

বাংলাদেশের পেশাদার নজরুল ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই অর্ধশিক্ষিত। অর্ধশিক্ষিত বলেই এগুলোর কোমরের জোর কিছুটা কম। কোমরের জোর কম বলে এরা বেলুনের মতো নিজেদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নজরুলের মতো ভাব ধরে। কিন্তু আত্মার সাইজ দেশী মুরগীর চেয়েও ছোট। তারাও এখন নিজেদের 'তক্‌মা' বজায় রাখার জন্য রুটি ও রুজির লোভে সরকারকে ঘিরে ভন্‌ ভন্‌ করে উড়ছে। নব্য নজরুল প্রেমিক, আওয়ামী নজরুল প্রেমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক হঠাৎ গজানো নজরুল-প্রেমিক এরা সবই মিলে তার স্বরে নজরুল জয়, নজরুল বলে বলে চোখে-মুখে ফেনা তুলে ফেলেছে। এদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। নজরুল জন্ম শতবার্ষিকীর উৎসবের নাম করে যে কোটি কোটি টাকার নাড়াচাড়া হবে যে কোন মূলে তার সিংহভাগ খসাতে হবে। এজন্য আগামী এক বছর যদি রবীন্দ্রনাথকে তালাক দিতে হয় তাতেও এরা রাজী।

জাতীয় কবির মাজারে দাঁড়িয়ে আলোকচিত্র সাংবাদিকদের একজনকে জিজ্ঞেস করি, এ অবস্থা কেন? বিষন্ন এক টুকরো হাসি দিয়ে সেই আলোকচিত্রী বললেন, 'নজরুলের মাজারে আসা-যাওয়ার উপর তো বৈষয়িক উদ্দেশ্য হাসিলের কোন কিছু নির্ভর করে না। সেজন্য এখানে কেউ নেই। সবাই সকাল থেকে বেহুশের মতো ছুটেছে মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামের দিকে। কারণ ওখানে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। মন্ত্রীরা থাকবেন। ওখানে প্রধানমন্ত্রীর নজরে একবার পড়তে পারলেই হলো। কিস্তি মাত।

বললাম, তাই নাকি?

সে বললো, এবারের মতো এত দুরবস্থায় নজরুলের মাজার কখনো দেখেছেন? জন্ম শতবার্ষিকী ডামাডোলের সাথে মানায় মাজার প্রাঙ্গণের এই ভয়াবহ নির্জনতা?

বললাম, মানায় না। কিন্তু কোটি কোটি টাকার এতো আয়োজন গেলো কোথায়?

রেগে ওঠে আলোকচিত্র সাংবাদিক, 'যাবে কোথায়। পকেটে ঢুকে পড়েছে। এই সরকার চোখে-মুখে অস্থিমজ্জায়, শরীরে-অন্তরে ভারতের তাঁবেদার। সঙ্গত কারণেই এদের গৃহপালিত বুদ্ধিজীবীগুলো সবই প্রায় 'রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র'। দেশবাসী এটা জানে। জানে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং আমাদের সরকার। সেজন্য দেশের মানুষকে বোকা বানানোর জন্য, চোখে ধুলা দেয়ার জন্য, নিজেদের তাবেদার বদনাম ঘুচানোর জন্য নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকীকে লুফে নিয়েছিলো হাতিয়ার হিসেবে। তারপর ডামাডোল, প্রচার-প্রপাগান্ডা, চিৎকার-চিল্লাচিল্লি কাকে বলে দেখিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু যেখানে ভালোবাসা নেই, আন্তরিকতাও সেখানে থাকে না। হীন স্বার্থবুদ্ধি হয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং অন্ধ। সেজন্য নজরুল উৎসবের নামে এরা যখন বিকট মচ্ছবে লাফিয়ে পড়লো তখন তাদের মাথায়ই আসেনি নজরুল উৎসব করতে হলে তা করতে হবে সামগ্রীকভাবে। উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে মাজারকে। বাংলাদেশের যে জনপদ জাতীয় কবিকে প্রথম খোশ্‌ আমদেদ জানাবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো সেই কাজীর শিমলা,

দরিরামপুর, নামা পাড়াকে নিতে হবে উৎসবের প্রধান স্থাপনা হিসেবে। দৌলতপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, নোয়াখালী, ঢাকার বর্ধমান হাউজসহ সবখানে জ্বালাতে হবে আলো। নজরুলের প্রতিটি বইয়ের সুলভ সংস্করণে ভরে ফেলতে হবে বাজার, ফুটপাত। পর্যটন করপোরেশন ব্যবস্থা নেবে নজরুল ট্যুরের। শিল্পকলার শিল্পীরা ঘুরে বেড়াবে সারাদেশ নজরুল সঙ্গীত নিয়ে। নজরুল অধ্যাপকদের এক একজনের তত্ত্বাবধানে প্রণীত হবে এক ডজন করে নজরুল থিসিস। সারাদেশে তিনশত পঁয়ষট্টিটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করবে নজরুল ইনস্টিটিউট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আমাদের দূতাবাসগুলোকে বলবে নজরুলের স্মরণে অনুষ্ঠান করার জন্য- তবেই না কিছু একটা হতো। তবে হচ্ছে নজরুলের নাম নিয়ে, কিন্তু নজরুলকে বাদ দিয়ে। তারই চিহ্ন আজ ২৫ মে জন্ম শতবার্ষিকীর উদ্বোধনী দিনে কবির মাজারে। (সাপ্তাহিক বিক্রম, ২-৮ জুন '৯৮ সংখ্যা)।

জাতীয় কোন কিছুকে অপমান করার অর্থ সে জাতিকে এবং রাষ্ট্রকেই অপমান করা। জাতীয় কবিকে অবহেলা বা অবমূল্যায়ন করা মানে জাতি ও দেশকেই অবহেলা ও অবমূল্যায়ন করা। জাতীয় কবি বিদ্বেষী মহলটি কর্তৃক কবির অপমান অবহেলা উপেক্ষার আর করুণ পরিণতি দেখে নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি বার বার মনে পড়ে। দেশের মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, মমতা প্রকাশ এবং অন্যায়-অত্যাচার থেকে মানুষের মুক্তিলাভ ও আপন শক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়ানোর জন্য প্রত্যয়শীল কবির ছিল আকুল আহবান। তাই এই মানব প্রেমিক ও কল্যাণকামী কবি উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী মহল এবং শাসক শ্রেণীর কাছে তিনি ছিলেন চক্ষুশূল। এ জন্যেই বোধ হয় একরাশ ব্যথা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ

.......বন্ধুগো আর বলিতে পারি না,
বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি,
তাই যাহা আসে কই মুখে।

শুধু তাই নয় নিজ জাতির ভন্ডামী দেখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ

"বুকে এক কথা মুখে আরেক
এই তো তোদের ভন্ডামী
তাই তো তোরা লোক হাসালী
বিশ্বে হলি কমদামী।"

সুতরাং আমাদের আত্মপরিচয় এবং অস্তিত্বের স্বার্থেই জাতীয় কবিকে সকল চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করে জাতীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে যথাযোগ্যভাবে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া একান্ত জরুরী। শুধু মুখে নয়; আন্তরিকতার সাথে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে। ইতোমধ্যে এই শুভ লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নজরুলের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীকে ঘিরে নকল নজরুল প্রেমিকদের মুখোশ জাতির সামনে আজ উন্মোচিত হয়েছে। তাই জাতির পক্ষ থেকে আজ দাবী উঠেছে ঃ

- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতীয় কবির জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন ও পালন, কবির জন্ম দিবসে সরকারী ছুটি ঘোষণা, অফিস-আদালতে বিশেষ করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কবির ছবি রাখার নির্দেশ প্রদান।
- কবির উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবসে মাযারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকর প্রধানের ফাতেহা পাঠ ও পুষ্প অর্পণ, রাষ্ট্রীয় অতিথিদের পক্ষ থেকে মাযারে যথোপযুক্ত সম্মাননার ব্যবস্থা গ্রহণ।

- কবির স্মৃতিধন্য বাংলাদেশের দরিরামপুর, দৌলতপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানে কবির জীবন সংশ্লিষ্ট স্মৃতি সমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও নজরুল পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- কবি রচিত কাহিনী অবলম্বনে বা পরিচালনায় নির্মিত, তাঁর অভিনয় সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রগুলো উদ্ধার, সংরক্ষণ। তাঁর জীবন ভিত্তিক মানবতার বাণী প্রকাশক আন্তর্জাতিক মানের তথ্যনির্ভর ছবি নির্মাণ।
- নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করণ ও পূর্ণাঙ্গ যাদুঘর-প্রদর্শনীশালা স্থাপন।
- নজরুল সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক সংকলন প্রকাশনা ও বহুমুখী মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাহিত্যাঙ্গনে উপস্থাপন এবং এ ব্যাপারে দূতাবাস সমূহের ভূমিকা।
- শিক্ষার সকল স্তরে নজরুল সাহিত্য বিশেষ গুরুত্বে অবশ্যপাঠ্য করণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল সাহিত্যে এম. এ. তে ১০০ নম্বর ও সম্মানে ৫০ নম্বর নির্ধারণ, নজরুল গবেষণা কেন্দ্রে পৃথক বিষয় হিসেবে নজরুল সাহিত্য পড়ানো ও কষ্টসাধ্য নজরুল বৃত্তি সহজলভ্যকরণ।
- নজরুলের অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য রচনা, পান্ডুলিপি উদ্ধার, গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ, নজরুল সাহিত্যে উচ্চতর মূল্যায়ন ও গবেষণা নিশ্চিতকরণ।
- নজরুল সঙ্গীতের দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড সংগ্রহ সম্পন্ন করণ, সুর বিকৃতি থেকে সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর সংরক্ষণ, নজরুল সঙ্গীত আধুনিক গানরূপে কোন কোন নামে রেকর্ড ভূক্তি বন্ধকরণ।
- বেতার টিভি সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নজরুল সঙ্গীতের সামগ্রিক প্রচার প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নজরুলের নাটক, উপন্যাস,কবিতা, অভিভাষন ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রচার, উপস্থাপন।
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নজরুল সাহিত্য সম্ভার ও সঙ্গীত সংগ্রহ পৌছনোর ব্যবস্থাকরণ।
- রাজধানী, বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে নজরুলের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উদযাপন ও পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরুল পুরস্কার প্রচলন।
- কবির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নজরুল সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন।
- জাতীয় কবির সৃষ্টিকর্মের লালন পরিচর্যা ও প্রচার প্রসারে নজরুল ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকতর ভিত্তিতে ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে বিস্তৃত করণ।
- নজরুল নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের ধারায় ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।
- নজরুল-অনীহা, অবমূল্যায়ন ও অপমূল্যায়নের যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।

জাতির পক্ষ থেকে উত্থাপিত উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবী। আমাদের আত্মার আত্মীয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান, মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের সুবিবেচনা প্রত্যাশা করছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অজানা সাক্ষাৎকার

[রবীন্দ্রনাথের পারস্য সফর সে দেশের শুধু প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই নয়; বরং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অঙ্গনেও প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে কবি হিসেবে যতটা, ঠিক ততটাই একজন ভারতীয় দার্শনিক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রমানস ও রচনার সাথে মরমীয়া সুফীবাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং রবীন্দ্রনাথের বংশ ও পরিবারের ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার খবর পারস্যের সুধীজনরা রাখতেন। ধর্মীয় বিষয়ে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী রবীন্দ্রনাথের উদার নৈতিকতা এবং মুক্ত দার্শনিক চিন্তার জন্যে পারস্য সফরের সময় তৎকালীন ইরানের দার্শনিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা তার সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনায় মিলিত হন। সমসাময়িক ইরানের প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আল্লামায়ে মোয়াজ্জম মোসলেহে কবীর হাজ্ব শরীয়ত সাঙ্গালজী গাফুরুল্লাহ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনাকারী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ববর্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা ও মতামত বিনিময়ের বিবরণ ফার্সী ১৩১১ সালের ১৮ই ওর্দীবেহেস্ত, ২রা মহরম আল হারাম ১৩৫১ হিজরীতে রোজনামেহ (ফার্সী দৈনিক) 'ইরান' ঃ ১৬শ বর্ষ ঃ ৩৭৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আয়াতুল্লা সাঙ্গালজীর গ্রন্থ 'ইসলাম ও মুসিকী'তে এ সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে।]

নিচে মূল ফার্সী হতে অনূদিত এ সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

"সকাল ন'টায় আমার গুরু হযরত ওস্তাদে মোয়াজ্জেম জনাব শরীয়ত সাঙ্গালজী এবং আরো কয়েকজন ফকীহকে (উচ্চমার্গের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) নিয়ে বাগে নিরুদ্দৌলার আঞ্জুমানে আদবীয়াত (সাহিত্য সংস্থা) ভবনের একটি কক্ষে বসেছিলাম এবং পরস্পরের সাথে খোশগল্প করছিলাম। কামরায় শুধুমাত্র একটি চেয়ারই খালি ছিলো। ভারতীয় দার্শনিক ডক্টর তাগোর (ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে কখন এসে উপবেশন করবেন, আমরা তারই অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েক মিনিট পরেই দীর্ঘদেহী, ঈষৎবন্দজ, ভাস্কর্যের মতো শ্বেতশুভ্র চুলদাড়িতে সুশোভিত, মাথায় কালো মখমলের টুপী ও লম্বা ওভারকোর্ট পড়া বয়োবৃদ্ধ মণীষী বিশাল দরজা অতিক্রম করে আস্তে আস্তে কামরায় প্রবেশ করলেন। মুহূর্ত খানেক বাদেই ভারতীয়দের স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচার অনুযায়ী সৌজন্য প্রকাশের ভঙ্গীতে দু'হাত উঁচু করে অভ্যাগতদের স্বাগত জানালেন। এরপর এলো উপস্থিত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়ের পালা। ডক্টর সবার সাথে সৌজন্য বিনিময় করে নিজ আসনে এসে বসলেন।

জনাব শরিয়ত সাঙ্গালজীকে আগেই ডক্টরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো বিশিষ্ট মহান ইসলামী চিন্তাবিদ এবং যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে পান্ডিত্যের অধিকারী প্রথম কাতারের আলেম হিসেবে। ডক্টর পরে জনাব শরিয়তের দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

একদিকে দর্শন এবং অন্যদিকে প্রাচ্য ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীর পান্ডিত্যের অধিকারী আপনার মতো বিশিষ্ট ও মহান ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি সীমাহীন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। বিশেষ করে এ সাক্ষাৎকারকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ সম্মানের বিষয় হিসেবে মনে করছি।

জনাব শরিয়ত ঃ বহু বছর ধরে আমি আপনার নাম শুনে আসছি। আমার মন মগজে সব সময়েই এমন একদিনের স্বপ্ন লালন করে আসছিলাম যেদিন, আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে; প্রশান্ত মনে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কিত আমার জিজ্ঞাসার জবাব জেনে নেবো আপনার কাছ থেকে।

ডক্টর তাগোর ঃ আমিও সীমাহীন উৎসাহ ও অধীর আগ্রহ নিয়ে এমন একদিনের জন্য অপেক্ষা

করছিলাম, যেদিন ইরান পৌঁছতে পারবো, ইরানের জ্ঞানী-গুণীজনদের সাথে পরিচিত হবো। বিশেষ করে আমার অসীম আকাংখা ছিলো ইরানের জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরকে জানবো, চিনবো। এ কারণে শিরাজ পৌঁছামাত্রই আমি ছুটে গিয়েছি হাফেজ ও সাদীর সমাধি পরিদর্শনে।

জনাব শরিয়ত ঃ মানুষ যখন দুনিয়ার মহান ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আপনার মতো একজন পূর্ণাঙ্গমানব ও মহাত্মার যার অস্তিত্বই হলো মানবতার জন্যে সুফলদায়ক যার সমস্ত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং জীবনাচরণ হলো মানবতার জন্যে কল্যাণকর এমন একজনের সাক্ষাত পায়-তখন তার উচিত এ দুর্লভ সুযোগকে যতদূর সম্ভব বেশি করে কাজে লাগানো। তাই এখন আমারো একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা হলো আপনার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, যা কি না বিজ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণের ক্ষেত্রে চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গবেষণা এবং উদ্যোগ ও ক্ষেত্র তৈরির কারণ হয়েছে- তার কাছ হতে চাই যে, আপনার মতে কোন জিনিস অধিকতর বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ বয়ে আনে? কিসে মানুষের সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে?

ডক্টর তাগোর ঃ অবশ্য এ ব্যাপারে এবং এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি যা মনে করি- সম্ভবত তা আপনাদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সাথে মিলবে না বা আপনারা হয়তো এ জবাবের সাথে একমত হবেন না। তবু যখন আপনি প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছেন- তাই এর জবাবে বলছি ঃ

মানুষ এক চিরঞ্জীব শাশ্বত অসীম অনন্ত হতে– জানি না সে অমৃত পুরুষোত্তম কে বা কি এবং সে ব্যাপারে আমার কোনো ভাবনা-চিন্তার কাজও নেই- এ দুনিয়ায় এসেছে। এ দুনিয়া হলো মানুষের জন্যে এক পবিত্র সমাধি ক্ষেত্র বা উপাসনালয়ের মতো। মানুষ এখানে এক তীর্থযাত্রী এবং তাকে এ তীর্থে অবশ্যই আসতে হয় ও হচ্ছে। পরিক্রমণ ও পরিভ্রমণ করতে হয় এ তীর্থাঙ্গণের চক্রবৃত্তে। এখানেই অতিবাহিত করতে হয় ইহলৌকিক জীবন। মানুষ সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য- লক্ষ্য-কারণ মূলত এই যে, তাকে সাফল্যের সাথে এ পরিভ্রমণ বা তীর্থ পরিক্রমণ শেষ করতে হবে। এ তীর্থ সমাধিতে মানুষের যাত্রাবিরতি বা অবস্থান একান্ত সাময়িক এবং এখানে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিবাহিত করতে হয়। চতুষ্পদ প্রাণী বা অন্যান্য জীবজন্তুও দুনিয়াতে আসে, চলে যায় এ দুনিয়া থেকে। কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে মানুষের পার্থক্য হলো ওরা শুধুমাত্র আহার-নিদ্রা-মৈথুনের জন্যেই আসে এবং তারপর পৃথিবী থেকে চলে যায়। তারা শুধুই সৃষ্টি এবং এক মহাসৃষ্টির অংশ মাত্র। রক্ত মাংস-পশম-চামড়ায় আবৃত এক প্রাণ। কিন্তু যে মানুষ অন্যান্য প্রাণীকূল হতে শ্রেষ্ঠতর- তার জন্যে এমনটি ঠিক নয় যে, মানব নামক প্রতিটি সৃষ্টিই মনুষ্য পদবাচ্য। বরং যে মানুষ বুদ্ধি, বিবেক, বিচার ও চিন্তাশক্তির অধিকারী এবং অন্যান্য প্রাণীকূল হতে এসব গুণাবলী যার মধ্যে ন্যূনতম হলেও বেশি সেই হলো সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। এ মানুষের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, মানবতার শাশ্বত কল্যাণ কামনা স্বতত তার মধ্য হতেই উৎসারিত হবে। মানবতাকে করবে তার স্বভাব ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে ঘনিষ্ঠ। এর ফলে তিনি মানবতার সেবা করবেন। তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব মানবতার ততটুকু সেবা করতে তিনি কখনো চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। যে কেউ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করুন না কেন- তার সুফলটুকুকে তিনি অবশ্যই মানবতার কাছে পৌঁছে দেবেন। বিজ্ঞানী তার বিজ্ঞান সাধনার মাঝে চিকি ৎসক নিজের চিকিৎসা কর্মের মধ্যদিয়ে, চিত্রকর তার চিত্রাংকনের ভিতরে, কবি তার কাব্যের মাধ্যমে, সঙ্গীতজ্ঞ তার গায়ন-বাদন-সংগীত চর্চার মধ্য দিয়ে যাতে মানবতার সেবা করতে পারে- তার জন্যে ঐশী মহাপ্রভু এক স্বাভাবিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি করে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে অর্থাৎ যে কেউ যে কোন পথ ও পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক না কেন মানবতার সেবা, মানুষকে সাহায্য করতে পারে। আর এ সেবা ও সাহায্যই মানুষকে স্বীয় সিদ্ধি এবং উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সবার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য একই। সবাই একই দিকে অভীষ্ট সন্ধানী, একই উদ্দেশ্য লক্ষেরই অভিযাত্রী হয়ে ধাবমান। যখন আমরা মানবতা সম্পর্কে কথাবলি তখন নিঃসন্দেহে তা দিয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতি সম্পর্কে বা বিচ্ছিন্নভাবে কারো সম্পর্কে কথা বলি না। আমরা বলি এক সামগ্রিক ও সার্বজনীন মানবতার কথা। আমি যখন ইউরোপে গেছি তখন দেখেছি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল উন্নতি সেখানকার মানুষকে আবিষ্ট ও গ্রাস করে রেখেছে। নিঃসন্দেহে ইউরোপীয়রা এসব দিকে প্রচুর উন্নতি সাধন করেছে এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব দিক নিছক বস্তুগত ও ভোগবাদী। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইউরোপীয়রা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিক হতে কোন উন্নতিই সাধন করতে পারেনি। এদিক থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্য অনেক বড়, বহুদূর আগানো। যাই হোক সবাই মানবতার সেবা করছে, কোন না কোনভাবে এটা মানবতার জন্যেসুফল বয়ে

আনছে। তারা একভাবে মানবতার সেবা করছে। আবার অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার মধ্য দিয়ে মানবতার সেবা করছে। এসব জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা মান-মর্যাদার দিক দিয়ে অন্যান্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর স্থানের অধিকারী। তারা এসেছেন মানবতাকে পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্যে। মানবতাকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমেই তারা মানুষের প্রতি সেবামূলক দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাদের রয়েছে রেসালাত বা ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা, তাবলীগ বা ধর্মীয় নীতি-আদর্শ প্রচারের দায়-দায়িত্ব, আর রূহানীয়াত বা আধ্যাত্মিক শক্তি। তাদের কাছে পৌঁছে ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশের বাণী। ঐ প্রত্যাদেশের হুকুম বা নির্দেশ অনুযায়ী তারা মানুষকে এক ও একক উপাস্যের- যিনি কি না সবার জন্যে একই তার উপাসনার জন্যে আহবান জানান। একথা বলার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলোঃ সত্যিকার রেসালাত এবং রূহানিয়াতকে তুলে ধরা। যারা মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার আবেগ অনুভূতিকে বিকশিত করেন, তারা মানুষকে এক ও একক উপাস্যের প্রতি যিনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও সবার জন্যে একই, যাকে যে কেউ স্ব-স্ব পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করতে পারেন- তার উপাসনার জন্যে আহবান জানান। এ উপাসনা বা উপাস্যের কাছে পৌঁছানোর পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ দিয়ে থাকেন নবী-রাসূলরা এবং যাদের কাছে ঐশী বাণীর প্রত্যাদেশ পৌঁছেছে তারা। আমি নিজেও তাদের ঐ সুউচ্চ শীর্ষ মর্যাদা সম্পর্কে জানি। আমি কোন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞ নই আমার জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য এবং আমার কাছেও পৌঁছায় ঐশী নির্দেশনার বাণী। আমি ও আমার অনুসারীদেরকে আমার স্বদেশবাসীদেরকে আহবান জানাই শাশ্বত কল্যাণের পথে। মোট কথা এর মাধ্যমেও আমি কিছু মানব সেবার আনজাম দিয়ে থাকি। আমি হলাম এক তীর্থ যাত্রী- যে এ তীর্থ ক্ষেত্রে এসেছি এবং এখানে সাময়িক অবস্থান ও তীর্থ পরিক্রমাকালে আমার উপরেও বর্তিয়েছে মানব সেবার দায়-দায়িত্ব। আর সে অনুসারে আমিও জনগণকে দিচ্ছি পথ-নির্দেশনা। এ কথা আমাদের বুঝতে হবে যে, মানব কল্যাণের অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তির কল্যাণ নয়। বরং এক সর্বজনীন ও সামগ্রিক কল্যাণ। আর সবাই যদি স্ব-স্ব শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষের সেবা করে এবং নিজেদেরকে পৌঁছায় পরিপূর্ণতার তাহলেই তা বয়ে আনে মানবতার সামগ্রিক ও সর্বজনীন কল্যাণ। আর এভাবে সবাই-ই স্ব-স্ব মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্যানুযায়ী কাংখিত পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ হতে পারে।

জনাব শরিয়ত ঃ খুব ভালো। এসব কথা ঠিকই। সুফীরা ও এ ধরনের কথাই বলে গেছেন। মহা মনীষীরা পরিপূর্ণ শাশ্বত কল্যাণ সম্পর্কে যেসব অনুসন্ধান ও সাধনা চালিয়েছেন তাও প্রায়শঃই এ পরিপূর্ণতা অর্জন সম্পর্কে। তবু আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে...

ডক্টর তাগোর ঃ আমাকে আরেকটু বলার অনুমতি দিন। উল্লেখিত উদ্দেশ্যে লক্ষ্য নিয়ে তীর্থ পরিক্রমায় বহু প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সংকট মানুষকে তার কাংখিত চূড়ান্ত উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধা দেয়। মানুষের কামনা-বাসনা-লালসা ভোগ স্পৃহা হলো এ ধরনের এক বাধা। অশিক্ষা-অজ্ঞনতা-মুর্খতা হলো এ পথে আরেক ধরনর প্রতিবন্ধকতা। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্ত বা মানুষের মধ্যেই ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক বা রুহানী প্রবণতার অস্তিত্ব থাকে না। বরং অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই থাকে পাশবিকতা, ভোগ লালসার অবাধ আধিপত্য। যে মানুষ বিচার-বিবেক-বুদ্ধির পরিশীলিতা স্তরে পৌঁছেছে, সে অন্যান্যের ঐসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমনে অনেক সহায়তা করতে পারে। এ আশংকাও রয়েছে যে, এসব প্রতিবন্ধকতা এবং ভোগ ও বস্তুবাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা-কাংখিত ঐ পরম কল্যাণকে বিপর্যস্ত করে দেবে। সুতরাং বিচার-বিবেক-বুদ্ধির স্তরে পৌঁছানো মানুষ যারা ঐশী প্রত্যাদেশের অধিকারী এবং যারা ঐ প্রত্যাদেশের আহবান শুনতে পেয়েছেন তাদের সবারই দায়িত্ব কর্তব্য হলো, উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো মানব সমাজ হতে দূর করারব্যবস্থা করা, এ জন্যে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালানো, এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন অব্যাহত রাখা।

জনাব শরিয়ত ঃ এসব বক্তব্য ঠিকই এবং এতে আমরা কোনো অসুবিধেও দেখছি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে কথাটি আসে তা হলো- আমরা সবাই জানি সত্যিকার মানুষের পরিপূর্ণতা এবং যথার্থ কল্যাণ অর্জনের একটি সঠিক পথ রয়েছে। ঐ পথ অনুসরণ করে সত্যিই মানুষ পরিপূর্ণতার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যেহেতু সবাই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে চায়, সেহেতু তারা ঐ পথের দিকেই ধেয়ে যায়। আর এ পরিপূর্ণতা তা-ই, যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, হে মানুষ। তোমাকে তোমার

পালন কর্তা পর্যন্ত পৌছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে। (আল-কুরআনঃ ৮৪ঃ ৬)। পরিপূর্ণতা অর্জনের এ সফরে বা পথ পরিক্রমনের জন্যে অবশ্য মানুষকে ধারাবাহিকভাবে বিশেষ নির্দেশাবলী অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হয়। এ পথের প্রতিবন্ধকতাগুলোও আমরা জানি। কিন্তু এখন আমি জানতে চাই, কোন জিনিস আমাদেরকে এ পথে পৌছে দেবে? আমাদের পরিপূর্ণতা বা অপূর্ণতা কোথায় ও কিসে? আমাদের পরম উপাস্য বা প্রভু কে? এ সম্পর্কি সঠিক বিধি বিধানগুলো আমরা কোথা হতে পাবো? কার কাছ হতে আমরা গ্রহণ করবো এ সম্পর্কিত নির্দেশনা? কোন নির্দেশনাকে দেব অগ্রাধিকার এবং কোনগুলোকে করবো বিশ্বাস- যে তা আমাদেরকে ভুল ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করবে না? সত্যিকার কল্যাণ অর্জন যার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হবে না? এখন বলুন কোন দার্শনিক, কোন জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী, কোন নবী-রাসূল এ পথকে সুষ্ঠুতর, সুন্দরতর ও সঠিকতরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন?

ডক্টর তাগোর ঃ (মুহূর্তখানেব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-ভাবনা এবং দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে ও ঠোঁটে তর্জনী রেখে বললেন) অবশ্যই এ ঐশী আসমানী প্রত্যাাদেশ মানব ইতিহাসের শুরু হতে এ পর্যন্ত বহু ব্যক্তির কাছে পৌছেছে। ঐসব মহান ব্যক্তিত্ববর্গের সবাই ছিলেন এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাদের সবারই কর্তব্য ছিলো এ সংক্রান্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন এবং এ পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা। এরপর আমরা বলতে পারি ঐ ঐশী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বা শ্রবণকারী প্রত্যেক মহান ব্যক্তিই সমমর্যাদাসম্পন্ন, সমান শ্রদ্ধেয়। যারাই মানবতার এ মহাতীর্থ সঠিকভাবে পরিক্রমণ করেছন, মানবতার পরম উপাস্যের উপাসাকদের সেবা করেছন- তারা সবাই হলেন সৎকর্মশীল, মঙ্গলকারী। মানবতার এ সেবার জন্য অনুসৃত সমস্ত পথ ও পদ্ধতিই হলো উত্তম। সমস্ত নবী-রাসূল ঐশী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মনীষীরাই একই দায়-দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তাদের সবার নির্দেশনাই হলো অতি উত্তম। আমিও এ পথে মানবতার সেবা করে যাচ্ছি। সত্যকে সঠিকভাবে চেনা-জানা, আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মাধ্যমেই আমাদেরকে এ সেবার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। যেসব ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং যারা এ ব্যাপারে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন- তাদের সবাইকেই অবশ্যই ভালবাসতে হবে। অবশ্যই তাদের জন্যে সবকিছু বিলিয়ে দিতে হবে, তাদের কাছ থেকে সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। কখনো এ কথা বলা যাবে না যে, কোনো একটি পথ উত্তম বা কোনো একটি পথ নিকৃষ্টতম। যেমনঃ মানবতার সেবার জন্যে আমার বহু পথ, পদ্ধতি ও সুযোগ রয়েছে। আমি এক বিশিষ্ট মহান ও সুপ্রাচীন বংশ হতে এসেছি। আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আমি এ পথেই ব্যয় করছি। স্বদেশে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। সমস্ত দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণীরাই এভাবে মানবতার সেবা করে থাকে। সারা বিশ্বেই আমার কবিতা পড়া ও পড়ানো হচ্ছে। যিনিই এসব কবিতা মনোযোগ দিয়ে পড়েন, অবশ্যই তার আন্তরিক আবেগ অনুভূতি-চেতনা, তার প্রেম ভালোবাসা গভীরতর হয়, বৃদ্ধিপায়। যেখানেই আমি সফর করিনা কেন, সেখানে নেই। আমি বলে থাকি-চেষ্টা করে থাকি- মানুষকে মানবতার চিন্তা প্রেম ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে। আমি প্রত্যাশা করি, এ ধরনের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা মানুষের সুন্দর ও শুভ অনুভূতিগুলোকে বিকশিত করতে পারবো।

জনাব শরীয়ত ঃ ঠিক আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না। আমি বলতে চাই- দরুণ নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে যদি সঠিকভাবে চিনতে ও বুঝতে না পারি-খুব ভালো করে বিষয়টি লক্ষ্য করুন এতে কোন সন্দেহ সংশয় নেই যে, পরম সত্যের পথ, পরিপূর্ণতা অর্জনের পথ, মুক্তি ও পরিত্রাণের পথ-একটি বেশি নেই।

অন্যদিকে দেখতে পাচ্চি যে, মানবতার মহা মনীষীরা কি নবী-রাসূল (সাঃ) আর কি ইবা দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণীরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব পন্থায় এ পথকে বিশ্লেষণ করেছেন- একেক জন এ পথকে একেক অংশে বিভক্ত করেছেন। এ পথের সন্ধান ও অতিক্রমণের বিষয়ে দিয়েছেন একেক ধরনের নির্দেশনা। নবী-রাসুলদের অধিকাংশ নির্দেশনাই হলো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। দার্শনিকরাও একেক জন একেক ধরনের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুবাদী দার্শনিকরা এ ব্যাপারে বলেছেন এক কথা, আবার আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের নির্দেশনা হলো অন্যরকম। আরেফ বা সুফী সাধকরা হলেন অন্য এক পথের নির্দেশনা দানকারী। তৌরাতে এক ধরনের কথা বলা হয়েছে। ইঞ্জিল আবার বলেছে অন্যধরনের কথা আন্যদিকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশনা আবার এদের সবার থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র। যদি সুক্ষ্মভাবে ভালো

করে লক্ষ্য করি, তাহলেই দেখতে পাবো যে, এ ব্যাপারে রয়েছে হাজারো পথের নির্দেশ,বলা হয়েছে হাজারো ধরনের কথা। আমরা সবাই চাই সত্যিকার সঠিক পথ, খুঁজে বেড়াই মুক্তি ও কল্যাণ অর্জনের মহাড়সক, পরম পরিপূর্ণতা লাভের পাথেয়। আমরা চাই এ হাজারো পথের গোলক ধাঁধার মধ্য হতে সঠিক সত্য পথটি বেছে নিতে। এতসব পথের গলিঘুজিতে আমরা সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়ি। আপনার বক্তব্য অনুসারে যারা। ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত এর শ্রোতা, তাদের সবাই একেকটি ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ঃ অমুক দার্শনিক বলেন, তুমি তমুক পথটি অনুসরণ করো, এ পথটিই হলো সঠিক এবং অতি উত্ম। আবার আরেক ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মহাপুরুষ বলেনঃ আমার নির্দেশিত সত্য পথ ধরেই অগ্রসর হও। অন্যদিকে আরেক পয়গম্বরের কথা হতে আমরা বুঝতে পরি, অবশ্যই আমাদেরকে এসব কিছু হতে স্বতন্ত্র আরেক পথ অনুসরণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলোঃ আমরা কার কথা শুনবো? কোন পথে কার পদাংক অনুসরণ করলে তা আমাদেরকে পৌছ দেবে চূড়ান্ত লক্ষ্যে, সত্য সঠিক মুক্তির পথে? ভারতীয় অনেক দার্শনিক বলেন জীব হত্যা, তাদের মাংস আহার খুবই খারাপ। অবশ্যই কাংখিত কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা অর্জনের পথে পৌছার জন্যে আমাদেরকে জীব হত্যা ও তাদের মাংস আহার হতে বিরত থাকে হবে। আবার যদি ইউরোপ আসি, তাহলে দেখবো, ইউরোপীয় দার্শনিকরা বলেছেন ঃ গোহত্যা এবং গো-মাংশ ভক্ষণ অতি উত্তম। আবার আরেক ধর্ম একে অতি নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। ভালো কথা এখন আমরা কার বা কাদের কথা মেনে নেব বা অনুসরণ করবো?

এই বিভিন্ন পথ ও পন্থার মধ্য হতে কোনটিকে অনুসরণের জন্যে বেছে নেব? এসব পথ ও পদ্ধতি সঠিকভাবে বেছে নেয়ার জন্যে মাপকাঠি বা মানদন্ডই বা কি?

ডক্টর তাগোর ঃ এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রদান মাপকাঠী বা মানদন্ডটি হলো ঃ প্রত্যেক মানুষের স্ব-স্ব বিবেক-বুদ্ধি বিচার শক্তি বা আকল। দ্বিতীয়তঃ এ পথ ও পদ্ধতি বেছে নেয়ার বিষয়টি মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, কোন ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে, কি পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে সরাসরি তার সাথে সম্পৃক্ত। যেমনঃ ইরান হলো মুসলমানদের দেশ। আর ভারতে রয়েছে অন্য আরেক ধর্ম। এটা হলো জন্মগত বিষয়। অন্যদিকে থেকে দেখতে হবে যে, সে কোন দর্শনে শিক্ষিত ও দীক্ষিত। আমি যখন জন্ম নেই তখন বৌদ্ধ ছিলাম। আমি পিতার ধর্মমতেরই অনুসারী থেকে যাই। সবাই মূলতঃ পিতৃ পুরুষের ধর্ম এবং মতের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং সঠিক পথে বেছে নেয়ার বিষয়টি এ সার্বিক বিষয়টির উপরেই নির্ভরশীল যে, মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, কি ও কোন পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছে। কিন্তু এ পদ্ধতিটি আমার জন্যে তেমন কোনো গুরুত্বের অধিকারী নয়। কেননা আমি একজন কবি। চরম মুক্তি ও শাশ্বত কল্যাণ অর্জনের জন্যে কবির বেছে নেয়া পথ ও পদ্ধতি হলো প্রেম ও ভালবাসা। যার মনে ও কর্মে রয়েছে প্রেমে ও ভালবাসা, সেই হলো উত্তম। প্রেম ভালবাসা নিয়ে যে পথেই অগ্রসর হন না কেনো, তাই উত্তম। কবি তার আপন প্রেম ভালবাসা দিয়েই জনণের সেবা করে থাকে। আর আমিও একজন কবি।

জনাব শরিয়ত ঃ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা ছিলো আকল-বিবেক বুদ্ধি, ফিলসফি ও দর্শন সম্পর্কিত। আমরা আকল বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-শক্তিকে কেন্দ্র করেই এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। এখন আপনি আলোচনার বিষয়বস্তুকে বিচার বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা এবং যুক্তি প্রমাণের গন্ডী হতে বের করে এনে প্রেম-ভালবাসায় কেন্দ্রীভূত করেছেন। নিঃসন্দেহে প্রেম-ভালবাসা ও সত্য ও কল্যাণকে চেনা-জানা অর্জনের একটি পথ এবং পদ্ধতি হতে পারে। কিন্তু তা অত্যন্ত ভাবাবেগ নির্ভর। কাজেই এদিক থেকে মনে হয় যুক্তি প্রমাণ দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হলেই ভালো হয়।

ডক্টর তাগোর ঃ দুঃখের বিষয়, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এছাড়াও বেলা দশটার সময় আরো কয়েকজনকে দেখা-সাক্ষাতের সময় দিয়েছে। তাই আপনাদের কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে আপাতত বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে) আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে গেল। জনাব ডক্টর তাগোর অসীম অনুগ্রহের সাথে দর্শন দিয়ে আমাদের সবাইকে চরম কৃতার্থ ও পরম কৃতজ্ঞ করলেন। এরপর তিনি সবার কাছ হতে বিদায় চেয়ে এবং নিজের স্বভাব ও প্রথাসিদ্ধ উপায়ে সবার সাথে হাত মিলিয়ে কামরা হতে বেরিয়ে গেলেন। আমরা খুবই দুঃখিত এবং অতৃপ্ত অন্তর নিয়ে ভাবছিলাম, আলোচনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সুর ও রেশ কেটে গেল। এক মধুর এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে আলোচনা শেষ করতে বাধ্য হলাম।

এ সাক্ষাৎকারের লিপিকার বা প্রতবিদেক ছিলেন ঃ হোসেইন কুলী মাস্তান। (আনিসুর রহমান স্বপনের পারস্যে রবীন্দ্রনাথ বই এর সৌজন্য)

পরিশিষ্ট—১

জনাব আলী আভারসাজী'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম" গ্রন্থের ভূমিকায় ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভা দেদীপ্যমান সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল। উপমহাদেশে বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী অশুভ লক্ষ্যের ব্যাপারে যারা অবহিত কিংবা যেসব বয়স্ক লোক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা জবরদখল এবং এখানকার জনগণের বন্দীদশার বেদনাদায়ক ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখেছেন তারা সংগ্রামী চেতনার উজ্জীবনে নজরুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তার সুউচ্চ মনোবল ও গভীর দৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ চিহ্নিত ও উদঘাটিত করে এবং এ ভূখন্ডের বস্তুগত ও নৈতিক সম্পদ আত্মসাৎ ও বিজাতীয় লুটতরাজ চলাকালে তিনি বিদ্রোহী ও বীরত্বপূর্ণ কবিতার আদলে তার বজ্রনির্ঘোষ আহবানে জনগণকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

নজরুল ইসলামের প্রাণ জাগানো কবিতা- যা বাংলার বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি করছিল, ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের মুখের বুলিতে পরিণত হয়ে যায় এবং তারা নিজস্ব রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে তার ব্যবহার করে। তার কবিতা ও গানের প্রাণস্পর্শী ও তরঙ্গ-সম সুর-ছন্দ, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, ধর্মীয় মাহফিলে, লোকজ উৎসবে, রেডিওতে, শিল্প সাহিত্য আসরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। বাংলার সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন তার বিপ্লবী ও বীরত্বপূর্ণ কবিতায় অলংকৃত হয়। সত্যিই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ ভূখন্ডের জনগণের জাগরণ ও উত্থানে এ মহান মুসলিম কবির ভূমিকা কিছুতেই ভুলবার মত নয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এ জন্যে গর্বিত যে, এই প্রথমবারের মত বাংলার এ বিপ্লবী কবির জীবনী ও সাহিত্য কর্মের পরিচিতি অতি সংক্ষেপে হলেও ফার্সী ভাষায় প্রণয়ন করে ইরানের বিপ্লবী মুসলিম জনগণের হাতে অর্পন করতে পারছে।

আমাদের প্রত্যাশা, এর মাধ্যমে ইনসাফ ও মানবতার সেবক এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামীদের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা হলেও ঋণ শোধ করতে পারব। এবং এই মুক্তিকামী কবির অচেনা ব্যক্তিত্বকে ইরানী সাহিত্যানুরাগীদের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব।

উল্লেখ্য যে, এ মহৎ কাজটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বাংলা ভাষায় ফেরদৌসীর শাহনামার অনুবাদক ও বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখক মরহুম জনাব মনির উদ্দীন ইউসুফ এর স্মরণে ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে। সে সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া সংস্কৃতি মন্ত্রী জাহানারা বেগমও উপস্থিত ছিলেন। শাহনামা অনুবাদের কাজে মরহুমের দীর্ঘ ১৭ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বাংলা একাডেমীর পক্ষ হতে ৬ খন্ডে তা প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে-

"ইরানের জাতীয় কবি ফেরদৌসীর মহান সাহিত্যকর্ম শাহনামা ফার্সী ভাষায় লিখিত; যা বাংলায় অনুবাদ করে বাংলার জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার পরিবর্তে আমরাও বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম ফার্সী ভাষায় প্রণয়ন করে ইরানের মুসলিম জনগণ ও দুনিয়ার ফার্সী ভাষীদের কাছে পেশ করব।"

মুসলিম দেশসমূহ; বিশেষ করে উপমহাদেশ তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক নীতিমালার অন্যতম বুনিয়াদী মূলনীতি। গত ৮শ বছর ধরে ইসলামী ইরানের সাথে এ তিনটি দেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল যে, উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের পরও দীর্ঘদিন এখানে ফার্সী ভাষা সরকারী, আইন আদালত, জ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষা ও বাহন হিসেবে প্রচলিত ছিল। এ বাস্তবতার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে আজকেও আমরা এসব দেশের গ্রন্থগার ও যাদুঘরগুলোতে তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের নিদর্শন স্বরূপ অতি মূল্যবান ফার্সী কিতাব ও পাণ্ডুলিপি দেখতে পাচ্ছি।

কাজী নজরুল ইসলাম- যার বহু কবিতা ইরানের মহান কবি হাফেজের দ্বারা প্রভাবিত এবং একই সাথে তিনি বাংলা ভাষায় হাফেজের কবিতা ও গজলের অনুবাদক, তিনিও এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার অনস্বীকার্য সাক্ষী।

দশ কোটির অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। অভিন্ন ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাস, পরস্পর

ঘনিষ্ঠ সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পারস্পরিক অন্তরঙ্গ অনুভূতি ও অনুরাগ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিন্ন ইসলামী নীতি অবস্থান, সরকারী ও গণ পর্যায়ে ব্যাপক যোগাযোগ প্রভৃতি সবকিছুই দুই দেশের মুসলিম জনগণের মধ্যকার গভীর সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রমাণ বহন করে।

ইরানী ও অন্যান্য দেশের ফার্সী ভাষীদের কাছে এ বইটির উপস্থাপনা বাংলাদেশের সেই মহান কবির স্মরণে উপঢৌকন হিসেবে গণ্য, যিনি হাফেজ, সাদী ও মাওলানা রুমীর মত মহান ইরানী কবিদের চিন্তা ও আদর্শে লালিত হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই মহান কবির আত্মাও এ কাজের দ্বারা খুশী হবে। কেননা তিনি সেই পবিত্র ভূমি খাজা হাফেজ শিরাজীর মাজারে যাওয়ার জন্য বড় আকাংখিত ছিলেন।

আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন হাশেমী রাফসানজানীর বাংলাদেশে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফরের প্রাক্কালে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করতে পারছি।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতিক কেন্দ্র আশা রাখে যে, ভবিষ্যতে উভয় দেশের বড় বড় কবিদের সাহিত্যকর্ম পরস্পরের ভাষায় অনুবাদ করে দু'দেশের মুসলিম জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে পারবে।

এখানে স্মরণ করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ভাষা বিভাগে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের তরফ হতে ভিজিটিং প্রফেসর জনাব ডঃ মুহাম্মদ কাযেম কাহদুয়ী বইটির জীবনী অংশের সম্পাদনা এবং কবিতার অনুবাদের বিন্যাস ও অনুলিখনের বিরাট দায়িত্বপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গবেষক ও অনুবাদক জনাব মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ডঃ কুলসুম আবুল বাশারের সহযোগিতায় কবির জীবনী ও কবিতা সংগ্রহ এবং তা ফার্সী ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এক্ষেত্রে তারা যে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশাকরি, আল্লাহ্ পাক জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় তাদেরকে সবসময় তাওফীক দান করবেন। তাদের উচ্চতর মনোবল ও উদ্যোগ ব্যতিরেকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হতে পারত না।

একই গ্রন্থে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভিজিটিং প্রফেসর (ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) জনাব মুহাম্মদ কাযেম কাহদুরী "বাংলার বুলবুল নজরুল স্মরণে" প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"ভাঙ্গা প্রাচীর ও দরজার কারুকাজ আর নক্শার মাঝে
অনারব মহান ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত আছে।"

কবিতা একটি প্রেরণা, যা কবির হৃদয় ও আত্মায় সঞ্চারিত হয়। তার চিন্তাকে সুবিন্যস্ত করে এবং কবিতার গ্রন্থিতে গ্রথিত করে। এই প্রেরণা যদি খোদায়ী হয় এবং মানুষের প্রাণসত্ত্বার উৎকর্ষতা ও বিকাশের কাজে প্রয়োগ হয় তাহলে মানুষের জন্য তা পদ প্রদর্শক হতে পারে এবং মানুষকে উন্নততর এক জগতের দিকে ধাবিত করতে পারে। কবি যদি দায়িত্বপরায়নতায় উজ্জীবিত হন, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করেন, দাসত্ব ও বন্দীদশার শৃংখল থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করে তাহলে তিনি নিজের যুগের চাইতেও এগিয়ে যেতে পারেন। অজ্ঞতা, অবহেলা ও আত্ম-বিস্মৃতির কলুষিত প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তদের পথের দিশারী হয়ে মুক্তি ও স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করতে পারেন এবং বিজাতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঝান্ডাবাহী হতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে কবি একটি ছত্র বা একটি পংক্তিতে এমন বিষয় ও বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন, যা বোঝাতে অন্যদের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।

রাজা বাদশাহরাও তাই তাদের দরবারে কবিদের জড়ো করতেন, তাদেরকে অবারিত পৃষ্ঠপোষকতা ও উপহার উপঢৌকনে ভরে দিতেন। দেখা যায়, কবিদের একটি কবিতা বা গজল অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়াও সেনাদলের মাঝে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করত। তাদেরকে দুষমনের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করত। এমন অনেক কবিতা আছ, যেগুলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। কোন পক্ষকে বিজয়ী করেছে বা শত্রু পক্ষকে পরাজয়ের গ্লানিতে নিক্ষেপ করেছে। 'ওহুদ' যুদ্ধের ঘটনায়ও বর্ণিত আছে যে, রসূলে খোদার (সাঃ) শত্রুপক্ষ একদল গায়িকা ভাড়া করে কুরাইশ বাহিনীকে উত্তেজিত করার জন্য রণাঙ্গনে নিয়ে এসেছিল। ইবনুল আসীরের 'তারিখে কামেল' এর বর্ণনা অনুসারে সুর ও ছন্দে সমন্বিত গায়িকাদের এই কবিতা কুরাইশ বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

নজরুল ইসলামও ছিলেন এমন কবি, যার কবিতায় দায়িত্ব চেতনা ও মুক্তির জয়গান মুখরিত। স্বাধীনতার জয়গান যদিও বহুবার তার জন্য বন্দীশালার শিকল নিয়ে এসেছিল এবং আধিপত্যবাদীরা কবিকে শিকল পরিয়ে কারারুদ্ধ করেছিল, কিন্তু ভারতীয় ভূখন্ডের স্বাধীনতার জয়গান সর্বপ্রথম তিনিই উচ্চারণ করেন এবং মানুষকে সামাজ্যবাদীদের খপ্পড় থেকে মুক্ত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। ফরখী ইয়াজদীও এ ধরনের মুক্তির গান গেয়ে বলেছিলেন–

"বীরত্বের হাতে তুলে নাও তলোয়ার-
ব্যাঘ্রের মুখ হতে কেড়ে আন অধিকার।"

নজরুলও ছিলেন সর্বকালে সব স্থানে মুক্তির জয়গানে সোচ্চার। তাই 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে আখ্যায়িত হন। যখন দেখলেন যে, মানুষ এখনো জাগছে না তখন 'মহররম' কবিতার মাধ্যমে ইমাম হোসাইনের বীরত্বগাঁথা তুলে ধরেন জাতির সামনে। ইমাম হোসাইন (আঃ) ছয় মাসের শিশু পুত্রকে কিভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথে উৎসর্গ করেন এবং ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন তা জাতির কর্ণগোচর করেন। 'ছাত্রদলের গানে' তিনি যুবসমাজের প্রাণে নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন, যার প্রভাব এখনো দৃশ্যমান। হয়ত তিনিও যদি নীরবতা পালন করতেন এবং মুক্তি, স্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষে ও বিজাতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলতেন তাহলে 'নোবেল' এর মত কোন বড় পুরস্কারে তিনি ভূষিত হতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুক্ত স্বাধীন। তিনি স্বাধীনতার জন্য শিকল পরা ও বন্দীদশাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন কোন পুরস্কার গ্রহণে উপর। এ ভূখন্ডের সমকালীন কবিতায় তিনি অপর যে বিপ্লবটি সাধন করেন তাহলো ফার্সী ও ইসলামী শব্দ ও পরিভাষার চমৎকার ব্যবহার। নজরুলের কথায়, এর ফলে তার কবিতার মূল্য যে কিছুমাত্র কমেনি তা নয়; বরং আরো সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

অপরদিকে হাফেজ শিরাজীর কবিতার সাথে নজরুল ইসলামের পরিচয়, পড়াশুনা ও অনুবাদ এবং হাফেজের কবিতা ও গজলের ছন্দ, শব্দ, ভাব ও বিষয় তার কবিতাকে অধিক মহিয়ান এবং প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা সহ আরো অনেক সুষমায় অলংকৃত করেছে। ফার্সী কাব্যের এ মহান কবি ও আধ্যাত্মিক সাধকের চিন্তাধারা তার হৃদয় ও আত্মায় প্রভাব বিস্তার করে তার কবিতাকে নতুন রং ও রূপে সজ্জিত করে। ফার্সীর বাইরে অন্য ভাষা ও কবিতায় এ জাতীয় চিন্তা-চেতনার উপস্থিতি দুর্লভ। নজরুল ওমর খৈয়াম এবং মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর চিন্তাধারায়ও সিক্ত হয়েছেন।

নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি হাফেজ ও খৈয়ামের ন্যায় ফার্সী কবিদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথা অপকটে স্বীকার করেছেন। তাদের সাথে পরিচয় লাভই তার চিন্তা চেতনায় বিরাট পরিবর্তনের কারণ বলে ঋণ-স্বীকার করেছেন। অথচ পৃথিবীর আরো অনেক বড় বড় কবি আছেন, যারা ফার্সী ভাষার ইরানী কবি ও সাধকদের চিন্তা-চেতনার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বটে; কিন্তু এ কথা তারা এতটুকু স্বীকার করেননি। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারটিও বাংলা ভাষার এ মহান কবির স্বাধীন ব্যক্তি সত্ত্বা ও মহত্বের পরিচায়ক।

নজরুল এমন এক শিল্পী, যিনি একটি কণ্ঠ হারের হারানো গ্রন্থিগুলো কুড়িয়ে যোগাড় করেছেন এবং সুদূর অতীত থেকে পরস্পর আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ দু'টি ভাষা ও জাতির মাঝে পুনঃ সংযোগ স্থাপন করেছেন। বিজাতীয়দের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের আধিপত্যের কারণে যা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল তাকে পুণরুজ্জীবিত এবং স্বদেশের মানুষকে পূর্বপুরুষদের ভাষার সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, 'ফার্সী কোন বিজাতীয় ভাষা নয়, আমাদের দেশ ও জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ফার্সী। তা বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাচ্ছে, তাকে অনুধাবন করতে হবে। তার প্রতি মনযোগ দিতে হবে। আগামী প্রজন্ম যাতে তাকে চেনে এবং তার স্বাদ আস্বাদন করতে পরে। দুই বন্ধু-প্রতীম দেশ এবং অভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যকার বন্ধনগুলো যাতে একবারে ছিন্ন হয়ে না যায়।'

নজরুল রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় হাফেজের রুবাইয়াত ও অন্যান্য কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে নজরুল হাফেজের এ কবিতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

তিনি বলেন, আজ শিরাজের বুলবুল হাফেজের মাজার দুনিয়ার প্রেমিক ও হৃদয়বানদের যিয়ারতের স্থানে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর সবখান থেকেই মানুষ তার কবর যিয়ারত করতে যায়। কিন্তু আজ শুধু হাফেজের মাযার নয় বরং হাফেজের কবিতার অনুবাদক (নজরুল ইসলাম) এর মাযারও দুনিয়ার সাহিত্য-প্রেমিকদের যিয়ারতগাহে পরিণত হযেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে চির নিদ্রায় শায়িত নজরুল হাজার হাজার পথিকের শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টির মিলন কেন্দ্র। অনেকে তার মাজার পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করেন এবং মজলিশের আয়োজন করেন।

আশা করি, ফার্সী ভাষায় বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কতিপয় কবিতার অনুবাদের এ প্রকাশনা ইরান ও বাংলাদেশের মূল্যবান সাহিত্যকর্ম ও জ্ঞান-মনীষার আরো অনুবাদ ও গ্রন্থনার পথে বলিষ্ঠ উদ্যোগ হিসেবে গণ্য হবে এবং দু'দেশের মহান ব্যক্তিবর্গকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে চেনার

পথ সুগম করবে।

"যার হৃদয় প্রেমে জীবন্ত সে কখনো মরে না, অমর।
জগতের বিশাল ফলকে অংকিত দেখ আমাদের স্থায়িত্ব।"

এখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি প্রিয় বন্ধু, প্রাজ্ঞ সাহিত্যসেবী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কালচারাল কাউন্সেলর জনাব আলী আভারসাজীর কথা, যিনি ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের একজন অনুরাগী ও সেবক এবং এ কাজটি তার পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যদিও ত্রুটিহীন একটি বই সাহিত্য প্রেমিকদের কাছে পেশ করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে এবং আরো সুন্দর ও পরিমার্জিত হওয়ার জন্য আরো বেশী পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। আশা করি, সাহিত্যসেবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

"হাফেজ! এ লেনদেনে তুর্কী ও আরবী এক, অভিন্ন।
প্রেমের কথা বলে যাও সে ভাষায় যে ভাষা তুমি জান।"

আলী আভারসাজী, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল।

পরিশিষ্ট—২

দেখে এলাম করাচীতে নজরুল একাডেমী

আবদুল ওয়াহিদ

মহাকবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তার অমর অবদান উদ্ধৃতির মাধ্যমেই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সকল অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে। মানুষের দ্বারা মানুষের অবমাননার বিরুদ্ধে-শোষণের বিরুদ্ধে। তাই, বিদ্রোহীর বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে ঃ

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম, রণভূমে রণিবে না--
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হত শান্ত।"

নজরুল মানুষকে বিশ্বনিয়ন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট (আশরাফুল মাখলুকাত) বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই, ফুটে উঠেছে তার মহান বাণীতে,

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান"
-মাহমুদ আলী, ইসলামাবাদ

[Nazrul Birth day, 88, Nazrul Academy, Karachi, June 1988]

কথাগুলো হচ্ছে জনাব মাহমুদ আলী সাহেবের মেসেজ বা বাণী। ১৯৮৮ সালে করাচীতে নজরুল দিবস পালন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় এটি প্রকাশিত হয়। সুদূর পাকিস্তানের করাচীতে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমী, নজরুল-চর্চায় নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নেপথ্যে রয়েছেন মাহমুদ আলী সাহেব। পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারের ক্যাবিনেট মিনিষ্টার জনাব মাহমুদ আলী। তাঁর আদি নিবাস সিলেটে। এখন তিনি ইসলামাবাদের বাসিন্দা। নিরহংকার, নিরাপোস, অতিথিবৎসল সেই মাহমুদ আলী সাহেবই আমাকে বলেছিলেনঃ করাচী যাচ্ছেন, নজরুল একাডেমীতে যাবেন অবশ্যই। দেখে যাবেন একটু। আমি এখনো ধরে রেখেছি। আমি সেক্রেটারী এবং লাইব্রেরীয়ানকে বলে দেবো আপনার যাবার কথা। তারপরই পি এ সাহেবকে বললেন, ঠিকানা লিখে দিতে। তিনি আমার হাতে যে স্লিপটি দিয়েছেন; তাতে ইংরেজীতে লেখা ছিলোঃ

নজরুল একাডেমী, ব্লক নং-৩৫, পাকিস্তান সেক্রেটারীয়েট, সদর, করাচী। ফোনঃ ৫৬৮৯৪৮৯।

লাইব্রেরীয়ান মিস তাহমীনা আউয়াল, সেক্রেটারী মিসেস শিরীন রহমতুল্লাহ।

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। তাফসীর সাহিত্যের ওপর গবেষণা কাজে গিয়েছিলাম জানুয়ারীতে করাচী। লাহোর হয়ে ইসলামাবাদে পৌছতে ফেব্রুয়ারীর শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে যায়। মার্চে দেশে ফিরে আসি।

এর পূর্বে মাহমুদ আলী সাহেবের অনেক গুণকীর্তন আমি শুনেছি। সাক্ষাতে মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। বয়সের এবং অভিজ্ঞতার ব্যবধান বোধ করিনি। সহাস্য বদনে রিসিভ করলেন। ইকবালের উপর বাংলাদেশে এতো কাজ হচ্ছে জেনে তিনি খুশীতে আত্মহারা।

যা-ই হোক, আমি করাচী ফিরে আসি ফেব্রুয়ারীর ২২ তারিখে। ২৩ তারিখে ফোন করে একাডেমী যাই। লাইব্রেরীয়ান মিস তাহমীনা রিসিভ করলেন। তিনি বাঙালী মেয়ে। ঢাকার মিরবাগে তাঁর আদি নিবাস। এখন ওখানে থাকেন। বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলা বলেন। ওখানে রেডিও-টিভিতে বাংলা অনুষ্ঠানও করেন। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরো একাডেমী দেখালেন। আমার তো চোখ বিস্ফারিত, কারণ আমি ঢাকার নজরুল একাডেমী এবং নজরুল ইন্সটিটিউট দেখেছি। এখানে লাইব্রেরীতে আর কত বই সংরক্ষিত আছে? করাচীর নজরুল একাডেমীতে না-কি ২৫,০০০ এর উপর বিভিন্ন ভাষার বই রয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষার বইয়ের সংখ্যাই বেশি। এগুলো পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হওয়ার পূর্বের সংগ্রহ। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বইগুলো দেখছিলাম। কয়েকটি বাংলা উর্দু বই ফটোস্ট্যাস্টও করিয়ে এনেছি। ভালো লাগলো তাদের ঔদার্য। সংকীর্ণতা নেই। নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি বলে তাকে পাকিস্তানীরা প্রত্যাখ্যান করেননি। একাডেমী বিলুপ্ত করেননি। এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নজরুল একাডেমী করাচী বন্দরে সেক্রেটারীয়েটের কাছে। নিজের কাছে ছোট হয়ে গেলাম। অনেক প্রশ্ন নিজকে নিজেই করলাম, উত্তর পাইনি। কি-ইবা উত্তর থাকতে পারে বলুন?

বলা দরকার, নজরুল ইসলামের ওপর এর পূর্বে আমি নজরুল একাডেমী পত্রিকায় "উর্দু ভাষায় নজরুল চর্চা-১" শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলাম। এই লেখাটা ছিলো বিখ্যাত গবেষক প্রফেসর ডঃ আবদুল্লাহ সাহেবের উর্দূতে লেখা 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই। উর্দূতে অসাধারণ গ্রন্থটি। নজরুল একাডেমীতে ওই মানের জীবনী আমার চোখে পড়েনি। আখতার হোসেন রায়পুরীসহ বিভিন্ন লেখক-সাহিত্যিক নজরুলের কবিতা এবং গানের অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদ অনাদর-অবহেলায় এখন লোকচক্ষুর আড়ালেই বলতে হবে। নজরুলের উপন্যাস 'কুহেলিকা'র উর্দু অনুবাদ দেখলাম হাতের লেখা ৮২ পৃষ্ঠা। অনুবাদক রফীউদ্দীন ফিদায়ী। ১৯৮৬ সালে একাডেমীতে জমা দিয়েছেন, এখনো ছাপা হয়নি। পাক সরকার বিশেষ কর্মসূচী নিয়ে ডঃ আবদুল্লাহর গ্রন্থসহ নজরুল ইসলামের সব রচনাবলী উর্দু ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দেবেন বলে আমরা আশাবাদী। যে কাজগুলো উর্দুতে হয়ে গেছে, সেগুলো আশু প্রকাশের ব্যবস্থা করা সময়ের অন্যতম দাবি বলেই আমাদের বিশ্বাস। এজন্য পাকিস্তানস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য, ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়ে নিজকে হীন মনে হলো। বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে যে মিশন–তার দীনহীন অবস্থা দেখে। এ ব্যাপারে সরকারের ইতিবাচক ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নজরুল ইসলামের জন্ম এবং মৃত্যুবার্ষিকী সেখানেও পালিত হয়। ঘটা করেই পালিত হয়। প্রকাশিত হয় স্মরণিকা-সংকলন। অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, নাটক ও গান।

প্রকাশিত স্মরণিকা-সংকলনে স্থান পায় বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষার প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদ কবিতা ও পাক প্রেসিডেন্টের বাণী। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের লেখা সংকলনে স্থান পায়। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদনও সন্নিবেশিত হয়। এমন মহৎ উদ্যোগ যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের ধন্যবাদ আর মোবারকবাদ সাধুবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৩ সালে করাচীতে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পাকিস্তান ভেঙে যায়নি। ইকবাল-নজরুল সোসাইটিও ছিলো এখানে। দুই কবি মহাসমারোহে জায়গা করে নেন রেনেসাঁস আন্দোলনের সদস্যদের মনের মণিকোঠায়। এ দুই কবির লেখার সঞ্জীবনী শক্তিতে দিশেহারা জাতি সম্বিত ফিরে পায় বললে অত্যুক্তি হবে না।

দুই.

এ পর্যায়ে আমরা পাক-প্রেসিডেন্টবৃন্দের প্রদত্ত বাণীগুলোর অংশবিশেষ করে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো। বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে যে গুরুত্ব এবং আবেগ সম্বলিত পাক-প্রেসিডেন্টের বাণী আমাদের সন্মুখে উদ্ভাসিত হয়, ঠিক পরে তার থেকে তা কম গুরুত্ব পায়নি। কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁরা এতটুকুন খাটো করে দেখেননি, দেখার চেষ্টা করেননি-এটা তাদের মহানুভবতাই বলতে হবে। যাক, আমরা পাক-প্রেসিডেন্টেদের বাণীগুলো ইংরেজী ভাষায় হুবহু পেশ করছিঃ

ফিল্ম মার্শাল আইউব খান ১৯৬১ সালে নজরুল দিবস উপলক্ষ্যে বাণীতে বলেন ঃ

"Nazrul occupies a special place in modern Bengali literature and the intellectual life of the Sub-Continent.

"He sang of the common man and kindled in him a new flame of hope. His message underlines dauntless adherence to one's principles in life, in the face of heavy odds.

"Nazrul will always remain a source of inspiration in the cause of liberty and emancipation." Wish the Academy every success in the programme of celebrations."

১৯৬৩ সালে নজরুল দিবসে এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট আইউব বলেন ঃ

"Poetry like his inspires people and ennobles them. It also enriches literature: Gifted poetry is beautiful in itself. When it also serves a higher idea, it is something to be valued."

প্রেসিডেন্ট আইউব ১৯৬৪ সালে নজরুল দিবসে তাঁর বাণীতে বলেন ঃ

"Nazrul Islam appeared on the literary horizon of Bengal when the whole sub-continent was under the domination of a foreign power.

His impassioned poetry, reflected an indomitable spirit and made a significant contribution to the awakening of the Muslims. He opened for them a window of hope when they were enveloped in gloom. He had profound sense ofMuslim unity."

প্রেসিডেন্ট আইউব ১৯৬৭ সালে তাঁর বাণীতে বলেন ঃ

A soldier by training, Nazrul Islam was essentially a poet who within a short period of only twenty years opened up new vistas and established for himself a prominent position in the world of literature, His wide-ranging creative genius, embracing songs, ghazals, novels, dramas and short stories carried a stirring message of hope and confidence. He helped in the creation of a sense of pride and self-respect and a new sense of consiciousness to live with human dignity in a world free to fear. He boldly championed the cause of the down-trodden.

১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক নজরুল দিবসের বাণীতে বলেন ঃ

"Kazi Nazrul Islam was a great poet of Islam whose revolutionary works in the field of Bengali poetry and literature brought wide awakening among the Muslims and thus helped them marched to their cherished goal. Islam is a great motivating force which can inspire its followers to accomplish their goal—even the hardest way. This was amply demonstrated during the Pakistan Movement."

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ১৯৮০ সালে নজরুল দিবসের বানীতে বলেন ঃ

"The Islamic spirit, which Kazi" Nazrul Islam embodied in his poetry to revitalize the Muslims and to actuate them with courage and determination at the crucial juncture of our history, can inspire us even today to accomplish the

unfinish task and for work for the glory and prosperity of Pakistan."

১৯৮২ সালে নজরুল দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তার বাণীতে বলেনঃ

"Kazi Nazrul Islam is the great poet of Muslim Bengal, who heralded the spirit of struggle, hope and eventual triumph. The best way to pay homage to Kazi Nazrul Islam is to imbibe the dynamic spirit of his poetry and to translate his intense yearning in verse in to the practical realities of life. His poetic message will doubtless continue to be source of inspiration from generation to generation."

১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তার বাণীতে বলেন ঃ

"Kazi Nazrul Islam was a precusesor of the Pakistan Movement in the Eastern part of South Asian Sub-continent. His patriotic poems and songs aroused an all pervading Muslim renaissance which added irresistable strength to the consciousness that Muslims were a nation. In his inimmitable language imbued with the revolutionary spirit of Islam. Nazrul gave life to Muslim Bengal which eventually galvanised Muslim mind for complete support to the collective aspiration of the Muslims of Sub-continent."

১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট নজরুল দিবসের বাণীতে উল্লেখ করেন ঃ

"The spirit of Nazurl Islam, just as the motive force of Allama Iqbal. is alive. And with the Passage of time, we shall see greater assertiveness and hightened consciousness among the Muslims all over the world."

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ১৯৮৮ সারে নজরুল দিবসে তার বাণীতে বলেন ঃ

"I am heartily pleased to learn that the Nazrul Academy is organising as a part of their tradition special functions on the birthday of the great Bengali poet, Qazi Nazrul Islam.

Qazi Nazrul Islam needs no introduction. His poetry had always been based on Islam. Whatever he wrote before the establishment of Pakistan was written with a conscious effort to awaken the Muslims of South Asia and restore their separate identity. Although most of his work was produced in the Bengali language, the words and phrases of Arabic, Persian and Urdu used therein are indicative of his deep association and love of Islam.

I think that even if a part of this special fervour could somehow be passed on to the younger generation, it would make them aware to a great extent, of their own Islamic identity."

পাকিস্তানে নজরুল দিবসে পাক প্রেসিডেন্টরা বাণী প্রদান করেন। এর থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। আমাদের শিক্ষার এটিও একটি দিক।

তিন.

পাকিস্তানের করাচীতে যুগ পরিক্রমায় দাঁড়িয়ে থাকা নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং এর ঐতিহাসিক অতীত এ পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করবো।

১৯৫৩ সাল। মে মাসের ২৪ তারিখ। দিবসটি ছিলো বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৫-তম জন্মবার্ষিকী। বিদ্রোহী কবির জন্মদিবস এই প্রথমবারের মতো করাচীর খালিক দিনা হলে ঘটা করে পালিত হয়। তদানীন্তন আইনমন্ত্রী মিঃ এ কে ব্রোহী সভায় সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব পাকিস্তান সোসাইটির করাচী শাখা এ সভার আয়োজন করে। ঐদিনই খালিক দীনা হলে নজরুলের কালজয়ী জীবন ও কর্মের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং গবেষণার জন্য করাচীতে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির নামও ঘোষণা করা হয়। এ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় '৫৩ সালের ২রা জুন, ২৫ ভিক্টোরিয়া রোডে। এ মিটিংয়ে

উদ্যোক্তাদারকে নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওই সভায় নজরুল একাডেমীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিরূপিত হয় এভাবেঃ

"(i) To disseminate the message of poet Nazrul Islam and secure a just appreciation of his life and literature, and thereby promote the cause of cultural understanding in different parts of Pakistan and outside;

(ii) To start a library and arrange for occasional meetings, mushairas, debates, discussions and musical soirees centring round the poet's life and literature and cognate cultural matters

(iii) to publish standard works in English, Urdu and other Languages by translating the poets works in Bengali and other wise; and

(iv) to do all otehr works connected with the above objectives, including collection of funds for the poet's treatment."

উল্লেখ করা দরকার, মিঃ ব্রোহী একাডেমীর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। মিঃ ফখরুদ্দীন ও মিঃমীজানুর রহমান যথাক্রমে সেক্রেটারী ও ট্রেজারার নির্বাচিত হন। অবশ্য, একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় ১৯৫৩ সালের ১৫ জুন। একাডেমী অন্যান্য নজরুল সংস্থার সাথেও যোগাযোগ শুরু করে। কোলকাতা এবং লন্ডনেও যোগাযোগ করা হয়। লন্ডন থেকে পাক হাইকমিশনারে মাধ্যমে তদানীন্তন সময়ে কবির চিকিৎসার জন্য ৬,০০০ রূপীও প্রেরণ করা হয়।

স্মর্তব্য যে, ১৯৬৩ সালের ২৬ শে জুলাই রোবার করাচীর Ingle রোডে আনুষ্ঠানিকভাবে নজরুল একাডেমীর ফলক উন্মোচিত হয়। এ উপলক্ষে বিদ্রোহী কবির বিচিত্র জীবন ও কর্মের ওপর একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকায় গুরুত্বের সাথে দাবি করা হয় যে, করাচী নজরুল জীবনের স্মরণীয় স্থান। কারণ, ৪৯ বেঙ্গলী রেজিমেন্টে থাকাবস্থায় তিনি করাচী ক্যাম্পেই অবস্থান করেছিলেন। ১৯১৭ সালে নজরুল রেজিমেন্টে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। নজরুল করাচীতে ৩ বছর অবস্থান করেছিলেন। ১৯১৭ সালে নজরুল রেজিমেন্টে সৈনিক হিসেবে যোগ দান করেন। নজরুল করাচিতে ৩ বছর অবস্থানও করেছিলেন। তাঁর রেজিমেন্টগঞ্জ লেনে অবস্থান নেয়।

যাই হোক, প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী উর্দুভাষীদের মাঝে নজরুলের মেসেজ পৌছানোর জন্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে উর্দুভাষীদের জন্য বাংলা শিক্ষা আসরের ব্যবস্থা করা হয়। এ বছরই একটি লাইব্রেরী এবং রিডিং রুম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখ লাইব্রেরী এবং রিডিং রুমের উদ্বোধন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে করাচী সিটির বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। অনুষ্ঠানে ঘোষনা দেয়া হয় নজরুল একাডেমীতে আজ যে লাইব্রেরী এবং রিডিং রুমের উদ্বোধন করা হলো, এটি নগরীর অন্যতম বৃহত্তর পাঠাগারে রূপান্তরিত হবে। এ বছরই গানের ক্লাসও খোলা হয়। এ ছাড়া সহজ বাংলা পঠনরীতি নামে বইয়ের সিরিজও প্রকাশ করা হয়।

১৯৫৯ সালে একাডেমী পরিচালনায় নিম্নোক্ত সংযোজনী সম্পৃক্ত হয়।

ক. একাডেমীর জার্নাল প্রকাশের জন্য একটি সম্পাদনা কমিটি গঠিত হয়।

খ. লাইব্রেরী কমিটি।

গ. বাংলা ক্লাস পরিচালনা কমিটি।

ঘ. প্রকাশনা কমিটি।

ঙ. বালকদের খেলাধুলা পরিচালনা কমিটি।

চ. গান প্রশিক্ষণ কমিটি।

নতুন উদ্যম উদ্দীপনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এ একাডেমী। একাডেমী আয়োজন করে সাহিত্য সভার। 'শনিবার বৈঠক' নামে সিরিজ বক্তৃতা আরম্ভ করে। ১৯৬০ সালে একাডেমী নজরুল গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য 'নজরুল পদক' প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬২ সালে একাডেমী উর্দুভাষীদেরকে বাংলা শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে সিলেবাস রদবদলও করে। বাংলা প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই বিবেচিত হয়।

একাডেমী প্রতি বছর স্মরণিকা সংকলনের পাশাপাশি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে 'Art of Mainamati' নামে। এটি রচনা করছেন রোকেয়া রহমান কবীর। একাডেমী নজরুলের বিভিন্ন রচনার সমন্বয়ে প্রকাশ করেছে 'সংগ্রহ' নামে একটি সংকলন। ১৯৬৭ সালে নজরুল দিবস উপলক্ষে একাডেমী

ইউনুস আহমার রচিত 'নজরুল ইসলামঃ জিন্দেগী আওর ফান' নজরুল ইসলাম জীবন ও সাহিত্য শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া একাডেমী নজরুল গীতিও উর্দু ভাষায় প্রকাশ করে। 'উপবন' শিরোনামে একাডেমীর প্রাক্তন সেক্রেটারী মরহুম আফাজউদ্দীন আহমদের একটি প্রকাশনাও বের করে।

নজরুল একাডেমী করাচী বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন-কর্মসহ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কাজের ওপর গবেষণায় নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান। নিরলসভাবে এ সংগঠন উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। একাডেমী বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উর্দুতে উর্দু সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বাংলায় পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করলে সফল হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই মোবারকবাদ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. জনাব মাহমুদ আলীর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার।
২. একাডেমীর পরিদর্শন এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ।
৩. একাডেমীর লাইব্রেরীয়ানের সাক্ষাতকার।
৪. একাডেমীর প্রকাশনা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

সংকলিত ঃ দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ, ঢাকা, ৩১ জুলাই, '৯৭।

এক নজরে নজরুলের জীবনপঞ্জী

- ১৮৯৮ মতান্তরে ১৮৯৯ ঃ ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বাং, ১৩ মোহররম, ১৩১৭ হিজরী, বুধবার প্রত্যুষ্যে কবি নজরুল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানঃ গ্রাম-চুরুলিয়া, মহকুমা-আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। পিতার নামঃ কাজী ফকির আহমদ, মাতার নামঃ জাহেদা খাতুন। নজরুলের সহোদর তিন ভাই এবং এক বোন।
- ১৯০৮ ঃ পিতা কাজী ফকির আহমদের ইন্তেকাল।
- ১৯০৯ ঃ এই গ্রামের মক্তবে কবির লেখাপড়ার প্রথম হাতে খড়ি। পারিবারিক দীনতায় এই ছোট বয়সে মক্তব্যের শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, মসজিদের ইমামতি প্রভৃতি কাজ করেছেন কবি।
- ১৯১০ ঃ নজরুলের পাড়া পড়শিরা তৎাকে প্রথমে রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি করে দেন, কয়েক মাস পর নজরুল ঐ স্কুল ছেড়ে মাথরুন উচ্চ ইংরেজী স্কুল নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ।
- ১৯১১ ঃ অর্থনৈতিক কারণে লেখাপড়া ছেড়ে লেটোর দলে যোগদান করেন। লেটোর দলে গান, নাটক ও প্রহসন লিখে প্রচুর নাম করেন। নজরুলের স্বরচিত পালাগানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো, শকুনিবধ, চাষার সং, রাজপুত্র, আকবর বাদশাহ প্রভৃতি।
- ১৯১২ ঃ পর্যায়ক্রমে রেলগার্ডের বাসায় এবং রুটির দোকানে চাকুরী। পরবর্তীতে পুলিশ অফিসার কাজী রফিকউল্লার বাসায় আশ্রয় লাভ।
- ১৯১৪ ঃ কাজী রফিকউল্লার সাহায্যে ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি।
- ১৯১৫ ঃ প্রথমে নিউ স্কুল বা অ্যালবার্ট ভিক্টর ইন্সটিটিউশনে এবং পরে পুনরায় রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।
- ১৯১৭ ঃ বাঙ্গালী পল্টনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ। নওশেরায় ট্রেনিং শেষে করাচীর সেনানিবাসে অবস্থান। এখান থেকেই কবি'র সাহিত্য-চর্চা শুরু হয়।
- ১৯২০ ঃ বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়ার ফলে কবি নজরুল করাচী ছেড়ে কলিকাতা চলে আসেন। মে মাসে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রতিকায় যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৮ মাস চাকরি করার পর শেরে বাংলার সাথে মতানৈক্যের কারণে পদত্যাগ করেন।
- ১৯২১ ঃ এপ্রিল মাসে প্রকাশনা ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের সাথে কবি নজরুল প্রথম কুমিল্লার দৌলতপুরে আসেন। ১৮ জুন নার্গিসের সাথে আক্‌দ সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই বাসর ঘর না করেই দুর্ভাগ্যক্রমে নজরুল দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লায় প্রমীলাদের বাড়ীতে চলে যান। সেখানে প্রায় পনর দিন অবস্থান করেন। কুমিল্লা থেকে কলিকাতায় ফিরে এসে 'সেবক' পত্রিকায় যোগদান করেন। সেখানে স্বল্পকালীন ছিলেন। অক্টোবর মাসে 'ব্যথার দান' প্রকাশ।

ডিসেম্বরের ২ তারিখে প্রস্তাবিত দৈনিক 'নকীব'-এর পরিকল্পনাসহ ন্যাশনাল জার্নাল্‌স লিঃ এর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯২২ ঃ ৬ ফেব্রুয়ারী দৈনিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১১ আগষ্ট কবি-সম্পাদকের অর্ধ-সাপ্তাহিক ধুমকেতুর আত্মপ্রকাশ। ১২ আগষ্ট 'ধুমকেতু' পত্রিকা এবং অক্টোবরে "অগ্নিবীণা' প্রকাশ। ২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ী' কবিতার জন্য কবি নজরুল রাজরোষে পতিত হয়ে ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার হন।

১৯২৩ ঃ ১৫ জানুয়ারী (২মাঘ ১৩২৯ সাল) বিচারের রায়ে কবির এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়। রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি নজরুল ৩৯ দিন জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক কবি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন। কবি নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে ঐতিহাসিক জবনবন্দী দেন তা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে খ্যাত ছিলো। এ বছরই তা 'ধুমকেতু সারথি' শিরোনামে পুস্তিতাকারে এবং 'দোলনচাঁপা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ ঃ ২৪ এপ্রিল হুগলির মিসেস এম. রহমানের উদ্যোগে কলিকাতায় কুমিল্লার গিরিবালা সেনগুপ্তার কন্যা প্রমীলা ওরফে দুলীর সংগে নজরুলের বিয়ে। আগষ্টে 'ভাঙার গান' ও 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ এবং অক্টোবর ও ১১ নভেম্বর সরকার কর্তৃক বই দু'টি বাজেয়াপ্ত। 'রিক্তের বেদন' ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশ। 'ঝিঙেফুল' এ মাসেই প্রকাশ।

১৯২৫ ঃ ২৫ ডিসেম্বর নজরুলের সম্পাদনায় 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশ। জুলাই মাসে 'চিত্তনামা' ও 'পুবের হাওয়া' এবং সেপ্টেম্বরে 'ছায়ানট' প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বর মাসে কবি হুগলীতে অবস্থান করেন।

১৯২৬ ঃ ৩ জানুয়ারী নজরুল হুগলী থেকে সপরিবারে কৃষ্ণনগর চলে যান। মে মাসে কৃষ্ণ নগরে কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্বোধীন সংগীত 'কান্ডারী হুশিয়ার' স্বরচিত গানে কণ্ঠ দেন। সেখানে কৃষক সভায় 'কৃষকের গান ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র-সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন করেন। ৯ এপ্রিল কবির পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়। এ মাসেই 'রুদ্র মঙ্গল' প্রকাশ পায়। জুলাইয়ে 'সিন্দু হিন্দোল' প্রাকিশত হয়। ১২ আগষ্ট নজরুল-মুজফ্‌ফরের যৌথ উদ্যোগে 'গনবাণী'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২ সেপ্টেম্বর সর্বহারা ও 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রকাশিত হয়। এই বছরের শেষ দিকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন।

- ১৯২৭ ঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কবি ঢাকা সফর করেন এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। জুনে নওরোজ পত্রিকায় যোগদান। ৫ম সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে 'সওগাত' পত্রিকায় যোগদান। জুলাই-'ফনি-মনসা' এবং আগষ্টে 'বাঁধনহারা' প্রকাশিত হয়।
- ১৯২৮ ঃ ২৮ মে (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) কবি নজরুলের মা পরলোক গমন করেন। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরে রংপুরে বিপুলভাবে কবিকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। আগষ্টে 'জিঞ্জীর' ১৪ অক্টোবর 'সঞ্চিতা' এবং 'বুলবুল' প্রকাশিত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ঢাকা সফর। 'চল্ চল্ চল' বিখ্যাত গানটি তখন রচিত হয়।
- ১৯২৯ ঃ ১৫ ডিসেম্বর সওগাত লেখক গোষ্ঠির উদ্যোগে জাতির পক্ষ থেকে কলিকাতার এলবার্ট হলে নজরুলকে বিরাট সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জনাব এম, ওয়াজেদ আলী বার-এট-ল। ১২ আগষ্ট 'চক্রবাক' 'সন্ধ্যা' এবং ২১ ডিসেম্বর 'চোখের চাতক' প্রকাশ।
- ১৯৩০ ঃ আগষ্ট 'প্রলয় শিখা' প্রকাশ। ১৭ সেপ্টেম্বর এই গ্রন্থ রাজদ্রোহমূলক বলে বাজেয়াপ্ত হয়। কবির ছয় মাসের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়। গান্ধী-আরুউইন চুক্তি অনুসারে কবি কারাদন্ড থেকে অব্যাহতি পান। ৭ মে বসন্ত রোগে কবিপুত্র বুলবুলের মৃত্যু। ১৬ জুন 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' ১৫ নভেম্বর 'ঝিলিমিলি' প্রকাশ। ২৫ অক্টোবর রাজদ্রোহী কবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা। ৬ নভেম্বর গ্রেফতার।
- ১৯৩১ ঃ সিনেমা ও থিয়েটারে যোগাযোগ ও অভিনয়। ২১ জুলাই 'কুহেলিকা', ২৫ আগষ্ট 'নজরুল-স্বরলিপি' সেপ্টেম্বর 'চন্দ্রবিন্দু', ১৬ অক্টোবর 'শিউলিমালা' ডিসেম্বর 'আলেয়া' প্রকাশিত। ২১ ফ্রেব্রুয়ারী ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ-এর সুর ভান্ডারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
- ১৯৩২ ঃ ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের অধিবেশনে

সভাপতি হিসাবে নজরুল 'যৌবনের ডাক' অভিভাষণটি পাঠ করেন। ৭ জুলাই 'সুরসাকী', আগষ্টে 'কাব্য আমপারা' ১৭ সেপ্টেম্বর 'বনগীতি' এবং এ মাসেই 'জুলফিকার' প্রকাশ।

- ১৯৩৩ ঃ এপ্রিল 'পুতুলের বিয়ে' ২৭ জুলাই 'সাত ভাই চম্পা' ও 'গুলবাগিচা' প্রকাশ।
- ১৯৩৪ ঃ এপ্রিলে 'গীতি শতদল' ১৬ আগষ্ট 'সুর লিপি', ৪ অক্টোবর 'সুর মুকুর', ২৩ অক্টোবর 'গানের মালা' প্রকাশ।
- ১৯৩৫ ঃ ৩১ জুলাই 'মক্তব সাহিত্য' প্রকাশ।
- ১৯৩৬ ঃ ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব।
- ১৯৩৭ ঃ কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ১৯৩৮ ঃ এপ্রিল মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে কাব্য শাখার সভাপতিত্ব। এপ্রিল মাসে নাট্য নিকেতনে মঞ্চস্থ সন্মথ রায়ের 'সতী' নাটকের সব গান রচনা ও সুর দেন। কলকাতা বেতারে অনুষ্ঠান ছাড়াও চলচ্চিত্রে কাজ করেন।
- ১৯৩৯ ঃ ২৩ জানুয়ারী 'নির্ঝর' প্রকাশ।
- ১৯৪০ ঃ অক্টোবর মাসে শেষ পর্যায়ে (পুনঃ) প্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগের' প্রধান সম্পাদক।
- ১৯৪১ ঃ মার্চ মাসে বন গাঁ সাহিত্য সভায় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব। ৫ ও ৬ এপ্রিল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতিত্ব ও শেষ ভাষণ "যদি আর বাঁশী না বাজে"। ২৪ মে নজরুলের ৪০তম জন্মোৎসব; সভাপতি ছিলেন কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী।
- ১৯৪২ ঃ ১০ জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯ জুলাই মধুপুরে গমন ও ২১ শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। অক্টোবরে লুম্বিনী পার্কে চিকিৎসার জন্য ভর্তি। তিন মাস পর চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।
- ১৯৪৪ ঃ ২২ জানুয়ারী অসুস্থতার কারণে 'নবযুগ' মোকদ্দমায় সাজা মওকুফ।
- ১৯৪৫ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'জগত্তারিনী' স্বর্ণপদক প্রদান করেন।
- ১৯৫২ ঃ নজরুল নিরাময় সমিতি গঠনঃ রাঁচিতে চিকিৎসার জন্য কবি ও কবি পত্নীর অবস্থান কিন্তু স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়নি।
- ১৯৫৩ ঃ নজরুল সাহায্য সমিতির উদ্যোগে ১০ মে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাত্রা এবং সেখান থেকে ডিসেম্বর মাসে ভিয়েনার প্রেরণ। চিকিৎসার ব্যর্থ হয়ে ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
- ১৯৬০ ঃ ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান।
- ১৯৬২ ঃ ৩০ জুন কবিপত্নী প্রমীলার মৃত্যু ও কবির স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় দাফন।
- ১৯৭৩ ঃ ২৪ মে কবিকে বাংলাদেশে আনয়ন এবং বাংলাদেশে অবস্থান।
- ১৯৭৪ ঃ কবিপুত্র কাজী অনিরুদ্ধের পরলোক গমন।
- ১৯৭৫ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে ডিলিট উপাধি প্রদান।
- ১৯৭৬ ঃ জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান। ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২১শে পদক প্রদান। ২৫ মে ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে গিয়ে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি 'ক্রেষ্ট' উপহার দেন।
- ১৯৭৬ ঃ ২৯ আগষ্ট রবিবার সকাল ৯টায় ঢাকার পিজি হাসপাতালে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে কবির পরলোক গমন। বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সমাধিস্থ করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে সর্বদলীয় নাগরিক শোক-সভা।
- ১৯৭৭ ঃ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কাবিকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

কবি অসুস্থ হবার পর যে সব বই প্রকাশিত হয় তা হলো ঃ ২৩ মার্চ (১৯৪৫) 'নতুন চাঁদ' ১৩৫৭ সনে 'মরু-ভাস্কর' ১১জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ সালে 'বুলবুল (দ্বিতীয় খন্ড)', ১৩৬২ বা ১৯৫৫ সালে 'সঞ্চয়ন' ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫ (১৯৫৯) 'শেষ সওগাত' পৌষ ১৩৬৫ (ডিসেম্বর ১৯৫৯) 'রুবাইয়াৎ-ই- ওমর খৈয়াম', ..১৩৬৫ সালে (১৩৪৪ সালে রচিত) "মধুবালা", ১৭ নভেম্বর ১৯৬০ সালে 'ঝড়'। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সালে 'ধুমকেতু'। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ সালে নজরুল রচনা সম্ভার। ১৩৭০ সালে 'পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে'। অগ্রহায়ণ ১৩৭১ সালে 'ঘুম জাগানো পাখী'। শ্রাবন ১৩৭২ সালে 'ঘুম পাড়ানো মাসী-পিসি'। বৈশাখ ১৩৭৩ সালে 'রাঙা জবা'। ১৩৭৫ সালে 'দেবী স্তুতি'। শ্রাবণ ১৩৭৭(১৯৭০) "সন্ধ্যা মালতী"। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ (২৫ মে ১৯৬৬) "নজরুল-রচনাবলী"ঃ প্রথম খন্ড। [দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণঃ ফালগুন ১৩৮১ ঃ ২১

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫] ৯ পৌষ ১৩৭৩, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৭ 'নজরুল রচনাবলী' দ্বিতীয় খন্ড। ৯ ফাল্গুন ১৩৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ [দ্বিতীয় প্রকাশঃ শ্রাবণ ১৩৮৩ঃ আগষ্ট ১৯৭৬] ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ঃ ২৫ মে ১৯৭৭ 'নজরুল রচনাবলী' চতুর্থ খন্ড', বৈশাখ।
১৩৮৯ ঃ এপ্রিল ১৯৮২ "নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' প্রকাশিত হয়।

নজরুলের লেখা বইগুলোর মধ্যে কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি, কিশোর কাব্য ২টি, উপন্যাস ৩টি, গল্প গ্রন্থ ৩টি, নাটক ৩টি, কিশোর নাটিকা ২টি, প্রবন্ধের বই ৫টি চলচ্চিত্র কাহিনী ২টি, রেকর্ড নাট্য ২টি এবং গান পাঁচ হাজারেরও অধিক।

এক নজরে রবীন্দ্রনাথের জীবনপঞ্জী

- ৭ মে ১৯৬১ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮) রাত আড়াইটার পর কলকাতায় পৈতৃক বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও সারদাদেবীর (১৮২৪-১৮৭৫) চতুর্দশ সন্তান। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) পৌত্র।
- ১৮৬৮-৭২। বয়স ৭-১১। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল ও বেঙ্গল একাডেমীতে অনিয়মিত অধ্যয়ন। বাড়িতে জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বিবিধ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষালাভ। ব্যায়ামচর্চা কাব্য রচনার সূত্রপাত (১৮৬৯)।
- ১৮৭৩-৭৫। বয়স ১২-১৪। উপনয়ন। পিতার সাথে বোলপুর হয়ে হিমালয় গমন। পিতার কাছে শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রভাব লাভ। অভিলাষ কবিতা রচনা ও ম্যাকবেতের অংশবিশেষ বঙ্গানুবাদ। মাতৃবিয়োগ ৮ মার্চ ১৮৭৫।
- ১৮৭৭। বয়স ১৬। ভারতী পত্রের প্রকাশ। ভারতীতে নিয়মিত সকল প্রকার রচনা প্রকাশ ভানুসিংহ ঠাকুরে পদাবলী, ভিখারিনী, করুণা, কবি কাহিনী।
- ১৮৭৮-৮০। বয়স ১৭-১৯। বিলেত যাত্রার আগে আমেদাবাদে বাস, সেখানে নিজে সুর দিয়ে গান রচনা। বিলেতযাত্রা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যয়নের জন্যে ভর্তি। বিলেতে অবস্থান সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৮০। বনফুল।
- ১৮৮১-৮৩। বয়স ২০-২২। বাল্মীকি প্রতিভা রচনা ও বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে চন্দননগরে বাস। ১০ নং সদর স্ট্রিটে দিব্যদর্শন (১৮৮২) ও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা। কারোয়ার বাস। মৃণালিনীর সাথে বিয়ে ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩।
  ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, সন্ধ্যাসঙ্গীত, কালমৃগয়া, বৌ ঠাকুরানীর হাট, প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ।
- ১৮৮৪। বয়স ২৩। নতুন বৌদিদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ১৯ এপ্রিল ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিয়োগ।
- ১৮৮৫-৯১। বয়স ২৪-৩০। রামমোহন রায়, আলোচনা, রবিচ্ছায়া, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, চিঠিপত্র, সমালোচনা। জাতীয় কংগ্রেসে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে গান গাওয়া। মাধুরী লতা (১৮৮৬) ও রথীন্দ্রনাথের (১৮৮৮) জন্ম। মায়ার খেলা। মানসী (১৮৯০)। য়ুরোপ প্রকাশ পরে শিলাইদহে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ, ১৮৯০। রাজা ও রানী ও বিসর্জন নাটকে অভিনয়। হিতবাদীপত্রে পোস্ট মাস্টার ইত্যাদি ছোটগল্প। শান্তি নিকেতন মন্দিরের উদ্বোধন। সাধনা পত্র প্রকাশ। রেনুকার জন্ম।
- ১৮৯২। বয়স ৩১। চিত্রাঙ্গদা ও গোড়ায় গলদ। মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদানের সমর্থনে 'শিক্ষার হেরফের'। সোনার তরীর সূচনা।
- ১৮৯৩-৯৪। বয়স ৩২-৩৩। উড়িষ্যা ভ্রমণ। বঙ্কিম চন্দ্রের সভাপতিত্বে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ। সাধনায় 'মেয়েলী ছড়া' 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। মীরার জন্ম। 'য়ুরোপ প্রবাসীর ডায়ারি ২য়, সোনার তরী, ছোট গল্প, বিচিত্র গল্প ১ম, কথা চতুষ্টয়, বিদায় অভিশাপ।
- ১৮৯৫-৯৭। বয়স ৩৪-৪৬। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের স্বদেশী শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য। ক্ষুধিত পাষাণ রচনা। শমীন্দ্রনাথের জন্ম। ১৮৯৬ সালে রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতঃ আয় ভুবনমনোমোহিনী। ১৮৯৭ নাটোরে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান। গল্প দশক, নদী, চিত্রা, কাব্য গ্রন্থাবলী, বেকুণ্ঠের খাতা, পঞ্চভূত।
- ১৮৯৮। বয়স ৩৭। ভারতীয় সম্পাদনা। ১২ ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠ। সিডিশন এ্যাক্টের প্রতিবাদে টাউন হলে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ। ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান। লক্ষ্মীর পরীক্ষা। বলেন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে

ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

- ১৮৯৯-১৯০০। বয়স ৩৮-৩৯। কলকাতায় প্লেগ। ১৮৯৯- সেবাকাজে ভগিনী নিবেদিতাকে সহযোগিতা। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও স্বদেশী শিল্প ব্যবসায়ের অবসান। 'কনিকা', 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', গল্প গুচ্ছ ১ম। ৭ পৌষ শান্তি নিকেতনের মন্দিরে উপাসনা, প্রথম ভাষণ ও আচার্যকৃত্য।
- ১৯০১। বয়স ৪০। নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে চোখের বালি'র সূচনা। ব্রহ্মমন্ত্র, গল্প, নৈবেদ্য, বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা'। মাধুরীলতা ও রেণুকার বিয়ে। বিলেতে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ত্রিপুরার মহারাজের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ। ৭ পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। শিক্ষকমন্ডলী জগদানন্দ রায়, উইলিয়ম লরেন্স, রেবাচাঁদ শিবধন বিদ্যাপর্ব, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র রায়।
- ১৯০২-০৪। বয়স ৪১-৪৩। বিদ্যালয়ে অর্থাভাব। পুরীর জমি ও স্ত্রীর গহনা বিক্রি। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু, ২৩ নভেম্বর ১৯০২। স্মরণ, রেণুকার মৃত্যু ১৯০৩। বঙ্গদর্শনে নৌকাডুবির ধারাবাহিক প্রকাশ, ৯টি ভাগে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, তার মধ্যে সপ্তমভাগে শিশু। হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে 'স্বদেশী সমাজ' ও টাউন হলে 'শিবাজি উৎসব' পাঠ, ১৯০৪। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে 'আত্মজীবনী' বঙ্গানুবাদ।
- ১৯০৫। বয়স ৪৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯ জানুয়ারী। ভাণ্ডারপত্র প্রকাশ। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে নিবেদিতা ও কাকুরা হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সাথে যোগ। বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব। টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' পাঠ। দেশপ্রেমমূলক গান ও বক্তৃতা। রাখী বন্ধন। 'আত্মশক্তি', 'বাউল', 'স্বদেশ'।
- ১৯০৬। বয়স ৪৫। কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ চন্দ্রকে আমেরিকা প্রেরণ। 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া', নৌকাডুবি'। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে সহযোগিতা।
- ১৯০৭। সমাজসেবায় অভিনিবেশ। 'ব্যাধি ও প্রতিকা'। 'গোরা' উপন্যাসের সূচনা। মীরার বিয়ে। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। গদ্য গ্রন্থাবলীতে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'চারিত্রপূজা' 'প্রাচীন সাহিত্য', লোকসাহিত্য, সাহিত্য, হাস্য কৌতুক ইত্যাদি প্রকাশ।
- ১৯০৮। বয়স ৪৭। পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব। 'পথ ও পাথেয়', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', শারদোৎসব, 'শিক্ষা'।
- ১৯০৯-১১। বয়স ৪৮-৫০। 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম', প্রায়শ্চিত্ত। 'তপোবন' আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা। গোরা, গীতাঞ্জলি 'রাজা'। 'শান্তিনিকেতন'। প্রবাসী পর্বে 'জীবনস্মৃতি'। ১৯১১ জাতীয় কংগ্রেসে 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে' গান গাওয়া হয়।
- ১৯১২-১৩। বয়স ৫১-৫২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি সংবর্ধনা, ১২ জানুয়ারী, ১৯১২। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ, ১৬ মার্চ ১৯১২। 'ডাকঘর', গল্প চারিটি, 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', অচলায়তন। Gitanjali-র সূচনা।
রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীসহ তৃতীয়বার বিদেশযাত্রা। ইংল্যাণ্ডে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ রোটেনস্টাইনকে প্রদর্শন এবং ঘরোয়া সভায় বিদ্বজ্জন সমক্ষে কবি ইয়েটস-এর গীতাঞ্জলির কবিতা পাঠ। ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক Gitanjali প্রকাশ। সি এফ এনড্রুজের সাথে পরিচয়। সুরুল কুঠি ক্রয়। আমেরিকা গমন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক ভাষণ Sadhana নামে প্রকাশ। আইরিশ থিয়েটার কর্তৃক post office মঞ্চস্থ। দেশে প্রত্যাবর্তন। Gitanjali-র জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব সংকল্পিত ডি লিট উপাধি কাল।
- ১৯১৪-১৫। বয়স ৫৩-৫৪। পিয়ার্সনের শান্তিনিকেতনে বাসগ্রহণ। এন্ড্রুস ও নন্দলালের আশ্রম পরিদর্শন। সবুজ পত্রের সূচনা। ফিনিক্স স্কুলের ছাত্র শিক্ষকদের আশ্রমে আগমন। গান্ধীজী ও কস্তুরবার আগমন। সবুজ পত্রে প্রকাশ ফাল্গুনী, বলাকা, চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে। গীতিমাল্য, গীতালি। ১৯১৫। নাইট উপাধি লাভ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তসহ কাশ্মীর ভ্রমণ। বলাকার কয়েকটি কবিতা রচনা। ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীয়র ত্রিশতবর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে সনেট প্রেরণ।
- ১৯১৬-১৮। বয়স ৫৫-৫৭। বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ তহবিলের জন্য ফাল্গুনী অভিনয়। ৪র্থ বার বিদেশ যাত্রা, মে ১৯১৬-মার্চ ১৯১৭। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা। আমেরিকায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা Nationalism & personality. জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল কর্তৃক কবি সংবর্ধনা। এ্যানি ব্যাসাণ্ডের অনুরোধে আলফ্রেড থিয়েটারে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, পাঠ। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধ। স্যাডলার কমিশন ও ভারত সচিব মন্টেগুর সাথে সাক্ষাৎকার। কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে India's prayer' পাঠ। তোতা কাহিনী রচনা। মাধুরীলতার মৃত্যু, ১৬ মে ১৯১৮। শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়, পরিচয়, বলাকা, গল্প সপ্তক পলাতকা।

◆ ১৯১৯। বয়স ৫৮। দক্ষিণ ভারত পর্যটন। আদেয়ারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে ভাষণ। শান্তিনিকেতন পত্রের প্রকাশ ও সম্পাদন। জালিয়ান ওয়ালাবাগে হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ ৩০ মে। বিশ্বভারতীয় কাজে আত্মনিয়োগ ও অধ্যাপনা। জাপানযাত্রী। লিপিকা'র বহু রচনা।

◆ ১৯২০-২১। বয়স ৫৯-৬০। পশ্চিম ভারত পরিক্রমা। জালিয়ান ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি বার্ষিকীতে বিবৃতি প্রেরণ। পঞ্চম বিদেশ যাত্রা মে ১৯২০। ফ্রান্সে বেরগম সিলজাঁ সেভি প্রভৃতি গুণীজনের সাথে সাক্ষাৎকার। হল্যাণ্ডে বিপুল সমাদর হেগ ও লিডেনে বক্তৃতা। আমেরিকায় গমন ও বক্তৃতা। পুনরায় ইংল্যাণ্ড হয়ে ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে গমন। রোম্যাঁ রোলা, কাউনট, কেসার লিং, টমাসমান প্রভৃতি মনীষীর সাথে সাক্ষাৎ ১৯২০। দেশে প্রত্যাবর্তন, জুলাই ১৯২১। শিকার মিলন, সত্যের আহবান, গান্ধীজির জবাব The Gnat Sentind । বর্ষ মঙ্গল উৎসব। শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্টর আগমন। মিলভঁ্যা লেভির বিশ্বভারতীতে আগমন। ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ বিশ্বভারতীর উদ্বোধন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনের সমুদয় সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান।

◆ ১৯২২। বয়স ৬১। দক্ষিণ ভারত শ্রীলংকা ভ্রমণ। প্রবাসীপত্রে মুক্তধারা, লিপিকা, শিশু ভোলানাথ। Crenative unity প্রকাশ।

◆ ১৯২৩। বয়স ৬২। বিশ্বভারতীয়কে বাংলা গ্রন্থস্বত্ব দান Visva Bharati Quarterly প্রকাশ। পশ্চিম ভারতে গমন। বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়। বসন্ত।

◆ ১৯২৪। বয়স ৬৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা। চীনে আমন্ত্রণ। জাপান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। পেরুর আমন্ত্রণে আমেরিকা যাত্রা। পূরবীর কবিতা ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', রচনা। প্রবাসীপত্রে রক্তকরবী।

◆ ১৯২৫। বয়স ৬৪। ইতালী হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু, ৪ মার্চ। গান্ধীজীর শান্তি নিকেতনে আগমন। বিশ্বভারতীতে কার্লো ফর্মিকির আগমন। প্রথম ভারতীয় ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসে সভাপতিত্ব। পূরবী, গৃহপ্রবেশ, প্রবাহিনী।

◆ ১৯২৬। বয়স ৬৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোধান, ১৮ জানুয়ারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা। আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজ কর্তৃক সংবর্ধনা। ইতালীর আমন্ত্রণে অক্টোবর বিদেশযাত্রা। মুসোলিনী কর্তৃক রাজকীয় সংবর্ধনা। ইতালীয় ভাষায় চিত্রাঙ্গদা অভিনয়, বোয়্যাঁ রোলার আমন্ত্রণে সুইজারল্যাণ্ডে গমন ও জর্জ দুহামেস প্রমুখ মনীষীদের সাথে সাক্ষাৎ। ফ্যাসিস্ট সরকারের স্বরূপ পরিচয় লাভ এবং প্রতিবাদে ম্যাকেস্টার গার্ডিয়ানে পত্রপ্রেরণ। অস্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড হয়ে নরওয়ে ও সুইডেনে যাত্রা। নরওয়ের রাজার অভ্যর্থনা। বোয়ারসন, যোহান বোয়ার, নানসেন, স্বেন হেডিন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার। ডেনমার্ক হয়ে জার্মানীতে আগমন এবং বার্লিনে ভারত দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিসর হয়ে সাত মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্তন। লেখন ও বৈকালী মুদ্রণ। চিরকুমার সভা, শোধরোধ, নটীরপূজা।

◆ ১৯২৭-২৮। ২৫ শে বৈশাখে কোলকাতায় বিচিত্রা ভবনে কবির তুলাদান হয়, অর্থাৎ বিশ্ব ভারতী থেকে তাঁর ওজনের সমান ওজনের বই সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীকে দেয়া হয়। বয়স ৬৬। ভারতপুর, জয়পুর, আগা ও আমেদাবাদে ভ্রমণ। বিলা শিলংয়ে অবস্থান ও যোগাযোগ উপন্যাসের সূচনা। নটরাজ, ঋতুরঙ্গ।

◆ ১৯২৯। বয়স ৬৮। দশমবার বিদেশ যাত্রা। জাপান হয়ে ভ্যাংকুভারে গমন ও বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দোচীন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। তপতী, অভিনয়ে বিক্রমের ভূমিকায় কবি। 'যাত্রী', 'যোগাযোগ' শেষের কবিতা, তপতী, মহুয়া।

◆ ১৯৩০। বয়স ৭০। সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন। কবিকে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের 'কবি সার্বভৌম' উপাধিদান। হিজলি বন্দীশিবিরে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে জনসভায় বক্তৃতা, ২৬ সেপ্টেম্বর। টাউন হলে সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিপুল সংবর্ধনা, ২৭ ডিসেম্বর। The Golden Book of Tagore প্রকাশিত 'প্রশ্ন' কবিতা রচনা।

'রাশিয়ার চিঠি', বনবানী। 'সহজ পাঠ'। গীতবিতান ও সঞ্চয়িতা। শাপ মোচন।

- ১৯৩১। বয়স ৬৯। পুনরায় বিদেশযাত্রা। ফ্রান্স হয়ে ইংল্যাণ্ড গমন। অক্সফোর্ডে হিবারট লেকচার, পরে গ্রন্থকারে Religion of man নামে মুদ্রিত। জার্মানীতে আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎকার। ডেনমার্ক হয়ে রাশিয়া গমন। রাশিয়ার সর্বত্র বিপুল সংবর্ধনা। আমেরিকা গমন। ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক, রাশিয়া ও আমেরিকা চিত্র প্রদর্শনী। The Child রচনা। 'ভানুসিংহের পদাবলী।
- ১৯৩২। বয়স ৭১। গান্ধীজীর কারাবরোধ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আমন্ত্রিত হয়ে পারস্য গমন। রেজা শাহ পাহলবী ও ইরানবাসীর বিপুল সংবর্ধনা। ইরাক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। পরিশেষে কালের যাত্রা, পুনশ্চ। গান্ধীজীর অনশনে উদ্বেগ ও পুনায় গমন। মদনমোহন মালব্যের শান্তিনিকেতন আগমন। কলকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব। গীত বিতান, ৩য় খন্ড।
- ১৯৩৩। বয়স ৭২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা 'মানুষের ধর্ম', শিক্ষা 'বিকিরণ', 'ছন্দ'। বোম্বাই যাত্রা। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা 'man'। রামমোহন মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব। ভারতপথিক, রামমোহন রায়। দুইবোন, বিচিত্রিতা, চন্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'।
- ১৯৩৪। বয়স ৭৩। শান্তিনিকতনে সরোজিনী নাইডু ও সস্ত্রীক জওহরলাল নেহরুর আগমন। শান্তি নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শ্রীলংকা ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার অভিনয়ে ঠাকুরদার ভুমিকায় রূপদান। শেষ সপ্তক ও বীথিকা।
- ১৯৩৫। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া 'ডক্টর' উপাধি গ্রহণ। সিনেট হলে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' সম্পর্কে বক্তব্য।
- ১৯৩৬। বয়স ৭৫। শিক্ষা সপ্তাহে বক্তৃতা 'শিক্ষার ধারা'। অর্থ সংগ্রহে উত্তর ভারত ভ্রমণ। গান্ধীজীর সাহায্যে ৬০ হাজার টাকা সংগ্রহ। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ বক্তৃতা। ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লাভ। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, পত্রপুট, ছন্দ শ্যামলী, 'সাহিত্যের পথে'। 'জাপানে পারস্যে', 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ।'
- ১৯৩৭। বয়স ৭৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কবির বাংলায় অভিভাষণ। চীনা ভবনের উদ্বোধন। 'খাপছাড়া', 'কালান্তর'। আলমোড়ায় অবদান ছড়ার ছবি ও বিশ্বপরিচয় রচনা। গুরুতর অসুস্থতার পর প্রান্তিক রচনা।
- ১৯৩৮। বয়স ৭৭। শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু এন্ড্রুজের হিন্দিভবনের ভিত্তিস্থাপন। কবির ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লাভ। গান্ধীজির সাথে সাক্ষাৎ। কালিম্পঙ ও মংপুতে গ্রীষ্মবাস। শান্তি নিকেতনে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আগমন। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য, 'পথে ও পথের প্রান্তে' সেঁজুতি, 'বাংলা ভাষা পরিচয়', মুক্তির উপায়। poet to poet (নোগুচির পত্র ও উত্তর)।
- ১৯৩৯। বয়স ৭৮। ২১ জানুয়ারী জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্রের আশ্রমে আগমন। হিন্দি ভবনের উদ্বোধন; ৩১ জানুয়ারী। কবির উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। চীনা শিল্পী জু পিয়ঁর শান্তিনিকেতনে অতিথি শিল্পী অধ্যাপক রূপে যোগদান। কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্বোধন। পুরীতে বাস। মংপু ও কালিম্পঙে গ্রীষ্মবাস। মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ১৯ আগষ্ট। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন ১৬ ডিসেম্বর। 'প্রহাসিনী', আকাশ প্রদীপ, শ্যামা নৃত্যনাট্য, 'পথের সঞ্চয়'। রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম ও ২য় খন্ডের প্রকাশ।
- ১৯৪০। বয়স ৭৯। গান্ধীজী ও কস্তরবার আশ্রমে আগমন, ১৭ ফেব্রুয়ারী। এন্ড্রুজের পরলোকগমন, ৫ এপ্রিল। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লাভ। ৭ আগস্ট। কালিম্পঙে রোগের আক্রমণ, ২৬ সেপ্টেম্বর। 'নবজাতক', 'সানাই', 'ছেলেবেলা', তিন সঙ্গী' রোগ শয্যা। চিত্রলিপি (রবীন্দ্রনাথের ছবি চিত্রালি)।
- ১৯৪১। বয়স ৮০। ১ বৈশাখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি উৎসব। জন্ম দিনের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট'। আরোগ্য, জন্মদিনে, গল্পসল্প, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। দেশব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব। ত্রিপুরার মহারাজার 'ভারত ভাস্কর' উপাধিদান, ১৩ মে। লেডি রাথবোনের খোলা চিঠির উত্তরে রোগশয্যা থেকে বিবৃতি, ৪ জুন। পীড়ার বৃদ্ধি। কবিকে কলকাতায় আনয়ন। ৩০ জুলাই অস্ত্রোপাচারের আগে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা 'তোমার দৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'। ৭ আগস্ট, ১৯৪১ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখী পূর্ণিমার দিন, বেলা ১২টার কিছু পরে, ৮০ বছর ৩ মাস বয়সে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে দেহত্যাগ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। সুন্দরবনের ইতিহাস, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৬।

২। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বুক স্ট্যান্ড, কলকাতা, ১৩৫২।

৩। নজরুল যুগ.....

৪। ইতিহাস কথা কয়, মুহম্মদ আবু তালিব, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫। দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনুদিত, বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪।

৬। নওয়াব সলিমুল্লাহ, আলহাজ্ব মোঃ সিরাজউদ্দিন, ১৯৯৭।

৭। বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব তালুকদার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯২।

৮। ইতিহাসের অন্তরালে, ফারুক মাহমুদ, ওয়েসিস বুক, ১৯৮৯।

৯। দিন যাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ, হায়াৎ মামুদ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮।

১০। বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ৯২তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন স্মারক '৯৭, বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র।

১১। আর কোন পলাশী নয়, পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক '৯৭।

১২। ইব্রাহীম খাঁ রচনাবলী, আবদুল মজিদ সম্পাদিত (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

১২। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭), ডঃ এম. এ. রহীম, দ্বিতীয় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

১৩। পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি (ই ওমডধম-মেফর্ধধডটফ ঔর্ধ্রমরহ মত ঈটভথটফ গ্রন্থের আংশিক বঙ্গানুবাদ), কামরুদ্দীন আহমদ, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৩ বাংলা।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, কামাল উদ্দিন হোসেন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৮।

১৫। মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ঃ দিলওয়ার হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৬। রবীন্দ্রালোক, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা তোফায়েল আহমদ, ১৯৯৭।

১৭। এক শ' বছরের রাজনীতি, আবুল আসাদ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৮। ইতিহাস কথা কয়, মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭।

১৯। কবিতীর্থ চুরুলিয়া, আবদুল হাই সিকদার, আল-আমীন ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৬।

২০। পাঁচ হাজার বছরের বাঙলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, এ. এফ. এম. আবদুল জলীল, কাকলি পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

২১। বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ঃ চিন্তা ও কর্ম, ইমরান হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

২২। ভারতবর্ষ- পাকিস্তান পর্বে ছিল না- বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নাই, এম. আর. চৌধুরী, দি ডলফিন এন্টারপ্রাইজ, ১৯৮৯।

২৩। মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, আসকার ইবনে শাইখ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

২৪। উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫), তৃতীয় খন্ড, মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৫। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, ১৩৭৬।

২৬। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা মুহম্মদ আবু তালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯০।

২৭। বিতাড়িত রাজা ফারুক, আনিস সিদ্দিকী, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৩।

২৮। ভাষা আন্দোলন ঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৭।

২৯। লোক সাহিত্য, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ১ম খন্ড, মুক্তধারা, ১৯৬৩।

৩০। মওলানা আকরাম খাঁ, সম্পাদনায় আবু জাফর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

৩১। অতীত দিনের স্মৃতি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, খোশরোজ কিতাব মহল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫।

৩২। খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা রচনাবলী, গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, জয় পাবলিশার্স, বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

৩৩। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

৩৪। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ, প্রথম খন্ড (পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩), সৃজন প্রকাশনী লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৮।

৩৫। বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, ২য় খণ্ড, কামরুদ্দীন আহমদ, ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৯৯১।

৩৭। আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যা এবং এপ্রিল-জুন '৯৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর '৯৫ সংখ্যা।

৩৮। নওয়াব সলিমুল্লাহ ঃ জীবন ও কর্ম, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

৩৯। বাংলা নাটকের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, অজিত কুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৮।

৪০। মহাকালের নজরুল, মোহাম্মদ ইমরানুল বারী, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

৪১। সুনির্বাচিত নজরুল গীতি গুচ্ছ, কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৩৮০।

৪২। রবীন্দ্রনাথ ঃ কিশোর জীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম, ১৩৮৩ এবং মুক্তধারা তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫।

৪৩। ভুলে যাওয়া ইতিহাস, এস. এ. সিদ্দিকী, ১৯৭৫।

৪৪। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪।

৪৫। যুগস্রষ্টা নজরুল, তৃতীয় সংস্করণ, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

৪৬। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কাজী আবদুল মান্নান, মডার্ন লাইব্রেরী, ১৯৮৯।

৪৭। অজানা নজরুল, শেখ দরবার আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮।

৪৮। 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়', সুফী জুলফিকার হায়দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক কেন্দ্র, ১৯৯৬।

৪৯। বাঙলাদেশ, সম্পাদনায়- মনসুর মুসা, বাঙ্লা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।

৫০। প্রত্যাশা, সম্পাদনায়- আবদুল মুকীত চৌধুরী, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৭।

৫১। আবুল ফজল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৮২।

৫২। নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৮।

৫৩। পারস্য যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৩।

৫৪। আমি স্মৃতি, আমি ইতিহাস, মোজাহারুল ইসলাম, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৪।

৫৫। বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, দিলওয়ার হোসেন, ১৯৮৪।

৫৬। যৎকিঞ্চিৎ, এস. মুজিবউল্লাহ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৮৭।

৫৭। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, রজত-জয়ন্তী (১৯৬৪-৮৯) উপলক্ষে বিশেষ সংস্করণ, ১৯৮৯।

৫৮। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, ১৯৮৫।

৫৯। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৯৮৭।

৬০। নজরুল অ্যালবাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৪।

৬১। জাহানারার আত্মকাহিনী, শ্রী মাখনলাল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩৫৭।

৬২। পারস্যে রবীন্দ্র চর্চা, আনিসুর রহমান, ১৯৯৩।

৬৩। পারস্যে রবীন্দ্রনাথ, আনিসুর রহমান, ১৯৯৫।

৬৪। নজরুল একাডেমী পত্রিকা, নব পর্যায় ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৫৯।

৬৫। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫) ১ম খণ্ড, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা সংকলন, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬২।

৬৬। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, নবম সংস্করণ, ১৩৯২।

৬৭। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পোস্টমর্টেম, ১ম খণ্ড, বদরুল ইসলাম মুনীর, চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯২।

৬৮। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৩।

৬৯। আত্মকথা, আবুল মনসুর আহমদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৭।

৭০। রবীন্দ্র-নজরুল রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড।

৭১। বাংলাদেশ ও ভারতে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বিশেষ সংখ্যা ও সাময়িকী।

কান্ডারী হুঁশিয়ার
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, কার অছে হিম্মত?
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ যুগান্তর সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ।।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কান্ডারী! আজ দেখিবে তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলমান" ? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কান্ডারী! বল, ডুবেছি মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥
গিরি সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কান্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যাজিবে কি পথ মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার!
কান্ডারী? তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার ॥
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তারা, দিবে কোন বলিদান?
অজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কান্ডারী হুঁশিয়ার॥
-জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম